বিদ্যাসাগর

VIDYASAGAR
By
VIHARILAL SARKAR

Nabapatra Prakashan
8, Patuatola Lane
Calcutta-9

বিদ্যাসাগর

বিহারীলাল সরকার

নবপত্র প্রকাশন

তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থকারের ভূমিকা

"বিদ্যাসাগরে"র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমার কোন কোন বন্ধু বলেন যে, "বিদ্যাসাগরে"র আরও বেশী সংস্করণ হওয়া উচিত ছিল। আমার লেখার গুণে নহে, বিদ্যাসাগরের নামের গুণে। ইহার আরও বেশী সংস্করণ দেখিয়া যাইব, আমারও এইরূপ আশা ছিল; কিন্তু আশা ফলবতী হয় নাই। তবে দেশে পাঠকবৃন্দের যেরূপ অবস্থা, তাহা ভাবিলে এই যে তৃতীয় সংস্করণ হইল, ইহাকেই আমার ও আমার দেশের সৌভাগ্য বলিয়া মানি।

তৃতীয় সংস্করণ আরও কিছু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার শারীরিক অবস্থা সে পক্ষে কতকটা পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। এই সংস্করণে অনেক জ্ঞাতব্য নূতন বিষয় সংযোজিত করিবার ইচ্ছা ছিল। কতক কতক নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। তাহা বোধহয় পাঠক-দিগকে পক্ষে অপাঠ্য হইবে না, এমন ভরসা আছে। তবে, যতগুলি বিষয় সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প ছিল, শারীরিক অপটুতাবশতঃ তাহা করিতে পারি নাই। যদি ভগবৎকৃপায় ইহার চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য আমার ঘটে, তাহা হইলে, মনের বাসনা অপূর্ণ না থাকিলেও থাকিতে পারে।

দেশের অবস্থা বুঝিলে বুঝিতে হয় যে বাঙ্গালা-পাঠকের নিকট "বিদ্যাসাগরে"র কতকটা আদর হইয়াছে। ইহা বিদ্যাসাগরের নামগুণের পরিচায়ক। ইহা যাঁহার জীবনী, হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া, তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনান্তে তাঁহার গুণগ্রামস্মৃতির উন্মেষণায় অনেকে অনেক ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্রের রচিত মনোজ্ঞ ইংরেজি "বিদ্যাসাগর চরিতে"র যে সূচনাপত্র লিখিয়াছেন, তাহা যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রাম চিত্রপটে জীবন্তভাবে পূর্ণাঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। পরিশিষ্টে তাহার ভাষানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা টাঁকশালের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান সুধী সুবিদ্বান্ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যে কয়টী কথা আমার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সুলেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনের সুখপাঠ্য হইবে ভাবিয়া পরিশিষ্টে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে বিদ্যাসাগর-জীবনের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের

আলোচনা আছে। ইঁহারা কৃতী, যশস্বী, সুধী, সুলেখক! ইঁহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা দেখাইবার ভাষা আমি অকৃতী লেখক কোথায় পাইব?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালে যে সকল শক্তিশালী ব্যক্তি নানাকারণে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত ছিলেন, এমন কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার জন্য বহুগ্রন্থ-প্রণেতা, 'সাহিত্য সংহিতা'র সুযোগ্য সম্পাদক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরেজি জীবন-চরিত-লেখক, আমার প্রীতিভাজন সুহৃৎ শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্রের নিকট আমি ঋণী। এই সকল শক্তিশালী ব্যক্তির মধ্যে অনেকের জীবন-কথা তাঁহার সঙ্কলিত ও সাহিত্যে সম্যক্ সমাদৃত "সরল বাঙ্গালা অভিধান" পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি অনেকের জীবন-কথা সেই অভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র এই তৃতীয় সংস্করণের আদ্যন্ত প্রুফ দেখিয়া এবং আবশ্যকমত ভাষাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাকে যদি সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে এই সংস্করণ বোধ হয়, আমার ইহজীবনে সাধ্যের সীমাবহির্ভূত হইয়া পড়িত।

এবার মুদ্রাঙ্কণের পরিপাটী সাধনসম্বন্ধে সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি; কতকটা সফল হইয়াছি বলিয়া মনে হয়; তবে ঠিক মনের মতনটী যে হইয়াছে, এমন বলিতে পারিব না; যাহা হইয়াছে, তাহা পাঠকের যে একান্ত অপ্রীতিকর হইবে না, এ ভরসা করিতে পারি। এবারও দুই-চারিটি ভুলভ্রান্তি আছে। ভুলভ্রান্তি লইয়া সংসারে আসিয়াছি, ভুলভ্রান্তি লইয়া যাইতে হইবে।—কবে—কোথায় কে বা কি নির্ভুল হইয়াছে? তবে এটা ঠিক, "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।" আমি অবশ্য "বিজ্ঞতমে"র তম রাখিতে পারি না, তবে যদি ইহার পুনঃসংস্করণ এ জীবনে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে সাবধান হওয়া যতটুকু সম্ভব বা সাধ্য, তৎপক্ষে যত্নশীল হইতে ক্রটী করিব না, এখন ইহাই মাত্র বলিয়া রাখিতে পারি। কেহ ইহার ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া দিলে বা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কোন তথ্যের উল্লেখ করিয়া পাঠাইলে, তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা আমার জীবনে নহে, আমার বংশানুক্রমিক জীবনে অনুলিপ্ত হইয়া রহিবে। এখন সুধী পাঠকবর্গ আমার "বিদ্যাসাগর" পাঠ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।

শ্রীবিহারীলাল সরকার

সূচীপত্র

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ত্রিংশ অধ্যায়

একত্রিংশ অধ্যায়

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

সম্পাদকীয় নিবেদন

বিদ্যাসাগর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে তথা বিশাল ভারতে একটি পুণ্য নাম। শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রসঙ্গে সি. ই. বাকল্যাণ্ড তাঁর **Bengal Under the Lieutenant-Governors, Vol. II, 1901, p. 1032—35** গ্রন্থে বলেছেন—

'The name of Pundit Iswar Chandra Vidyasagar C. I. E. will never be forgotten in Bengal. Few men have left such a work as he did for the generations. He combined a fearless independence of character with great gentleness and simplicity of a child his dealings with people of all classes. A stern disciplinarian, he could yet forgive the short comings of other less gifted and less exact than himself. He was a model of patience and perseverence in literary work.'

বিদ্যাসাগরের জন্ম ঊনবিংশ শতকের এক গ্লানিময় বিদেশী শক্তির অধীনতার মধ্যে। জন্ম ১৮২০ ও মৃত্যু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। তাঁর চরিত-কথা নানা জনে নানা ভাবে প্রায় শতাব্দী কালের ব্যবধানে প্রচার করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এখানে সেগুলির আলোচনার স্থান সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে সাংবাদিক ও গ্রন্থকার বিহারীলাল সরকার রচনা করেছেন সুবৃহৎ "বিদ্যাসাগর"। বিহারীলাল প্রথমে মুদ্রণ-শিল্পী হিসাবে অতি সামান্য পারিশ্রমিকে সাংবাদিকের কার্যে প্রবৃত্ত হন। অর্থাভাবে এফ. এ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। সাধ্যমতো আজীবন বঙ্গবাণীর সেবা করেছেন। সেজন্য তাঁকে রীতিমতো অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হয়। সরলভাবে তাঁর অপূর্ব চরিত-কথা বাংলা চরিত-কথা'র এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বখ্যাত "বঙ্গভাষার লেখক" প্রথম ভাগে (১৩১১ সাল) তাঁর এই আত্মচরিত (পৃষ্ঠা ৯১৪-৩৩) লিপিবদ্ধ আছে। এই লেখাটি পরিবর্তিত আকারে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র বিহারীলালের শ্রদ্ধায় স্মরণ অধিবেশনে প্রচারিত হয়। এ ছাড়া ঐ অধিবেশনে গৃহীত কার্যবিবরণে তাঁকে নানাভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়। উৎসাহী পাঠক বিহারীলালের এক বিরাট প্রতিভার পরিচয় পাবেন এইসব প্রকাশনে।

বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণের পর বিহারীলাল সরকারই (১৮৫৫-১৯১১ খৃষ্টাব্দ) প্রথমে সাগর-তর্পণে এগিয়ে আসেন এক বৃহৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে। প্রকাশ করেন কালজয়ী গ্রন্থ "বিদ্যাসাগর"। সাংবাদিক ও গ্রন্থকার যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর "জন্মভূমি"তে লেখক শ্রেণীভুক্ত হন। এই পত্রেই (১২৯৮—১৩০২ সালে) ধারাবাহিকভাবে বিদ্যাসাগর জীবনী প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের জীবিতকালে ও তার পর এই মহাগ্রন্থের চারটি সংস্করণ হয়। সেগুলির প্রকাশ কাল—

১. প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩০২ সাল খৃঃ ১৮৯৫

২. দ্বিতীয় সংস্করণ খৃঃ ১৯০০

৩. তৃতীয় সংস্করণ খৃঃ ১৯১০

৪. চতুর্থ সংস্করণ খৃঃ ১৯২২

নবপত্রের বর্তমান সংস্করণ "বিদ্যাসাগর" ''চতুর্থ সংস্করণ" অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে এই সংস্করণের প্রকাশক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়-এর পরিবেশিত পরিশিষ্টের জীবন-কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। এই মহাগ্রন্থ রচনায় বিহারীলাল নিজের কথায় তাঁর প্রচেষ্টার কথা বিবৃত্ত করেছেন--

"বিদ্যাসাগর" পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, আমি তিনমাস রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম। ''বিদ্যাসাগর" পুস্তকের বিষয় সংগ্রহে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তেমন গুরুতর পরিশ্রম জীবনে আর কখন করি নাই। কত দিন প্রত্যহ সকাল হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া "হিন্দু পেট্রিয়টে"র পঞ্চাশ বৎসরের ফাইল উল্টাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছি কতদিন সংস্কৃত কলেজের ধূলিপূর্ণ গৃহের মধ্যে বসিয়া আলমারি হইতে কীটদষ্ট দূষিত-পুরীষপূর্ণ পঞ্চাশ বছরের পুরাতন খাতাপত্র বাহির করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালা গ্রন্থ ও পুরাতন খাতাপত্র বাহির করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালা ও ইংরেজি সাহিত্যের তুলনা করিবার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে হস্ত লিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে কতদিন অনাহারে কাটাইয়াছি।

"বিদ্যাসাগর" মহাগ্রন্থই বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা আর যে-সব গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত তালিকা এইরূপ—

১. ইংরেজের জয় বা "আর্কট-অবরোধ" ও "পলাশী" কালিকা প্রেস, ১৮৯৬
২. তিতুমীর। কালিকা প্রেস, ১৮৯৭
৩. গান। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯০২
৪. ভরতপুর যুদ্ধ। বঙ্গবাসী প্রেস, ১৯০৬
৫. মহারাণী স্বর্ণময়ী। বঙ্গবাসী প্রেস, ১৯০৭
৬. বঙ্গেবর্গী। বঙ্গবাসী মেশিন প্রেস, ১৯০৮
৭. স্বর্গীয় রায়সাহেব বিহারীলাল সরকার, ১৯২১
৮. শকুন্তলা তত্ত্ব

সম্প্রতি বিহারীলালের একটি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সম্পাদকীয় ভূমিকার বিহারীলালকে পর-পর তথা ইংরেজের অনুগামী তথা দেশবৈরী হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই সম্পাদক বিহারীলালের আত্মস্মৃতি যা "বঙ্গভাষার লেখকে" রয়েছে, সেটি দেখেননি। এ ছাড়া বিহারীলালের শোক-সভা ও চিত্র প্রতিষ্ঠার কার্য-বিবরণের "শ্রদ্ধাঞ্জলি" অংশও দেখতে পাননি। এর অস্তিত্ব তাঁর জানা নেই।

এর ফলে তিনি বিহারীলালকে বিচার করতে পারেননি। প্রথম জীবনে বিহারীলাল "অন্ধকূপ হত্যা" মিথ্যা রটনা নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর আরাধ্য দেবতা বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করেছেন। ১৯১৫, জুন ভারত সম্রাটের জন্মদিনে 'রায় সাহেব' উপাধি পেয়েছেন। এজন্য তাঁকে তিরস্কার করতে হবে? এই সাহিত্য-সাধক বিহারীলাল আজীবন ছিলেন—'সত্য-সুন্দর মঙ্গলে'র পূজারী।

বিহারীলালকে সরকার থেকে রায় সাহেব উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এই উপাধি দেওয়া সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী সরকারী কাগজ পত্রে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া এই উপাধি পাওয়ার জন্য বিহারীলাল ব্যক্তিগতভাবে কিছু করেননি। তাঁর সমসাময়িক গ্রন্থকার জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতি লেখকদের সরকারী উপাধি পাওয়া সম্বন্ধে সরকারী মনোভাব কি ছিল সেটা দেখতে অনুরোধ করি। বিগত মৃত সাহিত্য সাধককে এভাবে তা প্রমাণ করা আজকাল একটা ফ্যাশান হয়েছে।

বিদ্যাসাগর প্রয়াণে বাঙালী তথা ভারতবন্ধু স্টেটসম্যান পত্রিকা যে উচ্চ সাংবাদিক সততার মনোভাব প্রকাশ করেন সেটি উপসংহার হিসাবে দেওয়া হল।

THE SEA IS DRY

From THE STATESMAN dated 30th July, 1881.

FOLLOWING closely on the death of Raja Rajendralala Mitra comes the news that another of the foremost men of Bengal has gone over to the majority. The venerable Pundit Iswar Chandra Vidyasagar, so well known as the leader of the widow marriage movement in Bengal, is dead, and by his death the cause of Indian social reform has lost one of its most ardent advocates. It is now some years since the larned pundit retired into private life to pass his declining years more as a student than a public man, but at one time he was the most active social reformer in Bengal and to the last his influence in that direction was felt and was always sought, His retirement from public life was due, he used to say, to his loss of faith in the moral courage and earnestness of his educated countrymen ; and yet with this sense of discouragement of him he still remained true to his convictions in spite of much ungenerous mis-judgment and at times even persecution, for there have been few of his countrymen who have more earnestly striven to make their example accord with their precepts.

*

যুগে যুগে বিদ্যাসাগর চরিত-কথা নানাভাবে প্রচারিত হয়েছে। বিহারীলালের "বিদ্যাসাগর" এমন একটি কালজয়ী গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। প্রায় ষাট বছর পরে এটির পুনঃপ্রচার হল।

১৪ মন্মথ দত্ত রোড
কলকাতা—৩৭

সনৎকুমার গুপ্ত

অবতরণিকা

দ্বিতীয় দাতা-কর্ণ এবং দয়ার সাগর অনাথ-বান্ধব বঙ্গের "বিদ্যাসাগর", ১৮৯১ খৃঃ অব্দে ২৯শে জুলাই বা ১২৯৮ সালে ১৩ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য,—"বিদ্যাসাগর" বলিলে, ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই বুঝায়। সেই বিশ্ব-বিশ্রুত "বিদ্যাসাগর" ত্রিংশৎ বৎসর হইল, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ কর্ম্মক্ষেত্রে সেই কর্ম্ম-শূর আপন কর্ম্ম সাধন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পতর ভাগ্যহীন ব্যক্তিবর্গকে কর্ম্মের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া, স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। জীবমাত্রের এই অবস্থা। সেই আদ্যা শক্তি মূলা প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। অবোধ মায়াময় জীব আমরা, মায়া-মুগ্ধ হইয়া, এ সব তত্ত্ব বুঝিয়াও, বুঝিতে পারি না। এ অনিত্য সংসারে কেবল বিয়োগবিলাপে অধীর হইয়া পড়ি। তাই বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতে এখনও বিয়োগ-বাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যে যায়, সে ত আর আসে না। যায়, কিন্তু স্মৃতি যে জাগে। স্মৃতি ত নয়, সে যে জ্বালাময়ী জ্বালা। সে জ্বালা জুড়াইব কিসে?

যাঁহার করুণায় শত শত নিরন্ন নিরাশ্রয়, অন্নাশ্রয় পাইত; যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, অগণিত অনাথ আতুর দীন হীন দুঃস্থ দরিদ্র অসহায় আত্মীয়-নির্বিশেষে প্রতিপালিত হইত; যাঁহার অপার দয়া-দাক্ষিণ্যে কপর্দ্দকহীন অধমর্ণ, উত্তমর্ণের নিদারুণ নিপীড়ন হইতে রক্ষা পাইত; যাঁহার সহৃদয়তাগুণে মল-মূত্রপূরিত পরিত্যক্ত রুগ্ন পথিক, গৃহে আনীত হইয়া যথাযোগ্য ঔষধ-পথ্য পাইত; যাঁহার জ্বলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্তে অতিবড় কু-পুত্রও অতুল মাতৃভক্তি শিক্ষা পাইত; যাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদম্য উদ্যম-উৎসাহ, অকুণ্ঠিত নির্ভীকতা, অলৌকিক শ্রমাকুণ্ঠিতা, অসীম কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, অমানুষিক সরলতা দেখিয়া বিদেশী প্রবাসী লোকেও সবিস্ময়ে সহস্র বার মস্তক অবনত করিত, সেই ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান্ পুরুষ লোকান্তরিত! বল দেখি, তাঁহার স্মৃতি পাসরি কিসে?

এখনও চারি দিকে কত কাঙালের পর্ণ-কুটীরে পূর্ণ হাহাকার! এখনও কত অনাথাশ্রমে আকুল প্রাণের মর্ম্মভেদী গভীর চীৎকার! সে সব কথা ভাবিলে চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়! সেই করুণপ্রতিম অনুপম করুণাময়ের কথা স্মরণ হইলে হৃদয়ের শোক-সাগর উথলিয়া উঠে।

বিদ্যা-বুদ্ধিতে "বিদ্যাসাগর" অপেক্ষা বড় অনেক থাকিতে পারেন; কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্যে তাঁহা অপেক্ষা বড় অতি অল্প লোক দেখিতে পাই। এমন নিরন্নের

অন্নদাতা, ভয়ার্ত্তের ভয়ত্রাতা, বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা এবং দীন-হীনের দয়াল পালক পিতা, এ কলিযুগে, এ সংসারে বড় বিরল। তিনি যে দয়ার অপূর্ব্ব অবতার! তিনি যে মূর্ত্তিমতী দয়ার পূর্ণ পুরুষকার। হৃদয়-বলে "বিদ্যাসাগর" বঙ্গের বিরাট পুরুষ।

এক জন বড় লোক হইলে, সমগ্র দেশ বা জাতি বড় বলিয়া সম্মানিত হয়। মার্কিণ গ্রন্থকার দার্শনিক এমারসন্ বড় লোকদের কথায় বলিয়াছেন,—

"The race goes with us on their credit."

এ কলুষময় কলিকালে, দানে পূর্ণ "সাত্ত্বিকতা" সুদুর্লভ; বিদ্যাসাগরের দানে কিন্তু সাত্ত্বিকতার পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার "বিধবা-বিবাহ" প্রচলন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে হিন্দু-সাধারণে একমত হইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার দয়া-প্রণোদিত দানের সাত্ত্বিকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দানে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। শাস্ত্রে আছে,—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"
—গীতা ১৭। ২০।

দান করিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, অপকারীকেও যে দান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে।

এরূপ সাত্ত্বিকভাবাপন্ন দানের পরিচয় বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্তে পুনঃ পুনঃ পাইবেন। বিদ্যাসাগর দান করিতেন, জানিতেন কেবল দাতা ও গ্রহীতা। দানের পৌরুষ-প্রকাশে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি দান করিতেন, নামের জন্য নহে। দরিদ্রের সেবা এবং রুগ্নের শুশ্রূষা কেবলমাত্র তাঁহার অকাম-কল্পিত নিত্য ক্রিয়া ছিল। দেনায় দায়ে ঋণী জেলে যাইতে যাইতে পথে বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া, বাষ্পাকুললোচনে কাতরভাবে তাঁহার পানে একবার তাকাইলে, চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত। কপর্দ্দক হস্তে না থাকিলেও, তদ্দণ্ডে তিনি ঋণ করিয়া ঋণীর ঋণ পরিশোধ করিতেন।

এরূপ দান অবশ্য সংসারের পক্ষে সকল সময় সর্ব্বথা অনুকরণীয় ও প্রবর্ত্তনীয় নয়। ইহাতে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। বিলাতী কবি গোল্ডস্মিথ্ কতকটা এইরূপ দানশীলতায় মধ্যে মধ্যে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্য কখন সেরূপ হইতে হয় নাই। হইলেও ইহা যে স্বাভাবিকী সহৃদয়তার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ কি?

প্রাসাদ-বিহারী কোটিপতি হইতে "কর্ম্মটাড়ে"র পর্ণকুটির-বাসী অশিক্ষিত দীন হীন সাঁওতাল পর্য্যন্ত জানিত,—"বিদ্যাসাগর দয়ার অবতার।" এই জন্য তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ, পারসিক, সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব জাতির সমান বরণীয় এবং মাননীয়। তাঁহার বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে যাঁহারা বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তাহারাও ঐ কার্য্য অতিমাত্র দয়া-প্রবণতার ফল বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিহীন হন নাই। সে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর কোথায়! সে দানবীর সর্ব্বজনসমাদৃত বিদ্যাসাগর কোথায়!

যখন শোকের দারুণ শক্তিশেল বুকের উপর, যখন যাতনার অগ্নিস্তূপ মর্ম্মের ভিতর, তখন "জন্মভূমি" পত্রিকায় এ অধম লেখকের উপর বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখিবার ভার পড়িয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, জ্বালা জুড়াইলে, সম্পূর্ণ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইব। জ্বালা জুড়াইল না; পাঠকগণ কিন্তু অধীর; কাজেই জীবনীর অসম্পূর্ণ উপকরণ লইয়া "জন্মভূমি"তে জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে কারণে "জন্মভূমি"তে জীবনী লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, সেই কারণে জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করি।

পুস্তকের উপকরণ সম্পূর্ণ না হউক, অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। সে বিরাট পুরুষের জীবনীর সম্পূর্ণ উপকরণ সংগ্রহ একরূপ সাধ্যাতীত। তবে ইহাতে যথাজ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাব যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি।

জীবনী লেখা হইয়াছে বটে; কিন্তু একেবারে নির্দ্দোষ হইবার সম্ভাবনা কম। কাহারও জীবনী লিখিতে হইলে, গুণাধিক্যের সঙ্গে দোষেরও সম্যক্ সমালোচনায় সমদর্শিতার সম্মান সংরক্ষিত হয়। মৃত ব্যক্তির গুণ ভালবাসার জিনিস; দোষ নিন্দার্হ। কবি সাদে বলিয়াছেন,—

"Their virtues love, their faults condemn."

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুগুণান্বিত হইলেও কেহ কেহ তাঁহার কোনও কোনও কার্য্যে দোষারোপ করিতেন এবং অনেকেরই বিশ্বাস যে, সেই দোষ তাঁহার ভ্রান্তবিশ্বাস-মূলক। কিন্তু তাহা সত্য হইলেও বহুগুণের সমাবেশে তাঁহার গুণের গরিমাই উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যাহাই হউক এ সময়ে দোষের সম্যক্ সমালোচনা করা নানা কারণে অনুচিত। ডাক্তার জনসন্ বলিয়াছেন যে, "যাঁহার জীবনী লিখিতে হয়, কেবল তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বল ভাগই সমালোচনা করা উচিত নহে; তাহা হইলে তাঁহার অনুকরণ অসম্ভব হইয়া উঠে।" তাঁহারও কিন্তু সে সাহসে কুলায় নাই। তাঁহার সময়ে যে সব কবি ছিলেন, তাঁহাদের

অনেকের অনেক কথা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা এই ছিল,

"Walking upon ashes under which the fire was not extinguished."

"অনলাভ্যন্তর ভস্মস্তূপে বিচরণ করিতেছি।"

সকল দোষত্রুটির সমালোচনা করা অসম্ভব হইলেও, আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন্ কোন্ কার্য্যের জনমত কিরূপ ছিল, তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। যাহার অনুকরণে সম্প্রদায়-বিশেষের মহতী ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনেকে দৃঢ়-মত পোষণ করেন, তাহা প্রদর্শন না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। গুণরাশির সমালোচনা ত অবশ্য কর্ত্তব্য ; যেহেতু তাহা একান্ত অনুকরণীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও, কি গুণে সম্রাট-মুকুট-লাঞ্ছন কীর্ত্তির অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্মান্ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান কালে অনেকে অবগত নহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সমালোচনায় তাহা উদ্ঘাটিত হইবে। সেই হেতু এ জীবনী বোধ হয় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লোকসমূহের কথঞ্চিৎ উপকারক ও উপাদেয় হইতে পারিবে।

যে গুণসংঘাত জন্য লোকের জীবনী লেখা আবশ্যক হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে গুণ অনেক ছিল। যে গুণ থাকিলে, মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে চাহে এবং যে গুণ থাকিলে, মানুষ বাহ্য জগৎ ভুলিয়া, সেই গুণবানের সম্পূর্ণ সত্তায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে, সে গুণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক ছিল। যিনি এক উদ্ভাবনায় চিন্তারাজ্যের সহস্র পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তাঁহার জীবনী লেখা আবশ্যক হয়। পাঠক! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবনাশক্তির পরিচয় পাইবেন। যিনি প্রতিভাবলে প্রকৃতির উচ্চ স্তরে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে উন্নতির সহস্র পথের যে কোন পথ দেখাইয়া থাকেন, আর নিম্ন স্তরের লোকসমূহ তাঁহাকে ধরিবার জন্য স্তর বাহিয়া উঠিতে চেষ্টা করে, তাঁহার জীবনীর প্রয়োজন আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীপাঠে এ কথার সার্থকতা সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইবে। প্রকৃত প্রতিভায় "চৌম্বক" আকর্ষণের অসীম শক্তি। মানুষ যেখানে যত দূরেই থাকুক, আকর্ষণ এড়াইবার যো নাই। যেখানে এরূপ একটি "চুম্বক" থাকিবে,, সেইখানে কোটি জীব আকৃষ্ট হইবে।

প্রতিভা স্বর্গের দেবতা। প্রতিভা পূজক সর্ব্বস্ব দিয়া প্রতিভার পূজা করিয়া থাকেন। চিন্তাশীল এমারসন্ বলিয়াছেন,—"তুমি বল,—ইংরাজ কাজের লোক, জর্ম্মাণ সহৃদয় অতিথি-সেবক,—ভালেন্‌সিয়ার জলবায়ু অতি মনোরম,—

সক্রেমেণ্টো পাহাড়ে প্রচুর সোণা পাওয়া যায়; কথা ঠিক বটে; কিন্তু আমি এ সব সুখশালী, ধনী এবং অতিথি-সেবক লোকদিগকে দেখিতে বা নির্ম্মল জল বায়ুর সেবন করিতে অথবা বহুব্যয়ে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে চাহি না। তবে প্রকৃত জ্ঞানশালী ও শক্তিমান্ ব্যক্তিবর্গের আবাসভূমি দেখাইয়া দিতে পারে, এমন যদি কোন চুম্বক-প্রস্তর প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করি এবং অদ্যই পথে বাহির হইয়া পড়ি।"

প্রকৃত শক্তিশালী এবং গৌরবান্বিত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পূজনীয়। তাঁহারা মানুষের আদর্শ। তাঁহারা প্রকৃতির সূক্ষ্ম শক্তির পরিচায়ক। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের শক্তি বিসর্পিত। তাঁহাদের সহবাসে মানুষ সন্তুষ্ট ও শক্তিসম্পন্ন হয়। ভাবে বা কার্য্যে মানুষ তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে চাহে। আমাদের সন্তানসন্ততি বা নগর গ্রামের নামকরণ, তাঁহাদের নামে হইয়া থাকে। ভাষায় তাঁহাদের নামের ভূরি ভূরি প্রয়োগ পাইবে। তাঁহাদের প্রতিকৃতি বা গ্রন্থাদিরূপ কার্য্যাবলী আমাদের ঘরে ঘরে দেখিবে। আমাদের নৈতিক কার্য্যে তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে। তাঁহাদের অন্বেষণ যুবার স্বপ্ন এবং বর্ষীয়ানের জাগরণ কার্য্য। যতদূরে থাকি না, তাঁহাদিগকে কার্য্যকলাপ এবং সম্ভবপর হইলে, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য মন স্বতঃই ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এইরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনী প্রয়োজনীয়। এই জন্য এমারসন্ বলিয়াছেন,—

"The genius of humanity in the real subject whose biography is written in our annals."

প্রতিভা মানবের প্রকৃত পদার্থ। প্রতিভাশালীর জীবন ইতিহাসে লিখিত হইয়া থাকে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে এমন প্রতিভার বহু পরিচয় পাইবেন। এক একটি প্রতিভাশালী ব্যক্তি যেমন এক একটি বিভাগ অধিকার করিয়া থাকেন, তেমনই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকৃতির এক বিশাল বিভাগ লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন। মনোবৃত্তির উচ্চ ক্রিয়ানিবন্ধন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ধ্যানমাত্রে কল্পনায় অন্য সাধারণের অলক্ষ্যে প্রকৃতির সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লন। এই জন্য প্লেটো, সেক্সপিয়র, সুইনবর্ণ, গ্যেটে প্রভৃতির এত প্রতিষ্ঠা।

মস্তিক ও হৃদয়ের কার্য্যফল অব্যর্থ। জ্ঞান ও ভাবের শক্তি চিরন্তন ধ্রুব সুখদায়িনী। এ শক্তির তেজ পরীক্ষা করিতে হইলে শক্তিশালী পুরুষের জীবন পড়িতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু কার্য্যে এ শক্তির প্রমাণ আছে।

বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা স্যর ওয়ালটর র‍্যালের সম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সচিব লর্ড সিসিল বার্লে বলিয়াছিলেন,—

"I know he can toil terribly."

ওয়ালটর ভয়ানক পরিশ্রম করিতে পারেন। এ কথা শুনিলে যেন বৈদ্যুতিক প্রভাবে সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠে। পাঠক! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, বার্লের এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে খাটে কি না। হামডেন্ সম্বন্ধে বিখ্যাত বিলাতী ইতিহাস-লেখক ক্লারেনডন্ বলিয়াছেন,—

"Who was of an industry and vigilance not to be tired out or wearied by the most laborious; and of parts not to be imposed on by the most subtle and sharp, and of a personal courage equal to his best parts."

হামডেন্ অকাতরে পরিশ্রম করিতেন, তাঁহার সংপ্রবুদ্ধা তীক্ষ্ণদর্শিতা বিলক্ষণ ছিল। তিনি অতি পরিশ্রমে কাতর ও ক্লান্ত হইতেন না। চতুর তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেন না। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও উদ্যমশীলতা, শারীরিক সাহস ও মানসিক বল সমান ছিল।

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের ভক্ত অনুচর ফক্ল্যাণ্ড সম্বন্ধেও ক্লারেন্ডন্ বলিয়াছেন,—

"Who was so severe an adorer of truth, that he can as easily have given himself leave to steal, as to dissemble."

ফক্ল্যাণ্ড এমন সুদৃঢ় সত্যপরায়ণ ছিলেন যে চুরি করা তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব, আত্মগোপন করাও তদ্রূপ অসম্ভব।

চীন দার্শনিক লু সম্বন্ধে চীন দার্শনিক মেনসয়াস্ বলিয়াছিলেন,—

"লুর ব্যবহারের কথা শুনিলে অতি নির্ব্বোধেরও বোধের সঞ্চার হয় এবং অস্থিরচিত্তেরও একাগ্রতা উপস্থিত হয়।"

বিদ্যাসাগর-জীবনে একাধারে এই হামডেন্, ফক্ল্যাণ্ড এবং লুর চরিত্র সমাবেশিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী হইতে এই সকলের শিক্ষা হয়। ইহা জীবনীর নৈতিক সার। এই জন্যই কার্লাইল্ বলিয়াছেন,—

"Not only in the common speech of men, but in all art too —which is or should be concentrated and conserved essence

of what men speak and show—Biography is almost the one thing needful."

কেবল যে মানুষের সাধারণ কথাবার্ত্তার জন্য জীবনী আবশ্যক হয়, তাহা নহে, মানুষ যাহা কথায় বলে এবং কার্য্যে দেখায়, সেই সকল বিষয়ের সার অংশটুকুর জন্য জীবনী অত্যন্ত আবশ্যক।

এই জন্য বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রয়োজনীয়। আধুনিক জীবন-লিখন-প্রথা বিদেশীয় অনুকরণ। বিদেশী শক্তিশালী বড়লোকমাত্র বিদ্যাসাগরের প্রীতিপাত্র ছিলেন; অতএব বিদেশীয় শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার তুলনা অযৌক্তিক নহে। কোন না কোন বিদেশীয় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কোন না কোন গুণ তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত।

"বিদ্যাসাগর চরিত" নামে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত অসম্পূর্ণ জীবনী তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি লইয়া ইহা রচিত। নারায়ণবাবু লিখিয়াছেন,—"যদি তাঁহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস নিজে লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার জীবন-চরিত সম্পূর্ণ করা সহজ হইত।" নিজের জীবনী নিজে লিখিলে জীবনবিবরণ যে সম্পূর্ণ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এতদ্ব্যতীত জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির ভাষা, মনোবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, রীতি, নীতি প্রভৃতির অনেক আভাস পাইবার সুবিধা ও সুযোগ হয়। জনসনের জীবনী লিখিতে বসিয়া জীবনীলেখক বসওয়েল বলিয়াছেন,—

"Had Dr. Johnson written his own life in conformity with the opinion which he has given, that every man's life may be best written by himself, had he employed in the preservation of his own history, that clearness of narration and elegance of language in which he has embalmed so many eminent persons, the world would probably have had the most perfect example of biography that was ever exhibited."

ডাক্তার জনসন্ বলিতেন,—"নিজের জীবন-বৃত্তান্ত মানুষ নিজে উত্তম লিখিতে পারেন। তিনি যে বিশদ বর্ণনায় এবং সুন্দর রচনায়, বহু সংখ্যক কীর্ত্তিকুশল ব্যক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যদি স্বয়ং নিজের ইতিহাস লিখিতেন, তাহা হইলে জগৎ তাঁহার নিকটে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন জীবনীর উত্তম দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারিত।"

কথাটা ঠিক বটে ; কিন্তু আত্মকথার সূক্ষ্ম সমালোচনা হওয়া দুষ্কর। সে ভার বাহিরের লোককে লইতে হয়। আত্মদোষের উদ্ঘাটনে সাহস কয় জনের হইয়া থাকে ? রুসোর "কনফেশন্" অর্থাৎ ত্রুটী-স্বীকার, দুরন্ত দুঃসাহসিকতার কাজ। ভলটেয়ার ঠিকই বলিয়াছেন,—

"There is no man, who has not something hateful in him—no man who has not some of the wild beast in him. But there are few who will honestly tell us how they manage their wild beast."

জগতে এমন কোন মানুষ নাই, যাঁহার কিছু দোষ নাই ; এমন মানুষ নাই, যাঁহাতে ঘৃণার্হ কিছুই একেবারেই নাই বা যাহার পাশব-বৃত্তি নাই, কিন্তু সেই প্রবল পাশববৃত্তি জীবনে কেমন করিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, কয়জন লোকে তাহা অকপটে বলিতে পারে ?

মানুষের এমন দোষ ও ত্রুটী থাকিতে পারে যে, তাহা বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিতেও দ্বিধা হয়। বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার শ্যামফোঁ বলিয়াছেন,—

"It seems to me impossible, in the actual state of society, for any man to exhibit his secret heart, the details of his character as known to himself, and above all, his weaknesses and his vices, to even his best friend."

ইহার ভাব এই,—

সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে আমার মনে হয়, মানুষ নিজের হৃদয়ের গূঢ় কথা, অথবা যাহা কেবল অন্তরাত্মাই জানেন, আপনার সেই প্রকৃত চরিত্রের গুপ্ত কথা, আপনার মানসিক দুর্বলতা এবং পাপের কথা তাহার অন্তরঙ্গ অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর নিকটেও বলিতে পারে না।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনীতে সকল সন্দেহ দূর হয় না। স্কট, মুর এবং সাদে আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানাবিধ সঙ্কোচ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করেন। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ সত্যপরায়ণ ছিলেন, তাহাতে তিনি সত্যপ্রকাশে যে অকুণ্ঠিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম অধ্যায়

জন্মস্থান, পূর্ব্ব-বংশ, পিতৃ-পরিচয়, মাতৃ-পরিচয়, পিতামহ-মাহাত্ম্য,
মাতৃব্যাধি ও গর্ভ-লক্ষণে জ্যোতিষী

মেদিনীপুর জেলার অন্তবর্ত্তী বীরসিংহ গ্রাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান। পূর্ব্বে ইহা হুগলী জেলার অন্তর্ভূত ছিল। ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর স্যার জর্জ কাম্বেলের সময় ইহা মেদিনীপুরের অন্তর্ভূত হয়। স্যার জর্জ কাম্বেলের শাসন-কাল,—১৮৭১—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরসিংহ গ্রাম কলিকাতা হইতে ২৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। কলিকাতা হইতে জলপথে বীরসিংহ গ্রামে যাইতে হইলে গঙ্গা, রূপনারায়ণ নদী প্রভৃতি বহিয়া গিয়া ঘাটালে উপস্থিত হইতে হয়। ঘাটাল হইতে বীরসিংহ গ্রাম আড়াই ক্রোশ।*

বীরসিংহ গ্রাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান বটে; কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতামহ বা তৎপূর্ব্ব-পুরুষদিগের জন্মস্থান নহে। তাঁহাদের জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত বনমালিপুর গ্রাম। এই গ্রাম তারকেশ্বরের পশ্চিমে ও জাহানাবাদ মহকুমার পূর্ব্বে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখন ইঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইঁহাদের অবস্থা-তুলনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীর গুরুত্ব সবিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। এতৎসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল।

"প্রপিতামহ-দেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান। জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহত্যাগের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত রামজয় তর্কভূষণের কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল।...তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক কালে, দেশত্যাগী হইলেন।

* বি. এন. রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারে চড়িয়া ঘাটাল যাইবার সুবিধা ছিল। ষ্টীমারের সুযোগে তখন এক দিনে বীরসিংহ গ্রামে যাওয়া যাইত। যখন ষ্টীমার চলিত না, তখন নৌকা করিয়া যাইতে চারি পাঁচ দিন লাগিত। স্থলপথে যাইতে হইলে গঙ্গার পরপারে শালিখার বাঁধা রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। দুই দিনে পৌছান যায়। আজকাল হাওড়া হইতে কোলা পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে যাওয়া যায়।

"বীরসিংহ গ্রামে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।...রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গা দেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস; জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

"রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; দুর্গা দেবী পুত্রকন্যা লইয়া বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই দুর্গা দেবীর লাঞ্ছনাভোগ ও তদীয় পুত্রকন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল যে, দুর্গা দেবীকে পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয়ে যাইতে হইল।...কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গা দেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এজন্য সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল।...

"কিছু দিনের মধ্যেই পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গা দেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ।... অবশেষে দুর্গা দেবীকে পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে এক কুটীর নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গা দেবী পুত্রকন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থিত ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরকায় সূতা কাটিয়া, সেই সূতা বেচিয়া অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের দিন গুজরান করিতেন। দুর্গা দেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন।...তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা নিজের, দুই পুত্রের ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহাদের আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

"সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য

ছিলেন, তাঁহার অনুগ্রহে ও সহায়তায় তিনি, কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়েন। ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন এবং কি জন্য আসিয়াছেন, অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, তিনি অকাতরে অন্ন-ব্যয় করিতেন, এমন স্থলে, দুর্দ্দশাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক, ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

"ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়ন-বিষয়ে, সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি, সংস্কৃত পড়িবার জন্য, সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে, এবং সর্ব্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন, যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন, সংস্কৃতপাঠে প্রাণপণে যত্ন করিব; কিন্তু, জননীকে ও ভাই-ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে, একেবারে অপসারিত হইত। যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জ্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়া-শুনা করাই কর্ত্তব্য।

"এই সময়ে, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম্ম হইত। এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইঙ্গরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্য্যোপযোগী ইঙ্গরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিতেন; সুতরাং, দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য, তিনি ঠাকুরদাসকে সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে, ঠাকুরদাস, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকটে গিয়া ইঙ্গরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরি লোকের আহারের

কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস ইঙ্গরেজী পড়ার অনুরোধে সে সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া তিনি দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছ কেন? তিনি কি কারণে সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে সেই স্থানে শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস, যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং পর দিন অবধি তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

"এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। তিনি দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জ্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের নির্বিঘ্নে, দুই বেলা আহার ও ইঙ্গরেজী পড়া চলিতে লাগিল। কিছু দিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে তদীয় আশ্রয়-দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব্ব হইয়া গেল; সুতরাং, তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি, প্রতিদিন, প্রাতঃকালে বহির্গত হইতেন এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনও দিন দেড় প্রহরের, কোনও দিন দুই প্রহরের, কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন, যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে, কোনও দিন বা সচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত।

"ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ একখানি পিতলের থালা ও একটী ছোট ঘটী ছিল। থালাখানিতে ভাত ও ঘটীটিতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সার সালপাত কিনিয়া রাখিলে, ১০/১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক; সুতরাং থালা না থাকিলে, কাজ আট্‌কাইবেক না, অতএব, থালাখানি বেচিয়া ফেলি; বেচিয়া যাহা পাইব, তাহা আপনার হাতে রাখিব। যে দিন, দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই

স্থির করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নূতন বাজারে, কাঁসারিদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাঁসারিরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিব না, পুরাণ বাসন কিনিয়া কথনও, কথনও বড় ফেসাতে পড়িতে হয়। অতএব আমরা তোমার থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস বড় আশা করিয়া, থালা বেচিতে গিয়াছিলেন ; এক্ষণে, সে আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

"এক দিন, মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন ; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে স্বধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন ; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।* ...

"যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস সেই সেই

* পিতা ঠাকুরদাসের মুখে এই উপাখ্যান শুনিয়া স্ত্রীজাতির উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি চিরকাল ভক্তিমান্।

দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।...

"কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায় মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, যথানিয়মে জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও যার-পর-নাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া সকল কর্ম্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন; এজন্য, ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

"দুই তিন বৎসরের পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাইভগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী পুত্র কন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহ আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে, বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন; এজন্য কিছু দিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গা দেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহ-গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।

"বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে, তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটায় উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার

লইতেছি ; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার কোনও অংশে অসুবিধা ঘটিবেক না।

"এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ; এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি ঠাকুরদাসের আহারক্লেশের অবসান হইল। যথাসময়ে আবশ্যকমত, দুই বেলা আহার পাইয়া তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভ ঘটনার দ্বারা, তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল, এরূপ নহে, সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে শুনিয়া তদীয় জননী দুর্গা দেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

"এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাট-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয় কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন।* এই ভগবতী দেবীর গর্ভে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ভগবতী দেবী, শৈশবকালে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।"

রামকান্ত তর্কবাগীশ শব-সাধনায় সিদ্ধ হইতে গিয়া উন্মাদগ্রস্ত হইয়া যান। এই জন্য পাতুলগ্রাম-নিবাসী তদীয় শ্বশুর পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে সস্ত্রীক নিজ ভবনে আনিয়া রাখেন। বহুবিধ চিকিৎসাতে তর্কবাগীশ মহাশয় আরোগ্য লাভ করেন নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী সেই জন্য মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা। ভগবতী দেবী কনিষ্ঠা। ভগবতী দেবীর জননীর নাম গঙ্গা দেবী। ইনি পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চারি পুত্র ও আর একটি কন্যা ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সত্যবাদিতা ও সরলতা চির-প্রসিদ্ধ। তিনি এই গুণ পিতা ও পিতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। পিতামহ, রামজয় তর্কভূষণ অসীম তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না এবং পরশ্রী-কাতর ব্যক্তিবর্গের ভ্রুকুটী

*শুনিয়াছি, এই সময়ে ঠাকুরদাসের কনিষ্ঠ কালিদাস কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কার্য্যক্ষম হইলে, তাঁহাকে নিজ কার্য্যে রাখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে, রেশম ও তৎপরে বাসনের ব্যবসায় করেন। কনিষ্ঠ দ্বারা সুন্দররূপে না চলায়, তিনি আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্বর স্বকর্ম্মে নিযুক্ত হন।

ভঙ্গীতে ভীত হইতেন না। তিনি এইরূপ স্বাধীন প্রকৃতি লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্যালক ও তৎপক্ষীয় লোক তাঁহার বিপক্ষ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—'এদেশে মানুষ নাই, সবই গরু।' তিনি যেমন সৎসাহসী তেমনই নিরহঙ্কার ও সত্যবাদী ছিলেন। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের একটু রসিকতারও পরিচয় লউন—একদিন গ্রামের পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, একজন বলিল,—"ও পথ দিয়া যাইবেন না,—বড় বিষ্ঠা।" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—"বিষ্ঠা কৈ ? সবই ত গরু।" কথিত আছে, তিনি যখন গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটন করেন, এমন একদিন রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখেন,—"তোমার পরিবার তোমার জন্মস্থান বনমালিপুর পরিত্যাগ করিয়া বীরসিংহ গ্রামে বাস করিতেছে। তাহাদের এখন কষ্টের একশেষ।" ইহার পর রামজয় প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় পরিবারগণের ভার গ্রহণ করেন।*

বীরসিংহ গ্রামের ভূস্বামী তাঁহাকে তাঁহার বাস্তুভিটার ভূমিটুকু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিতে চাহেন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনও তাঁহাকে তৎগ্রহণার্থ অনুরোধ করেন। তেজস্বী রামজয়ের বিশ্বাস ছিল যে, নিষ্কর ভূমিতে বাস করিলে ভূস্বামী তাঁহার পুণ্যাংশ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার অহঙ্কার বাড়িবে। এইজন্য রামজয় নিষ্কর ভূমি লইতে সম্মত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত জীবন-চরিতে পিতামহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।†

"তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি একাহারী। নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন।"

রামজয়ের হৃদয়ের বল যেমন ছিল, তাঁহার শারীরিক বলও তেমনই ছিল। মনের বল থাকিলে, দেহের বল যেন আপনি আসিয়া পড়ে। দেহ মনের এমনই নিত্য নিকট সম্বন্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি;—পিতামহ রামজয়ের কথা কর্ণে শুনিয়াছি। রামজয় সর্ব্বদাই লৌহদণ্ড হস্তে নির্ভীক চিত্তে ভ্রমণ করিতেন। এক সময়ে তিনি বীরসিংহ হইতে মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে এক ভল্লুককে দেখিয়াই এক বৃক্ষের অন্তরালে

* বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত জীবন-চরিতে এ কথার উল্লেখ করেন নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজ গ্রন্থে বলিয়াছেন।

† এ সম্বন্ধে অবশ্য দার্শনিকদের ভিতরই মতভেদ আছে। সে সব কথা লইয়া এ প্রবন্ধে বিচার করিবার সময় নাই।

দণ্ডায়মান হন। ভল্লুকও তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল। ভল্লুক যেমন হস্ত প্রসারণ করিয়া ধরিতে যাইল, তিনি অমনি তাঁহার দুইটী হাত ধরিয়া বৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভল্লুক মৃতপ্রায় হইল। রামজয় তাহাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। ভল্লুক কিন্তু তাঁহার পশ্চাৎ-ভাগে নখরাঘাত করে। রামজয় তখন অনন্যোপায় হইয়া হস্তস্থিত লৌহদণ্ড-আঘাতে তাহার প্রাণনাশ করেন। তাঁহাকে প্রায় মাসাধিক নখরাঘাতের ক্ষত ভোগ করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নখরাঘাতের চিহ্ন ছিল।

ঠাকুরদাস কার্য্যক্ষম হইলেই রামজয় পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। বিদ্যাসাগরের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি আবার ফিরিয়া আসেন।

রামজয় যখন বীরসিংহ গ্রামে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার পুত্রবধূ ভগবতী দেবী গর্ভবতী; কিন্তু উন্মাদগ্রস্তা।* ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি উন্মাদগ্রস্তা হন। দশ মাস কাল এই উন্মাদ-অবস্থাই ছিল। বিচিত্র ব্যাপার! দশ মাস কাল নানা চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয় নাই; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রসব করিবার পরেই ভগবতী দেবী রোগমুক্তা হন। তিনি আর কখনও এরূপ রোগে আক্রান্ত হন নাই। চিরকালই তিনি অটুট অবস্থাতেই দীনহীন কাঙ্গালকে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিতেন; পরন্তু স্বয়ং রন্ধন এবং পরিবেশনাদি করিয়া দিবা-রাত্র অতিথি-অভ্যাগত জনকে ভোজন করাইতেন। বিদ্যাসাগরের জননীর মত দয়া-দাক্ষিণ্যবতী রমণী প্রায় দেখা যায় না। এই অন্নপূর্ণা স্বর্ণগর্ভা জননীর পরিচয় পাঠক পরে পাইবেন। এই করুণাময়ীরই করুণা-কণা পাইয়া, অতুল মাতৃভক্তিবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় জগতে করুণাময় নাম রাখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, যদি আমার দয়া থাকে ত মা'র নিকট হইতে পাইয়াছি, বুদ্ধি থাকে ত বাবার নিকট হইতে পাইয়াছি। ইংরেজীশিক্ষিত যুবক! যদি জর্জ হার্বটের সেই বাণীর সার্থকতা দেখিতে চাও, একমাত্র জননীই শত শিক্ষকের সমান দেখিতে পাইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী-জীবনেও—"One good mother is worth a hundred school-masters."

আজকাল অনেক জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীর প্রতি লোকে নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে জ্যোতিষীর গণনার ফল

---

* কথিত আছে,—রামজয় কেদার পাহাড়ে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার বংশে এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে। সেই সুপুত্র এই বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত চরিতে ইহার উল্লেখ নাই।

প্রায়ই মিথ্যা হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তদানীন্তন জ্যোতিষী ভবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ভগবতী দেবীর গর্ভে দয়ার অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন। ইনি জন্মগ্রহণ করিলে ভগবতী দেবীর রোগ সারিয়া যাইবে।" হইলও তাহাই। ভবানন্দের অব্যর্থ বাণী প্রত্যক্ষীভূত হইল। এইজন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি চিরকালই ভক্তিমান্ ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম, কোষ্ঠী-বিচার, পাঠশালার শিক্ষা, পাঠশালায় প্রতিভা, বাল্য-চাপল্য, বাল্য-প্রতিভা, কলিকাতায় আগমন, পীড়িত অবস্থায় প্রতিগমন, পুনরাগমন ও শিক্ষার ব্যবস্থা

১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন বা ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি কুমারগঞ্জের হাটে গিয়াছিলেন। কুমারগঞ্জ বীরসিংহ গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে। হাট হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহার সহিত পিতা রামজয়ের পথে সাক্ষাৎ হয়। রামজয় বলিলেন,—"ঠাকুরদাস, আজ আমাদের এঁড়েবাছুর হয়েছে।" রামজয় পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রকেই লক্ষ্য করিয়া রহস্যচ্ছলে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার ভিতর কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃত পূর্ব্বাভাস নিহিত ছিল। এঁড়ে গরু যেমন "একগুঁয়ে," শিশুও তেমনই "একগুঁয়ে" হইবে, দীর্ঘদর্শী প্রবীণ রামজয় বোধ হয় শিশুর ললাট-লক্ষণ অথবা হস্তরেখাদি দর্শনে বুঝিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মও "বৃষ রাশিতে"। "বৃষ রাশিতে" জন্মগ্রহণ করিলে "একগুঁয়ে" অথবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হয়,—

> "বৃষবৎ সন্মার্গবৃত্তোঽতিতরাং প্রসন্নঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঽতিবিশালকীর্ত্তিঃ।
> প্রসন্নগাত্রোঽতিবিশালনেত্রো বৃষে স্থিত রাত্রিপতৌ প্রসূতঃ॥"
>
> —ভোজ।

ঈশ্বরচন্দ্রের "একগুঁয়েমি"র পরিচয় তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। "একগুঁয়ে" লোকদ্বারা ভাল কাজ যেমন অতি ভালরূপে হয়, মন্দ কাজ তেমনই অতি মন্দরূপে হইয়া থাকে। "একগুঁয়েমি"র ফল দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা। এই জন্য

ষ্টীফেন জিরার্ড, "একগুঁয়ে" কেরাণীকেই নিজের অধীন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে কাজ ধরিতেন, সে কাজ না করিয়া ছাড়িতেন না। ভাল মন্দ উভয় কাজে ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ঠাকুরদাস পিতার কথার প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়ীতে একটী "এঁড়ে" বাছুর হইয়াছে। সেই সময়ে তাঁহাদের একটী গাভীও পূর্ণগর্ভা ছিল। পিতা-পুত্রে সত্বর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুরদাস গোয়ালে গিয়া দেখিলেন, বাছুর হয় নাই। তখন পিতা রামজয় তাঁহাকে সূতিকাঘরে লইয়া গিয়া সদ্যোজাত শিশুটীকে দেখাইয়া বলিলেন,—"এই সেই "এঁড়ে"; এবং "এঁড়ে" বলিবার প্রকৃত রহস্যটুকুর উদ্ঘাটন করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় অনুজ ৺ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন,—"তীর্থক্ষেত্র হইতে সমাগত পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় নারীচ্ছেদনের পূর্ব্বে আলতায় ভূমিষ্ঠ বালকের জিহ্বার নিম্নে কয়েকটী কথা লিখিয়া তাঁহার পত্নী দুর্গা দেবীকে বলেন,—"লেখার নিমিত্ত শিশুটী কিয়ৎক্ষণ মাতৃদুগ্ধ পায় নাই। বিশেষতঃ কোমল জিহ্বায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায় এই বালক কিছুদিন তোতলা হইবে। আর এই বালক ক্ষণজন্মা, অদ্বিতীয় পুরুষ ও দয়ালু হইবে এবং ইহার কীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী হইবে।" বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন,—"তিনি এই সব কথা ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, মাতামহী ও পিতামহীর মুখে শুনিয়া ছিলেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত চরিতে কিন্তু এ কথার উল্লেখ করেন নাই; অধিকন্তু আমাদের বন্ধু বিশ্বকোষ নামক বিবিধ বিষয়ক পুস্তক-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বন্ধু তাঁহার জীবনীর তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া "বিশ্বকোষে" মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ কথার উত্থাপন করিয়া ছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"ও সব কথা শুনিও না; ও সব অমূলক।"*

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মগ্রহণ করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহবিপ্র কেনারাম আচার্য্য তাঁহার ঠিকুজি প্রস্তুত করেন। আচার্য্য মহাশয় ঠিকুজি প্রস্তুত করিবার

* আমাদের অপর কোন কোন আত্মীয়ের নিকটে এরূপ শুনিয়াছি। পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ও ঐরূপ বলেন।

কালে ফল বিচার করিয়া বিস্মিত হন। তিনি বালকের ভবিষ্যৎ জীবন শুভজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোষ্ঠী গণনায় এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়। কোষ্ঠীগণনায় ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোষ্ঠীপর্য্যালোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। আমরা নিম্নে তৎপর্য্যা-লোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শুভমস্তু—শকাব্দাঃ ১৭৪২। ৫। ১১। ১৫। ৪১
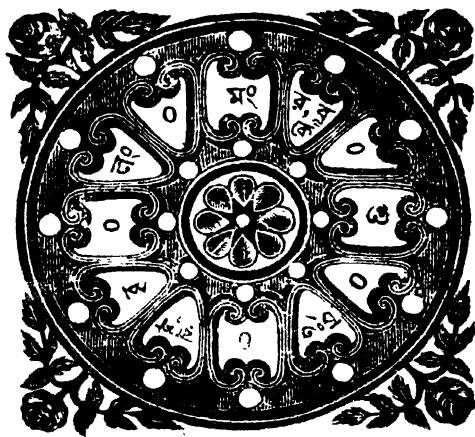
৩	৬	১৫
২০	৪৩	৩৪
৫২	৭	৫২
৪৭	৩	১২

জাতাহঃ

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন ১৫ দণ্ড ৪১ পল সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম হয়। তৎকালে ধনুর্লগ্নের উদয় হইয়াছিল। ইঁহার জন্মকালীন তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি, চতুর্থ স্থানে রাহু ও শনি, ষষ্ঠে চন্দ্র, অষ্টমে শুক্র, দশমে রবি, বুধ ও কেতু এবং একাদশ স্থানে মঙ্গল গ্রহ বিদ্যমান ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকালীন রবি, বুধ, শনি, রাহু ও কেতু এই পাঁচটী গ্রহ কেন্দ্রস্থানে; বুধ স্বক্ষেত্রে এবং চন্দ্র ও বুধ গ্রহ তুঙ্গস্থানে ছিল। সামান্যরূপ বুধাদিত্য-যোগও ছিল।

একাদি গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে কি ফল?

"কুলতুল্যঃ কুলশ্রেষ্ঠো বন্ধুমান্যো ধনী সুখী।
ক্রমান্নৃপসমো ভূপ একাদৌ স্বগৃহে স্থিতে॥"

যাহার একটী গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকে, সেই ব্যক্তি কুলতুল্য হয়, দুইটী থাকিলে কুলশ্রেষ্ঠ, তিনটীতে বন্ধুমান্য, চারিটী হইলে ধনী, পাঁচটীতে সুখী, ছয়টীতে রাজতুল্য এবং সাতটী গ্রহই স্বক্ষেত্রে থাকিলে রাজা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী গ্রহ স্বক্ষেত্রে; এইজন্য তিনি কুলোচিত তেজস্বী ছিলেন। একাদিগ্রহ তুঙ্গগত হইলে কি ফল?

"উৎকৃষ্টাঃ স্ত্রীসুখিনঃ প্রকৃষ্টকার্য্যা রাজপ্রতিরূপকাশ্চ।
রাজান্ একদ্বিত্রিচতুর্ভির্জায়ন্তেঽতঃ পরং দিব্যাঃ॥"
ইতি কূটস্থীয়ে। রঘুবংশ ৫ সর্গ ১৩ শ্লোকে মল্লিনাথ।

যাহার একটী গ্রহ তুঙ্গী থাকে, তিনি উৎকৃষ্ট লোক, দুইটী থাকিলে স্ত্রীসুখী, তিনটী থাকিলে উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী, চারিটী থাকিলে রাজপ্রতিরূপ, পাঁচটী গ্রহ তুঙ্গী হইলে রাজা হয় এবং নরাকারে অবতীর্ণ-দেবতারই ছয়টী গ্রহ তুঙ্গী হয়। সাতটী গ্রহ একেবারে তুঙ্গী হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুইটী গ্রহ তুঙ্গী।

ধনবত্তাদিযোগ।

"লগ্নাদতীব বসুমান্ বসুমান্ শশাঙ্কাৎ
সৌম্যগ্রহৈরুপচয়োপগতৈঃ সমস্তৈঃ।
দ্বাভ্যাং সমোঽল্পবসুমাংশ্চ তদূনতায়া
মন্যেষু সৎস্বপি ফলেষ্বিদমুৎকটেন॥"—দীপিকায়াম্॥

জন্মকালে লগ্ন হইতে যদি সমস্ত শুভগ্রহ উপচয়গত অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানগত হয়, তবে অত্যন্ত ধনবান্ হয়। ঐরূপ জন্মরাশি হইতেও যদি সমস্ত শুভগ্রহ উপচয়গত হয়, তবে ধনবান্ হয়। দুইটী গ্রহ যদি লগ্নের বা রাশির উপচয়গত হয়, তবে মধ্যমরূপ ধনবান্ হয় এবং তদপেক্ষা কম থাকিলে সামান্যরূপ ধনবান্ হয়। অন্যান্য ফলসকল অপেক্ষা ইহারই ফল অধিক হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোষ্ঠীতে লগ্ন হইতে বৃহস্পতি, চন্দ্র ও বুধ এবং জন্মরাশি হইতে শুক্র ও বুধ উপচয়গত।

"বিনয়বিত্তাদীনামধমমধ্যমোত্তমাদিনিরূপণম্।"
—দীপিকায়াম্ ৬৫ শ্লোকঃ

"অধমসমবরিষ্ঠান্যর্ককেন্দ্রাদিসংস্থে
শশিনি বিনয়-বিত্ত-জ্ঞান-ধী-নৈপুণ্যানি।
অহনি নিশি চ চন্দ্রে স্বাধিমিত্রাংশকে বা
সুরগুরু-সিতদৃষ্টে বিত্তবান্ স্যাৎ সুখী চ ॥"

জন্মকালে চন্দ্র যদি রবির কেন্দ্র (স্বস্থান, চতুর্থ, সপ্তম, দশম) স্থানগত হয়, তবে নিয়ম, ধন, জ্ঞান, বুদ্ধি ও নিপুণতা অধমরূপ হয়। চন্দ্র, রবির পণকর (দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ) স্থানে থাকিলে বিনয়াদি মধ্যম রূপ হয়। আর ঐ চন্দ্র যদি রবির আপোক্লিম (তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ) স্থানগত হয়, তবে বিনয়াদি সমস্তই উত্তমরূপ হইয়া থাকে। অথবা চন্দ্র যদি স্বীয় অধিমিত্র গৃহে থাকিয়া বৃহস্পতি বা শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে ধনী ও সুখী হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোষ্ঠীতে চন্দ্র রবির আপোক্লিম-গত; অতএব উঁহার বিনয়াদি উৎকৃষ্টরূপ ছিল।

তুঙ্গগত চন্দ্রের ফল

"স্থিরগতিং সুমতিং কমনীয়তাং কুশলতাং হি নৃণামুপভোগতাম্।
বৃষগতো হিমগুর্ভ্শমাদিশেৎ সুকৃতিতঃ কৃতিতশ্চ সুখানি চ ॥—ঢুণ্ঢিরাজ

জন্মকালে চন্দ্র, বৃষরাশিগত হইলে, জাত মানবের স্থির গতি, সদ্‌বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, নৈপুণ্য, উপভোগ এবং স্বীয় পুণ্য ও কার্য্য হইতে সুখ হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকালে বৃষ রাশিতে চন্দ্র ছিল।

তুঙ্গগত বুধের ফল। ঢুণ্ঢিরাজীয় জাতকাভরণে—

"সুবচনানুরতশ্চতুরো নরো লিখনকর্ম্মপরো হি বরোন্নতিঃ।
শশিসুতে যুবতৌ চ গতে সুখী সুনয়নানয়নাঞ্চলচেষ্টিতৈঃ ॥"

জন্মকালে কন্যারাশিতে বুধ থাকিলে, জাত মানব সদ্‌বক্তা, চতুর, উত্তম লেখক, উন্নতিমান্ এবং সুন্দরী রমণীর নয়নাঞ্চলচেষ্টাদি দ্বারা সুখী হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকালে কন্যারাশিতে বুধ আছে।

"লগ্নাৎ কর্ম্মণি তুর্য্যে চ যদি স্যুঃ পাপখেটকাঃ।
স্বধর্ম্মে নিতরাং তস্য জায়তে চঞ্চলা মতিঃ ॥"

—জাতকালঙ্কারটীকায়াম্।

জন্মলগ্নের চতুর্থ ও দশম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, মানবের স্বধর্ম্মে চঞ্চলা মতি হয়।

'কামাতুরশ্চিত্তহরোঽঙ্গনানাং স্যাৎ সাধুমিত্রঃ সুতরাং পবিত্রঃ।
প্রসন্নমূর্ত্তিশ্চ নরো বৃষস্থে শীতদ্যুতৌ ভূমিসুতেন দৃষ্টে ॥" —ঢুণ্ঢিরাজ।

জন্মকালে বৃষরাশিস্থ চন্দ্রের উপর মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে, জাত মনুষ্য কামাতুর, কামিনী-মনোরঞ্জন, সজ্জন-বন্ধু, অত্যন্ত পবিত্র এবং প্রসন্ন-মূর্ত্তি হয়।

'ব্যয়েশে তদ্রিপ্‌ফগতে তত্র দৃষ্টে শুভৈগ্র্হৈঃ।

দানবীরো ভবেন্নিত্যং সাধুকর্ম্মসু মানবঃ॥"—শম্ভুহোরাপ্রকাশ।

যে ব্যক্তির জন্মকালে লগ্নের দ্বাদশ স্থানের অধিপতি গ্রহ, দ্বাদশের দ্বাদশগত হয়, আর ঐ দ্বাদশ স্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে সেই ব্যক্তি সৎকর্ম্মে দানবীর অর্থাৎ অত্যন্ত দাতা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লগ্নের দ্বাদশাধিপতি মঙ্গল একাদশ স্থানে আছে এবং ঐ দ্বাদশ স্থানে বৃহস্পতি ও চন্দ্রের দৃষ্টি আছে। উত্তরকালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ বদান্য হইয়াছিলেন।—ইতি সংক্ষেপ।

শুভগ্রহ সঙ্গে সঙ্গে। ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস জন্মগ্রহণে। ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করিলেন, ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা ঠাকুরদাসের কুটীরে একটু লক্ষ্মী-শ্রী দেখা দিল। পাড়ায় পাড়ায় রব উঠিল,—"বাড়ুয্যেদের বাড়ীতে পয়মন্ত ছেলে জন্মিয়াছে।" "পয়মন্তের" প্রতিপত্তি বিদ্যাসাগরের বাল্যকাল হইতে। বাল্যকাল হইতে তিনি প্রতিবাসীর প্রীতিপাত্র।

পিতামহ রামজয় জাত পৌত্রের নাম রাখিয়াছিলেন,—ঈশ্বর। পঞ্চম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। তখন বীরসিংহ গ্রামের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। গ্রাম্য-পাঠশালায় বালকদিগের বিদ্যারম্ভ হইত। পাঠশালার শিক্ষা সাঙ্গ হইলে, উহারই মধ্যে অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা টোলে সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত করিতেন। টোলে বিদ্যা' পর্য্যবসান। কেহ কেহ বা জমিদারী সেরেস্তাবিদ্যা শিখিতেন।

সে সময় সনাতন সরকার গ্রামের গুরুমহাশয় ছিলেন। সরকার মহাশয় বড় প্রহারপটু ছিলেন বলিয়া ঠাকুরদাস পুত্রের জন্য অন্য গুরুর অন্বেষণ করেন। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার মনোনীত হন। কালীকান্তের নিবাস বীরসিংহ গ্রাম। তিনি কিন্তু ভদ্রেশ্বরের নিকট গোরুটী গ্রামে শ্বশুর বাড়ীতে বাস করিতেন। কালীকান্ত স্বকৃত-ভঙ্গকুলীন। কৌলীন্য-কল্যাণে তাঁহার অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল। ঠাকুরদাস তাঁহাকে আনাইয়া নিজগ্রামে একটী পাঠশালা করিয়া দেন। বালক বিদ্যাসাগর ও গ্রামের অন্যান্য বালকেরা তাঁহার পাঠশালায় পড়িত। তিনি যত্নসহকারে সকলকে শিক্ষা দিতেন। কালীকান্তের সৌজন্যে প্রতিবাসিমণ্ডলী তাঁহার প্রতি বড় অনুরক্ত ছিল।

পাঠশালায় প্রতিভার পরিচয়। বালক ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসরে পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করেন। এই সময় তাঁহার হস্তাক্ষর বড় সুন্দর হইয়াছিল। তখন সর্ব্বত্র হস্তাক্ষর সমাদৃত হইত। হস্তাক্ষর বিবাহের সর্ব্বোচ্চ সুপারিস। গুরু কালীকান্ত, বালক বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিমত্তা ও ধৃতি-ক্ষমতা দেখিয়া প্রায় বলিতেন,—"এ বালক ভবিষ্যতে বড় লোক হইবে।" এই সময় বালক বিদ্যাসাগর প্লীহা ও উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হন। এই জন্য তাঁহাকে জননীর মাতুলালয় পাতুলগ্রামে যাইতে হয়। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। পাতুল গ্রামে ক্রমাগত ছয় মাস কাল চিকিৎসা হয়। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত কোঠারা-গ্রামবাসী* কবিরাজ রামলোচনের চিকিৎসাগুণে বালক বিদ্যাসাগর সে যাত্রা রক্ষা পান। পাতুলগ্রামে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া, তিনি বীরসিংহ গ্রামে পুনরাগমন করেন। পুনরায় কালীকান্তের উপর তাঁহার শিক্ষাভার সমর্পিত হয়। কালীকান্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে পাঠশালার চলিত অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। রাত্রিকালে তাঁহাকে কোলে করিয়া লইয়া বাড়ীতে রাখিয়া আসিতেন। এই কালীকান্তের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকাল ভক্তিমান্ ছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাল্যকালে বড় দুষ্ট ছিলেন। তাঁহার বালক-সুলভ অনেক "দুষ্টমি"রই পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেই তো বাল্যকালে দুষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু সকলের কথা তো আর স্মরণীয় হয় না; পরন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও স্থান পায় না। ভবিষ্যৎ জীবন যাঁহার উজ্জ্বলতম হয়, তাঁহার বাল্যজীবন জানিতে লোকের আগ্রহ হইয়া থাকে। তাঁহার বাল্য জীবনের "দুষ্টমি"টুকু জানিতে কেমন যেন মিষ্ট লাগে। ভগবান্ মানবাকারে লীলাচ্ছলে কৃষ্ণরূপে গোপ-গোপীদের ঘরে প্রবেশ করিয়া দুগ্ধ হাঁড়ি ভাঙিতেন; শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণদের নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেন; সেক্সপিয়র বাল্যকালে দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে জুটিয়া হরিণ চুরি করিয়াছিলেন; কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জ্বালায় তাঁহার জননী জ্বালাতন হইতেন। কোথায় কিছু নাই, একবার বালক

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত জীবন-চরিতে "কোঠারা" স্থলে "কোটরী" মুদ্রিত হইয়াছে! "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" পত্রিকায় খানাকুল-কৃষ্ণনগর নিবাসী পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "পল্লীসমাজ"-নামক খানাকুল-কৃষ্ণনগরের ইতিহাসে প্রথমে ঐ ভ্রমের উল্লেখ করেন; কিন্তু তিনি এক ভ্রম শোধন করিতে, অন্য ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। তিনি কবিরাজ শ্রীধর সুধাকরের নাম লিখিয়াছিলেন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ঘরের একখানা সেকেলে সাবেক ছবি দেখিয়া বড় ভাইকে বলিয়াছিলেন,—"দাদা! ছবিখানিতে ঘা-কতক চাবুক লাগাইয়া দাও তো।" বড ভাই শুনেন নাই। তখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আপনি সপাসপ চাবুক বসাইয়া দেন। বিলাতী পাদরী ডাক্তার পেল বাল্যকালে বড দুষ্ট ছিলেন। তখন তাহার জ্বালায় রাত্রিকালে পাড়ার লোক ঘুমাইতে পারিত না। এমন অনেক প্রতিষ্ঠাশালী প্রতিভাবান্ ব্যক্তির বাল্যজীবনের বাল্য স্বভাবোচিত "দুষ্টমি"র কথা শুনা যায়। ছেলে দুষ্ট হইলে অনেকে অনেক সময় এই সব দৃষ্টান্তের স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য বুক বাঁধিয়া থাকেন। এক সময় এক ব্যক্তি একটি পুত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"এ ছেলেটী ভবিষ্যতে বড় লোক হবে।" আগন্তুক বলিলেন,—"মহাশয়। এ বড দুষ্ট।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"দেখ ছেলেবেলায় আমি অমনই দুষ্ট ছিলাম; পাড়ার লোকের বাগানের ফল পাড়িয়া চুপি চুপি খাইতাম, কেহ কাপড শুখাইতে দিয়াছে দেখিলে, তাহার উপর মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আসিতাম, লোকে আমার জ্বালায় অস্থির হইত।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ "বাল্য-দুষ্টমির" কথা নিজে স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাহার আরও "দুষ্টমি"র দুই একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মথুর মণ্ডল নামে একজন প্রতিবেশী ছিল। মথুর মণ্ডলের জননী ও স্ত্রী, বালক বিদ্যাসাগরকে বড ভালবাসিতেন। বালক বিদ্যাসাগর কিন্তু প্রায় প্রত্যহ পাঠশালায় যাইবার সময় মথুরের বাডীর দ্বারদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। মথুরের মাতা ও স্ত্রী দুই হস্তে তাহা মুক্ত করিতেন। বধূ কোন দিন বিরক্ত হইলে, শাশুডী বলিতেন,—"ইহাকে কিছু বলিও না। ইহার ঠাকুরদাদার মুখে শুনিয়াছি, এ ছেলে একজন বড় লোক হইবে।" এক দিন বালক বিদ্যাসাগরের গলায় ধানের "সুঙা" আটকাইয়া গিয়াছিল। তাহাতে তিনি মৃতকল্প হন। পিতামহী অনেক কষ্টে সেই "সুঙা" বাহির করিয়া দিলে তিনি রক্ষা পান। দুষ্ট বালক প্রত্যহ ধান্যক্ষেত্রের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ধানের শিষ তুলিয়া চিবাইয়া খাইত। এক দিন তাহার উক্তরূপ ফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই বার্দ্ধক্যের শান্ত দান্ত স্থির ধীর মূর্ত্তি দেখিলে কেহ মনে করিতে পারিত না যে, বাল্যে তিনি এত দুষ্ট ছিলেন। বস্তুতঃ প্রায় দেখিতে পাই, অনেকের বাল্যের দুষ্ট প্রকৃতি অধিক বয়সে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

পাঠশালের বিদ্যা সাঙ্গ হইলে, কালীকান্ত, ঠাকুরদাসকে এক দিন বলেন,— "ইহার পাঠশালার লেখা-পড়া সাঙ্গ হইয়াছে; এ বালক বড় বুদ্ধিমান; ইহাকে

তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কলিকাতায় রাখ, তথায় ভাল করিয়া ইংরেজি বিদ্যার শিক্ষা দাও।" কালীকান্তের কথা শুনিয়া ঠাকুরদাস বালক বিদ্যাসাগরকে কলিকাতায় আনাই স্থির করেন।

এই সময় পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের দেহত্যাগ হয়। তাঁহার মৃত্যু হইবার পর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বা ১২৩৬ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে ঠাকুরদাস, গুরুমহাশয় কালীকান্তের পরামর্শে ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। সঙ্গে কালীকান্ত ও আনন্দরাম গুটি নামক ভৃত্য ছিল। অষ্টম-বর্ষীয় বালক, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেছে দেখিয়া, বালক বিদ্যাসাগরের স্নেহময়ী জননী মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যেমন মাতৃভক্ত ছিলেন, তাঁহার জননীও তেমনই পুত্রবৎসলা ছিলেন।

পিতা, পুত্র, গুরুমহাশয় এবং ভৃত্য,—চারি জনকেই পদব্রজে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। তখন জলপথ বড় সুগম ছিল না। উলুবেড়ের নূতন খালও তখন কাটা হয় নাই। গাঙের মাঝ দিয়া নৌকা করিয়া আসাটাও বড় বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল। একে তো ঝড়-তুফানের ভয়, তাহার উপর দস্যু-ডাকাতের উপদ্রব; কাজেই গৃহস্থ লোক বড় কেহ নৌকা করিয়া আসিত না। ব্যবসাদার-মহাজনেরা নির্দ্দিষ্ট দিনে জোট বাঁধিয়া যাতায়াত করিত মাত্র। এতদ্ভিন্ন অনেককেই হাঁটা পথে আসিতে হইত। যাতায়াতের সময় অনেকেই মধ্যে মধ্যে চটি বা আত্মীয়-বর্গের বাটীতে আশ্রয় লইত। ঠাকুরদাসও সদল-বলে প্রথম দিন পাতুলগ্রামে মামা-শ্বশুরের বাটীতে বিশ্রাম করেন। পর দিন তিনি সন্ধ্যার সময় দশ ক্রোশ দূরস্থিত সন্ধিপুর গ্রামে এক জন আত্মীয় ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকেন। পর দিন তাঁহারা শেয়াখালা হইতে শালিখার বাঁধা রাস্তা দিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে ধারকতাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিপ্রভাবে ভবিষ্যৎ জীবনে কীর্ত্তি-কুশলতা লাভ করিয়াছিলেন, এই পথের মাঝে সেই সুকুমার কোমল বয়সেই তাহার নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। বিশাল বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্ভব এইখানে হইল।

এই পথের মাঝে "মাইল-ষ্টোন" অর্থাৎ পথের দূরত্ব-জ্ঞাপক শিলাখণ্ড দেখিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন,—"বাবা, বাটনা বাটিবার শিলের মতন এটা কি গা?" পিতা ঠাকুরদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ইহার নাম 'মাইল-ষ্টোন'—আধক্রোশ অন্তর এইরূপ এক একটী 'মাইলষ্টোন' পোতা আছে। ইংরেজী অক্ষরে মাইলের অঙ্ক লেখা।" ঈশ্বরচন্দ্র "মাইলষ্টোন" দেখিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত ইংরেজী অক্ষর শিখিয়া লইলেন। মধ্যে এক স্থানের "মাইল-ষ্টোন" দেখান হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বলেন,—"আমরা একটা 'মাইলষ্টোন' দেখিতে

ভুলিয়া গিয়াছি।" গুরুমহাশয় কালীকান্ত বলেন—"ভুলি নাই, তুমি শিখিয়াছ কি না, জানিবার জন্য তোমাকে দেখাই নাই।"

ক্রমে সন্ধ্যার সময় তাঁহারা শালিখার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতায় বড়বাজারের দয়েহাটায় শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীতে উপস্থিত হন। এই জগদ্দুর্লভ সিংহের পিতা ভাগবতচরণ সিংহ ঠাকুরদাসকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। জগদ্দুর্লভবাবু পিতার ন্যায় ঠাকুরদাসকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, এমন কি তাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধনও করিতেন। জগদ্দুর্লভ একমাত্র বাড়ীর কর্ত্তা। বয়স তাঁহার তখন ২৫ পঁচিশ বৎসর মাত্র। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র,—এইমাত্র তাঁহার পরিবার।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পরিবারের বড় প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। পর দিন প্রাতঃকাল হইতেই এই প্রীতির সূত্রপাত হইয়াছিল। বালক নিজের অদ্ভুত ধারকতা-শক্তিবলে সিংহপরিবারের সকলকেই স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যে দিন সন্ধ্যার সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাহার পর দিন পিতা ঠাকুরদাস, জগদ্দুর্লভবাবুর কয়েকখানি ইংরেজী বিল ঠিক দিতেছিলেন। সেই সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্র বলেন,—"বাবা, আমি ঠিক দিতে পারি।" কেবল বলা নহে ; সত্য সত্যই বালক কয়েকখানি বিল ঠিক দিয়াছিলেন। একটীও ভুল হয় নাই। উপস্থিত ব্যক্তিগণ চমৎকৃত হইলেন। গুরু কালীকান্ত পুলকিত-চিত্তে ও প্রফুল্লবদনে ঈশ্বরচন্দ্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিয়া উঠেন,—"বাবা ঈশ্বর, তুমি চিরজীবী হও। তোমায় যে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসিতাম, আজ তাহা সার্থক হইল।"

মানব-জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বড় বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। অসীম প্রতিভাসম্পন্ন বা অপরিমেয় বিদ্যাবুদ্ধিশালী বহুসংখ্যক ব্যক্তির বাল্যকালে ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাসের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ জীবনে যাঁহার যে শক্তিপুষ্টির প্রতিপত্তি, বাল্যজীবনে তাঁহার সেই শক্তির অঙ্কুরোৎপত্তি। এই জন্য মিল্টন্ বলিয়াছেন,—

"The childhood shows the man as morning shows the day."

প্রাতঃকাল-দৃষ্টে যেমন দিবার বিষয় বুঝা যায়, মানবের বাল্যকাল-দৃষ্টে তাহার উত্তর কাল তেমনই বোধগম্য হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন,—

"Child is the father of man."

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন সাত-আট বৎসরের সময় কলিকাতায় আসেন, তখন এক জন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর, কলিকাতায় কেমন আছ ?' ভবিষ্যতের কবি উত্তর দিলেন,—

"রেতে মশা, দিনে মাছি।
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র এক দিনে "ক, খ," শিখিয়াছিলেন।

জনসনের অন্যান্য গুণের মধ্যে ধারকতা-শক্তির প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। যে সময়ে বালক জন্‌সন্ সবেমাত্র লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এক দিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে একখানি প্রার্থনা-পুস্তক মুখস্থ করিতে দেন। মুখস্থ করিতে বলিয়া মাতা উপরে উঠিয়া যান। পুত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বলেন,—"মা, মুখস্থ করিয়াছি।" সত্য সত্যই বালক অনায়াসে সমস্ত মুখস্থ বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি দুই বার মাত্র পুস্তকখানি পড়িয়াছিলেন।

পোপ ১২ বার বৎসর বয়সে কবিতা লিখিয়াছিলেন।* বাল্যকালে তিনি কবিতা লিখিতেন। তাঁহার পিতার কিন্তু তাহা অভিপ্রেত ছিল না। এই জন্য পিতা তাঁহাকে কবিতা লিখিতে নিষেধ করেন; পোপ কিন্তু তাহা শুনিতেন না। এক দিন তাঁহার পিতা এই জন্য তাঁহাকে প্রহার করেন। প্রহারের পরও বালক কবিতায় বলিয়া ফেলিল,—

"Papa papa pity take,
I will no more verses make"

মিল্টন্ বাল্যকালে যে পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তাৎকালিক প্রসিদ্ধ লেখকবর্গ বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত বিলাতী কারিকর (Mechanic) স্মিটন্ ছয় বৎসর বয়সে কলের ছাঁচ প্রস্তুত করিয়াছিলেন !

এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এ সব অমানুষিকী শক্তিরই পরিচয়। ইহা লইয়া ভাবিতে ভাবিতে কত মহা মহা চিন্তাশীল দার্শনিক ইহ-জগতের সুখৈশ্বর্য্য ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া চিন্তার অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছেন। আমরা ক্ষুদ্র জীব, তাহার কি মীমাংসা করিব ? তবে যখনই দেখি, তখনই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকি এবং ভাবিয়া অকূল সমুদ্রে নিমগ্ন হই। সে বিচার-বিতর্কের শক্তি নাই এবং তাহার প্রবৃত্তিও নাই। সবই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল বলিয়া বুঝি এবং তাহা বুঝিয়াই নিশ্চিন্ত হই। আমরা শাস্ত্রবিশ্বাসী।

*Ode on solitude.

শাস্ত্রের কথা মানি। শাস্ত্রের কথা শুনিতে পাই,—বাল্যপ্রতিভা পূর্ব্ব জীবনের সাধনার ফল। ধ্রুব-প্রহ্লাদ পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফলে বাল্যে ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন। *

বালক বিদ্যাসাগরের বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয় পাইয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। সকলেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন একটা ভাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। পুত্রের প্রশংসাবাদে পিতা ঠাকুরদাস পুলকিত হইয়া বলেন,—"আমি ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু স্কুলে পড়াইব।" উপস্থিত সকলেই বলিলেন,—"আপনি দশ টাকা মাত্র বেতন পান, আপনি পাঁচ টাকা বেতন দিয়া কিরূপে হিন্দু স্কুলে পড়াইবেন?"

ঠাকুরদাস বলিলেন,—"পাঁচ টাকায় যেরূপে হউক, সংসার চালাইব।" ঠাকুরদাসের হৃদয় তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রজ্বলিত অনল-শিখায় উদ্দীপিত। বালকের প্রতিভা-কথা স্মরণ করিয়া, ব্রাহ্মণ আপনার দারিদ্র্য-দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দরিদ্র-ব্রাহ্মণ পূর্ণানন্দে পূর্ণভাবে নিমগ্ন। ঠাকুরদাস পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু স্কুলে পড়াইবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তিন মাস কাল তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। এই তিন মাস কাল ঈশ্বরচন্দ্র নিকটবর্ত্তী একটি পাঠশালায় যাইতেন। এই পাঠশালার গুরুমহাশয়-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত চরিতে লিখিয়াছেন,—"পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষা শিক্ষাদান বিষয়ে বোধ হয় অধিকতর নিপুণ ছিলেন।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ কাল বাঙ্গালা শিক্ষার এরূপ সুনিপুণ গুরুমহাশয় দুর্লভ। এ দুর্লভতার হেতু লোকের প্রকৃতি-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন। এখন পাঠশালাও আছে, গুরুমহাশয়ও আছে; নাই সেই তলস্পর্শিনী শিক্ষা; আর নাই সেই সুদক্ষ শিক্ষক; এখনকার পাঠশালা ইংরেজিরই রূপান্তর; গুরু অন্যরূপ হইবে কিসে?

---

* ভগবান ধ্রুবকে বলিয়াছিলেন,—

'যৎ ত্বয়া প্রার্থিতং স্থানমেতৎ প্রাপ্স্যতি বৈ ভবান্।
ত্বয়াহং তোষিতঃ পূর্ব্বম্ অন্যজন্মনি বালক।"

—বিষ্ণুপুরাণ, ধ্রুবচরিত্র, ১ম অঃ ৮৩ শ্লোঃ।

*

"অন্যেষাং তদ্বরং স্থানং কুলে স্বায়ম্ভুবস্য যৎ।
তস্যৈতদ্বরং বাল যেনাহং পরিতোষিতঃ।"

— বিষ্ণুপুরাণ, ধ্রুবচরিত্র, ১ম অঃ, ১২ অঃ ৮৮ শ্লোঃ।

"কর্ত্তব্যোমহদাশ্রয়ঃ," মহাজনের এই মহাবাণী অবশ্যপালনীয়। এ বাণীর সাক্ষাৎ ফল প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্য জীবনে। জগদ্দুর্ল্লভ সিংহ কেবল যে পিতাপুত্রকে আশ্রয় মাত্র দিয়াছিলেন, তাহা নহে ; তাঁহার পরিবারবর্গ ও তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। জগদ্দুর্লভবাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণি, বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রাপেক্ষা ভালবাসিতেন। এই রমণী সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন,—"স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্য মূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে।" প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অকৃত্রিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

বাস্তবিক রাইমণির সেই অকৃত্রিম যত্ন-স্নেহ ব্যতিরেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতায় থাকা দায় হইত। তিনি স্নেহময়ী মাতা ও পিতামহীর কথা ভাবিয়া প্রথম প্রথম বড় ব্যাকুল হইতেন। পিতা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট থাকিতে পারিতেন না। তিনি প্রাতে এক প্রহরের সময় কর্ম্মস্থানে যাইতেন এবং রাত্রি এক প্রহরের সময় বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। এই সময় রাইমণি এবং জগদ্দুলভবাবুর অন্যান্য পরিবার নানা মিষ্ট কথায় ঈশ্বরচন্দ্রকে ভুলাইয়া রাখিতেন এবং নানাবিধ আহারীয় ও অন্যান্য মন-ভুলান জিনিষপত্র দিয়া অনেকটা সান্ত্বনা করিতেন। এইরূপ অনেক দীনহীন বালক মহদাশ্রয়ে প্রীতিস্নেহে প্রতিপালিত হইয়া পরিণামে কীর্ত্তিমান্ হইয়া গিয়াছেন। কলিকাতার কোটিপতি রামদুলাল সরকার বাল্যকালে যদি হাটখোলার সেই সদাশয় দত্ত-পরিবারে প্রতিপালিত না হইতেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, তিনি ভবিষ্যৎ-জীবনে অতুল ধনের অধিকারী হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি-সঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন? রামদুলালের বাল্য-দরিদ্রতা এবং দত্ত-পরিবারের তৎপ্রতি সদাশয়তার কথা স্মরণ হইলে বাস্তবিকই মনে এক অচিন্তনীয় ভাবের উদয় হয়। বিলাতের বিখ্যাত গ্রন্থকার জনাথন্ সুইফট্ যদি বাল্যকালে স্যার্ উইলিয়ম হামিল্টনের আশ্রয় না লইতেন এবং জার্ম্মাণ পণ্ডিত হিম্ ধর্ম্মপিতার সাহায্য না পাইতেন, তাহা হইলে এ জগতে তাঁহারা ফুটিতেন কি না সন্দেহ।

বালক বিদ্যাসাগর অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ; কিন্তু ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে পীড়া এত দূর উৎকট হইয়া পড়ে যে, মল-মূত্রত্যাগে তিনি সর্ব্বদা সাবধান হইতে পারিতেন

না। তাঁহার পিতাকে অনেক সময় স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিতে হইত। ঐ পল্লীর দুর্গাদাস কবিরাজ তাঁহার চিকিৎসা করেন; কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বীরসিংহ গ্রামে সংবাদ যায়। পিতামহী সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কলিকাতায় দুই দিন থাকিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে বাড়ী লইয়া যান। তথায় সাত আট দিনের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় ঈশ্বরচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ীতে ছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে পিতা ঠাকুরদাস তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আনয়নার্থ বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন। এবারও পদব্রজে আসা স্থির হয়। পূর্ব্ব বারে সঙ্গে ভৃত্য ছিল। ভৃত্য মধ্যে মধ্যে বালককে কাঁধে করিয়া আনিয়াছিল। এবার পিতা জিজ্ঞাসিলেন,—"কেমন ঈশ্বর! তুমি চলিয়া যাইতে পারিবে, না আনন্দরামকে সঙ্গে করিয়া লইব?" বালক বাহাদুরী করিয়া বলিল,—"না, আমি চলিয়া যাইতে পারিব।" বিদ্যাসাগরের বাহাদুরীর পরিচয় বাল্য কাল হইতে।

এবার পিতাপুত্রে চলিয়া আসিয়া প্রথম দিন পাতুলগ্রামে আশ্রয় লন। পাতুলগ্রাম বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ দূর। ঈশ্বরচন্দ্রের এ দিন চলিতে কষ্ট হয় নাই। তারকেশ্বরের নিকট রামনগর গ্রামে ঠাকুরদাসের কনিষ্ঠা ভগিনী অন্নপূর্ণাকে দেখিতে যাইবার প্রয়োজন হয়। তিনি তখন পীড়িতা ছিলেন। রামনগর পাতুলগ্রাম হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। পিতাপুত্রে দুই জনে প্রাতঃকালে রামনগর অভিমুখে যাত্রা করেন। তিন ক্রোশ পথ গিয়া ঈশ্বরচন্দ্র আর চলিতে পারেন নাই। পা টাটাইয়া ফুলিয়া যায়। পিতা বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হন। তখন বেলা দুই প্রহরের অধিক। ঈশ্বরচন্দ্র তখন এক রকম চলচ্ছক্তিহীন। পিতা বলিলেন,—"বাবা! একটু চল, আগে মাঠে ফুটি তরমুজ খাওয়াইব।" ঈশ্বরচন্দ্র অতি কষ্টে প্রাণপণে হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই মাঠের কাছে গিয়া ফুটি তরমুজ খাইলেন পেট ঠাণ্ডা হইয়াছিল বটে; পা কিন্তু আর উঠে নাই। পিতা রাগ করিয়া পুত্রকে ফেলিয়া কিয়দ্দূর চলিয়া যান; কিন্তু আবার ফিরিয়া আসিয়া রোরুদ্যমান পুত্রকে কাঁধে করিয়া লন। দুর্ব্বলদেহ পিতা, অষ্টম বর্ষের বলবান্ বালককে কত দূর কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবেন? খানিক দূর গিয়া আবার তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে কাঁধ হইতে নামাইয়া দেন; বিরক্ত হইয়া দুই একটা চপেটাঘাত করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ভিন্ন আর কি উপায় ছিল? এখন একেবারে চলচ্ছক্তিহীন। পিতা আবার পুত্রকে কাঁধে করিলেন, এইরূপ একবার কাঁধে করিয়া, একবার নামাইয়া একটু একটু বিশ্রামান্তর চলিয়াছিলেন।

এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামনগরে উপস্থিত হন। পর দিন তাঁহারা শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিবস কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই বার আবার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার কথা। পিতা ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত শিখাইবার মানস করেন। তাঁহার ইচ্ছা, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিখিলে দেশে তিনি টোল করিয়া দিবেন। এই সময়ে মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃ-মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র। মধুসূদন বাচস্পতি ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দেন,—"আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে আপনার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবে; আর যদি চাকুরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে; সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া যাহারা 'ল' কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইতে পারে। অতএব আমার বিবেচনায় ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়িতে দেওয়া উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কলেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্ম-জীবনীতে এই সকল কথা আছে, অধিকন্তু তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণরূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থা অবলম্বনীয় স্থির হইল।"

এই সময় ঠাকুরদাস সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণাধ্যাপক পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের সহিতও এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছিলেন। শেষে সংস্কৃত কলেজে দেওয়াই স্থির হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি, সংস্কৃত কলেজের উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠা, তাৎকালিক শিক্ষার অবস্থা, ভবিষ্যৎ আভাস, ব্যাকরণশিক্ষা, কলেজের অধ্যাপক, বেতন-ব্যবস্থার ফল, পিতার শাসন, ব্যাকরণে প্রতিপত্তি ও পুরস্কার, একগুঁয়েমি, অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়, কাব্যের শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য-কঠোরতা এবং ব্যাকরণ ও কাব্য শিক্ষার ফল

১২৩৬ সালে ২০শে জ্যৈষ্ঠ বা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন সোমবার ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তখন সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষারই প্রচলন ছিল। ইংরেজি শিক্ষার অতি সামান্য মাত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। তখনকার সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রগণ ইংরেজি পড়িতে বাধ্য ছিলেন না। কেহ ইচ্ছা করিলে ইংরেজি পড়িতেন মাত্র।

সংস্কৃত কলেজে প্রথমে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে আদৌ মনে হয় না, সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষা চালাইবার কর্ত্তৃপক্ষের কোনরূপ সঙ্কল্প ছিল। তখন কেবল দ্বিজসন্তানেরই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার ছিল। তাঁহারা ঘরের মেজেয় বিছানার উপর বসিয়া টোলের ধরণে অধ্যয়ন করিতেন; আর অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া অধ্যাপনা করিতেন।

কর্ত্তৃপক্ষের অন্তরের উদ্দেশ্য হউক বা না হউক, আমাদিগের দুরদৃষ্টে সে শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের পাঠ্যাবস্থায়; পরিপুষ্টি তাঁহার কার্য্যাবস্থায়।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠা-প্রস্তাবে রাজা রামমোহন রায়-প্রমুখ বঙ্গের তাৎকালিক অনেক শক্তিশালী মনীষী ব্যক্তি আপত্তি তুলিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা-কল্পে প্রকৃতপক্ষে মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষাকমিশনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে রামমোহন রায়ের সে মনস্তাপের পরিচয় পাওয়া যায়। রিপোর্টে এইরূপ লেখা আছে ;—

"Ram Mohan Ray, the ablest representative of the more advanced members of the Hindu community, expressed deep disappointment on the part of himself and his countrymen at the resolution of Government to establish a new Sanskrit College instead of a seminary designed to impart instruction in the Arts; Sciences and Philosophy of Europe."

রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন—টোলে যেরূপ সংস্কৃত শিক্ষা হইতেছে, তাহাই হউক, বরং তাহার উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থা হউক; কিন্তু সংস্কৃত শিখাইবার জন্য স্বতন্ত্র কলেজের প্রয়োজন নাই। যাহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান-প্রভৃতির শিক্ষা-প্রসারের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তদর্থে কর্ত্তৃপক্ষের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। টোলের শিক্ষা অব্যাহত রাখিবার পরামর্শ দেওয়া

সাধু কল্পনা সন্দেহ নাই; তবে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রসারের পরামর্শ দিয়া তিনি ভবিষ্যদ্দর্শিতার পরিচয় দেন নাই। তাৎকালিক ইংরেজি শিক্ষার ফলাফল আলোচনা করিলে আমাদের এ কথার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

হিন্দু কলেজের প্রসাদে তখন কলিকাতা সহরে উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজি শিক্ষার আবর্তে পড়িয়া অনেক হিন্দুসন্তান বিপথগামী ও সমাজদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আকস্মিক ইংরেজি শিক্ষার প্রবাহ হিন্দুসমাজকে তখন অনেকটা উদ্বেলিত করিয়াছিল। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সাত বৎসর পূর্বে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তখন হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র বিজাতীয় বিদেশীয় শিক্ষকের বিজাতীয় শিক্ষাভাব-প্রণোদনে এবং ইংরেজি শিক্ষার বিষময় ফলে বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া হিন্দুসমাজে একটা বিষম বিপ্লব ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্বে যাঁহারা কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকের অসদাদর্শে হিন্দু কলেজের তাৎকালিক অনেক ছাত্রের মতি-গতি বিকৃত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি স্বরচিত চরিতে যে আত্মকথা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের এই মন্তব্যের একটি প্রমাণ হইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।...তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন মনে না করিতেন। আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি...প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক-কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া, ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না, উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম। একদা আমি গোলদীঘিতে মদ খাইয়া টুপভুজঙ্গ হইয়া রাত্রিতে বাটীতে আসিলে, মাতাঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলেন,—'আমি কলিকাতার বাসায় থাকিব না। বোড়ালে গিয়া থাকিব।' পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন।...সেকালে মুন্সি আমীর আলী সদর দেওয়ানী আদালতের একজন

প্রধান উকীল ছিলেন।...পিতাঠাকুরের সহিত মুন্সি আমীর আলীর আন্তরিক বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। মুন্সি সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে 'রাজদার দোস্ত' বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথা বলা যাইতে পারে, পার্শিতে তাহাকে 'রাজদার দোস্ত' বলে। প্রতিদিন মুন্সি আমীর আলীর বাটী হইতে আমাদিগের বাসায় একটী টিনের বাক্স আসিত। আমি মনে করিতাম যে; মুন্সি আমীর আলী পিতাঠাকুরকে তরজমার জন্য সদর দেওয়ানীর কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। ...এক দিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি? তাহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্কস্ক্রুপ ও একটি সেরীর বোতল ও একটি ওয়াইন গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের বাক্স খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই, পোলাও, কোপ্তা রহিয়াছে। পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন,—'তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু সেরী মদ দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না, যখনই শুনিব, অন্যত্র মদ খাও, সেই দিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।' কিন্তু আমি এইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম। এইরূপ অপরিমিত মদ্যপানে আমার একটি পীড়া জন্মিল।"

হিন্দু কলেজে পড়িয়া অনেক হিন্দুসন্তান পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহাদের অনেকের কিরূপ মতিগতি ঘটিয়াছিল, তাৎকালিক অধ্যাপক হোরেশ হেমান্ উইলসন্ সাহেবের রিপোর্টে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কথা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম; -

"An impatience of the restrictions of Hinduism and a disregard of its ceremonies are openly avowed by many young men of respectable birth and talents."

—Report of the India Education Commission, p. 257.

উহার তো ইহাই ভাবার্থ,—অনেক ভদ্রবংশজাত এবং বুদ্ধিমান্ হিন্দুসন্তান প্রকাশ্যভাবে স্বধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়াছিলেন। অতঃপর পাঠকের বোধ হয়, আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

তাৎকালিক অনেক ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুসন্তান ইংরেজের গুণানুকরণে অক্ষম হইয়া দোষাবলীর সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া বসিয়াছিলেন। ইংরেজ রাজা;

ইংরেজ জগতে প্রভূত শক্তিশালী, ইংরেজ সমুন্নত সভ্যজাতি বলিয়া সমগ্র পৃথিবীতে পরিগণিত। সভ্য ইংরেজ যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত অনেক কৃতী ব্যক্তি তাহা সভ্যতানুমোদিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

প্রকৃত গুণের অনুকরণ বড় সোজা কথা নহে। গুণানুকরণ তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইয়াছিল। যাহা সহজসার্থ্য এবং অকষ্টকল্প, তাহাই তাঁহাদের অনুকরণীয় হইল। ইংরেজ গরু খান, ইংরেজ মদ খান, ইংরেজ কোট-পেণ্টুলেন পরেন, ইংরেজ ঘাড়ের চুল ছাঁটিয়া মস্তকের সম্মুখ ভাগে লম্বা লম্বা চুল রাখেন। এই সব অনায়াসসাধ্য কার্য্যগুলিকে সভ্যতার অঙ্গ ভাবিয়া অনেক ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুসন্তান তদনুকরণে পূর্ণমাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি তখন হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র, কলেজের সম্মুখে, গোলদীঘির অনাবৃত প্রাঙ্গণে বসিয়া সুরাপান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অনেকে গোমাংস ভক্ষণ করিয়া ভুক্তাবশেষ অস্থিমাংস প্রতিবেশী গৃহস্থের বাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহারা ভাবিতেন, এরূপ না করিলে, ইহাদের বর্ব্বরতার কলঙ্ক অপনীত হইবে না।

ইংরেজি শিক্ষার এতাদৃশ বিষময় ফল-সন্দর্শনে সমগ্র হিন্দু-সমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক হিন্দু কলেজে রক্ষা ছিল না, তাহার উপর সংস্কৃত কলেজটি ইংরেজি কলেজ হইলে, বোধ হয় ঘরে ঘরে নরক-দৃশ্য দেখিতে হইত। সে সময় সংস্কৃত কলেজ ইংরেজি কলেজের অনুকরণে গঠিত হইলেও, সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন থাকায় উহা হিন্দু-সন্তান ব্রাহ্মণগণের তবুও কতক আশ্রয়স্থল হইয়াছিল।

তদানীন্তন ইংরেজি শিক্ষার কুফলসন্দর্শনে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি পড়িয়া, তদানীন্তন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় বিকৃত হইয়া না পড়েন, ইহাই ঠাকুরদাসের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঠাকুরদাস মনে মনে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন যে, বংশের সকলে যেমন অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অগ্রণী হইয়া আসিতেছেন, দারিদ্র্যনিবন্ধন তিনি নিজে সেই সুখে বঞ্চিত হইলেও যদি তাঁহার পুত্র সেই প্রকার অধ্যাপকমণ্ডলীর শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া যাহাতে স্বীয় বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক নানাস্থানের বালককে সংস্কৃত বিদ্যা দান দ্বারা যশস্বী হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; সুতরাং স্বজনগণের পরামর্শমতে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে

ইংরেজি শিক্ষায় ব্রতী করিতে রাজী হইলেন না। তিনি পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। গদাধর তর্কবাগীশ মহাশয় সেই সময়ে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনিও ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করাইবার জন্য ঠাকুরদাসকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত হইলেও, ইংরেজি শিক্ষার ব্যূহবেষ্টনে আবদ্ধ ছিলেন। এক দিকে হিন্দু কলেজের উন্মাদিনী শিক্ষা, অপর দিকে মিশনরী কলেজের মোহিনী মায়া; তদুপরি শক্তিশালী সাহেব সিবিলিয়নদের গাঢ় ঘনিষ্ঠতা। যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তাহার পর বৎসরে পাদরী ডফ্‌ সাহেবের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানী স্কুল "বিসপ্স কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরেজি শিক্ষার অপ্রতিহত ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়বান, মনস্বী ও তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্রও বিচলিত হইয়াছিলেন। অবিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিয়াও ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, ইংরেজি না শিখিলে বর্ত্তমান যুগে সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন দুঃসাধ্য। তাই তিনিও সংস্কৃতপাঠ-সমাপনান্তে কার্য্যাবস্থায় ইংরেজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভাদর্শনে প্রীত হইয়া অধ্যক্ষ মেজর মার্শেল সাহেব বলেন, "ঈশ্বরচন্দ্র, তুমি ইংরেজি পড়িতে আরম্ভ কর। তাহাতে তুমি জগতে বিশেষ যশস্বী হইবে।" তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমতঃ ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ইংরেজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তাহার পর ডাঃ ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) মহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন; পরে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তিনি ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত শিক্ষার ফলেই হউক, আর তাঁহার অলৌকিক দৃঢ়চিত্ততা ও আত্ম-সম্মানবোধের জন্যই হউক, তিনি সর্ব্বতোভাবে দেশীয় ভাব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ইংরেজি শিক্ষার তৎকালীন ফল কতকটা তাঁহাতেও সংক্রামিত হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী হইতে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীর তৃতীয় বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া সন্ধিসূত্র পাঠ করেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-শিক্ষা, সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষার সম্পূর্ণ সাহায্যকারিণী। এই জন্য ভারতে চিরকাল সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগকে সর্ব্বাগ্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া

ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে হয়। মুগ্ধবোধ, পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার, কলাপ প্রভৃতি ব্যাকরণ পাঠ্য। এই সব ব্যাকরণ সহজে আয়ত্ত করিবার জন্য অনেকে সংক্ষিপ্তসারের "কড়চা" অভ্যাস করিয়া থাকেন।

ব্যাকরণ শিক্ষার অনুপাতে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যুৎপত্তি বিকাশ। সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে, সংস্কৃত শিক্ষা যেরূপ তলস্পর্শিনী হইয়া থাকে, অধুনা উপক্রমণিকা, কৌমুদী পড়িয়া সেরূপ হয় না। টোলে ব্যাকরণ শিক্ষাব যে প্রথা প্রচলিত প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজে সেই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে এ প্রথার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, পাঠক পরে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, তখন কুমারহট্টনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব বঙ্গের কৃতবিদ্য বিচক্ষণ পণ্ডিতগণকে নির্ব্বাচিত করিয়া কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত অধ্যাপক নিম্নলিখিত বিষয়ে অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন,—নিমচাঁদ শিরোমণি—দর্শন; শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি—বেদান্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—স্মৃতি, ক্ষুদিরাম বিশারদ—আয়ুর্ব্বেদ; নাথুরাম শাস্ত্রী—অলঙ্কার, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—সাহিত্য, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ—ব্যাকরণ, হরিপ্রসাদ তর্কালঙ্কার—ঐ; হরনাথ তর্কভূষণ—ঐ, যোগধ্যান মিশ্র—জ্যোতিষ।

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ভর্ত্তি হইলে পিতা ঠাকুরদাস প্রত্যহ নয় টার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজে দিয়া আসিতেন; আবার স্বয়ং অপরাহ্ণ চারিটার সময় লইয়া যাইতেন। ছয় মাস কাল এইরূপ করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং কলেজে যাতায়াত করিতেন। ছয় মাস পরে ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঁচ টাকা বৃত্তি পান।

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে "বাঁটুল" ছিলেন। ছাতা মাথায় দিয়া যাইলে মনে হইত, যেন একটী ছাতা যাইতেছে। তাঁহার মাথাটা দেহের অনুপাতে একটু বড় ছিল। এই জন্য বালকেরা তাঁহাকে 'যশুরে কৈ' বলিয়া ক্ষেপাইত। বালক ঈশ্বরচন্দ্র সমবয়স্কদের বিদ্রূপোক্তিতে বড় বিরক্ত হইতেন। অনেক সময় তিনি রাগে রক্তমুখ হইয়া উঠিতেন; কিন্তু কথা কহিতে গিয়া আরও হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেন। তিনি তখন বড় 'তোতলা' ছিলেন। সেই জন্য সহজে সকল কথা উচ্চারিত হইত না এবং এক একটী কথা উচ্চারণ করিতে কাল-বিলম্ব হইত; সুতরাং তাহাতে সমবয়স্ক বালকেরা হাসির মাত্রা চড়াইয়া বিদ্রূপের মাত্রাও

বাড়াইয়া দিত। ক্রমে 'যশুরে কৈ' নামটী 'কসুরে যৈ' শব্দে পরিণত হইয়াছিল। বালকেরা তখন কি বুঝিত,—এই মাথা-মোটা 'যশুরে কৈ' কালে কত বড় লোক হইবে? তাহারা কি তখন বুঝিত,—মাথা অপেক্ষা বালক ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়টা কত বৃহৎ?

বালক বিদ্যাসাগর কলেজে যাহা শিখিয়া আসিতেন, রাত্রিকালে প্রত্যহ পিতার নিকট তাহার আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার জনক মহাশয় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ না হউক, তাহার অধিকাংশ যে জানিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা আত্ম-জীবনীর একাংশে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ব্যাকরণ পাঠ করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনও পাইয়াছি। তাঁহার নিকটে যিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন, তিনি রীতিমত ভট্টাচার্য্য হইয়া অধ্যাপকতা করিয়াছেন। প্রত্যহ পুত্রের আবৃত্তি শুনিয়া ব্যাকরণে ঠাকুরদাসের অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পুত্র কোন কথা বিস্মৃত হইলে পিতা তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেন। পুত্র বুঝিতেন, তাঁহার পিতা ব্যাকরণে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। পুত্রের নিকট পিতার প্রকারান্তরে কৌশলে অনুশীলন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

পুত্রের বিদ্যানুরাগিতা সম্বর্দ্ধনসম্বন্ধে পর সেবা-নিরত হইয়াও পিতা এক মুহূর্ত্তের জন্য কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না। কার্য্যস্থানের কঠোর পরিশ্রমেও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। রাত্রি নয়টার পর বাসায় ফিরিয়া তিনি রন্ধনাদি করিতেন এবং পুত্রকে আহার করাইয়া আপনি আহার করিতেন। তাহার পর পিতা-পুত্রে একত্র শয়ন করিতেন। শেষ রাত্রিতে পিতা, পুত্রের পঠিত বিদ্যার পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি পর-মুখ-শ্রুত নিজের অভ্যস্ত নানাবিধ উদ্ভট শ্লোক পুত্রকে শিখাইতেন।

ঠাকুরদাস কঠোর-শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। যে দিন তিনি দেখিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, সে দিন তাঁহাকে নিদারুণ প্রহার করিতেন। এক দিন ঈশ্বরচন্দ্র পিতার নিকট চালাকাঠের মার খাইয়া কলেজের তদানীন্তন কেরাণী রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। রামধনবাবু তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত বাড়ীতে রাখিয়া আহারাদি করান। পরে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বাসায় পৌঁছাইয়া দেন। সময়ে সময়ে পিতার নিকট মার খাইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র এমনই আর্ত্তনাদ করিতেন যে, তাহাতে সিংহ-পরিবার উত্যক্ত হইয়া উঠিতেন এবং ঠাকুরদাসকে বলিতেন,—"এরূপ প্রহারে হয় তো বালক কোন্ দিন মারা যাইবে; অতএব যদি এরূপ প্রহার কর, তাহা হইলে এখান হইতে তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।" ইহাতে প্রহারের

মাত্রা কিছু কম হইত। ঈশ্বরচন্দ্রও অনেকটা সাবধান হইয়া চলিতেন। পাছে নিদ্রা আসে বলিয়া, তিনি আপনার চক্ষে সরিষা তেল দিতেন। তেলের জ্বালায় নিদ্রা পলায়ন করিত। বর্ত্তমান যশস্বী খ্যাতনামা কোন কোন ব্যক্তি ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য বাল্যকালে এইরূপ ও অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন, ইহাও আমরা জানি। লেখকের কোন বন্ধু বাল্যকালে ঘুমাইবার পূর্ব্বে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া রাখিতেন। দড়ির টানে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি পাঠাভ্যাসে রত হইতেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে এক জন অধিক বেতন-ভোগী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী বালকদিগের জন্য প্রচণ্ড প্রহার, পীড়ন বা কঠোর দণ্ড-শাসনের প্রয়োজন হয় না, বরং এ ব্যবস্থায় অনেক সময় বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। যাহারা স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিহীন বা বিদ্যার্জনে অমনোযোগী, তাহাদের তো কিছুতেই কিছু হয় না; পরন্তু এমনও দেখিয়াছি, কঠোর শাসন-পীড়নে অনেক স্বাভাবিক বুদ্ধিমান্ বালক বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আমাদের একজন আত্মীয়ের একটী বুদ্ধিমান্ পুত্র ছিল। পিতা ভাবিতেন, নিয়ত কঠোর শাসনে রাখিতে পারিলে, পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির মাত্রা বাড়িবে। এই বিশ্বাসে পুত্রের সামান্য দোষ দেখিলেই পিতা পুত্রের প্রতি কঠোর প্রহার-পীড়নের ব্যবস্থা করিতেন। ফলে পুত্রের হৃদয়ে পিতৃশাসনের বিভীষিকা এতদূর ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, পুত্র পিতাকে দেখিলেই দূরে পলায়ন করিত। তখন বহু সাধ্য-সাধনায়ও তাহাকে সমীপবর্ত্তী করা দুঃসাধ্য হইত, সুতরাং যাহার জন্য শাসন, তাহাই ঘুচিয়া গেল। এইরূপ শাসন-বিভীষিকায় পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি-পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রহার-পীড়ন-ফলে বুদ্ধিমান্ ঈশ্বরচন্দ্রের অবশ্য সেরূপ হয় নাই। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনেও এরূপ শাসন-পীড়নের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতারও ঠাকুরদাসের ন্যায় কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। আবার ইহাও দেখা যায়, এক জনের বুদ্ধিহীন পুত্র পিতার প্রহার-পীড়নেও নির্বুদ্ধিতার সীমা অতিক্রম করিতে না পারিয়া অধঃপাতে গিয়াছে; অপর বুদ্ধিমান্ পুত্র অক্ষত-পৃষ্ঠে জীবনের পথ উজ্জ্বল করিয়াছে। এ সব দৃষ্টান্তের আলোচনায় অদৃষ্টবাদিত্বের পক্ষপাতিত্ব পড়ে না কি?

ব্যাকরণ শ্রেণীতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র অন্য ছাত্র অপেক্ষা অধ্যাপকের প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। অন্যান্য ছাত্রাপেক্ষা ব্যাকরণ বিদ্যায় তাঁহার অসম্ভাবিত ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অধ্যাপক তাঁহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি পাঠান্তে ঈশ্বরচন্দ্রকে

আপনার নিকট বসাইয়া উদ্ভট শ্লোক শিখাইতেন। পিতা ও অধ্যাপকের নিকট ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় চারি পাঁচ শত উদ্ভট শ্লোক শিখিয়াছিলেন।*

ব্যাকরণ শ্রেণীতে পড়িয়া তিন বৎসরের মধ্যে তিনি দুই বৎসর প্রচুর পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; এক বৎসর পান নাই। সেই বৎসর তিনি মনঃসংক্ষোভে ও অভিমানে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা ও অধ্যাপকের অনুজ্ঞায় পারেন নাই। সে বৎসর যে তিনি পারিতোষিক পান নাই, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও মত এইরূপ,—"ঐ বৎসর প্রাইস্ সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যাহা উত্তর করিতেন, তাহা ভালরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক করিতেন; সুতরাং উত্তর দিতে বিলম্ব হইত; কিন্তু প্রায়ই তাহা নির্ভুল হইত। যে বালক বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়াছিল, তাহা ভাল হউক, আর মন্দই হউক, সাহেব তাহাকে বুদ্ধিমান্ জানিয়া অধিক নম্বর দিয়াছিলেন।" সংস্কৃত ব্যাকরণের পরীক্ষায় সাহেব পরীক্ষক সম্বন্ধে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। সাহেব কেন, কোন কোন টোলের ও কলেজের অধ্যাপকের এরূপ সংস্কার ছিল ও আছে, যে বালক দ্রুত উত্তর করিতে পারে, সে নির্ভুল বলিতেছে; সত্বর উত্তর করায় তাঁহারা ভুল ধরিতে পারেন না। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় দুই একবার ঐরূপ বালকদের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন।

এই সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের "একগুঁয়েমী" ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই "একগুঁয়েমীর" দরুণ পিতা অনেক সময় উত্যক্ত হইতেন। পিতা বলিতেন,—"ফরসা কাপড় পরিয়া স্কুলে যাও।" ঈশ্বরচন্দ্র বলিতেন,—"ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব।" যে দিন ঈশ্বরচন্দ্র স্নান করিব না মনে করিতেন, সে দিন তাঁহাকে স্নান করান বড়ই দুষ্কর হইত। পিতা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গার ঘাটে বলপূর্ব্বক স্নান করাইয়া দিতেন। অন্য কোন গুরু জন কোন কাজ করিতে বলিলে, ঈশ্বরচন্দ্র যদি মনে করিতেন করিব না, তাহা হইলে কেহই তাঁহাকে তাহা করাইতে পারিতেন না। গুণের মধ্যে এই ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র কাহারও কথায় কোন উত্তর না দিয়া কেবল ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এই জন্য

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত "শ্লোকমঞ্জরী" নামক গ্রন্থে বহু সংখ্যক উদ্ভট শ্লোক দেখিতে পাইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এই উদ্ভট শ্লোক দ্বারা আমরা সবিশেষ উপকার লাভ করিয়াছিলাম, সন্দেহ নাই। আমাদের পাঠদশায় উদ্ভট শ্লোকের যেরূপ আদর ও আলোচনা লক্ষিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ উদ্ভট শ্লোকের আলোচনা একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।"

পিতা ঠাকুরদাস তাঁহাকে অনেক সময় "ঘাড়কেঁদো" বলিয়া ডাকিতেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের "একগুঁয়েমীর" কথায় বালক জনসনের "একগুঁয়েমীর" কথা মনে পড়িয়া যায়। বাল্য কালে এক জন ভৃত্য জনসনকে প্রত্যহ স্কুল হইতে লইয়া আসিত। এক দিন ভৃত্যের যাইতে বিলম্ব হওয়ায় বালক জনসন্ আপনি স্কুল হইতে বাহির হন এবং পথে চলিয়া যান। স্কুলের কর্ত্রী জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, বালক হয় পথ ভুলিয়া অন্যত্র গিয়া পড়িবে, না হয় অন্য কোনরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি জনসনের অনুবর্ত্তিনী হন। বালক জনসন্ দেখিলেন, কর্ত্রী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে কর্ত্রী সন্দিহান হইয়াছেন ভাবিয়া, বালক জনসন্ অভিমানে অভিভূত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন, এমন কি তখনই ফিরিয়া গিয়া কর্ত্রীকে যথা-সাধ্য প্রহার করিলেন। জনসনের জীবনীলেখক বসওয়েল তাঁহার এই "এক-গুঁয়েমীর" বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া বলিয়াছেন,—"জনসনের ভবিষ্যৎ জীবনে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।" বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আমরাও এই কথা বলিতে পারি।

ব্যাকরণ পাঠের সময় ১২৩৭ সালে বা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের ইংরেজি শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১২৩৩ সালে বা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এই ইংরেজি শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ বিশাল ইংরেজি-বৃক্ষের ইহাই বীজাঙ্কুর। ছাত্রেরা কাজের মতন যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজি শিখিতে পারে, ইংরেজি শিখিয়া, ইংরেজি চিকিৎসা-গ্রন্থাদি কতক পরিমাণে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই ইংরেজি শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে উলষ্টন সাহেব এই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন।* ইহাতে পড়িতে কিন্তু অনেকের প্রবৃত্তি ছিল না। বহু ছাত্রের মধ্যে অল্পসংখ্যকই পড়িত। বিদ্যাসাগর ছয় মাস মাত্র এই শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন ; সুতরাং ইংরেজিতে তিনি তাদৃশ জ্ঞান লাভ করেন নাই। তাঁহার জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে অন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

এইবার বালকের অক্ষুণ্ণ শ্রমশীলতার পরিচয় লউন। ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিনি তিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করেন। তিন বৎসরে ব্যাকরণপাঠ সাঙ্গ করিয়া, বাকি ছয় মাস তিনি অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এ অল্প বয়সেও তিনি প্রায় সারা রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। রাত্রি দশটার সময় আহারান্তে ঠাকুরদাস দুই ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন নিদ্রা যাইতেন। রাত্রি বারটার সময় পিতা

* **Minute of the Sanskrit College, 1835.**

তাঁহাকে তুলিয়া দিতেন। তার পর বালক সমস্ত রাত্রি পড়িতেন। এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমে ঈশ্বরচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে পীড়া ভোগ করিতে হইত। এইরূপ অমানুষিক পরিশ্রম বিদ্যাসাগর যাবজ্জীবন করিয়াছিলেন। আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র পাঠ্যাবস্থায় এইরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকেন বটে ; কিন্তু অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিশ্রমের কথা তো পরের কথা, দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে শিখিলে, তাঁহারা বিলাস-মদ-লালসার সম্পূর্ণ পরবশ হইয়া এক একটা "বাবুজী" হইয়া পড়েন।

নবম বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। একাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয়।

দ্বাদশ বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের কাব্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। সেই সময় পণ্ডিতবর জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বালক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পাঠ করিতেন।* বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত ধী-শক্তির পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলী বিস্মিত হইতেন। প্রথম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘব-পাণ্ডবীয় প্রভৃতি সাহিত্য-পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে তিনি মাঘ, ভারবি, শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি পাঠ করেন। এ সব কাব্য আদ্যোপান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। অনুবাদে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। পুস্তক না দেখিয়া তিনি সংস্কৃত নাটকাদি অনর্গল বলিতে পারিতেন। দ্বাদশ বর্ষীয় বালক সংস্কৃত কথা কহিতে পারিতেন। প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতেও তাঁহার কোন সঙ্কোচ হইত না। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তি ও অশ্রুত-পূর্ব্ব বাক্যবিন্যাস-ক্ষমতা দেখিয়া মোহিত হইতেন এবং প্রায়ই বলিতেন,—"এ বালক পৃথিবীতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে।" প্রতিভা আর কাহাকে বলে ?

দ্বিতীয় বৎসর সাহিত্য-পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম হন। হস্তাক্ষরের জন্য তিনি প্রতি বৎসর পারিতোষিক পাইতেন। হস্তাক্ষরের প্রশংসা তাঁহার যাবজ্জীবন ছিল। সকল সাহিত্য-সেবকের ভাগ্যে এরূপ প্রশংসা ঘটিয়া উঠে না। আধুনিক উচ্চতম সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-সমালোচকদিগের সংস্রবে থাকিয়া আমাদের কতকটা এই প্রতীতি জন্মিয়াছে। বিদ্যাসগর মহাশয় অনেক

* এই মদনমোহন উত্তরকালে সুকবির খ্যাতি পাইয়াছিলেন ও মুক্তারাম শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত পুঁথি স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন। পুঁথির লেখা দেখিয়া সকলে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি যে সকল পুঁথি স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার পঙ্‌ক্তিগুলি দেখিলে মনে হয়, যেন কারপেটে উল বুনিয়া লেখা।

এই সময় বালক বিদ্যাসাগর জীবন-সংগ্রামে কঠোরতার অভেদ্য ব্যূহ-বিবরে পতিত হন। সে কঠোরতা দরিদ্র হীনাবস্থাপন্ন বালকের অনুকরণীয়, শিক্ষণীয় এবং সর্ব্ব সাধারণের চিরস্মরণীয়। সেই সময় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু * শিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। পাক-কার্য্যের ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপর পতিত হয়। কেবল কি তাই, প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া তিনি বাজারে যাইতেন এবং বাজার হইতে পিতার অবস্থানুসারে আলু, পটোল প্রভৃতি তরি-তরকারী ও মৎস্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। তৎপরে তিনি নিজেই ঝাল হলুদ শিলে বাটিয়া লইতেন। তখন পাথুরে কয়লার প্রচলন হয় নাই। তিনি স্বহস্তে কাঠ চালা করিতেন এবং উনুন ধরাইতেন। বাসায় চারিটী লোক খাইতেন। চারিজনের জন্য ভাত, ডাল, মাছের ঝোল রাঁধিয়া তিনি সকলকে আহার করাইতেন এবং আহারান্তে সকলের উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিয়া স্বয়ং বাসনাদি ধৌত করিতেন। হলুদ বাটিয়া, কাঠ চিরিয়া, বাসন মাজিয়া সত্য সত্য তাঁহার অঙ্গুলি ও নখ কতকটা খয়িয়া গিয়াছিল। তুমি আমি শুনিলে শিহরিয়া উঠি বটে ; বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতে কিন্তু অপার আনন্দ ও পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। অনেক অবস্থাহীন ব্যক্তি বাল্যকালে এইরূপ কঠোরতার সহিত সংগ্রাম করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে অতুল কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায়। তাঁহাকে একজনের বাসায় রন্ধন করিতে হইত। রন্ধন করিতে করিতে তিনি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেন। তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে একজন যশস্বী চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হন। বাল্যে বা যৌবনে কঠোরতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে কোন বিষয়ে কীর্ত্তিমান্ হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। দারিদ্র্যের কঠোরতায় ভবিষ্যৎ জীবনোন্নতির বীজ উপ্ত হয়। দারিদ্র্যের নির্ম্মমতায় অসাধারণ চরিত্র, শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। কঠোরতার উত্তেজিকা শক্তি দরিদ্রের শিরায় শিরায় শোণিত-প্রবাহে যেন বিদ্যুৎ ছুটায় এবং দারিদ্র্যের আলিঙ্গনে প্রীতি ও প্রফুল্লতা, অধ্যবসায় ও আত্মসংযম সহজসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য রিচার্

---

* ইনি ন্যায়রত্ন উপাধি ভূষিত হন। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তৎপরে স্কুলের ডিপুটী ইনস্‌পেক্টর হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত একখানি পদ্য পুস্তক ছিল।

বলিয়াছেন,—"এস, দারিদ্র্য এস ; তোমায় আলিঙ্গন করি ; জীবনে যেন বিলম্ব করিয়া আসিও না।"

স্পেনের কবি সারবেন্তিসের দারিদ্র্যের কথায় একজন বলিয়াছেন,—

"ইহার দারিদ্র্যে পৃথিবী ধনশালিনী।" অর্থাৎ তাঁহার গ্রন্থে জগৎ উপকৃত।

সত্য সত্যই তো বুদ্ধিজীবী শক্তিশালী ব্যক্তি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যে শক্তি ও ক্ষমতা সঞ্চয় করেন, আত্মীয়-পরিজন-পরিবৃত অতুল ধনের উপর অধিষ্ঠিত ব্যক্তি অনেক সময় তাহা পারে না। কার্লাইল সাধে কি বলিয়াছেন,—

"যাঁহাকে দুঃখদারিদ্র্যের সহিত যুঝিতে হয় নাই ; যিনি ঘরে বসিয়া সর্ব্ব সম্পদের প্রহরী বেষ্টিত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহার অপেক্ষা যিনি দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর সমরে জয়ী হন, দেখিবে পরিণামে তিনিই বলবত্তর শূর এবং অধিকতর কর্ম্মঠ বলিয়া সমাজে প্রতিপন্ন হইবেন।" *

বালক বিদ্যাসাগর রন্ধনাদি করিয়া ভ্রাতা ও পিতাকে মনের আনন্দে আহার করাইতেন এবং সতত আত্মপ্রসাদে প্রফুল্ল থাকিতেন। যাহাকে আমাদের কঠোর কষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহা তাঁহার মনোমদ স্নিগ্ধ সুখকর বলিয়াই মনে হইত। তিনি রন্ধনের ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না ; অধিকন্তু পাঠাভ্যাসে অবিরাম পরিশ্রম করিয়াও কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিতেন না। কষ্টের সীমা ছিল না। যে ঘরে তিনি রন্ধন করিতেন, সে ঘরটী অতি জঘন্য ছিল। একে তো ঘরটী বাড়ীর সর্ব্ব নিম্নতলে, তাহার উপর জানালার অভাবে ভয়ানক অন্ধকারময়। নিকটে দুইটী পাইখানা ছিল ; সুতরাং ঘরটী সদাই দুর্গন্ধে পূর্ণ থাকিত। মলমূত্রের কীটসকল 'কিলি-বিলি' করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিত। ঈশ্বরচন্দ্র রন্ধন করিবার সময় ঘটীতে জল লইয়া বসিয়া থাকিতেন। পোকাগুলো ঘরের ভিতর ঢুকিলে তিনি জল দিয়া ধুইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত ঘরময় প্রায় আরসুলা ঘুরিয়া বেড়াইত। সময়ে সময়ে ভাতে ব্যঞ্জনে আরসুলা উড়িয়া পড়িত। হঠাৎ কোন দিবস ঈশ্বরচন্দ্র অজ্ঞাতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটা আরসুলা রাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে, ভ্রাতা বা পিতা ঘৃণাপ্রযুক্ত আর ভোজন করিবেন না, ইহা ভাবিয়া তিনি আরসুলাটী ব্যঞ্জন সহিত ভক্ষণ করেন।

---

* He who has battled, were it only with poverty and hard toil, will be found stronger and more expert than he who could stay at home from the battle, concealed among the provision waggons, or even rest unwatchfully, abiding by the stuff.

আহারের তো এই অবস্থা। শয়নের অবস্থা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে তাঁহার শয়নব্যাপারের এইরূপ পরিচয় পাইয়াছি। নারায়ণবাবু বলেন,—"এক দিন চন্দননগরের বাসা-বাড়ীতে আমি বলিলাম,—'বাবা! এ ছোট ঘরে শুইতে আপনার কষ্ট হইবে না তো?' বাবা বলিলেন,—'বলিস্ কি রে! ছেলে বেলায় বড়বাজারের বাসায় আমি দেড় হাত চওড়া ও দু-হাত লম্বা একটী বারাণ্ডায় প্রত্যহ শয়ন করিতাম। বারাণ্ডার আলিসা আমার বালিস ছিল। আমি বারাণ্ডার মাঝে একটী মাজুরী করিয়াছিলাম, সেই মাজুরীতেই শয়ন করিতাম। এক দিন রাত্রিকালে দেখিলাম, সেই মাজুরীর উপর আমার একটী ভ্রাতা শুইয়া আছে। আমি তাহার নিকট গিয়া অনেক ডাকা-ডাকি করিলাম; সে কিন্তু কিছুতেই উঠিল না, তখন আমি তাহার নিজের বিছানায় গিয়া শুইলাম। শুইবামাত্র আমার গায়ে বিষ্ঠা লাগিয়া গেল। আমি তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া একটু মজা করিব বলিয়া যেখানে আমার সাধের বিছানায় ভাইটী শুইয়াছিল, সেইখানে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, উঠ্‌বি তো ওট্, না হলে তোর গায়ে বিষ্ঠা মাখাইয়া দিব। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া চলিয়া আসিলাম। সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হয় নাই।' জগদ্দুর্লভ-বাবুর বাড়ীর সম্মুখে তিলকচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর নিম্নতলে একটী ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র শয়ন করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতেন। ভ্রাতা তাঁহার শয্যায় শয়ন করিতেন। বালক বিদ্যাসাগর পাঠাভ্যাস করিয়া অধিক রজনীতে শয়ন করিতেন। এক দিন ভ্রাতা বিছানায় মলত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাছে একথা বলিলে পেটের ব্যারাম হইয়াছে বলিয়া খাইতে না পান, সেই ভয়ে ভ্রাতা মলত্যাগের কথা প্রকাশ করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র তো তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি প্রাতে উঠিয়া দেখেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা। তখন তিনি বিষ্ঠা ধৌত করিয়া স্বহস্তে ভ্রাতার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দেন। বিদ্যাসাগরের যেমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি ছিল, তেমনই ভ্রাতৃ-স্নেহ ছিল।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন তাঁহার উপর এক বেলা রন্ধনের ভার ছিল। রাত্রিকালে পিতা নয়টার সময় বাসায় আসিয়া পাকাদি করিতেন। এত কষ্টে বিদ্যাসাগরের পাঠাভ্যাসে ক্রটি ছিল না। তিনি কলেজে যাইবার সময় পুস্তক খুলিয়া পড়িতে পড়িতে যাইতেন এবং কলেজ হইতে আসিবার সময়ও ঐরূপ করিতেন। চিরকাল তিনি বিলাসে বীতস্পৃহ ছিলেন।

সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াও তিনি মোটা কাপড় ও মোটা চাদর ব্যবহার করিতেন। বাল্যেও তাঁহার তাহাই ছিল। জননী চরকায় সূতা কাটিয়া, বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইতেন। সেই মোটা কাপড় পরিয়া তিনি কলেজে যাইতেন। বিদ্যাভ্যাসে তাঁহার ত্রুটির কথা শুনা যায় নাই। দৈবাৎ একটু ত্রুটী হইলে পিতা ঠাকুরদাস ভয়ানক শাসন করিতেন। পুত্রও পিতার শাসনকে বড় ভয় করিতেন। বাল্যাবস্থায় বিদ্যাসাগর সন্ধ্যার মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এ কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। পিতা তাহাকে শাসন করেন। এই শাসনে তিনি সন্ধ্যার পুঁথি দেখিয়া সন্ধ্যা মুখস্থ করিয়াছিলেন।

কাব্যে ও ব্যাকরণে ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অত্যদ্ভুত ব্যাপার। বীরসিংহ গ্রামে আদ্যশ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে তিনি এত অল্পবয়সে অনেক সময় সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার রচনা দেখিয়া তাৎকালিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী অবাক হইতেন। মিলটন্ ত্রয়োদশ বর্ষে কবিতা রচনা করিয়া তাৎকালিক বিলাতী পণ্ডিতবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। * জীবিত, সর্ব্বত্র-প্রচারিত ও প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখিবার চেষ্টামাত্রে যদি মিলটন্ প্রতিভাশালী বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন, তাহা হইলে বালক বিদ্যাসাগর অধুনা সংকীর্ণ-প্রচার সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতজনমোহকর কবিতা রচনা করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাশালী বলিয়া কি পরিচিত হইতে পারেন না? সংস্কৃত ভাষা আজ যদি পূর্ণ প্রচলিত থাকিত, সংস্কৃত যদি হিন্দু-সন্তানের সাধারণ শিক্ষণীয় ও পঠনীয় হইত, তাহা হইলে এই প্রতিভাশালী বাল-কবির মস্তিষ্ক হইতে ভবিষ্য জীবনে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী কবিতা নিঃসৃত হইয়া যে প্রতিভার পূর্ণ বিভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বালক বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধ-সভায় সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের বিচার করিতেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা ও কথনশক্তিশীলতার প্রতিপত্তি ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইল। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল। লোকে বলিতে লাগিল,—"অদ্বিতীয় পণ্ডিত।"

* His first attempts in poetry were made as early as his 13th year, so that he is as striking an instance, of precocity as of power of genious.—Shaw's Students English.

চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহ, শ্বশুরের পরিচয়, অলঙ্কারে প্রতিষ্ঠা, দয়া, সখ ও শ্রম

ঈশ্বরচন্দ্রের ভূয়সী খ্যাতি-প্রতিপত্তি হওয়ায়, নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে কন্যা সমর্পণ করিবার জন্য লালায়িত হন। ক্ষীরপাইনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা দিনময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এ বয়সে তাঁহার বিবাহ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতার অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন। দিনময়ী পাদুকা-কন্যা। পাদুকা-কন্যার সৌভাগ্য-ফলে স্বামীর লক্ষ্মী অচলা হয়। দিনময়ীর পতির অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছিল। ভাগ্যবতী দিনময়ী পুত্রকন্যা রাখিয়া স্বামীর পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিজ সৌভাগ্যশালিতার এবং শুভগ্রহসম্পন্নতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বহুবর্ষব্যাপক কৃচ্ছ্রসাধ্য সাবিত্রী ব্রতের উদ্যাপন করিয়াছিলেন। সকল নারীর ভাগ্যে সধবা অবস্থায় এই কঠোর ব্রতের উদ্যাপন করা ঘটিয়া উঠে না। অনেককেই অনুদ্যাপিত অবস্থায় তনু ত্যাগ করিতে হয়। দিনময়ী প্রকৃত সাধ্বীর মত সকল দিক বজায় করিয়া, পতিপুত্র রাখিয়া দিব্যধামে প্রয়াণ করেন।

এইখানে দিনময়ীর পিতা শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের একটু পরিচয় দিই। এ পরিচয়ে পরিণামসম্পর্ক আছে। বংশৌরসের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য এই পরিচয়।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য অতি তেজস্বী, ক্রোধী ও বলশালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার গ্রামে তাঁহার বলবত্তার তুলনা ছিল না; পরন্তু তিনি সহজাতা সহৃদয়তা ও উদারতা গুণে সর্ব্বজনের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার বলবত্ত ও উদারতার দুই একটী গল্প শুনুন।

প্রতি বৎসর ক্ষীরপাই নগরে গাজন হইত। ভট্টাচার্য্য এই গাজনের অধিনেতা ছিলেন। গাজন লইয়া সহর প্রদক্ষিণ করা তখনকার নিয়ম ছিল। স্বয়ং শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য গাজনের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী পল্লীর লোক তাঁহার বিষম প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার বিষম প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, তিনি শত্রুঘ্নকে গাজন লইয়া তাঁহার পল্লীতে যাইতে দিবেন না। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু বলদৃপ্ত ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা হইল, তিনি যে কোন প্রকারে হউক, প্রতিপক্ষের পল্লীতে যাইবেন। তিনি গাজন লইয়া সেই দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু গিয়া দেখেন, পল্লীর পথের সম্মুখে একটী হস্তী দণ্ডায়মান,

তৎপশ্চাতে কিয়দ্দূরে একখানি রথ ; তৎপশ্চাতে আরও দূরে প্রতিপক্ষেরা অবস্থিত ছিলেন। ভট্টাচার্য্য বুঝিলেন, এ সব গতিরোধের ব্যবস্থা। তিনি কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পথ হইতে একখানি ইট্ কুড়াইয়া লইলেন। পরে হস্তীর শুণ্ড বগলে চাপিয়া রাখিয়া সেই ইষ্টক খণ্ডদ্বারা হস্তীকে এমনই প্রহার করিলেন যে, হস্তী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে পলায়ন করিল। পরে ভট্টাচার্য্য সবলে রথখানা একাকী টানিয়া ফেলিয়া দেন। দুর্দ্দান্ত বীরের বিক্রম-ব্যাপার দেখিয়া প্রতিপক্ষ পলায়ন করেন। ভট্টাচার্য্য ক্রোধান্বিত হইয়া একাকী তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হন। প্রতিপক্ষের দলপতি হালদার ভয়ে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। ভট্টাচার্য্য পদাঘাতে লৌহকীলকবিশিষ্ট দ্বার ভগ্ন করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করেন। তাঁহার পায়ে একটা লৌহশলাকা ফুটিয়া গিয়াছিল। তাহাতেও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁহার শ্যালক ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আসিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—"ভট্টাচার্য্য করিয়াছ কি, তোমার পায়ে যে পেরেক ফুটিয়াছে।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"বটে বটে, টানিয়া বাহির করিয়া লও।" পেরেক বাহির করা হইল। ভট্টাচার্য্যের নিবৃত্তি নাই। তিনি প্রতিপক্ষের দলপতি হালদারের অন্বেষণে বাড়ীর ভিতরের দিকে ছুটিলেন। দলপতির লোকেরা ভয়ে তাঁহাকে এমনই স্থানে ভয়ঙ্কররূপে ইষ্টকাঘাত করেন যে, তাহাতে ভট্টাচার্য্য বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসেন।

প্রতিপক্ষের দল ভাবিলেন,—ভট্টাচার্য্যকে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে ; তিনি বোধহয়, আদালতে নালিশ করিবেন। ভট্টাচার্য্যের মনোগতভাব জানিবার নিমিত্ত তাঁহারা এক জন চর পাঠাইয়া দেন। ভট্টাচার্য্য চরকে দেখিয়াই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিলেন। তিনি বলিলেন,—"হালদার ভাবিয়াছে, আমি নালিশ করিব। নালিশ করিব কি রে! উকিল পেয়াদাকে পয়সা খাওয়াইব? এবার সে মারিয়াছে. আগামী বারে আমি মারিব। নালিশ-ফৌজদারী করিলে আর গাজন কি থাকিবে?" চর এই কথা শুনিয়া চলিয়া যায়। পরে প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করেন। দলপতি হালদার বলেন,—"ভট্টাচার্য্য! তোমার বলপরীক্ষার জন্যই ঐরূপ করিয়াছিলাম। তুমি দ্বিতীয় ভীম বটে ; তোমার শুধু বল নহে ; মনুষ্যত্ব আছে। তোমার তেজ আছে, তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিবার বুদ্ধি আছে। আমায় ক্ষমা কর।"

হালদারের কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"এ সব কথায় আর কাজ নাই ; আজ আমার বাড়ীতে তোমাদের সকলকে খাইয়া যাইতে হইবে।"

প্রতিপক্ষগণ ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ পরমানন্দে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে পরম পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন।

আর এক সময় ভট্টাচার্য্য এক দোকানে বসিয়া আছেন, এমন সময় চারিমণী কলাই-বোঝাই এক ছালা আসিয়া উপস্থিত হয়। উপস্থিত সকলে বলিল,—"ভট্টাচার্য্য! তুমি যদি এই ছালা বহিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমায় এই কলাই দি।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"পারি বটে; কিন্তু সোজা হইয়া যাইব না, দুই পা ও দুই হাত মাটীতে রাখিয়া গরুর মত চলিব; তোমরা আমার পিঠে এক খানি লেপ দিয়া তাহার উপর কলাই চাপাইয়া দিবে।"

তাহাই হইল। ভট্টাচার্য্য সেখান হইতে প্রায় আধক্রোশ দূরে সেই চারিমণী ছালা বহিয়া বলদের মত হাঁটিয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২০০/৩০০ দুই-শ তিন-শ লোক গিয়াছিল। বাড়ীতে পৌঁছিলে সকলে ভট্টাচার্য্যকে কলাই লইতে অনুরোধ করে। ভট্টাচার্য্য বলেন—"আমি কলাই কি করিব? কোথায় রাখিব? তোমরা উপযুক্তরূপ চাউল তরি-তরকারী প্রভৃতি লইয়া এস; এই কলায়ে দাইল হউক; রাঁধিয়া বাড়িয়া সবাই আনন্দে আহার করিব।" তাহাই হইল।

এক সময় ভট্টাচার্য্যের গ্রামস্থ ভুবন ঘোষ নামক এক সদ্গোপ নিকটবর্ত্তী একটী খালের নিকট বেণাবনের ভিতর লোক ঠেঙ্গাইয়া মারিত। ঘোষ খুব বলবান ছিল। গ্রামের লোক তাহার জন্য সদা শঙ্কিত থাকিত। একদিন ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন—"শতু! তুই থাকিতে ঘোষ জব্দ হয় না।" শত্রুঘ্ন বলিলেন,—"তাহার আর কি, এত দিনতো বল নাই।" শত্রুঘ্ন ঘোষকে জব্দ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শত্রুঘ্ন এক দিন প্রাতঃকালে চুপি চুপি গিয়া বেণাবনে লুকাইয়া থাকেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তিনি দেখিলেন, সমস্ত বন আন্দোলিত হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, ঘোষ কাহাকে ধরিয়াছে। বাস্তবিক ঘোষ সেদিন একজন পশ্চিমে খোট্টাকে ধরিয়াছিল। খোট্টাটী খুব বলবান্ ছিল, ঘোষ তাহাকে সহজে পাড়িতে পারে নাই। দুই জনে ধস্তাধস্তি হইতেছিল। ভট্টাচার্য্য এই সময় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া ঘোষ ভায়া শিকার ছাড়িয়া সম্মুখে একটী শিমুল গাছে উঠিয়া পড়ে। এই সময় খোট্টাটী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। ভট্টাচার্য্য তাহার মুখে জল দিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। পরে তিনি

শিমূল বৃক্ষের তলায় গিয়া তাহার উপর উঠিতে চেষ্টা করেন। স্থূলকায় হেতু উঠিতে না পারিয়া তিনি শিমূলতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে তিনি বলিলেন,—'ঘোষ! তুই কতক্ষণ থাকবি? তোকে না মারিয়া আমি যাইতেছি না।" ঘোষ গাছের উপর বসিয়া থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল। সে কোনমতে গাছ হইতে নামিল না। ঘোষ গাছ হইতে কিছুতেই নামিতেছে না দেখিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"নামিয়া আয়্; আমার পা ছুঁইয়া দিব্যি কর্ যে, আর এ কাজ কর্‌বি না; তাহলে এ যাত্রা তোকে ক্ষমা করিব।"

ঘোষ বলিল, —"তুমি পৈতা ছুঁইয়া দিব্যি কর, আমি নামিয়া গেলে আমাকে মার্‌বে না, তাহলে আমি নাম্‌বো।"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া কহিলেন,—"আমি পৈতা ছুঁইয়া দিব্য করিলে তোর বিশ্বাস হইবে কেন?"

ঘোষ বলিল, "আমি তোমার পা ছুঁইয়া দিব্যি করলে তুমি বিশ্বাস কর্‌বে, আর তুমি ব্রাহ্মণ, পৈতা ছুঁইয়া দিব্যি কর্‌লে আমি বিশ্বাস কর্‌ব না?"

ভট্টাচার্য্য পৈতা ছুঁইয়া দিব্য করিলেন। ঘোষ নামিয়া আসিয়া ভট্টাচার্য্যের পা ছুঁইয়া দিব্য করিল, ভট্টাচার্য্য ক্ষমা করিলেন। ঘোষ চলিয়া গেল। পরে ভট্টাচার্য্য সেই আহত খোট্টাটীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। তিনি খোট্টাটীকে যথাযোগ্য আহারাদি করাইয়া বিদায় দেন।

ভট্টাচার্য্যের প্রতাপে সে সময় অনেক দস্যু-লেঠাল জব্দ হইয়াছিল।

একবার তাঁহার পৃষ্ঠব্রণ হয়। ডাক্তার অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে "ক্লোরোফরম্" করিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিবার উপক্রম করেন। তিনি বলিলেন,—"অজ্ঞান করবে কেন? অস্ত্র কর, আমি অজ্ঞান হইয়া আছি।" ডাক্তার ছুরি বসাইলেন, ছুরি ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার দেহের চর্ম্ম ঠিক হাতীর শুঁড়ের মত কঠিন ছিল। ডাক্তার ভাবনায় পড়িলেন, কি করিবেন। অন্য ছুরি আনিলেও তো কঠিন চর্ম্মে ভাঙ্গিয়া যাইবে। তখন শত্রুঘ্ন নিজে এক উপায় বাহির করিলেন। কামার ঘর হইতে কাস্তিয়ায় ধার দিয়া আনিয়া কাস্তিয়া ক্ষত মুখে প্রবিষ্ট করিয়া কড়্ কড়্ শব্দে ফোঁড়া কাটা শেষ করিলেন। এতাবৎকাল ভট্টাচার্য্য যাতনাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী বা কোন শব্দ না করিয়া অম্লানবদনে বসিয়া রহিলেন।

দিনময়ী এই তেজস্বী সরল সাহসী পুরুষের কন্যা। ইহার পরিচয় যথাস্থানে পাইবেন। সে পরিচয়ে বংশ-গৌরবের ফল-প্রমাণ। এখন ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠ্য-প্রতিষ্ঠার পর্য্যালোচনা করা যাউক।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।* সেই সময় পণ্ডিতপ্রবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিতেন। এই শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি সাহিত্যদর্পণ, কাব্য প্রকাশ, রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ পাঠ করেন। অলঙ্কারের বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তখন পুস্তক ও টাকা পারিতোষিকের ব্যবস্থা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র এই কয়েকখানি পুস্তক পাইয়াছিলেন,—রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, রত্নাবলী, মালতীমাধব, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী, মৃচ্ছকটীক।

একদিন পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহাকে সাহিত্যদর্পণের আবৃত্তি করিতে দেখিয়া তাৎকালিক বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবেত্তা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"এত ছোট ছেলে সাহিত্যদর্পণের এমন সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।" তর্কপঞ্চানন মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই বালকের বয়োবৃদ্ধি হইলে, বালক বাঙ্গালা দেশের অদ্বিতীয় লোক হইবে।"

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে মাসিক ৮৲ আট টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।† তিনি যাহা বৃত্তি পাইতেন, তাহা পিতাকে আনিয়া দিতেন। পুত্রের প্রথমাবস্থার বৃত্তিলব্ধ টাকায় পিতা ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রামের নিকট কতকটা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই জমিতে তাঁহার টোল বসাইবার সংকল্প ছিল। টোল বসাইয়া ছাত্র রাখিয়া সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারবৃদ্ধি করিবেন, পিতার এই সাধ বরাবর ছিল। পুত্রের বিদ্যা-গৌরব-সংবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার চিরপোষিত সাধ সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায়ই বন্ধুবান্ধবের নিকট একথা বলিতেন। বীরসিংহ গ্রামে যখন প্রথমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হইত। সংস্কৃতকলেজে ইংরাজি শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের সময় ঐ বিদ্যালয়েও

* ১২৪২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শ্রেণীতে পাঠ করেন। ইতঃপূর্ব্বে শিক্ষাপ্রথার প্রচলনসম্বন্ধে দুইটী দল হইয়াছিল। একটী দল প্রাচ্য শিক্ষা-প্রথা প্রচলনের, অপরটী পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রথা প্রচলনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ প্রাচ্য প্রথার প্রচলনকারীরা প্রবল হইয়াছিলেন। তদানীন্তন অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশীয় শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের সাহায্যে অপর পক্ষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। লাট-সাহেবের অন্যতম সভ্য মেকলে সাহেব অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রথা প্রচলিত করা উচিত। তাঁহার মত প্রবল হইল। প্রাচ্য-প্রথাকামীদের আর মস্তক তুলিবার শক্তি রহিল না। ইংরেজি শিক্ষাপ্রসারের ইহা একটী সুদৃঢ় স্তর।

† এই সময় কলেজে মাসিক পাঁচ টাকা ও আট টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঠাকুরদাস কি জানিতেন যে, তাঁহার পুত্র ভবিষ্যজীবনে টোলের পরিবর্ত্তে গ্রামে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে পারিবেন? ঈশ্বরচন্দ্র যে বৃত্তির টাকা পাইতেন, পরে পিতা তাহার সমস্ত লইতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র বৃত্তির টাকায় হস্তলিখিত পুঁথি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সব পুঁথি তাঁহার লাইব্রেরীতে বিদ্যমান ছিল। কেবল তাহাই নহে, তিনি বাল্যকাল হইতে পরদুঃখমোচনে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র বুকখানি অনন্তব্যাপিনী; কিন্তু দয়া যেমন, উপায় তো তেমন নহে; তবুও যে কোন উপায়ে যথাশক্তি দানে, দীনের দুঃখোদ্ধারে তিনি প্রাণান্তপণ করিতেন। অবশিষ্ট যে টাকা থাকিত, তিনি সেই টাকায় জল খাইতেন। জল খাইবার সময় যে সকল বালক তাঁহার নিকটে থাকিত, তিনি তাহাদিগকেও জল খাওয়াইতেন। কাহারও ছেঁড়া কাপড় দেখিলে, নিজের হাতে পয়সা না থাকিলেও, দরওয়ানের নিকট ধার করিয়া তিনি তাহাদের কাপড় কিনিয়া দিতেন। বাসায় কেহ আসিলে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে জল খাওয়াইতেন। সে ভাবিত, ঈশ্বরচন্দ্র বড মানুষের ছেলে; কিন্তু ঈশ্বর কিসে বড, তাহা বুঝিত না। সবাই কি বুঝে, বাগানের ছোট চারা আম গাছটী কিসে অমৃতময় সুমিষ্ট আম প্রদান করে। কোন সমবয়স্ক বালকের পীড়া হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। কাহারও কোন সংক্রামক পীড়া হইলে, অপর কেহ তাহার নিকট যাইত না; তিনি কিন্তু অম্লানবদনে ও অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন।

বালক বিদ্যাসাগর যখন বীরসিংহ গ্রামে যাইতেন, তখন সর্ব্বাগ্রে গুরুমহাশয় কালীকান্তের বাড়ীতে গিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রত্যেক প্রতিবাসীর বাড়ী গিয়া, প্রত্যেকের তত্ত্ব লইতেন। কাহারও পীড়াদি হইলে, তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার সেবাশুশ্রূষাদি করিতেন। এই জন্য তখন বালক বিদ্যাসাগর গ্রামবাসী কর্ত্তৃক দয়াময় নামে অভিহিত হইতেন। তিনি তখন বিদ্যাসাগর হন নাই; কিন্তু দয়ার সাগর হইয়াছিলেন। কুকুর বিড়ালটী মরিলেও তাঁহার চক্ষে জল পড়িত। বালকের কি অসীম দয়া!

যাহারা বাল্যকালে তাঁহার মাননীয় ছিলেন, বয়সে তাঁহারা তাঁহার নিকট সমান সম্মান পাইতেন। তাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধিতে হীন হইলেও, বিদ্যাসাগর বিদ্যাভিমানে বা পদগৌরবে গর্ব্বিত হইয়া, কখনই তাঁহাদের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিতেন না; বরং তাঁহারা পূর্ব্বকার স্নেহভাব বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান

প্রকাশ করিলে, তিনি কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতেন। বিদ্যাসাগর যখন কলেজের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন কলেজের তদানীন্তন কেরাণী রামধনবাবু তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যাসাগর ইঁহার পরম স্নেহভাজন ছিলেন। ইঁহাকে এইরূপ সসম্ভ্রমে সম্মান করিতে দেখিয়া বিদ্যাসাগর একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমি আপনার সেই স্নেহপাত্রই আছি, আপনি অমন করিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না।" বিদ্যাসাগরের অমায়িকতা ও বিনয়-নম্রতা দেখিয়া রামধনবাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে সখ্ ও সাধের মধ্যে ছিল, কবির গান শোনা। তিনি সমবয়স্ক বালকদিগকে লইয়া কবির গান করিতেন। কবির গানপ্রিয়তা-সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প আছে। তিনি যখন চাকুরী করিয়া উপায়ক্ষম হন, তখন একদিন স্বগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। মধ্যে তিনি এক রাত্রি এক চটীতে অবস্থান করেন। প্রাতঃকালে তিনি শুনিলেন, চটীতে এক জন অতি সুমিষ্ট-স্বরে কবির গান গাহিতেছে। তিনি উঠিয়া গিয়া সেই লোকটীর নিকট গমন করিলেন। যতক্ষণ সে গান করিতেছিল, তিনি ততক্ষণ নিঃশব্দে ও আনন্দোৎসুক হৃদয়ে গান শুনিতেছিলেন। গান থামিয়া গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, লোকটীর বাড়ী তথা হইতে ৬/৭ ছয় সাত ক্রোশ দূরে এবং তাহার নিকট কবির গান সংগৃহীত আছে। তিনি তখন তাহাকে বলিলেন,—"ভাই। আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে তোমায় কতকগুলি গান দিতে হইবে।" লোকটি স্বীকার পাইল। পরে তিনি সেই লোকটীর বাড়ীতে গিয়া অনেক গান সংগ্রহ করিয়া আনেন। যেখানে যে কবির গান শুনিতেন, তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার নিকট কবির গানের একখানি প্রকাণ্ড খাতা ছিল। সখের মধ্যে এই কবির গান শোনা এবং খেলা ছিল কেবল কপাটী ও লাঠী-খেলা। এই সময় সংস্কৃত কলেজে পালোয়ান-কুস্তীর আখড়া ছিল। তিনি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সতীর্থগণ মিলিয়া কুস্তি করিতেন। তিনি অনেক সময় সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে জুটিয়া মাঠ হইতে ধান কাটিয়া আনিতেন। এই সব কথা এবং বাজার করা, রন্ধন করা প্রভৃতির কথা, বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট অবসরক্রমে খুলিয়া বলিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখন কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। ইহাতে তো মহতের মাহাত্ম্য-ত্রুটী হয় না; বরং এই সব কথা শ্রোতার মুখ হইতে প্রচারিত হইয়া, সাধারণের অনেক বিষয়ে শিক্ষা-স্থানীয় হয়।

অলঙ্কারের শ্রেণীতে পড়িবার সময় তাঁহাকে দুই বেলা রন্ধন করিতে হইত।

রন্ধনভারে ও গুরুতর পাঠপরিশ্রমে তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। প্রত্যহ রক্তভেদ হইত। কলিকাতায় রোগ আরাম হইল না। অগত্যা তাঁহাকে পল্লীগ্রামে যাইতে হইল। সেখানে দিনকতক থাকিলে রোগ সারিয়া যায়। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আবার সেই রন্ধন ও অধ্যয়ন। তবে মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা সাহায্য করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বাজারও করিয়া দিতেন। একদিন দীনবন্ধু সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে গিয়া, যোড়াসাঁকোর নূতন বাজারের এক স্থানে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বহু দিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে নূতন বাজারে যাইয়া ভ্রাতাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পান এবং তথা হইতে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আসেন। শুনিতে পাই, ইহার পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র ভ্রাতা দীনবন্ধুকে আর বড় একটা একাকী বাহিরে যাইতে দিতেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা, পিতৃভক্তির পরিচয়, বেদান্ত-পাঠ, পিতৃঋণে কষ্ট, ন্যায়-দর্শনে প্রতিষ্ঠা, ব্যাকরণের অধ্যাপকতা, পাঠ-সমাপ্তি ও প্রশংসাপত্র

অলঙ্কারের পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, ১২৪৪ সালে বা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। তৎকালে কলেজে স্মৃতির পূর্ব্বে ন্যায়-দর্শন ও তৎপরে বেদান্ত পড়িতে হইত। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল, স্মৃতি পড়িয়া, "ল-কমিটি"র পরীক্ষা দিবেন। তৎপরে "ল কমিটি"র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজ পণ্ডিতের পদ-প্রাপ্তিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।* কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে তিনি ন্যায়-দর্শন ও বেদান্ত পড়িবার পূর্ব্বে স্মৃতি পড়িবার আদেশ পান। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন ১৭/১৮ সতর আঠার বৎসর হইবে। ঈশ্বরের অদ্ভুত কীর্ত্তি! ভাবিলে বিস্ময়ে

* বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের পূর্ব্বে সদর কোর্টের (এখনকার হাইকোর্ট) উকিল হইতে হইলে "ল" কমিটির অধীনে পরীক্ষা দিতে হইত। "ল" কমিটি সদর কোর্টের অন্তর্গত ছিল। এ কমিটির অস্তিত্ব এখনও লোপ পায় নাই। কমিটি এখন "প্লিডারসিপ" ও "মোক্তারসিপ" পরীক্ষা গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসর হইতে "ল একজামিনেসনের" প্রতিষ্ঠা হয়। অতঃপর নিয়ম হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে "ল" পাশ দিলে, তবে সদর কোর্টের উকিল হইবে; কমিটিতে পরীক্ষা হইবে না। তদবধি কমিটি "প্লিডারসিপ" এবং "মোক্তারসিপ" পরীক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্বে প্রত্যেক জিলায় যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবার জন্য একজন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা সচরাচর আদালতের জজ-পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইতেন।

লোমাঞ্চিত হইতে হয়। সচরাচর দুই তিন বৎসরে পণ্ডিতগণও স্মৃতির পাঠাভ্যাস করিয়া উঠিতে পারিতেন না। বালক ঈশ্বরচন্দ্র ছয় মাসে পড়া সাঙ্গ করিয়া "ল কমিটি"র পরীক্ষা দেন এবং প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হন। এই ছয়মাস কাল তিনি রন্ধনাদি করেন নাই। ছয় মাস কেবল প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টামাত্র নিদ্রা যাইতেন। স্মৃতি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। অধ্যাপক এবং সহপাঠীগণ তাঁহার এতাদৃশ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। এমন নহিলে কি মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনে যশস্বী হইতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অদ্ভুত শক্তির কথা যখনই আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনই মহাকবি ভবভূতির সেই স্বল্পাক্ষর গভীরভাবপূর্ণ শ্লোকটী মনে পড়ে,—

"বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন চ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি-তদ্ যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।"

ভাবার্থ—গুরু, সুবোধ এবং নির্ব্বোধ দ্বিবিধ ছাত্রকেই সমভাবে বিদ্যা বিতরণ করেন; কিন্তু তদুভয়ের বুঝিবার শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পারেন না। বিদ্যা-বিষয়ে যে পূর্ব্বোক্ত ছাত্রদ্বয় প্রভূত পার্থক্য প্রাপ্ত হন, ইহা বলা বাহুল্য। নির্ম্মল মণি প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, মৃৎপিণ্ড কিন্তু হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে সময় "ল কমিটির" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই সময় ত্রিপুরা জেলায় জজ-পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পদের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু পিতা তাঁহাকে ত্রিপুরায় যাইতে নিষেধ করেন। পিতৃভক্ত পুত্র, পিতার অনুরোধে আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে পিতার সংসারক্লেশ-লাঘবের জন্য তাঁহার এই পদপ্রার্থনা, সেই পিতা যখন তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন, তখন কি পিতৃপ্রাণ পুত্র তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন? পিতাই যে তাঁহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা এবং মাতাই যে একমাত্র আরাধ্যা দেবী ছিলেন। তাও বটে; আর অদৃষ্টও তাঁহাকে অন্য পথে লইয়া যাইল না। আরও দুইটী বিদ্যা তাঁহার বাকী ছিল। দর্শনশাস্ত্র পড়া হয় নাই। তিনি জজ-পণ্ডিতের পদ না লইয়া বেদান্ত-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। সেই সময় শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন। বেদান্ত পড়িবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যরচনায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া ১০০্ এক শত টাকা পুরস্কার পান। কষ্টের জীবনে দুঃখের অন্ত কি সহজে হয়? সকলই ভগবানের পরীক্ষা বৈ তো নয়।

পূর্ব্বে একবার বলা গিয়াছে, তৎকালে ঈশ্বচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র কলিকাতার বাসায় উপনীত হন। বাসায় একটী লোক বাড়িল ; সুতরাং তাঁহার কার্য্যও বাড়িল। এতদুপরি মধ্যম পুত্র দীনবন্ধুর বিবাহ দিয়া ঠাকুরদাস বড় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন ; কাজেই ব্যয়ের হ্রাস করিতে হইল। এই সময়ের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন আমাদিগের কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন,— "বাল্যকালে আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি ; কিন্তু কোন কষ্টকেই এক দিনও কষ্ট বলিয়া ভাবি নাই ; বরং তাহাতে আমার উৎসাহ-উদ্যম বৰ্দ্ধিত হইত ; কিন্তু ভাইগুলির কোন কষ্ট দেখিলে আমার যে কি অন্তর্যাতনা হইত, তা আর কি বলিব !" বিশ্বপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের পক্ষে ইহা বিচিত্র কি !

যখন পিতা ঠাকুরদাস কলিকাতার বাসার ব্যয় কমাইয়া দেন, শুনিয়াছি, তখন বৈকালের জলখাবার জন্য আধ পয়সার ছোলা আনিয়া ভিজান হইত এবং আধ পয়সার বাতাসা আসিত। ঐ ভিজা ছোলার অর্দ্ধেক আবার রাত্রি-কালে আলু-কুমড়ার ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত। প্রাতে রাত্রিতে কুমড়ার ডালনায় পোস্ত দিয়া ছোলার ব্যঞ্জন হইত। ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা পাক করিতেন। ভাই দুইটীর পাতে তরকারী দিবার সময় তিনি চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিতেন না। এই সময় আহারের যেমন কষ্ট, আবার থাকিবার কষ্ট ততোধিক হইয়াছিল। ঠাকুরদাস ঋণগ্রস্ত ; ইহার উপর আশ্রয়দাতা সিংহ-পরিবারও ঋণগ্রস্ত। ঠাকুরদাস পুত্রগুলিকে লইয়া তে-তলায় শয়ন করিতেন, কিন্তু জগদ্দুর্লভবাবু তে-তলাটী এক জনকে ভাড়া দেন ; কাজেই পুত্রগুলিকে লইয়া ঠাকুরদাসকে নিম্নে একটা ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য জঘন্য গৃহে বাসা করিতে হয়। কঠোর পরীক্ষা।

ইহাতেও ঈশ্বরচন্দ্র অকুণ্ঠিত। তিনি এই সময় ন্যায়দর্শন-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। মহাপণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।* ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম হইয়া ১০০৲ এক শত টাকা এবং কবিতা রচনায় ১০০৲ এক শত টাকা পুরস্কার পান। তিনি পাঁচ বৎসরে দর্শনশাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন। আর কেহ ৮।১০ আট দশ বৎসরে তাহা পরিতেন কি না সন্দেহ ! প্রতিভা আর কাহাকে বলে ? তদীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বলেন, "যৎকালে তিনি দর্শন-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন দেশে যাইলে অনেকের সহিত তাঁহার বিচার হইত। সকলেই তাঁহার সহিত বিচারে

* এই সময়ে এই নিমচাঁদ শিরোমণির মৃত্যু হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহা পাঠ্যাস্থবারও প্রতিপত্তিপরিচায়ক।

সন্তুষ্ট হইতেন। কুরাণ-গ্রামবাসী সুবিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবেত্তা রামমোহন তর্ক-সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার প্রাচীন ন্যায় গ্রন্থের বিচার হয়। বিচারে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পরাজয় হয়। ইহা শুনিয়া পিতৃদেব তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পদরজ লইয়া দাদার মস্তকে দেন।" এ বিষয়ের জন্য শম্ভুচন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-সম্বন্ধে যে সকল মহোদয়ের নিকট হইতে অন্যান্য সকল বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা পাইয়াছি, তাঁহাদের সকলকেই এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি; কিন্তু সদুত্তর পাই নাই। কেহ কেহ তর্কচ্ছলে বলিতে পারেন,—অগ্রজ সম্বন্ধে তখনকার অনেক কথা পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্রের মনে থাকিবারই সম্ভাবনা; অথচ কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভাশালীর পক্ষে অসম্ভবও নয়। আমরা কিন্তু বিপরীত ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। দর্শনবিদ্যায় তাঁহার যে রীতিমত পারদর্শিতা জন্মে নাই ও তাহাতে যে তাঁহার তাদৃশ প্রবৃত্তিও ছিল না, তাহার গল্প বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে অনেকের নিকট করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের পাঠ সমাপন করিলে, কলেজ হইতেই "বিদ্যাসাগর"* উপাধি প্রাপ্ত হন। বিংশতি-বর্ষীয় যুবক—"বিদ্যাসাগর!" এমন ভাগ্যবান্ এ সংসারে কয় জন? ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতিতে বিশারদ হয়, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে কয় জন? কি অপূর্ব্ব বুদ্ধি-বিক্রম! কলেজের অধ্যাপকমাত্রেই বিস্মিত! যিনি ব্যাকরণের অধ্যাপক, তিনি ভাবেন,—"আমি ধন্য!" যিনি সাহিত্যের অধ্যাপক, তিনি বলেন, "আমার অধ্যাপনা সার্থক।" যিনি দর্শন স্মৃতির অধ্যাপক, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন,—"ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চিতই অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন।" প্রত্যেকেই প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। প্রশংসাপত্রে সকল বিষয়ের ও তত্তদ্বিষয়ক অধ্যাপকের অভিমতি একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন, "বিদ্যাসাগর" উপাধি-লিখিত প্রশংসাপত্রে। এই পত্র, কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ—রসময় দত্তের স্বাক্ষরিত। ১৭৬৩ শকের (১২৪৮ সালের) ২০শে অগ্রহায়ণের বা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বরের প্রদত্ত উক্ত পত্রের অনুলিপি এই,—

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের মতে "১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের শেষে পাঠ্যাবস্থা শেষ করিয়া সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ সময়ে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ অগ্রজ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান করেন।" ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ নিশ্চিতই ভুল; কেননা, তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্টউইলিয়ম কলেজে প্রথম চাকুরি করেন।

"অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুতকোম্পানীসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে দ্বাদশ বৎসরান্ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান।

ব্যাকরণম্……………শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ

কাব্যশাস্ত্রম্………… শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ

অলঙ্কারশাস্ত্রম্……… শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

বেদান্তশাস্ত্রম……… … শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

ন্যায়শাস্ত্রম্…… …… শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ

জ্যোতিঃশাস্ত্রম্………… শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ

ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ …………… শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতৈস্তৈতস্তেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।

১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

(Sd.) "Rasamoy Dutta, Secretary.
10 Decr. 1841"

ঈশ্বরচন্দ্র দুই মাস ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হইয়াছিলেন। এই টাকায় পিতা ঠাকুরদাস গয়া তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসেন। এই দুই মাস কাল মাত্র তাঁহার অধ্যাপনাপরিপাটী দেখিয়া অন্যান্য অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ মুগ্ধচিত্তে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা স্বীকার করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃত-রচনা, পরীক্ষার ব্যবস্থা, পরীক্ষার রচনা, অনুরোধে রচনা, স্বেচ্ছায় রচনা ও আমাদের বক্তব্য

কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র চাকুরিতে প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে তদ্বিবরণের বিবৃতি আরম্ভ হইবে। সংস্কৃত কলেজে পাঠের সময় তিনি যে সব রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহার একত্র সমাবেশ হইলে পাঠকগণের পড়িবার সুবিধা হইবে বলিয়া এই অধ্যায়ে সেই সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।

রচনা সাহিত্য-শিক্ষার সবিশেষ সাহায্যকারিণী। রচনায় সাহিত্যের শিক্ষা-পুষ্টির পরিচয়। যে সময় ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, সে সময় রচনার উৎকর্ষ-সাধনজন্য কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট যত্ন চেষ্টা ছিল। কেবল সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নয়, ইংরেজি কলেজেও ইংরেজি

শিক্ষার জন্য, রচনার সম্যক্ বিধি-ব্যবস্থা দেখা যাইত। উৎসাহে উৎকর্ষ। এই জন্য ছাত্রবৃন্দের রচনাবিষয়ে উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ যথোচিত পারিতোষিক বিতরণের বন্দোবস্ত ছিল। রচনার পরিপাটি প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষের পরম প্রীতি-উৎপাদন করিত। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি,—"তখন রচনার জন্য যেমন ছাত্র-শিক্ষকের আগ্রহ দেখা যাইত, এখন আর তেমন বড় দেখা যায় না। এখনকার মত তখন বিশ্ববিদ্যালয়ী বিমিশ্র শিক্ষার বাঁধাবাঁধি তো ছিল না। তখন যাঁহার যে বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকিত, তিনি সে বিষয়েরই উৎকর্ষ-সাধনের সুযোগ পাইতেন। যাঁহার সাহিত্যে প্রবৃত্তি, তিনি সাহিত্যের উৎকর্ষ-সাধনে যত্নশীল হইতেন। গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও সেইরূপ ছিল। অধুনা বিকট বিমিশ্র শিক্ষার বাঁধাবাঁধিতে কোন বিষয়ে প্রকৃষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে না। তখন সাহিত্যে যাঁহার প্রবৃত্তি থাকিত, রচনায়ও তাঁহার অনুরাগ দেখা যাইত। সাহিত্যাধ্যাপকগণও তদ্বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল হইতেন। যে ছাত্র অল্পের ভিতর বহু ভাবময় রচনা লিখিতেন, তিনি প্রশংসিত হইতেন। একবার আমাদের 'পরিশ্রম' সম্বন্ধে ইংরেজি রচনার বিষয় ছিল। আমি এ সম্বন্ধে পনর ষোল ছত্র মাত্র লিখিয়াছিলাম ; কিন্তু এই পনর ষোল ছত্রের জন্যও পুরস্কার পাইয়াছিলাম ; পরন্তু এই সময় হইতে আমি অধ্যাপক ও পরীক্ষকের প্রীতিপাত্র হইয়াছিলাম।"

সংস্কৃত কলেজে রচনার জন্য পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকিলেও ঈশ্বরচন্দ্র রচনায় বড় অগ্রসর হইতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল,—"আমরা সংস্কৃত ভাষায় রীতিমত রচনা করিতে অসমর্থ। যদি কেহ সংস্কৃত ভাষায় কিছু লিখিতেন, ঐ লিখিত সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত বলিয়া আমার প্রতীতি হইত না।"*

ঈশ্বরচন্দ্রের এ বিশ্বাস চিরকাল দৃঢ়বদ্ধ ছিল। তাঁহার কার্য্যাবস্থায় একজন কোন বিষয় সংস্কৃতে লিখিয়া, তাঁহাকে দেখাইতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহার সংশোধন করিয়া দেন। তাঁহার সংশোধন-প্রণালী দেখিয়া রচয়িতা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—"আপনি এমন সুন্দর সংস্কৃত লেখেন, তবে আপনি যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিতেছেন, তাহার মুখবন্ধে বা বিজ্ঞাপনে বাঙ্গালা লেখেন কেন?" এতদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাস্য করিয়া বলেন,—"সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলেও বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা দুরূহ বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

* বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রকাশিত "সংস্কৃত রচনা"। প্রথম পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত রচনায় সহজে অগ্রসর হইতেন না বটে; কিন্তু যখনই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখনই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

টোলে রচনার প্রথা নাই। সংস্কৃত কলেজে প্রথমতঃ তাহা ছিল না। ইংরেজির প্রণালীমতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪৫ সালে সংস্কৃত কলেজে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই বৎসর নিয়ম হয়,—স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত—এই তিন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে বার্ষিক পরীক্ষায় গদ্যে ও পদ্যে সংস্কৃত রচনা করিতে হইবে। এই নিয়মানুসারে ঐ বৎসর সংস্কৃত গদ্য "সত্যকথনের মহিমা" সম্বন্ধে রচনার বিষয় ছিল। বেলা দশটা হইতে ১টা পর্য্যন্ত এই রচনা লিখিবার সময় নির্দ্ধারিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নে প্রকাশিত রচনা লিখিয়া ১০০্ এক শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

সত্যকথনের মহিমা

সত্যং হি নাম মানবানাং সার্ব্বজনীয়বিশ্বসনীয়তায়া হেতুঃ। তথাবিধায়াশ্চ বিশ্বসনীয়তায়াঃ ফলমিহ বহুসমুপলভ্যতে। তথা হি যদি নাম কশ্চিৎ সত্যবাদিতয়া বিনিশ্চিতো ভবতি সর্ব্ব এব নিয়তং তদ্বচসি সম্যগ্‌ বিশ্বসন্তি। সত্যবাদী হি সততং সজ্জনসংসদি সাতিশয়ং মাননীয়ঃ সবিশেষং প্রশংসনীয়শ্চ ভবতি।

যো হি মিথ্যাবাদী ভবতি ন কোঽপি কদাচিদপি তস্মিন্ বিশ্বসিতি। স খলু নিঃসংশয়ং নিরতিশয়ং নিন্দনীয়ো ভবতি ভবতি চ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বেষাং জনানামবজ্ঞাভাজনম্।

কিমধিকেন শিশবোঽপি বাললীলাসু যদি কশ্চিন্মিথ্যাবাদিতয়া প্রতীয়মানো ভবতি ভো ভ্রাতরো নানেনাধমেনাস্মাভিঃ পুনর্ব্যবহর্ত্তব্যম অয়ং খলু মৃষাভাষী-ত্যাদিকাং গিরমুদ্গিরন্তীত্যলং পল্লবিতেন।

১০ দশটা হইতে ১ একটা পর্য্যন্ত উল্লিখিত রচনার জন্য সময় নির্দ্ধারিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পরীক্ষার সময় প্রথমে উপস্থিত ছিলেন না। উপস্থিত থাকিবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের সক্রোধ আদেশে তিনি বেলা ১২ বারটার সময় রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা হাস্যাস্পদ হইবে; কিন্তু তদ্বিপরীতে তিনি এই রচনার জন্য পুরস্কার পান।

দ্বিতীয় বৎসর বিদ্যাসম্বন্ধে রচনা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র নিম্নে প্রকাশিত রচনার জন্য পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

বিদ্যা

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং
চিত্তং প্রসাদয়তি জাড্যমপাকরোতি
সত্যামৃতং বচসি সিঞ্চতি কিঞ্চ বিদ্যা
বিদ্যানৃণাং সুরতরুর্ধরণী তলস্থঃ ॥ ১ ॥
বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্য্যং
বিদ্যা বিদেশগমনে সুহৃদদ্বিতীয়ঃ।
বিদ্যা হি রূপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাং
বিদ্যা ধনং ন নিধনং ন চ তস্য ভাগঃ ॥ ২ ॥
রূপং নৃণাং কতিচিদেব দিনানি নূনং
দেহং বিভূষয়তি ভূষণসন্নিকর্ষাৎ।
বিদ্যা মিদং পুনরিদং সহকারিশূন্য-
মামৃত্যু ভূষয়তি তুল্যতয়ৈব দেহম্ ॥ ৩ ॥
অন্যানি যানি বিদিতানি ধনানি লোকে
দানেন যান্তি নিধনং নিয়তং হি তানি।
বিদ্যাধনস্য পুনরস্য মহানগুণোঽসৌ
দানেন বৃদ্ধিমধিগচ্ছতি যৎ সদেদম্ ॥ ৪ ॥
নৈশ্বর্য্যেণ ন রূপেণ ন বলেনাপি তাদৃশী।
যাদৃশী হি ভবেৎ খ্যাতির্বিদ্যয়া নিরবদ্যয়া ॥ ৫ ॥
দুর্ব্বলোঽপি দরিদ্রোঽপি নীচবংশভবোঽপি সন্।
ভাজনং রাজপূজায়া নরো ভবতি বিদ্যয়া ॥ ৬ ॥
বিদ্বৎসভাসু মনুজঃ পরিহীণবিদ্যো
নৈবাদরং ক্বচিদুপৈতি ন চাপি শোভাম্।
হাস্যায় কেবলমসৌ নিয়তং জনানাং
তজ্জীবিতং বিফলমেব তথাবিধস্য ॥ ৭ ॥
অজ্ঞানখণ্ডনকরী ধনমানহেতুঃ
সৌখ্যাপবর্গফলমার্গনিদেশিনী চ।
সা নঃ সমস্তজগতামভিলাষভূমি-
বিদ্যা নিরস্য জড়তাং বিমমাদধাতু ॥ ৮ ॥

এই কবিতাগুচ্ছে প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার মর্ম্ম নিবদ্ধ থাকিলেও উহা একটী বিদ্যার্থীর রচনা বলিয়া বিবেচনা করিলে মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করিতে হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার পক্ষপাতী না হওয়ার পক্ষে ইহাও এক কারণ ফলতঃ কবিতাগুলি সারল্যে ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ও অতিমাত্র স্বাভাবিক।

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার সময় জি. টি. মার্শেল সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৃতীয় বৎসর অধ্যক্ষ ছিলেন; বাবু রসময় দত্ত। এ বৎসর অগ্নীধ্র রাজার তপস্যাসংক্রান্ত বিষয়টী রচনার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। রসময়বাবু কয়েকটী কথা লিখিয়া দিয়া তৎসম্বন্ধে কবিতায় শ্লোক রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে নিম্নে প্রকাশিত কবিতাগুলি রচিত হয়। রসময়বাবু এই কবিতা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

অগ্নীধ্র রাজার উপাখ্যান

অগ্নীধ্রো নাম ভূমীন্দ্রঃ প্রজারঞ্জনবিশ্রুতঃ।
আরাধয়ৎ সুতাকাঙ্ক্ষী গিরিপ্রস্থে প্রজাপতিম্। ১।
ভগবান্ সোহথ তজ্‌জ্ঞাত্বা প্রেষয়ামাস সত্বরম্।
প্রযত্নতঃ পূর্ব্বচিত্তিং নাম কামপি কামিনীম্। ২।
নৃপতিস্তাং সমালোক্য কান্তাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্
শ্লোকানুবাচ কতিচিজ্জড়বন্মোহমাশ্রিতঃ। ৩।
আলীঢ়নীরদচয়ে শিখরৈরুদগ্রৈ-
রুচ্চাবচৈরজগরৈরভিতো বিকীর্ণে।
ক্রব্যাদনৈরগণনৈর্ভয়মাদধানে
কং নু ব্যবস্যসি মুনীশ্বর ভূধরেঽস্মিন্। ৪।
কোদণ্ডযুগ্মমিদমদ্ভুতমম্বুজাক্ষি
ধৎসে কিমর্থমথবা হরিণোপমানম্।
বালে বশীকরণবাসনয়া নিতান্ত-
মস্মাদৃশাং হতদৃশামজিতেন্দ্রিয়াণাম্। ৫।
বীণাবিমৌ বিবিধবিভ্রমমন্থরৌ তে
পুঙ্খং বিনাপি রুচিরৌ নিশিতাগ্রভাগৌ।
ধাতুঃ কটাক্ষপতিতায় হতাশ্রয়ায়
কস্মৈ প্রযোক্তুমভিবাঞ্ছসি তন্ন বিদ্মঃ। ৬
যদ্ দৃশ্যতে সুমুখি বিম্বফলং মনোজ্ঞং
মধ্যে সুবর্ণপরিকল্পিতবাগুরায়াঃ।
জানীমহে ন হি করিষ্যতি কস্য যুন-
শ্চেতোবিহঙ্গমশিশোর্বিপুলাং বিপত্তিম। ৭।

অস্মিন্ নিরাকৃতকলঙ্কশশাঙ্কবিম্বে
নীলাম্বুজন্মযুগলং যদিদং বিভাতি
মন্যে সুধাংশুমুখি সংবননং বিধাত্রা
লোকত্রয়স্য বিহিতং মহতাদরেণ। ৮।

যুষ্মচ্ছিখাবিগলিতা ললিতা নিতান্তং
শিষ্যা ইমে মুনিবরানুগতা ভবন্তম্।
প্রীতা ভজন্তি বিমলাং কিল পুষ্পবৃষ্টিং
ধর্ম্মব্রতা মুনিসুতা ইব বেদশাখাম্। ৯।

তস্মাদ্বয়ং ভয়পরিপ্লববুদ্ধয়স্তাম্
অভ্যর্থয়ামহ ইদং চটুলায়তাক্ষি।
উদ্যন্ বিজেতুমবনীং তব বিক্রমোঽয়-
মস্মাকমস্তু কুশলায় নিরাশ্রয়াণম্॥ ১০ ॥*

এই নৈসর্গিক মধুরতায় আদিরসাত্মক কবিতা প্রাঞ্জলতাগুণে সকলেরই চিত্ত প্রীত করিবে। যেন প্রাচীন কবির লিপিপটুতা পদে পদে প্রতিভাত।

১২৪৫ সালে বা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্ মিয়র্ নামে এক সিবিলিয়ন সাহেবের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে এক শত শ্লোক রচনা করিয়া, এক শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই শ্লোকগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছিল। তখন উহার মুদ্রা-কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ১২৯৯ সালে ১৫ই বৈশাখে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।† ইহাতে এখন

* ১,২,৩,৪,৯ ও ১০ রসময়বাবুর কথানুসারে রচিত। ৫,৬,৭ ও ৮ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে রচিত।

† খগোল-ভূগোল রচনা-সংক্রান্ত পুস্তকের সূচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার একটী সহাধ্যায়ীর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা একটু বিচিত্র। সেইজন্য তাহা এইখানে প্রকাশ করিলাম, "খগোল-ভূগোল সম্বন্ধে রচনা হইবার পূর্ব্বে মিয়র্ সাহেব পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে রচনার বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া এক শত টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। একশতটী শ্লোকে এই রচনা লিখিবার কথা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন সহাধ্যায়ী আসিয়া তাঁহাকে বলেন— "তুমি পঞ্চাশটী শ্লোক লিখিও এবং আমি পঞ্চাশটী লিখিব। পরে তোমার নামেই হউক, আর আমার নামেই হউক, ঐ রচনাটী কর্ত্তৃপক্ষকে দেওয়া যাইবে।" সহাধ্যায়ীর বহু পীড়াপীড়িতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্মত হন। রচনা কর্ত্তৃপক্ষকে দিবার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সেই সহাধ্যায়ীটী আসিয়া বলেন যে, আমি শ্লোকগুলি লিখিতে পারি নাই। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন—"তবে আমার লেখা এই শ্লোকগুলির আর কি হইবে?" এই বলিয়া তিনি সেই স্বরচিত শ্লোকগুলি তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে কিন্তু তাঁহার সহাধ্যায়ীটী ১০০ একশত শ্লোকই রচনা করিয়া আনিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে দেখান এবং পুরস্কার পান।

১০৮টী শ্লোক দেখা যায়। সুতরাং মিয়র্ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট শত শ্লোক অপেক্ষা ইহাতে অতিরিক্ত শ্লোক রহিয়াছে। সেগুলি বোধহয় পরে রচিত।

এ পুস্তকের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্রের আস্তিকতা, গুরুদেবপরায়ণতা ও বিনয়নম্রতার প্রমাণ রহিয়াছে।

আস্তিকতার প্রমাণ,—

যৎক্রীডা ভাণ্ডবদ্ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমিদদ্ভুতম্
অসীমমহিমানং তং প্রণমামি মহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

বিনয়নম্রতা ও গুরুপরায়ণতার পরিচয়,—

"জগদ্বর্ণন কর্ম্মেদং শর্ম্মণে কিমু মাদৃশাম্।
খদ্যোতানাং তমোনাশোদ্যমো হাস্যায় কস্য ন ॥ ৪ ।

তথাপি শরণীকৃত্য* গুরূণাং চরণং পরম্।
কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ সুধিয়ঃ শোধয়ন্তু তৎ ॥ ৫ ।

এ ভাবের এমন প্রমাণ আর পরবর্ত্তী গ্রন্থে পাই না। এইটী বুঝি কেবল অবিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষার ফল।

খগোল-ভূগোল পুস্তকে যেরূপ বিভাগক্রমে দ্বীপ, বর্ষ, বর্ষখণ্ড এবং জনপদসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক স্থলে পুরাণের অপেক্ষা পুরাণাংশ সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য।

পুরাণমতে সাতটী পরিচ্ছেদে পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপবর্ণন, অষ্টম পরিচ্ছেদে দ্বীপাতিরিক্ত সত্বস্তুত ভূমিভাগ, কাঞ্চনভূমি, লোকালোক পর্ব্বত এবং ভূমণ্ডলের পরিমাণ আর নবম পরিচ্ছেদে খগোল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। খগোল বৃত্তান্তে রাশিচক্র, গ্রহ-সংস্থান প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণমতের পরেই সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে একটী পরিচ্ছেদ। এক পরিচ্ছেদেই ভূগোল ও খগোল সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। তবে ইহাতে ভূগোল অপেক্ষা খগোলের বৃত্তান্ত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। পুরাণ ও সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে প্রথমে ভূগোল, পরে খগোল। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতের পরে য়ুরোপীয় মত। তাহাতে প্রথমে খগোল, পরে ভূগোল। য়ুরোপীয় ভূগোলে আসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা ক্রমে বর্ণিত। য়ুরোপখণ্ডে ইংলণ্ডাদিক্রমে প্রধান দেশগুলি পৃথক পৃথক্ বর্ণিত। য়ুরোপীয় ভূগোল-খগোল সংস্কৃত শ্লোকাকারে রচিত হওয়ায় বালকগণের অভ্যাসের সুবিধা। সর্ব্বত্রই রচনা প্রাঞ্জল। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সরল সুখবোধ্য রচনা বিদ্যাসাগরের এতদ্বিষয়ে

* ক্স "শরণীকৃত্য অভূততদ্ভাবে চি"। চিন্তনীয়।

বিশিষ্ট জ্ঞানের পরিচায়ক। সেই অল্প বয়সে ঈদৃশ ভাষা ও পদার্থ জ্ঞান পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি ও ইহজন্মের অধ্যবসায়ের ফল, ইহা একবাক্যে সকলেরই স্বীকার্য্য। য়ুরোপীয় মতের ভূগোল-সংক্রান্ত সংস্কৃত রচনার কয়েকটী উদ্ধৃত হইল—

"পুরাণসূর্য্যসিদ্ধান্তমতমেবং" প্রদর্শিতম্।
মতং য়ুরোপপ্রথিতং সংক্ষেপেণাধুনোচ্যতে ॥ ২৩০ ।

আধারভূতং সর্ব্বযোং ধাত্রা নির্ম্মিতমম্বরম্
তদন্তরালসংলীনো বর্ত্ততে তপতাম্পতিঃ ॥ ২৩১ ।

নাস্ত্যস্য প্রাণসঞ্চারো নায়ঞ্চলতি দূরতঃ।
তেজোময়ঃ পৃথুর্ভূর্মের্দ্দশলক্ষ-গুণেন সঃ ॥ ২৩২ ।

ভ্রমতো গ্রহচক্রস্য সদা মধ্যস্থলস্থিতঃ।
উষ্ণতাতেজসী তেভ্যো দদাত্যেষ নিরন্তরম্ ॥ ২৩৩ ।

সর্ব্বোষামেব বস্তানামন্যোকর্ষণং ভবেৎ।
গুরুণা কৃষ্যতে তত্র লঘুস্বাভিমুখং যতঃ ॥ ২৩৪ ।

আকর্ষতি ততো ভানুগ্রহান্ স্বাভিমুখং সদা।
তথাকর্ষতি পৃথ্বীন্দুং যতোহস্য লঘুতা ততঃ ॥ ২৩৫ ।

অর্কস্যাকর্ষণাদূর্দ্ধমধস্তাদাত্মনাং তথা।
ভ্রমন্তি নিয়তং মধ্যদেশে পৃথ্যাদয়ো গ্রহাঃ ॥ ২৩৬ ।

এক সময় অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় "গোপালায় নমোহস্তু মে" এই চতুর্থ চরণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া এবং একঘণ্টা সময় দিয়া ছাত্রগণকে শ্লোক-রচনায় নিযুক্ত করেন। গোপালের কথা কবিতার বিষয়ীভূত হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— "মহাশয়, আমরা কোন্ গোপালের বর্ণনা করিব? এক গোপাল আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন; এক গোপাল বহুকাল পূর্ব্বে বৃন্দাবনে লীলা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।" পণ্ডিত মহাশয় হাস্য করিয়া গোকুলের গোপাল সম্বন্ধে লিখিতে বলেন। বিদ্যাসাগরের শ্লোকরচনায় পণ্ডিত মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। সেই শ্লোকগুলি এই,—

গোপালায় নমোঽস্তু মে

যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ১।

ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকূলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ২।

ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ৩।

বৃষ্ণিবংশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ৪।

নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্ভাগ্যানুকূলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ৫।

ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর এক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে শ্লোকের পাদপূরণ করিতে পারিতেন, পাঠক এখানে তাহারও প্রমাণ পাইলেন। এ কবিতায় গোপালের প্রতি ভগবদ্ভাব প্রকটিত।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনুরোধে আর একবার সরস্বতী পূজার সময় ঈশ্বরচন্দ্র নিম্নলিখিত রসপূর্ণ কবিতাটী লিখিয়াছিলেন,—

"লুচী-কচুরী-মতিচুর-শোভিতং
জিলেপি-সন্দেশ-গজা-বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্ ॥"

কবিতাটীর রচনা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্লোকটী দেখিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছিলেন এবং অনেককে ডাকাইয়া আনিয়া স্বয়ং পাঠ করিয়া শ্লোকটী শুনাইয়াছিলেন।"*

অল্পায়তনে কি সুন্দর রস-রচনা! ভবিষ্যৎজীবনে কিন্তু এরূপ রস রচনায় পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটে নাই। রসরচনার সে পরিচয় নাই থাকুক; রসালাপের প্রসিদ্ধি অপ্রতুল নয়।

* "সংস্কৃত রচনা" পুস্তক, ১৬ পৃষ্ঠা।

পরীক্ষার্থ রচনা বা অনুরোধ জন্য রচনা ভিন্ন ঈশ্বরচন্দ্র মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছায় কিছু কিছু রচনা করিতেন। সকল রচনা পাওয়া যায় নাই। এ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"এক আত্মীয় আমার রচনা দেখিবার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ এবং সত্বর ফিরিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া সমুদায় রচনাগুলি লইয়া যান ; বারংবার প্রার্থনা করিয়াও, তাঁহার নিকট হইতে আর ফিরিয়া পাইলাম না। এইরূপে রচনাগুলি হস্তবহির্ভূত হওয়াতে আমি যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইয়াছি। পুরাণ কাগজের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়া, যে কয়টী মাত্র পাইয়াছিলাম, তন্মাত্র মুদ্রিত হইল।*

স্বেচ্ছাকৃত রচনার মধ্যে "মেঘ বিষয়িণী" একটা কবিতা পাওয়া যায়। সেই কবিতাটী এইখানে প্রকাশিত হইল,—

মেঘ

প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকত্তুমীশতে সর্ব্বে।
জলদাঃ প্রাবৃডপায়ে পরীহিয়ন্তে শ্রিয়া নিতরাম্ ॥ ১ ॥

কিং নিম্নগা জলদমণ্ডলবর্জ্জিতেন
তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তুমধীশতে তাম্।
ন স্যাদজস্রগলিতং যদি পান্থ যূনাং
সাহায্যকায় কিল নির্ম্মলশর্ব্বর্যম্ ॥ ২ ॥

কান্তাভিসাররসলোলুপমানসানাম্
আতঙ্ককম্পিতদৃশামভিসারিকাণাম্
যদ্ বিঘ্নকৃদ্ দুরিতমার্জিতবানজস্রং
কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিদ্মঃ ॥ ৩ ॥

ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মা
নো নির্দ্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্।
ক্ষীণো ভবিষ্যসি হি কালবশং গতঃ সন্
আস্তে তবাপি নিয়তস্থিতিকো বিয়োগঃ ॥ ৪ ॥

---

* "খগোল-ভূগোল" রচনাটী লইয়া যেমন একখানি পুস্তক হইয়াছে, এই রচনাগুলি লইয়া ১২৯২ সালে ১লা অগ্রহায়ণ বা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে "সংস্কৃত রচনা" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

সর্ব্বত্র সন্নমৃতদস্তটিনীশরীর-
সংবর্দ্ধকস্তনুভৃতাং শমিতোপতাপঃ।
যচ্চাতকেষু করুণাবিমুখোঽসি নিত্যং
নায়ং মতো জলদ কিং বত পক্ষপাতঃ ॥ ৫ ।

লোকোত্তরা যদি চ তোয়দ তে প্রবৃত্তি-
রেষা যদব্ধিসরিতোরসি সঙ্গহেতুঃ।
জাগর্ত্তি সজ্জনসভাসু তথাপি ঘোরং
ত্বৎকল্মষং কৃপণপান্থবধূবধোত্থম্ ॥ ৬ ।

ত্বং হি স্বভাবমলিনস্তব নাশ্মমন্তং
তদ্গর্জ্জিতং বিরহিবর্গনিসর্গবৈরি।
কস্মাং স্তুবীত বদ তোয়দ লোকসিদ্ধাং
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে ॥ ৭ ।

কান্তাবিয়োগবিষজর্জ্জরপান্থযূনাং
ত্বং জীবনাপহরণব্রতদীক্ষিতোঽসি।
ত্বামামনন্তি ঘন জীবনদায়িনং যৎ
কিং স ভ্রমো ন বদ তৎ স্বয়মেব বুদ্ধ্বা ॥ ৮ ।

গর্জ্জন্ ভৃশং তত ইতঃ সততং বৃথা কিং
নো লজ্জসে জলদ পান্থনিতান্তশত্রো।
আস্তে হি নান্যগতিচাতকপোতচঞ্চু-
সম্পূরণেঽপি বত যস্য ন শক্তিযোগঃ ॥ ৯ ।

কবি-প্রতিভা

জীমূতচাতকগণং নন্তু বঞ্চয়িত্বা
মা মুঞ্চ বারি সরসীসরিদর্ণবেষু।
কং বা গুণং শিরসি সংস্তুতবৈতলেপে
তৈলপ্রদানবিধিনা লভতেঽত্র লোকঃ ॥ ১০ ।

কবিতায় কি সুন্দর স্বভাব-বর্ণন! কি মনোহর অলঙ্কারবিন্যাস! কি সরল সরস রচনা-কৌশল! বিদ্যাসাগর কবি বলিয়া পরিচিত নহেন; কিন্তু কেবল

এই একটীমাত্র কবিতা পাঠে বলিতে পারি,—বিদ্যাসাগর স্বভাব কবি! বাল-কবির কি অপূর্ব্ব প্রতিভা! বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙ্গালায় "বর্ষার মানভঞ্জন" নামে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন।* ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় যেমন প্রথমে মেঘের স্বভাববর্ণন, পরে বিরহিণীর বিরহ-ব্যঞ্জন; বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাতেও তেমনই প্রথমে বর্ষার স্বভাববর্ণন, পরে মানিনীর মানভঞ্জন। উভয়ই পূর্ণ কবিত্বময়। বাল্যে উভয়ে কবি। উত্তরকালে উভয়েই সাহিত্য-পুষ্টির উত্তর-সাধক। তবে পথ ও প্রণালী স্বতন্ত্র।

রচনার বঙ্গানুবাদ দিলাম না; দিবার প্রয়োজনও নাই। রচনা যেরূপ সরস ও সরল, তাহাতে যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্র বোধ আছে, তাঁহারা ইহার রস-মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এ রচনাগুলি পড়িলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সর্ব্ব-রস-বিকাশে এবং ছন্দোবিন্যাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় শক্তিমান। বাল্যে যিনি এমন মধুর, সুললিত ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত লিখিতে পারেন, প্রবৃত্তি বা অভ্যাস রাখিলে, অথবা নিজ রচনা-শক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া সংস্কৃত রচনাকল্পে উদাসীন না হইলে, তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে উপাদেয় এবং সুপাঠ্য সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষার সংকীর্ণ-প্রচারও বোধহয় সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রণয়নের প্রবৃত্তিপ্রণোদন-পক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

কার্য্যাভাস, চাকুরিতে প্রবেশ, সাহেবের গুণগ্রাহিতা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ইংরেজি শিক্ষা, অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত পরিচয়, মহাভারত অনুবাদ ও অধ্যাপনা প্রণালী

পাঠ্যাবস্থার অবসানে কার্য্য-কালের প্রারম্ভ। এইবার কার্য্যবীর বিদ্যাসাগর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কার্য্যময় সংসারে কার্য্যের কীর্ত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু প্রকারের। পাঠক! বাল্যকালে ও পাঠ্যাবস্থায় যে অপরিসীম শ্রমশীলতা, যে প্রগাঢ় একাগ্রতা, যে অবিচলিত আত্মনির্ভরতা এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও বহ্নিবর্ষিণী তেজস্বিতা দেখিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রেও তাহার প্রচুর প্রমাণ ও পরিচয় পাইবেন।

* ১৩০১ সালের শ্রাবণ মাসের সাহিত্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্র।

বিপদে নির্ভীকতা, কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, নৈরাশ্যে সজীবতা এবং সর্ব্বাবস্থায় নিরভিমানিতা ও সর্ব্বকার্য্যে নিঃস্বার্থতা দেখিতে চাহেন তো পাঠক দেখিবেন, বিদ্যাসাগরের জীবনে, কার্য্যাবস্থার প্রারম্ভ হইতে দেহাবসানের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত। করুণার কথা আর কি বলিব? বলিয়াছি তো, তাহার তুলনা নাই। এ বহু-বর্ণময় ভারতভূমিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল কার্য্য সর্ব্বসম্মত হওয়া সম্ভব নহে এবং হয়ও নাই; কিন্তু সকল কার্য্যে যে সেই শ্রমশীলতা, সেই দৃঢ়তা, সেই নির্ভীকতা, সেই বুদ্ধিমত্তা এবং সেই বিদ্যাবত্তা, সকল সময়েই পূর্ণমাত্রায় পরিচালিত হইত, তাহা তাঁহার জীবনী-পর্য্যালোচনায় নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে। তিনি সকল কার্য্যে সকল সময়ে স্বাধিকারভূতা ও স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধিসম্মতা শক্তির আমূল সঞ্চালন ও পূর্ণ প্রয়োগ করিতেন। এক কথায় বলি, এমন এক-টানা খরস্রোত ইহা সংসারে মনুষ্যজীবনে বড়ই দুর্লভ! এইবার তার পূর্ণ পরিচয়। করুণার পরিচয় অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পাইবেন। কর্ম্মীর জীবনে যে কখন কর্ম্মাবসাদ হয় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন তাহার প্রমাণ। তাহা সর্ব্বসময়ে সকলের অনুকরণীয় এবং শিক্ষণীয়। কর্ম্মীর কার্য্যাভাব যে কখন থাকে না, বিদ্যাসাগরের কর্ম্মাবস্থার প্রথম হইতে তাহার প্রমাণ। বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থকার সিডন্ স্মিথ বলিয়াছেন,—

"সকলে যেন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি যেন তদনুসারে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হন। আপন কার্য্য যথাসাধ্য সাধন করিয়াছেন, এইটী বুঝিয়াই যেন তিনি মরিতে পারেন।"*

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যারম্ভ ১২৪৮ সালের অগ্রহায়ণ বা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। এখানে কার্য্য অর্থে চাকুরি বুঝিতে হইবে। কার্য্যের অবশ্য সুবিশাল অর্থ,—মনুষ্য জীবনের করণীয় মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখন সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপন করেন, তখন ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। † বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন বীরসিংহ গ্রামে। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের তাৎকালিক সেক্রেটারী মার্সেল্ সাহেব তাঁহাকে তথা হইতে আনাইয়া এই পদে অভিষিক্ত করেন। এইখানে মার্সেল্ সাহেবের গুণগ্রাহিতার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হওয়ায় অনেকে সেই পদের প্রার্থী হন। কলিকাতা

* "Let every man be occupied, and occupied in the highest employment of which his nature is capable, and die with the consciousness that he has done his best."

† এই কলেজ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে (১২০৭) সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বহুবাজার-মলঙ্গাপাড়া-নিবাসী কালিদাস দত্ত মার্সেল্ সাহেবের সবিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। মার্সেল্ সাহেব কালিদাসবাবুকে বড় ভালবাসিতেন। কালিদাসবাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—তাঁহার একজন পরিচিত পণ্ডিত ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন। মার্সেল্ সাহেব কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি জানিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন; অধিকন্তু একজন অসামান্য শক্তিশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

কালিদাসবাবু সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দ্বিরুক্তি করিলেন না; বরং আনন্দসহকারে সাহেবের সে সৎপ্রস্তাবের সম্পূর্ণ পোষকতা করেন। কালিদাস বাবু ঈশ্বরচন্দ্রের দক্ষতা ও বিদ্যাবুদ্ধিমত্তা-সম্বন্ধে আদৌ সন্দিহান ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত করা, মার্সেল সাহেবের একান্ত ইচ্ছা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা এ সংবাদ পাইয়া, বীরসিংহগ্রাম হইতে পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। মার্সেল্ সাহেবের এই গুণগ্রাহিতা দেখিয়া অনেকেই সাহেবকে ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। সত্য সত্যই মার্সেল্ সাহেব প্রকৃত সহৃদয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন তদানীন্তন সিবিলিয়ান, সওদাগর প্রভৃতি সকল সাহেব-সম্প্রদায়ের প্রায় এইরূপ সহৃদয়তা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যাইত।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিতের বেতন ৫০ পঞ্চাশ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে মধুসূদন তর্কালঙ্কার মহাশয় এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদ প্রাপ্ত হন।

বিলাত হইতে যে সকল সিবিলিয়ান ভারতে চাকুরি করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু ও পার্শী শিখিতে হইত। ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাঁহারা কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। এই সকল ভাষার সাহেব পরীক্ষকদিগকে সাহায্য করিবার এবং সিবিলিয়ানদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পণ্ডিত ও মৌলবী নিযুক্ত থাকিতেন। যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত হন, সে সময় এখনকার মতো বিলাতে প্রতিযোগিনী সিবিলিয়ান-পরীক্ষা ছিল না। তখন মনোনীত হইয়া তত্রত্য "হালিবরী কলেজে" পড়িতে হইত এবং তৎপরে সিবিলিয়ান হইয়া এদেশে আসিতে হইত।* এই সকল সিবিলিয়ান তখন

* ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বা ১২৬১ সালে নির্ব্বাচন-প্রণালীর পরিবর্ত্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এ প্রথা এখনও প্রচলিত।

"রাইটার্স অব্ দি কোম্পানী" নামে অভিহিত হইতেন। এই জন্য তাঁহারা যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার নাম ছিল, "রাইটার্স বিল্ডিং"। এই রাইটার্স বিল্ডিং হইতে বর্ত্তমান "রাইটার্স বিল্ডিং" নাম। এখন কলিকাতার যেখানে "রাইটার্স-বিল্ডিং', তখন সেইখানেই ছিল। সিবিলিয়ানগণ এই "রাইটার্স বিল্ডিং"-এ বাস করিতেন। এখানে সিবিলিয়ান সাহেবদের নাচ, ভোজ, আমোদ-প্রমোদ যথারীতি সম্পন্ন হইত। বাড়ীর মধ্যস্থলে "ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ" ও তাহার "আফিস্" ছিল। আফিসে পণ্ডিত ও মৌলবী ব্যতীত, "হেড্-রাইটার" বা "কেসিয়ার" এবং তদধীন দুই তিনটী কেরাণী কার্য্য করিতেন।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ সিবিলিয়ানদের আশ্রয়-স্থল ছিল, এ জন্য ইহা সাহেবসম্প্রদায়ের নিশ্চিতই চির-স্মরণীয়; কিন্তু ইহা অপর বিশেষ কারণেও বাঙ্গালীর হৃদয়ে চির-জাগরূক থাকিবে। এই ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ, বিদ্যাসাগরের ইহ-যুগসম্মত ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য গৌরবের সূত্রপাত হয়। ইহার পরিচয় পাঠক পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের চির-স্মরণ-যোগ্যতার জন্য গুরুতর কারণ আছে। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টি-কল্পে অন্যতম শক্তিশালী সহায়। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকাল নির্ণয় করা বড় দুরূহ। কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সময় ইহার সৃষ্টি। তিনি যে কৃষ্ণযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টি-কল্পে প্রধান সহায়। কেহ বলেন, তাহা নয়; তাহার পরবর্ত্তীকালে ইহার সৃষ্টি। চৈতন্যমঙ্গল গান হইবার পূর্ব্বে যে "গৌর-চন্দ্রিকা" কীর্ত্তন হইত, তাহা গদ্যে লিখিত ছিল। সেই গদ্যে বাঙ্গলা-গদ্য-সাহিত্য-স্রোতস্বতীর উৎপত্তি-স্থান। আমরা কিন্তু তিন চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত একখানি বাঙ্গালা গদ্য পুঁথি দেখিয়াছি। যাহা হউক, তাহা লইয়া এক্ষণে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের গদ্য-সাহিত্যের অস্তিত্ব সত্ত্বেও উহা অনেকটা দুর্ব্বল ও নির্জীব ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, গদ্য-সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা-পীড়নে পাঠ্য-গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে দৃষ্টি পতিত হয়। ফলে ইহার পর অনেকগুলি পাঠ্য গদ্য-পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। সেগুলি গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে অনেকটা সহায় হইলেও পূর্ণ পুষ্টির পরিচায়ক নয়। সে পরিচয় অনেকটা বিদ্যাসাগর প্রণীত পাঠ্য-পুস্তকে প্রতিভাত। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পহেতু বাঙ্গালীর আশীর্ব্বাদপাত্র বটে; কিন্তু বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য পাঠ্যে ধর্ম্মাভাবপ্রণোদনের কতক উত্তর সাধক! ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে থাকিয়া সিবিলিয়ানদিগকে মাসে মাসে পরীক্ষা দিতে হইত। পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইবার একটা সময় নির্দ্ধারিত ছিল। সেই সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, সিবিলিয়ানদিগকে বিলাতে প্রতিগমন করিতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসে মাসে পরীক্ষার কাগজপত্র দেখিতেন। এতদ্ভিন্ন মার্সেল্ সাহেব তাঁহার নিকট সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিতেন। অধ্যাপনায় পণ্ডিত হইলেও কার্য্যে ইংরেজের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক, সুতরাং তাঁহার ইংরেজি শিখিবার প্রয়োজন হইল। তদ্ব্যতীত তাঁহাকে হিন্দী পরীক্ষারও কাগজপত্র দেখিতে হইত; কাজেই হিন্দী শিক্ষারও প্রয়োজন দাঁড়াইল। ইংরেজি শিক্ষা অপেক্ষা হিন্দী শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ; কেননা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের সঙ্গে হিন্দীর অনেকটা সাদৃশ্য। তিনি মাসকতক পরিশ্রম করিয়া একজন হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হিন্দী শিখিয়া লইলেন।

ইংরেজি শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর; বিশেষতঃ চাকুরি অবস্থায়; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত অসাধারণ শ্রমশীল এবং অসীম অধ্যবসায়ী ব্যক্তির নিকট কোন্ কার্য্য কষ্টকর? তাহা হইলে অন্যান্য সাধারণের সহিত তাঁহার বিশেষত্ব রহিল কোথায়? সাধারণের সহিত অসাধারণের পার্থক্য সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব দেশে। তাহা না হইলে পঞ্চাশ টাকার বেতনভোগী একজন সামান্য কর্ম্মচারী, সংসারের সর্ব্বোচ্চ পথে, ভাবিষ্য বংশধরদিগের জন্য সজীব পদাঙ্ক রাখিয়া যাইতে পারেন কি? বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ ছিলেন প্রথমে "প্রিণ্টার"; রালে ছিলেন সামান্য সৈনিক পুরুষ; ইংলণ্ডের কবি-গুরু চসর ছিলেন সৈনিক পুরুষ; সেক্সপীয়র ছিলেন নাট্যশালার নট, আর কত নাম করিব? ইঁহারা যে গুণে বড়, বিদ্যাসাগরও সেই গুণে বড়; ইঁহাদের পার্থক্য সাধারণ হইতে যে গুণে, বিদ্যাসাগরেরও পার্থক্য সেই গুণে।

পৃথিবীতে যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ প্রতিভাশালী বলিয়া পরিচিত, পুঙ্খাপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মশীল; এমন কি, তাঁহাদের অধিকাংশকে অতি হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। এই জন্য বলিতে হয়, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ, মানুষের সহিষ্ণুতায় এবং শ্রমশীলতায়। প্রতিভার কার্য্যে বিরাম বা বিরতি কোন কালে থাকে না। ওয়াসিংটন বাল্য-কালে পাঠ্যাবস্থার অবসরে রসিদ, ছাড়, হাত-চিঠি প্রভৃতি নকল করিতেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা বাল্যকাল হইতেই পরিপুষ্ট তাঁহার শ্রমশীলতায়। পাঠ্যাবস্থায় কাজ না থাকিলে এবং আবশ্যক না হইলেও যিনি অবসরে পুঁথি নকল করিয়া কার্য্যানুরাগিতার পরিচয় দিতেন, তাঁহার পক্ষে এই অবস্থায় চাকুরির অত্যাবশ্যক ইংরেজি শিক্ষাটা আর কষ্টকর কি? বিখ্যাত ইতিহাস-

লেখক নিবো চাকুরি করিতে করিতে অবসর সময়ে আরব্য, রোমান এবং অন্যান্য "শ্লাবনিক" ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের ন্যায় একজন অতি শ্রমশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যে ইংরেজিটা শিখিয়া লইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? ইংরেজি শিক্ষার উপর তাঁহাকে আরও গুরুতর পরিশ্রম-সাপেক্ষ কার্য্যের ভার লইতে হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার নিকট সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পড়িতে আসিতেন, এই সকল লোককে পড়াইয়া তিনি আবার স্বয়ং ইংরেজি পড়িতেন।

এই সময় কলিকাতার বহুবাজার-পঞ্চাননতলায় নিতাই সেনের বাড়ীতে তাঁহার বাসা ছিল। এই বাড়ীর বাহিরে দুইটী বড় বড ঘর ছিল। একটী ঘরে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা থাকিতেন এবং অপর ঘরে অন্যান্য আত্মীয়েরা বাস করিতেন। পরে এখান হইতে অতি নিকটে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বাটীতে বাসা উঠিয়া যায়।

বিদ্যাসাগর ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রত্যহ প্রাতে ইংরেজি শিক্ষা করিতেন। নীলমাধব বাবু কলিকাতা তালতলার স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। দুর্গাচরণ বাবু তখন ডাক্তার হন নাই। তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। দুর্গাচরণ বাবু এই সময়ে প্রায় প্রত্যহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় আসিতেন। ক্রমে তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্য হয়। দুর্গাচরণ বাবু ডাক্তার হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহার হৃদয়ের কার্য্যে অনেক সহায়তা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দুর্গাচরণ বাবুর সহায়তায় ও চিকিৎসায় অনেক আর্ত-পীড়িতের কষ্ট নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেন। নীলমাধব বাবুর নিকট কিছুদিন ইংরেজি শিখিয়া বিদ্যাসাগর হিন্দুকলেজের অন্যতম ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের নিকট রীতিমত ইংরেজি শিক্ষা করেন।* ইংরেজি অঙ্ক শিখিবার জন্যও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই শোভাবাজার-রাজবাটীতে স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু, অমৃতলাল মিত্র এবং স্বর্গীয় শ্রীনাথ ঘোষের নিকট যাইতেন।† অঙ্ক শিখিবার জন্য তাঁহার যথেষ্ট

* রাজনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন পাইতেন, যিনি বলেন, তাঁহার কথা নির্ব্বিবাদ নয়, কেননা রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রত্যহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় আহার করিয়া কলেজে পড়িতে যাইতেন এবং মাসে মাসে যৎকিঞ্চিত পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইতেন।

† অমৃতলাল বাবু শোভাবাজারের ৺রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের মধ্যম জামাতা, শ্রীনাথ বাবু কনিষ্ঠ জামাতা এবং আনন্দকৃষ্ণ বাবু দৌহিত্র। আনন্দ বাবুর জননী রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। ইঁহাদের সকলের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধুত্ব ছিল। ইঁহারা হিন্দু কলেজে পড়িয়া ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

চেষ্টা ছিল; কিন্তু বিষয়টা তাঁহার তত প্রীতিপ্রদ হয় নাই; অথচ ইহাতে অনেকটা সময় অনর্থক অতিবাহিত হইত; তদুপরি বিষয়টা তাঁহার নীরস বলিয়া বিবেচিত হইত; অগত্যা তিনি তাহা হইতে বিরত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অঙ্কবিদ্যা-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার চরম ফল,—আত্মোৎকর্ষ। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিমিশ্র শিক্ষাপ্রণালীতে অনেকের আত্মোৎকর্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডের কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষ এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক বিমিশ্র শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত হইবার পূর্ব্বে, অনেকের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরিচালনার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই জন্য অনেকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-সম্মত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আত্মোৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারিতেন। এ আত্মোৎকর্ষ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাধনা"য়* চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটী যুক্তি-সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি এই,—

"যদি কোন পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অধীনস্থ ছাত্রদিগকে এক ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের নিজত্ব না ফুটাইয়া তুলিয়া যদি একটা সাধারণ আদর্শে সকলকেই গঠিত করিবার প্রয়াস পায়, তবে বুঝা যায় যে, সে পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত শিক্ষাবিধানে নিতান্ত অযোগ্য ও অসমর্থ। প্রকৃত শিক্ষা কি? না, আত্মোৎকর্ষ সাধন—উন্নতি সাধন। যাহা আত্মার অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে থাকে, তাহা উপর দিকে আনা—উন্নয়ন করা—নিজত্বের কর্ষণ করা—নিজেকে নিজের যথাথ অনুরূপ করিয়া তোলা। কোন ব্যক্তিবিশেষকে একটা স্থানীয় আদর্শের কিম্বা লৌকিক আদর্শের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে গেলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-প্রণোদনে আত্মোৎকর্ষের কিরূপ সুবিধা, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, পুত্রব্লো ও কলরাডোর সরকারি পাঠশালার "ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রণালীর" কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানকার বিদ্যালয়ে "প্রত্যেক ঘরে কতকগুলি ছাত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আপন আপন কাজ করে, শিক্ষক তাহাদিগকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া কিংবা মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া অথবা লেক্‌চার দিয়া কিংবা ব্যাখ্যা করিয়া সময় নষ্ট করেন না। তিনি কেবল প্রত্যেকের ডেস্কের নিকট গিয়া ছাত্রদিগের সহকারি-স্বরূপ হইয়া উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করেন।"

শিক্ষা-সাধন-সম্বন্ধে যে কথা, বৃত্তি-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধেও সেই কথা। এতৎ-সম্বন্ধেও ১৩০০ সালের চৈত্র মাসের সাধনায় জ্যোতিরিন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—

* মাসিক পত্রিকা—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। এখন নাই।

"অনেক সময় দেখা যায়, যে কর্ম্ম যাকে সাজে, সে পায় না বা করে না। যে ডাক্তার হইবার উপযুক্ত, সে হয় তো আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে; যে আইন ব্যবসায়ের উপযুক্ত, সে হয় তো ইঞ্জিনিয়রের কাজ করিতেছে। এইরূপ অনুপযোগী কাজে প্রবেশ করিয়া কেহই সফলতা লাভ করিতে পারে না,—তাহার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়।" জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর মতে কে কোন্ কাজের উপযুক্ত, তাহা তাহার দৈহিক ও মানসিক লক্ষণে কতক বুঝা যায়। কোন কোন য়ুরোপীয় দার্শনিকেরও এই মত; কিন্তু এরূপ মত-মীমাংসার অনেক সময় ব্যত্যয় দেখা যায়। ডাক্তার গিলবার্ট মীমাংসা করেন, যাহারা বুদ্ধিজীবী ও প্রতিভাশালী, তাঁহাদের মস্তক বৃহৎ, কিন্তু আলেকজাণ্ডার, জুলিয়স্ সিজর, ফ্রেডারিক দি গ্রেট্, বায়রন্, বেকন্, প্লেটো, আরষ্টটল্ প্রভৃতি প্রতিভাশালী লোকদিগের মস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, বিপরীত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়।

এরূপ অবস্থায় দৈহিক-মানসিক লক্ষণ নির্ণয়ে, বৃত্তি-নির্ব্বাচনের অব্যর্থতা স্বীকার করিতে কখন কখন দ্বিধা হয় না কি? বংশ-পরম্পরাগত বৃত্তি-সাধনায় সেরূপ দ্বৈধ ভাব থাকিবার কথা নয়। যাঁহাবা এ কথা মানিবেন, তাঁহারা হিন্দুর জাতিভেদের গৌরব ঘোষণা করিবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অঙ্ক শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আনন্দকৃষ্ণ বাবুর নিকট সেক্সপীয়র পড়িবার জন্য প্রায়ই শোভাবাজার রাজবাটীতে যাতায়াত করিতেন। এই সময় তিনি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট পরিচিত হন। এক দিন মধ্যাহ্নে রাজা বাহাদুর আহারান্তে মুখপ্রক্ষালন করিতেছিলেন, সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজবাটীতে আনন্দকৃষ্ণ বাবুর নিকট যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার প্রতি রাজা বাহাদুরের দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি পার্শ্বস্থ একটী আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করেন,—"ঐ যে হৃষ্ট-পুষ্ট তেজঃপুঞ্জময় ব্রাহ্মণ-যুবকটী যাইতেছেন, উনি কে? উঁহার মুখে যেন প্রতিভার প্রভা ফাটিয়া পড়িতেছে। উঁহাকে ডাকিয়া আন তো।" আত্মীয়টী তখনই বিদ্যাসাগরকে রাজা বাহাদুরের নিকটে ডাকিয়া লইয়া যান। রাজা বাহাদুর তখন তাঁহার নিকট তাঁহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরের কথা-বার্ত্তায় যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়াও বুঝিয়াছিলেন। তখন তিনি,—"বিদ্যাসাগর" উপাধিধারী একটী ব্রাহ্মণযুবক মাত্র। সে "বিদ্যাসাগরে" বিশ্ববিশ্রুতি সংঘটিত হয় নাই। তখনকার বিদ্যাসাগর, এখনকার বিদ্যাসাগর ছিলেন না। এই শোভাবাজার-রাজবাটীতে অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত

বিদ্যাসাগরের আলাপ পরিচয় হয়। তখন অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।* তত্ত্ববোধিনীর সহিত আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রমুখ অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আনন্দকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি,—"বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় বাবু উভয়েই রাজবাটীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরেজি, অঙ্ক ও সাহিত্য পড়িতে যাইতেন। তাঁহারা ছাদের উপর বসিয়া খড়ি দিয়া, অঙ্ক পাতিয়া, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতেন। মাস পাঁচ ছয় পরে বিদ্যাসাগর অঙ্কবিদ্যা পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। অতঃপর তিনি সেক্সপীয়র পড়িতেন। ইহা শীঘ্রই আয়ত্তও করিয়াছিলেন।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যিনি যাহা লিখিতেন, আনন্দকৃষ্ণ বাবু প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে তাহা দেখিয়া আবশ্যকমত সংশোধনাদি করিয়া দিতে হইত। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দ বাবুর বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় অক্ষয়কুমার বাবুর একটা লেখা তথায় উপস্থিত হয়। আনন্দ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অক্ষয়কুমার বাবুর লেখাটা পড়াইয়া শুনাইয়া দেন। অক্ষয়কুমার বাবু পূর্ব্বে যে সব অনুবাদ করিতেন, তাহাতে কতকটা ইংরেজি ভাব থাকিত। বিদ্যাসাগরমহাশয় অক্ষয়কুমার বাবুর লেখা দেখিয়া বলিলেন,—"লেখা বেশ বটে; কিন্তু অনুবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজি ভাব আছে।" আনন্দকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংশোধন করিয়া দেন। এইরূপ তিনি বার কতক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু সেই সুন্দর সংশোধন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেন। তখনও কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানিতেন না। লোক দ্বারা প্রবন্ধ প্রেরিত হইত এবং লোক দ্বারা ফিরিয়া আসিত। তিনি সংশোধিত অংশের বিশুদ্ধ-প্রাঞ্জল বাঙ্গালা দেখিয়া ভাবিতেন,—এমন বাঙ্গালা কে লেখে? কৌতূহল নিবারণার্থ তিনি এক দিন স্বয়ং আনন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় পান। আনন্দকৃষ্ণ বাবুর পরিচয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরে তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। ইহার পর অক্ষয়বাবু যাহা কিছু লিখিতেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখাইয়া লইতেন।

* কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে ১৭৬১ শকে (১২৪৬ সালে) ৩রা কার্ত্তিকে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "১৭৬৫ শকের (১৮৪৩ খৃঃ) ভাদ্র মাস হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে ঐ সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার এক সভাকার্য্যে ব্রতী হইয়া ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত ১২ বৎসর কাল অবাধে ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন।"—শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন-কৃত "বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব।" ২৫৩ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংশোধন করিয়া দিতেন। পরস্পারের প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য সংগঠিত হয়।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব শুভ সংযোগ। এ শুভ সংযোগের দিন বাঙ্গালীর চির-স্মরণীয়। উভয়ে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আডিসন্ ষ্টিলের শুভ সংযোগে ইংরেজি সাহিত্য প্রসারের শুভলক্ষণ ভাবিয়া আজিও বিলাতবাসী ইংরেজ আনন্দে উৎফুল্ল হন। হয়তো অনেক আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী, এই শুভসংযোগের দিনকে জাতীয় উৎসবের দিন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালার অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের এ শুভ সংযোগ কয় জন বাঙ্গালী স্মরণ করেন?

অক্ষয়কুমার বাবুর প্রস্তাবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যান্য সভ্যগণের সমর্থনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত "পেপার-কমিটী"র অন্যতম সদস্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন। * এই সূত্রে তিনি স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু মানাস্পদ হইয়াছিলেন। বলিয়া রাখি, ব্রহ্ম-সমাজের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না। "পেপার কমিটী" বা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, কেবল সাহিত্যের সংস্রবে, ধর্ম্মের টানে নহে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, অক্ষয় বাবুকে তৎসম্বন্ধে "পেপার কমিটী"র সভ্যদিগের মতামত লইতে হইত। তাহার একটী প্রমাণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম,—

* 'কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা নামে একটী সভা ছিল। ঐ সভার সভ্যদের নাম গ্রন্থাধ্যক্ষ এবং অক্ষয় বাবুর উপাধি গ্রন্থ সম্পাদক ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে যে কোন পুস্তক বা প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত, তাহা গ্রন্থাধ্যক্ষের সম্মতি লইয়া মুদ্রিত করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভা দেবেন্দ্র বাবুর স্নেহপাত্রী। তিনি অন্যত্র কোন সদ্ব্যবস্থা দেখিলে, তাহা ঐ সভাতেও প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা করিতেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর পেপার কমিটী দেখিয়া, তত্ত্ববোধিনী সভাতেও তদনুরূপ গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতে উপকারও দর্শিয়াছিল। অবিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত বা অশুদ্ধরূপে দূষিত, কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে পারিত না। এমন কি গ্রন্থাধ্যক্ষ-বিশেষের বিরচিত প্রবন্ধও কখনও কখনও অধিকাংশের মতক্রমে অগ্রাহ্য হইয়াছে। আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই সভার সভ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সহিত সংস্রবাধীন অক্ষয় বাবু আপনাকে উপকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত। ৫০ ও ৫২ পৃষ্ঠা।

"কবিরপন্থীদিগের বৃত্তান্ত-বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি, যথাবিহিত অনুমতি করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা,
১৭৭০ শক, ১৪ই আষাঢ়। } শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত,
গ্রন্থ-সম্পাদক।"

"প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম। ইতি—

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।"

"শ্রীযুক্ত ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।"

অক্ষয়কুমার দত্তের যত্নে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৭৭০ শকের ফাল্গুন মাসে বা ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৬৭ সংখ্যায় মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। আদি পর্ব্বের কিয়দংশ-মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবাদের একটু নমুনা এই :—

"নারায়ণ ও সর্ব্বনরোত্তম নর এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

কোন কালে কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক দিবস ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন, এই অবসরে সূত লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক উগ্রশ্রবা বিনীতভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বিগণ দর্শনমাত্র অদ্ভুত কথা শ্রবণ-বাসনাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবা বিনয়নম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সেই সমস্ত মুনিকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে সমুদয় ঋষিগণ স্ব স্ব আসন উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দ্দিষ্ট আসনে নিবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহার শ্রান্তি দূর হইলে, কোন ঋষি কথা-প্রসঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন সূতনন্দন! তুমি এতক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ এবং এতকাল কোথায় ভ্রমণ করিলে বল।" *

* বলা বাহুল্য, ইহার পূর্ব্বে মহাভারতের এরূপ বঙ্গানুবাদ হয় নাই।

কিছু দিন অনুবাদ মুদ্রিত হইবার পর, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মতি লইয়া মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "মহাভারতানুবাদ সময়ে অনেক স্থলে অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মার নিকট আমাকে ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরল হৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে, আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠ্যাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।" মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার—(১৭৮৮)।

মহাভারত অনুবাদ করিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় "বাসুদেবচরিত" ও "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" এই দুই খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই দুই গ্রন্থে তিনি অনুবাদের কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলেন। তাহার বিস্তৃত আলোচনা অন্য অধ্যায়ে হইবে। এই অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের কথা এইখানে প্রকাশ করিলাম। "তত্ত্বোধিনী" সংস্রবত্যাগের কথাটাও এইখানে বলিয়া রাখি।

কয়েক বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উপযুক্ত সম্পাদক ৺অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা ত্যাগ করিলে, কানাইলাল পাইনের প্রস্তাবে ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমর্থনে, সম্পাদকের বৃত্তি দিবার প্রস্তাব হয়। সেই সময় ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাতে এই বলিয়া প্রতিবাদী হন, কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আয়ে যদি বৃত্তি দেওয়া হয়, তবে তাহা হইতে পারে, তত্ত্ববোধিনী সভার আয় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আয় একত্র মিলিত করিয়া

তাহা হইতে দেওয়া অবিধি। সাধারণ সভ্যের মতানুসারে কিন্তু উহার বিপরীত ব্যবস্থা ধার্য্য হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে অক্ষয়কুমারকে মাসিক পঁচিশ ২৫ টাকা বৃত্তি দেওয়াইবার প্রধান উদ্‌যোগী।

"অক্ষয় বাবুর অসাধ্য রোগ তত্ত্ববোধিনী সভার ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটী বিপত্তির বিষয়, ইহা বলা বাহুল্য। ঐ সভার সভ্যেরা তন্নিমিত্ত অতিমাত্র দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, ইহাও বলা অতিরিক্ত। তাঁহারা ইঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। দেশমান্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ের জন্য বিশেষ উদ্‌যোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহা কর্তৃক বিরচিত সে বিষয়ের বৃত্তান্ত ১৭৭৯ সতরশ ঊনআশী শকের (১২৬৪ সালের) কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে,—

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে, এতদ্দেশীয় লোকদিগের যে নানা গুরুতর উপকার লাভ হইয়াছে, ইহা বোধবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-সৃষ্টির প্রধান উদ্‌যোগী এবং এই পরোপকারিণী পত্রিকার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধিলাভের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বত্র এরূপ আদর-ভাজন ও সর্ব্বসাধারণের এরূপ উপকারসাধন হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অনন্য-মনা অনন্য-কর্ম্মা হইয়া কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনেই নিয়ত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবিশ্রান্ত অত্যুৎকট পরিশ্রমদ্বারা শরীর-পাত করিয়াছেন বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত্ত শরীরপাত করিয়াছেন, সেই মহোদয়কে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা আবশ্যক, না করিলে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়। দীর্ঘকাল দুরন্ত রোগে আক্রান্ত থাকাতে, অক্ষয়কুমার বাবুর আয়ের সঙ্কোচ, ব্যয়ের বাহুল্য এবং তন্নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। এ সময় কিছু অর্থসাহায্য করিতে পারিলে, প্রকৃতরূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, এই বিবেচনায় গত শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ দিবসীয় বিশেষ সভায়

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন যে, তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে কিছু-কালের জন্য অক্ষয় বাবুকে সাহায্য প্রদান করা যায়। তদনুসারে অন্য সমাগত সভ্যেরা নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার বাবু যতদিন পর্য্যন্ত সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ শরীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রমক্ষম না হন, ততদিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক পাইবেন। আর ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে, এই প্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি অক্ষয়কুমার বাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও অবিকল মুদ্রিত হয়। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯৭ শক কার্ত্তিক মাস।)*

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই লিখিত অংশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত। কেমন সুন্দর প্রাঞ্জল রচনা বল দেখি? বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিপ্রারম্ভে এরূপ রচনা, রচয়িতার কৃতিত্বপরিচায়ক নহে কি? সাহিত্যের ইতিহাসে এই সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট রচনার স্থান অতি উচ্চ নহে কি? এমন ভাষায়, যিনি প্রাণের এমন কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত করিতে পারেন, তিনি প্রকৃতই বাঙ্গালা সাহিত্য-মন্দিরের জাগ্রত দেবতা নহেন কি? এই ভাষাকে আমরা "কৃতজ্ঞতার" ভাষা বলি, মনে হয়, এ ভাষা না হইলে বুঝি কৃতজ্ঞতার বিকাশ হয় না।

সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম্মভাব বিজড়িত দেখিয়া এবং কোন কোন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত তাঁহার ঠিক মতমিল হইতেছে না বুঝিয়া, অক্ষয়কুমার দত্তের কিছু কাল পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর সম্পর্ক ত্যাগ করেন। দুইজন স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী পুরুষের মতসংঘর্ষে পরিণাম এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। চকমকী পাথরের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়। এই কারণেই কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েক ব্যক্তির সহিত ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাসায় ইংরেজি শিখিতেন, তখন হাইকোর্টের অন্যতম অনুবাদক শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনাপ্রণালী এমনই কৌশলময় যে, অতি দুরূহ বিষয়ও অল্প দিনের মধ্যে সহজে শিক্ষার্থীদিগের আয়ত্ত হইত। সে শিক্ষা-প্রণালীর কথা শুনিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন পণ্ডিত-মণ্ডলীও চমৎকৃত হইতেন। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন এবং তাঁহার

---

* শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত" ২৩৩ ও ২৩৪ পৃষ্ঠা।

শিক্ষা দিবার প্রণালীটা কিরূপ ছিল, রাজকৃষ্ণ বাবুর সংস্কৃত শিক্ষাতত্ত্বটা বিধৃত করিলে, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

রাজকৃষ্ণ বাবু বহুবাজার নিবাসী ৺হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার সম্মুখেই তাঁহার বাড়ী ছিল। তখন তাঁহার বয়স ১৫/১৬ বৎসর। তিনি হিন্দু কলেজে ইংরাজি পড়িয়া এই বয়সেই পড়াশুনা ছাড়িয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় যাইতেন। এক দিন তিনি দেখিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু সুর করিয়া মেঘদূত পড়িতেছেন। সুন্দর সুরলয়ে উচ্চারিত সেই রসপূর্ণ ও ভাবময় শ্লোকের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু বিমোহিত হইলেন। তখন তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার বাসনা হইল। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতে সম্মত হইলেন; কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এত বয়সে মুগ্ধবোধ পড়িয়া সংস্কৃত শিখিতে গেলে সংস্কৃত শিক্ষা দুষ্কর হইবে, অধিকন্তু অনর্থক সময় নষ্ট হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলেন,—"দেখ, আমি যখন মুগ্ধবোধ মুখস্থ করি, তখন ইহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই; পরে যখন সংস্কৃত সাহিত্যে অগ্রসর হইলাম, তখন ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। তোমাকে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করাইয়া সংস্কৃত শিখাইতে হইলে এ বয়সে সংস্কৃত শিখা দায় হইবে। অতএব তোমাকে একটা সহজ উপায়ে ব্যাকরণ শিখাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি সে দিন রাজকৃষ্ণ বাবুকে বিদায় দেন। রাজকৃষ্ণ বাবুকে বিদায় দিয়া তিনি ব্যাকরণ শিখাইবার একটা সরল পথের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন।

পর দিন রাজকৃষ্ণ বাবু আসিয়া দেখেন, তাঁহার জন্য ব্যাকরণ শিখিবার সরল ও সহজ উপায় উপস্থিত। চারি 'তা' ফুলস্কেপ কাগজে বাঙ্গলা অক্ষরে, বর্ণমালা হইতে ধাতু প্রত্যয়াদি পর্য্যন্ত মুগ্ধবোধের সারাংশ লিখিত। রাজকৃষ্ণ বাবু দেখিয়া অবাক হইলেন রাজকৃষ্ণ বাবু আমাদিগকে বলিয়াছেন,—"ইহাই উপক্রমণিকা ব্যাকরণের সূত্রপাত। উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পূর্ব্বাভাস এইখানেই তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করে। আমি সেই ফুলস্কেপ কাগজে লিখিত ব্যাকরণের সারাংশ এবং তাৎকালিক ব্যাপটিষ্ট প্রেসে মুদ্রিত একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করি। মাস দুই তিন পড়িয়া আমি ব্যাকরণের আভাস কতকটা আয়ত্ত করিয়া লই। তিন চারি মাসের পর আমি মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করি।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার প্রণালীর গুণে এবং স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায়ে ও

পরিশ্রমবলে রাজকৃষ্ণ বাবু ছয় মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ পড়া সাঙ্গ করেন। পরে তিনি কাব্যাদিপাঠে প্রবৃত্ত হন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজে "জুনিয়র্" ও "সিনিয়র্" পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবুকে "জুনিয়র্" পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুও সম্মত হন ; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন সংস্কৃত কলেজে গিয়া শুনেন, একটী ব্রাহ্মণপণ্ডিত ৮৲ আটটী টাকা "জুনিয়র্" বৃত্তি পাইতেছেন। ব্রাহ্মণের সেই আটটী টাকায় লেখাপড়া এবং আহারাদি সবই নির্ভর করিত। এ সংবাদ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন,— "রাজকৃষ্ণের জুনিয়র পরীক্ষা দেওয়া হইবে না, রাজকৃষ্ণ যদি পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের বৃত্তি-রোধ হইবে।" স্বভাবতঃ পরদুঃখকাতর বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে বড় কাতর হইয়া পড়েন। তিনি বাসায় ফিরিয়া আসেন এবং রাজকৃষ্ণ বাবুকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু "জুনিয়র্" পরীক্ষা দিবার কামনা পরিত্যাগ করেন। ইহা গুরু-শিষ্যের সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে কি ? করুণা-স্রোতে উভয়ের বলবতী বাসনা ভাসিয়া গেল। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণ বাবুকে "সিনিয়র্" পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। "সিনিয়র্" পরীক্ষা দিবার প্রস্তাব শুনিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু বলেন—"আমি কি পারিব ?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"কেন পারিবে না ? তবে একটু বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে। তুমি যদি প্রত্যহ আহারাদি করিয়া বেলা ৯ টার সময় আমার সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমায় পড়াইতে পারি। রাজকৃষ্ণ বাবু সম্মত হন।

প্রত্যহ ৯ নয়টার সময় আহারাদি করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় বেলা ৩ তিনটা পর্য্যন্ত সাহেবদিগকে পড়াইতেন এবং অন্যান্য কাজ করিতেন। ইহার মধ্যে কোন রকমে অবকাশ পাইলেই, তিনি সাহেবের গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে পড়াইয়া যাইতেন। ৩ তিনটার সময় আফিসের কার্য্য সমাধা হইলেই তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে রাজকৃষ্ণ বাবুকে পড়াইতেন। পরে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে আহারাদি সমাপন করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতেন। ঐ সময় অন্যান্য শিক্ষার্থীদিগকেও শিক্ষা দিতে হইত। রাজকৃষ্ণ বাবু কোন কোন দিন পড়িতে পড়িতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় ঘুমাইয়া পড়িতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে জাগরিত

করিয়া পড়াইতেন। এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার সুপ্রণালীতে এবং নিজের অবিচলিত অধ্যবসায়ে রাজকৃষ্ণ বাবু ২॥০ আড়াই বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষিত হন।

রাজকৃষ্ণ বাবুর অধ্যাপনায় বিদ্যাসাগরের শুদ্ধ শ্রমশীলতা, নহে, উদ্ভাবনী-শক্তিমত্তারও সম্পূর্ণ পরিচয়। সময়ের দুর্নিরীক্ষ্য গতির প্রতি অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তিনি স্বকীয় শক্তিমাহাত্ম্যে দুর্জয় সিবিলিয়ানদিগকেও কিরূপ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাহার পরিচয় পাইবেন।

৪।৫ চারি পাঁচ বৎসরের শিক্ষা ২॥০ আড়াই বৎসরে। কথাটী সহরময় রাষ্ট্র হইল। দলে দলে পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বাবুকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। অভূতপূর্ব্ব অভিনব পদ্ধতি ও প্রথার প্রতিষ্ঠা এইরূপ। বিখ্যাত স্কচ্ গ্রন্থকার কারলাইলের নূতন পদ্ধতি ও প্রণালীমতে প্রবন্ধসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে পর, ভূরি ভূরি বিজ্ঞতম বিদ্বন্মণ্ডলী, সুদূর স্কট্‌লণ্ডের পার্ব্বত্যপ্রদেশ "ডমফ্রের" ক্ষেত্রাবাসে গিয়া কারলাইলকে দেখিতে যাইতেন। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থকার এমার্সন্ সাহেব কেবল কারলাইলকে দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিবার জন্য স্কট্‌লণ্ডে আসিয়াছিলেন।

১৮৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫০-৫১ সালে রাজকৃষ্ণ বাবু সংস্কৃত কলেজের "সিনিয়র্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ টাকা বৃত্তি পান। পরে ২ দুই বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০ কুড়ি টাকা করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। আর এক বার তাঁহার পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; এমন কি, তিনি মৃতকল্প হইয়াছিলেন। শরীর শোধরাইবার জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়; সুতরাং আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই।

অষ্টম অধ্যায়

প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, বাঙ্গালা চিঠি, শিক্ষা-বিভাগের পরিবর্ত্তন, পিতার কার্য্য-ত্যাগ, বাসার অবস্থা, সহৃদয়তার পরিচয়, প্রতিশ্রুতি-পালন, চলচ্ছক্তির প্রমাণ, বীরসিংহে কৌতুক, দুর্ব্বলে দয়া, মাতৃ-ভক্তি, সংস্কৃত-রচনা, তেজস্বিতা, পদ-পরিবর্ত্তন ও গুণগ্রাহিতা

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে চাকুরি করিবার পূর্ব্বে পাঠ্যাবস্থাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিজ-গুণগ্রামে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন।

তখনও তাঁহার অনেকটা প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাই, তিনি দর্শন-পাঠকালে অধ্যাপক পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায়, চেষ্টা করিয়া পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে তৎপদে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে তাঁহার প্রতিপত্তি অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। মার্সেল সাহেব তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি তৎসাধনে কৃতকার্য্য না হইয়া ক্ষান্ত হইতেন না।

এই সময় সংস্কৃত কলেজের দুই জন ব্যাকরণাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। তখন বাবু রসময় দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ঐ পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন।* ইনি তখন কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ পদের জন্য কিন্তু একটা পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়াছিলেন। কি কারণে বলা যায় না, রসময় দত্ত ইঁহাকে সেই পদটী না দিয়া তাড়াতাড়ি পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ কথা মার্সেল্ সাহেবকে অবগত করান। মার্সেল্ সাহেব তদানীন্তন "এডুকেশন্ কৌন্সিলে"র সেক্রেটারী ডাক্তার মৌয়েটকে ঐ কথা বলেন। মৌয়েট্ সাহেব রসময় বাবুর বন্দোবস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করেন।†

পণ্ডিতবর ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, স্বীয় বাঙ্গালা ভাষার "সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিপত্তি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"মার্সেল্ সাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিলেন, ততই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, তেজস্বিতা, উদারতা প্রভৃতি সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইতে লাগিলেন। তদবধি সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং তদীয় মত গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রায় কোন কর্ম্ম করিতেন না। ঐ সময়ে ডাক্তার মৌয়েট্ সাহেব এডুকেশন 'কৌন্সিলের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যা ও হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে মার্সেল্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেন; মার্সেল্

* ১৭৪২ শকে বা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত চাঙড়িপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১২ বৎসর সংস্কৃত কলেজে পড়িয়াছিলেন। উত্তরকালে ইনি সোমপ্রকাশের সম্পাদক হন। ইঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল।

† নববার্ষিকী, ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, ২২৮ পৃষ্ঠা।

সাহেব, বিদ্যাসাগর দ্বারা মৌয়েট্‌ সাহেবের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতেন। এই সূত্রে মৌয়েট্‌ সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। তদবধি ইনি বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরমাত্মীয় ও যারপরনাই হিতৈষী হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

মার্সেল্‌ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। তিনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসিতেন। আবশ্যক হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বাঙ্গালায় চিঠিপত্র লিখিতেন। এক বার তাঁহার বাড়ীতে আত্মীয়ের অসুখ হওয়ায়, তিনি কার্য্যে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই কথা বলিয়া বাঙ্গালায় চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দেন, চিঠিখানি এইখানে প্রকাশ করিলাম,—

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

সবিনয় নিবেদনং—

অদ্য আমার পিতৃব্যপুত্রের প্রাতঃকালাবধি চারি বার ভেদ হইয়াছে ২০ ড্রপ্‌ লডেনম্‌ দেওয়াতে আপাততঃ প্রায় এক ঘণ্টা ভেদ বন্ধ রহিয়াছে কিন্তু একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে এমত বোধ হয় না অতএব তাঁহার নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক সুতরাং অদ্য যাইতে পারিলাম না, ত্রুটিমার্জ্জনে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২৮ নভেম্বর ১৮৪৩

আজ্ঞাবর্ত্তিনঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণনঃ।

এ পত্রের শিরোভাগে "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং" লেখা আছে। ইহা বিশ্বাস, কি অভ্যাসের ফল, ঠিক করিয়া তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে তখনকার পক্ষে বিশ্বাসের ফল বলিয়া একেবারে অবিশ্বাস করাও যাইতে পারে না। তখনও তো তিনি অবিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষারই ফলভোগী ছিলেন। তবে ইহার পরবর্ত্তী কালে যখন তিনি ইংরেজি-বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ইংরেজি ভাষাদর্শিত শিক্ষা-প্রণালীর পূর্ণমাত্রায় পোষকতা করিতেছিলেন, যখন হিন্দুচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে বিরত ছিলেন, তাঁহার কোন কোন চিঠিপত্রেই শিরোনামেও "শ্রীদুর্গা শরণং" বা "শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়ঃ" দেখা যায়। কোন সময়ে তিনি একবার সুকিয়া ষ্ট্রীট নিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষের বাড়ীতে বসিয়া পাইকপাড়ার রাজবাটীতে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র লেখা হইলে পর চন্দ্রমোহন বাবু একবার পত্রখানি দেখিতে চাহিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি

যাহা ভাবিতেছ, তাহা নহে ; এই দেখ, শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়ঃ লিখিয়াছি।" ইহাতে মনে হয়, তিনি যে কারণে চটি জুতা পায়ে দিতেন, থান-ধুতি, মোটা চাদর পরিতেন, ভট্টাচার্য্যের মতন মাথা কামাইতেন, সেই কারণেই পত্রের শিরোভাগে ঐরূপ লিখিতেন। ইহাকে হয়তো তিনি বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বের একটা অঙ্গ মনে করিতেন।

এ পত্রের আর একটা বিশেষত্ব আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাদিতে অধুনা ভূরি ভূরি ইংরাজি মতানুযায়ী বিরাম-চিহ্নাদি দেখিতে পাওয়া যায়, এ পত্রে তাহার একটীমাত্র নাই।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের চাকুরিতে প্রবৃত্ত হইবার পরই, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের একটা বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিতে হয়। শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। শিক্ষাবিভাগের অধীন হইয়া তন্মতানুসারে তাঁহাকে শিক্ষাপ্রণালীর অনেক প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় শিক্ষাবিভাগের কি ছিল, কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিয়া রাখা ভাল। পরিবর্ত্তনে শিক্ষা-প্রণালীর কিরূপ তারতম্য হইয়াছিল, তাহাও কতকটা বুঝিয়া রাখা উচিত।

ইতিপূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের পরিচালন-ভার, "কমিটী অব্ পাব্লিক ইনষ্ট্রক্শন্" নাম্নী সভার হস্তে বিন্যস্ত ছিল। এই সভা ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বা ১২৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, ১২ বৎসর প্রাচ্যশিক্ষাপ্রচলন-কারী এবং পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্ত্তনপ্রয়াসীদের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। শেষে মেকলের মতামত প্রভাবে প্রথমোক্ত দলের পরাভব হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪৬ সালে তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড অক্লণ্ডের এই মর্ম্মে এক "মিনিট" প্রকাশিত হয়,—"ইয়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষা ইংরাজিতে হইবে বটে ; তবে বর্ত্তমান প্রাচ্য বিদ্যালয়গুলিও পুরা দমে চলিবে। ইংরাজিতে ছাত্রদিগকে যেমন উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে, প্রাচ্য-বিদ্যার্থীদিগকেও সেইরূপ উৎসাহ দেওয়া হইবে ; পরন্তু ইংরাজির সঙ্গে এ দেশীয় ভাষার শিক্ষা চলিবে ; যে যাহা পছন্দ করে সে তাহাই শিখিবে।" অতঃপর "কমিটী অব্ পাব্লিক্ ইনষ্ট্রক্শন্" এই শিক্ষা-প্রণালীর পর্য্যালোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। ইহার পর ইংরাজি শিক্ষার বেগ খরতর হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪২ সালে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪৪ সালে আদালত হইতে পার্সী ভাষা উঠিয়া যায়। এদেশীয় বিচার-কর্ত্তাদের উপর অধিকতর বিস্তৃত ভাবে কার্য্যভার অর্পিত হয়। সুতরাং নূতন শিক্ষা-প্রণালীর কার্য্যও প্রশস্ততর হইতে

থাকে। কমিটী বাঙ্গালাকে নয়টী সার্কেলে অর্থাৎ অংশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক ভাগে একটী করিয়া কলেজ বসান হইয়াছিল।* প্রত্যেক ভাগের অন্তর্ভূত প্রত্যেক জেলায় একটী ইংরাজি-বাঙ্গালা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৯ সালে কমিটী শিক্ষা-বিভাগের ভার অধিকতর শক্তিশালিনী সভা "কৌন্সিল অব এডুকেশনের" উপর অর্পণ করেন। এই কৌন্সিলের অধীনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক কার্য্য করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ঘটনায় কৌন্সিলের কার্য্যকলাপের ফল উদ্ঘাটিত ও আলোচিত হইবে।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যকালে, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫১ সালে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাঙ্গালা ভাষা-শিক্ষার নিমিত্ত পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চারি বৎসরের মধ্যে এইরূপ একশত একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সব বিদ্যালয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল। এই সকল বিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষার প্রসার-প্রবর্ত্তনের জন্য সৃষ্ট হয়; পরন্তু বাঙ্গালা পাঠ্যে বিজাতীয় ভাব-প্রণোদনের সম্পূর্ণ সহায় হইয়াছিল। সেইজন্য এই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-কথাটা এইখানে বলিয়া রাখিলাম।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কার্য্যকালে একদিন পথে পিতা ঠাকুরদাসের কি একটা দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। কাহারও কাহারও মুখে শুনি, অশ্বের পদাঘাতে তিনি আহত হন, কিন্তু এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে কেহই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত নহেন। যাহা হউক, এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 'বাবা! এখন তো আমি মাসে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পাইতেছি, স্বচ্ছন্দে সংসার চলিবে, আপনি আর কেন পরিশ্রম করেন? আপনি দেশে গিয়া থাকুন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিতান্ত অনুরোধে পিতা ঠাকুরদাস কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে যাইয়া বিশ্রাম করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে মাসে মাসে ২০৲ কুড়ি টাকা পাঠাইয়া দিতেন এবং নিজের বাসায় ৩০৲ ত্রিশ টাকা খরচ করিতেন। এই সময় বাসায় তাঁহার দুই সহোদর, দুই জন পিতৃব্যপুত্র, দুই জন পিসতুতো ভাই, এক জন মাসতুতো ভাই এবং অনুগত ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত,

* এই কমিটীর কার্য্যকালেও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪২ সালে হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছিল, বাঙ্গালায় এক লক্ষ গ্রাম্য স্কুল ও পাঠশালা ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বা ১২৬২ সালের পূর্ব্বে ইহাদের উন্নতি পক্ষে কোন চেষ্টা হয় নাই।

এই কয়জনের অবস্থিতি হইত। * এতদ্ব্যতীত দুই চারি জন অতিরিক্ত লোকও প্রায়ই দুই বেলা আহার পাইত। বাসার সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে রন্ধন করিতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও রন্ধন করিতেন। তা না করিলে কি ৩০ ত্রিশ টাকায় এতগুলি লোকের অন্নসংস্থান হয়? বিদ্যাসাগরের নিকট কি শিখিবার বস্তু ছিল ও আছে, পাঠক! তাহা বুঝিতে কি এখনও বাকি রহিল? ৫০ পঞ্চাশ টাকা-বেতনভোগী বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যবস্থা কয়জনের দেখিতে পাও?

এই সময়ে মার্সেল্ সাহেব সংস্কৃত কলেজের "জুনিয়র্" ও "সিনিয়র্" পরীক্ষার পরীক্ষক হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া সাহেবের সাহায্য করিতে হইত। ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি সকল প্রশ্ন তিনি নিজেই লিখিয়া দিতেন। ভাবি তাই একটা মানুষ এত কাজ কি করিয়া করিতেন? ভাবি, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়ি। কিন্তু আবার যখন বিলাতের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ কব্‌ডেনের কথা মনে হয়—"আমি ঘোড়ার মতন একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া খাটিতেছি;" যখন ভাবি,—"রোমক সম্রাট্ সীজর্ আল্পস হইতে সৈন্য সঞ্চালন করিবার সময় লাটীন অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন,"—তখনই মনকে প্রবোধ দিই, শক্তিশালী ব্যক্তির ইহজগতে অসাধ্য কি? এই গুণে তো পশুর উপর মনুষ্যের রাজত্ব; সামান্যের উপর অসামান্যের প্রভুত্ব।

পাঠ্যাবস্থায় যখন সামান্য বৃত্তি পাইতেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা হইতেও অন্নার্থী ও বস্ত্রার্থীকে সাধ্যানুসারে অন্ন-বস্ত্র দান করিতেন। এখন তিনি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনভোগী। ২০৲ কুড়ি টাকা পিতার নিকট পাঠাইতেন, আর ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাত্র বাসা খরচের জন্য রাখিতেন। এই ৩০৲ ত্রিশ টাকার মধ্যেও তিনি বাসাখরচ চালাইয়া, আবশ্যকমত সাধ্যানুসারে অন্নবস্ত্রার্থী এবং পীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করিতেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫০ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের বিসূচিকা পীড়া হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংবাদ পাইয়া, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাসায়

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যখন সুকিয়া ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা ছিল, তখন কতকগুলি আত্মীয় লোক তাঁহার প্রাণনাশকল্পে ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তখন এই অনুগত ভৃত্য শ্রীরামের কল্যাণেই তিনি আত্মরক্ষায় সমর্থ হন।

উপস্থিত হন। ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করেন এবং বিদ্যাসাগর নিজ হস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া দেন। তিনি নিজে ঔষধের মূল্য দিয়াছিলেন। কোন অনাথ দুঃস্থ লোক পীড়িত হইলে, তিনি স্বয়ং গিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং তাহাকে বাঁচাইবার জন্য নিজের ব্যয়ে সাধ্যানুসারে ঔষধ-পথ্য যোগাইতেন।

একবার নারিকেল-ডাঙ্গায় অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ওলাউঠা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাত্রিকালে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চিকিৎসা করান। তিনি নিজের বাসা হইতে মাদুর-বিছানা লইয়া গিয়া রোগীর শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দেন। রাজকৃষ্ণ বাবু বলেন, "তাঁহাকে প্রায়ই এইরূপ করিতে হইত। তাঁহার সে অকৃত্রিম দয়ার কার্য্য— কি সব আমার স্মরণ আছে? আর কতই বা বলিব মহাশয়, আর কতই বা শুনিবেন? সে সব কথা স্মরণ হইলে সেই দয়াবতারের সেই করুণ মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরূক হয়। তাঁহার কথা ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়! চক্ষের জল রাখিতে পারি না! আহা! তেমন দয়ালু দাতা কি আর এ জগতে দেখিব?"

একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার সম্মুখে কোন এক ব্যক্তির ভৃত্য ওলাউঠা-রোগাক্রান্ত হয়। যাঁহার ভৃত্য, তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দেন। আহা! সে অনাথ পীড়িতের এমন কেহই ছিল না যে, তাহার মুখে একটু জল দেয়। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর সংবাদ পাইয়া তখনই গিয়া পীড়িত ভৃত্যকে বুকে করিয়া তুলিয়া আনিয়া, আপনার শয্যায় শয়ন করাইয়া দেন। তাঁহার অবিরাম যত্ন-শুশ্রূষায় এবং সুহৃদ্-চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগী দুই চারি দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সুবিধা পাইলেই আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব এবং গুণবান্ কৃতবিদ্য লোকের চাকুরি করিয়া দিতেন। কোন কোন সময়ে তিনি অপরের জন্য ক্ষতিস্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সময় সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। মার্শেল্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ঐ পদের বেতন ৮০৲ আশী টাকা। পঞ্চাশ টাকার বেতনভোগী বিদ্যাসাগর ঐ পদ-গ্রহণে অসম্মত হন। তাহার কারণ এই —

তিনি পূর্ব্বে তৎকালিক বহু-শাস্ত্রাধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে যেরূপেই হউক কোন একটি চাকুরি করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং উপস্থিত পদে তর্কবাচস্পতি মহাশয় উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল।

সুযোগ পাইয়া তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইলেন। এই পদে তর্কবাচস্পতি মহাশয় যাহাতে নিযুক্ত হন, তাঁহার জন্য তিনি মার্সেল্ সাহেবকে অনুরোধ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "যখন সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি বলেন, মহাশয়, টাকার প্রত্যাশা করি না, আপনার অনুগ্রহ থাকিলেই, আমি চরিতার্থ হইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ চাটুবাক্য প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার জীবন-সমালোচনা করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সাহস হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রকৃত প্রতিশ্রুতির কথা বলিলে সাহেব হয়তো তাঁহাকে অহঙ্কারী মনে করিবেন, সুতরাং কথা রক্ষার সম্ভাবনা থাকিবে না . তাই তিনি সাহেবকে এইরূপ তুষ্টিকর কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর আত্মগোপন করিয়া সাহেবের তুষ্টিকর কথা বলিবেন, এ কথায় বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না ; আর মার্সেল্ সাহেবও আত্মতুষ্টিকর কথায় বিমূঢ় হইয়া পড়িবেন, এ ধারণাও আমাদের নাই। যাহা হউক, মার্সেল্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কেই উক্ত পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন। যে দিক্ দিয়াই হউক, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বার্থত্যাগের সজীব সঙ্কেত। এরূপ প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে একটু হৃদয়-বলের প্রয়োজন। জর্ম্মণ পণ্ডিত হীনের জীবনী-পাঠে তদানীন্তন মনস্বী রস্কিনের এইরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। রস্কিনকে একবার একটী উচ্চ পদ দিবার প্রস্তাব হয়, তিনি কিন্তু হীনকে ঐ পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া উক্ত পদ তাঁহাকেই দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই ব্যাপার কেবল বিদ্যাসাগরের স্বার্থত্যাগের পরিচয় নহে; প্রতিশ্রুতি-রক্ষা করিতে তাঁহাকে কিরূপ কঠোরতা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাইবেন।

যে সময়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে নিযুক্ত করিবার কথা হয়, সেই সময়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় অম্বিকা কাল্নায় অবস্থিতি করিয়া তেজারতীর "কারবার" করিতেছিলেন ; এতদ্ব্যতীত তথায় ইঁহার একটী টোলও ছিল। তাঁহাকে সোমবারে প্রয়োজন ; কিন্তু শনিবারে কথা হয়। পত্র পাঠাইলে সময়ে পত্র পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই ; পৌঁছিলেও তর্কবাচস্পতি মহাশয় এ কার্য্য স্বীকার করিবেন কি না, তাহার স্থিরতা ছিল না। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দিনই একজন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া কালনাভিমুখে যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে কালনা ২৪।২৫ ক্রোশ দূর। তিনি ও সেই সঙ্গী আত্মীয় সারারাত পদব্রজে চলিয়া পরদিন তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন।

তর্কবাচস্পতি ও তাঁহার পিতাঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে তাঁহার গমন কারণ জানিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং শতবার ধন্যবাদ করিলেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর অনায়াসে ও অক্লেশে এত পথ শ্রম সহ্য করিয়াছেন এ কথা ভাবিয়া তাঁহারা বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—"ধন্য বিদ্যাসাগর। তুমিই নরাকারে দেবতা।" যাহা হউক, শুনিয়াছি, এ পদগ্রহণে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কি একটা আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপত্তি খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে এ পদগ্রহণে সম্মত করান। পর দিন তিনি আবার সেই আত্মীয় সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সঙ্গে আসেন নাই; প্রশংসাপত্রাদি বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং আনিয়া মার্সেল্ সাহেবকে প্রদান করেন। মার্সেল্ সাহেব তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। পরে তর্কবাচস্পতি মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া পদপ্রাপ্ত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ "পথ-চলা"র কথাটা কবি-কল্পনা বলিয়া যেন মনে হয়। সত্য সত্যই কিন্তু তাঁহার "পথ-চলা" শক্তি এমনই ছিল। তাঁহার "পথ-চলা" সম্বন্ধে কত কথাই শুনিয়াছি। উত্তরকালে তিনি রোগভগ্ন দেহে যেরূপ চলিতে পারিতেন, একজন ভীম কলেবর সুদৃঢ় দেহসম্পন্ন যুবকও তেমন চলিতে পারেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার উত্তরকালেও কিরূপ হাঁটিবার শক্তি ছিল, প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার এইখানে দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলাম,—

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন,—"এক দিন কর্ম্মটাড়ে আমি, দাদা মহাশয় এবং আর কয়েক জন প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইবার উদ্‌যোগ করি। আমি বলিলাম, "দাদা মহাশয়। আজ আপনাকে দেখি, আপনি কেমন আমাদের অপেক্ষা হাঁটিয়া যাইতে পারেন।" দাদা মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ভাল, তাহাই হইবে।" এই বলিয়া আমরা সকলেই হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের সঙ্গীরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন; আমি কেবল তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিলাম; কিয়দ্দুর যাইয়া দেখি, দাদা মহাশয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চটি জুতা পায়ে চট্ চট্ করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। আমি চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। দাদা মহাশয় দূর হইতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হারাবি না?" আমি অবাক!

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"সংস্কৃত কলেজে চাকুরি করিবার সময় এক দিন বাবার বীরসিংহ হইতে

কলিকাতায় এক দিনে আসিবার প্রয়োজন হয়। তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উদ্‌যোগ করেন। সেই সময়ে মদন মণ্ডল নামে একজন পাইক বাবাকে বলিল,—'দাদাঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব।' বাবা বলিলেন,—'তুমি আমার সহিত হাঁটিতে পারিবে?' সে স্বীকার করিল। পরে উভয়েই হাঁটিতে লাগিলেন। চার ক্রোশ পথ আসিয়া মদন মণ্ডল দেখিল, বাবা তাহাকে ছাড়িয়া ৩।৪ রসি অগ্রসর হইয়াছেন। সে 'হা রা রা' করিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, আপনি দু-চার পাক ঘুরিয়া, দ্রুতপদে বাবাকে ধরিবার চেষ্টা করিল এবং ছুটিয়া বাবাকে ধরিল। উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। দশ বার ক্রোশ দূরে গিয়া মদন বাবাকে বলিল,—'দেখ, আজ আর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না, এই চটিতে থাকা যাক্।' বাবা হাসিয়া বলিলেন, 'আমাকে যাইতেই হইবে। তুমি এই পয়সা লইয়া চটিতে থাক; কাল তখন যাইও।' মদন চটিতে রহিয়া গেল। বাবা কলিকাতায় আসিলেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে এক দিনে হাঁটিয়া বাড়ী যাইতেন এক দিনে বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিতেন। বীরসিংহ গ্রাম হইতে ১০।১২ দশ বার ক্রোশ দূরে মসাট নামক স্থানে দাঁড়াইয়া একটী করিয়া ডাব খাইতেন মাত্র। যখন তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখনও তিনি প্রায় হাঁটিয়া যাইতেন, এমন কি সঙ্গীদের মোট-বোঝা ভারি হইলে, তিনি তাহাদের মোট-বোঝা কতক নিজের মস্তকে লইয়া হাঁটিতেন। একবার পথে তিনি এইরূপ অবস্থায় যাইবার সময় কলেজের দুই জন দ্বারবানের সম্মুখে পতিত হন। দ্বারবানেরা তাঁহার তদবস্থা দেখিয়া তাঁহার মোট লইবার চেষ্টা করে, তিনি কিন্তু তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় বিদায় দিয়া আপনি মোট বহিয়া চলিয়া যান।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে চাকুরি করিবার সময় বিদ্যাসাগরের বাড়ী যাইবার যেরূপ সুযোগ ঘটিত, সংস্কৃত কলেজের চাকুরির সময় সেরূপ ঘটিত না। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে চাকুরি করিবার সময় তিনি প্রায়ই বাড়ী যাইতেন। বাড়ী গিয়া প্রতিবেশীর তত্ত্ব লওয়া, আর্ত্তপীড়িতের শুশ্রূষা করা, তাঁহার কার্য্য ছিল। এতৎসম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত এইখানে প্রদত্ত হইল।

বাড়ী যাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সঙ্গে মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন। পথে কৌতুক করিবার জন্য কোন নালা নর্দ্দমা দেখিলে তিনি লাফাইয়া পার হইতেন এবং মধ্যম ভ্রাতাকে সেই নালা নর্দ্দমা পার হইবার জন্য উপরোধ করিতেন। মধ্যম ভ্রাতা বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কখন কখন লাফাইতে গিয়া পড়িয়া যাইতেন। সেই সঙ্গে

হো হো হাসি রব হইত। তিনি মধ্যম ভ্রাতাকে লইয়া এইরূপ কৌতুক প্রায়ই করিতেন।

এক বার তিনি বীরসিংহ গ্রাম হইতে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন। এক মাঠের মাঝে তিনি দেখিলেন, একটী অতি বৃদ্ধ কৃষক মোট মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, লোকটীর বাড়ী সেখান হইতে ২/৩ দুই তিন ক্রোশ দূরে। তাহার যুবক-পুত্র, তাহার মস্তকে বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়াছে। বৃদ্ধ এখন চলচ্ছক্তিহীন। বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া এবং পুত্রের ব্যবহারের কথা শুনিয়া, চক্ষের জলে বিদ্যাসাগ মহাশয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের মস্তক হইতে সেই বোঝা আপন মস্তকে তুলিয়া লইলেন এবং বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গেলেন। তিনি সেই মোট বৃদ্ধের বাড়ীতে পৌছিয়া দিয়া, আবার হাঁটিয়া কলিকাতায় আসেন।

এমন অনেক শুনিয়াছি, সব কথা বলিবার স্থান হইবে না। পাঠক ইহাতেই অবশ্য বুঝিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের চলচ্ছক্তি কিরূপ অসামান্য। বল দেখি, মস্তিষ্ক ও দেহের এরূপ শক্তি-সমবায় ইহ সংসারে অতি বিরল কি না? আর কোন বাঙ্গালীর এমন দেখিয়াছ কি? কেবল কি তাই? এমন অনাত্মপরতা বা কয় জনের আছে বল দেখি? বল, বুদ্ধি, দয়া,—তিনটীর একত্র সমাবেশ, বড় ভাগ্যবান্ না হইলে কাহারও হয় কি? একধারে যে ত্রিবেণীর ত্রিধারা, ইহার উপর আবার মাতৃভক্তির মন্দাকিনীধারা পূর্ণোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত। এই খানে তাহারও একটু পরিচয় দিব। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে কার্য্য করিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। বীরসিংহ গ্রাম হইতে জননী পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন,—"তুমি অতি অবশ্য আসিবে।" মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন মার্শেল্ সাহেবের নিকট ছুটীর জন্য প্রার্থনা করিলেন; ছুটী কিন্তু পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন,—আমাকে না দেখিয়া মা মরিবেন! অত্যন্ত কৃতঘ্ন আমি, মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না। হা ধিক! শত ধিক্।" সকলেই বাড়ী গিয়াছেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় শূন্য প্রাণে ও উদাস মনে সারারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইলেন। পর দিন প্রাতঃকালে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"ছুটী না পাই, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, অদ্য কিন্তু বাড়ী নিশ্চিতই যাইব।" তিনি মার্সেল্ সাহেবকে গিয়া বলিলেন,—"ছুটী না দেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম,—মঞ্জুর করুন; চাকুরির জন্য জননীর অশ্রু-জল সহ্য করিতে পারিব না।" সাহেব

স্তম্ভিত হইলেন ! ভাবিলেন,—"কি এ অদ্ভুত মাতৃভক্তি !" তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রসন্নচিত্তে তখনই ছুটী মঞ্জুর করিলেন। ছুটী পাইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসায় আসিলেন এবং বেলা তিনটার সময় ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। আষাঢ় মাস—আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন,—মুহুর্মুহুঃ কড় কড় বজ্রধ্বনি,—চকিতে বিদ্যুৎ-চমকানি—অবিরাম বাত্যা প্রবাহিনী,—মুষলধারে বৃষ্টি,—পথ ঘাট কর্দ্দমাক্ত। বিদ্যাসাগর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মাতৃ-উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় ভৃত্য শ্রীরামের অনুরোধে তাঁহাকে সে রাত্রি, কৃষ্ণরামপুরের এক দোকানে অবস্থিতি করিতে হয়। তখনও ১২/১৩ বার তের ক্রোশ পথ অবশিষ্ট। পরদিন প্রত্যুষে তিনি আবার চলিতে লাগিলেন। শ্রীরাম ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বাড়ী নিকটস্থ কোন গ্রামে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন। শ্রীরাম কিন্তু প্রভুর বিপদাশঙ্কায় সঙ্গ ছাড়িল না। সে ধীরে ধীরে প্রভুর পদানুসরণ করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত শ্রীরামকে একটী দোকানে ফলারে বসাইয়া বলিলেন,—"শ্রীরাম এই পয়সা লও,—বাড়ী যাও।" এই কথা বলিয়া তিনি দ্রুতপদে তীরবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীরাম সঙ্গ লইতে পারিল না। ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় দামোদর নদের তীরে উপস্থিত হইলেন। বিষম বর্ষায় দামোদরে খরতর একটানা স্রোত,—'দুকূল-ভরা',—'কানে কান জল।'

গ্রীষ্মকালে দামোদরে সামান্য-মাত্র জল থাকে ; এমন কি হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। বর্ষাকালে কিন্তু ইহা প্রলয়ঙ্করী সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে। আজ সেই দামোদর বাত্যাবিক্ষোভিত বারিধিবৎ ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন,—পারাপারের নৌকা অন্য পারে। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, যুবতী বনিতা*—সবই আছে , আজ কিন্তু বিদ্যাসাগর ভাবিতেছেন—"তাঁহার কেহই নাই ;—আছেন কেবল,—"জননী।" বিদ্যাসাগর বাহ্যজ্ঞান শূন্য ,—অন্তরে বাহিরে কেবল সেই অন্নপূর্ণা মাতৃ-মূর্ত্তি ! অনন্ত বিশ্ব-ব্যোম ব্যাপিনী মাতৃ-মূর্ত্তি। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নৌকার অপেক্ষা না করিয়া, তিনি উচ্চকণ্ঠে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিয়া দামোদরের জলে ঝাঁপ দিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর সাঁতার দিয়া দামোদর পার হইয়া গেলেন।

* ১৮৩৬ কি ৩৭ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪৪ কি ১২৪৩ সালের ফাল্গুন মাসে বিদ্যাসাগরের বিবাহ হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর কি নিজ-বলে সে দুর্জ্জয় দামোদর পার হইলেন? মানুষের শক্তিতে কি তাহা কুলায়? এ ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, মাতৃভক্তের কাতর ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, স্বয়ং মাতৃরূপিণী মহামায়া বিদ্যাসাগরকে বুকের ভিতর করিয়া লইয়া, সেই দুরন্ত দামোদর পার করিয়া দিয়াছিলেন। পার হইয়া বিদ্যাসাগর আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে তাঁহাকে দ্বারকেশ্বর নদ সাঁতরাইয়া পার হইতে হয়। মাঠের মাঝে 'কুড়ান খালের' নিকট সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। এই খানে ভয়ানক দস্যুর ভয় ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অকুতোভয়ে মাতৃপদ স্মরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। রাত্রি ৯ নয়টার সময় তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া দেখেন, বর বিবাহ করিতে গিয়াছে; মা কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া, অনাহারে পড়িয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক বার উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা! মা! আমি এসেছি।" বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বর বুঝিয়া মা ঘরের বাহিরে আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মাও কাঁদেন, পুত্রও কাঁদেন। উভয়েই অনাহারে ছিলেন। উচ্ছ্বাস-বেগের হ্রাস হইলে পর, মাতা ও পুত্র একত্র আহার করিতে বসেন।

বহুতর বিদেশীয়-গ্রন্থ পাঠক বহুতর মাতৃভক্ত বিদেশীয় পুরুষের নাম শুনিয়া থাকেন। জন্‌সন্‌, জেনারল্‌ ওয়াশিংটন্‌ প্রভৃতির মাতৃভক্তি অতুলনীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; কিন্তু বল দেখি, বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের এ মাতৃভক্তির তুলনা হয় কি? শুনিয়াছি, রোমক-বীর সম্রাট্‌ সিজর, যখন ইংলণ্ড-বিজয়-মানসে সাগর পার হইবার উপক্রম করেন, তখন ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে অনেকেই নিষেধ করেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ শুনেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দামোদরে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করেন, তখন নিকটস্থ জনকয়েক লোক তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া, সে দুষ্কর কার্য্যে বাধা দেয়; বিদ্যাসাগর কোন বাধা মানেন নাই। বাহ্য জগতে উভয়ের অবস্থা এইরূপ; অন্তর্জগতের ক্রিয়া নিশ্চিতই ভিন্নরূপ। একজনের বিজয়বাসনা; অপরের মাতৃপূজা। বল দেখি, পাঠক! কাহার সাহস প্রশংসনীয়? এ জগতে কোন্‌ বীর স্মরণীয়? বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত পাইলেন; পরে আরও বহু প্রকার পাইবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাল্য-রচনায় যেমন সুন্দর সুপাঠ্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; যৌবনেও তাঁহার সেইরূপ কবিতা রচনা করিবার শক্তি ছিল। তিনি যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, তখন কষ্ট-নামে এক

সিবিলিয়ন সাহেব তাঁহাকে নিজের নামে একটী কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করেন। অনুরোধের বশে নিম্নলিখিত কবিতাটী রচিত হইয়াছিল,—

"শ্রীমান্ রবর্টকষ্টোঽস্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্নিতরাং মামতোষয়ৎ ॥
সহি সদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বব্দশতং সুখী ॥"

কষ্ট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ২০০৲ দুই শত টাকা পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হন। তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া কলেজে জমা দিতে বলেন। সাহেব তাহাই করেন। যে ছাত্র সংস্কৃত রচনায় প্রথম হইতেন, তিনি এই টাকা হইতে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইতেন। ৪ চারি বৎসর ৪ চারিটী ছাত্র এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইহার নাম হইয়াছিল, "কষ্ট-পুরস্কার"। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে টাকা না লইয়া সংস্কৃত চর্চ্চার শুভোদ্দেশে ৪ চারিটী স্বদেশীয় পণ্ডিতকে প্রকারান্তরে এই টাকা দেওয়াইলেন। কষ্ট সাহেবের দ্বিতীয় অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন ;—

"দোষৈর্ব্বিনাকৃতঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বৈরাসেবিতো গুণৈঃ।
কৃতী সর্ব্বাসু বিদ্যাসু জীয়াৎ কষ্টো মহামতিঃ ॥
দয়াদাক্ষিণ্যমাধুর্য্যগাম্ভীর্য্যপ্রমুখাঃ গুণাঃ।
নয়বর্ত্মরতে ননং রমন্তেঽস্মিন্ নিরন্তরম্ ॥
সদাসদালাপরতৈর্নিত্যং সৎপথবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকপ্রিয়স্যাস্য সম্পদস্তু সদা স্থিরাঃ ॥
অস্য প্রশান্তচিত্তস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মপ্রবীণস্য কীর্ত্তিরায়ুশ্চ বর্দ্ধতাম্ ॥
বিদ্যাবিবেকবিনয়াদিগুণৈরুদারৈঃ।
নিঃশেষলোকপরিতোষকরশ্চিরায় ॥
দূরং নিরস্তখলদুর্ব্বচনাবকাশঃ।
শ্রীমান্ সদা বিজয়তাং নু রবর্টকষ্টঃ ॥"

কষ্ট সাহেব যখন এই কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি পঞ্জাবের সিবিলিয়ান্ পদ হইতে চির বিদায় লইয়া বিলাত যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

অতঃপর উত্তর-চরিত, শকুন্তলা ও মেঘদূতের সংক্ষিপ্ত টীকা ভিন্ন বিদ্যাসাগর

মহাশয় এ ভাবে আর কোন শ্লোকাদি রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তিনি যে এ ভাবে আর সংস্কৃত গদ্য বা পদ্য রচনা করিয়াছিলেন, এমন বোধও হয় না। সংস্কৃত-রচনায় তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। আধুনিক লোকে প্রকৃত বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা করিতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। একদিন মেঘদূতের স্বরচিত টীকা দেখিয়া তিনি স্বীয় দৌহিত্রের নিকট একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"ওরে আমি বেশ সংস্কৃত লিখেছি তো।"

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে অধ্যাপনার কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবদের পরীক্ষক হইতেন। তদুপলক্ষে বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"পরীক্ষায় পাস না হইলে, কোন কোন সিবিলিয়নকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। এ কারণ মার্সেল্ সাহেব দয়া করিয়া ঐ সিবিলিয়নদের কাগজে নম্বর বাড়াইয়া দিতে বলিতেন। অধ্যক্ষের কথা না শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিতেন। উপরোধ করিলে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেন, অন্যায় দেখিলে কার্য্য পরিত্যাগ করিব। এ কারণ সিবিলিয়ন্ ছাত্রগণ ও অধ্যক্ষ মার্সেল্ সাহেব তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ ন্যায়পরায়ণতা অসম্ভব নয়; কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে মার্সেল্ সাহেবের যেরূপ সদাশয়তা ও সৎসাহসিকতার কথা শুনি, তাহাতে তিনি বিদ্যাসাগরকে এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এ কথা হঠাৎ স্বীকার করিতে যেন মন চাহে না। তবে স্বজাতি-প্রেমের কথা স্বতন্ত্র।

নবম অধ্যায়

বাসুদেব চরিত ও সাহিত্য-সন্ধান

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করিবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সুপাঠ্য বাংলা গদ্য পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি "বাসুদেব-চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। "বাসুদেব-চরিত" শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া রচিত। "বাসুদেব-চরিতে" শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত; কোন কোন স্থানের ভাবমাত্র গৃহীত এবং কোন কোন স্থান অবিকল ভাষান্তরিত। ইহা অবলম্বন বা অনুবাদ হউক; লিপি-মাধুর্য্যে ও ভাষা-সৌন্দর্য্যে মূল সৃষ্টি-

"বাসুদেব-চরিত" বাংলা গদ্য গ্রন্থের আদর্শ-স্থল। হিন্দু সন্তানের ইহা প্রকৃত পাঠ্য। বাঙ্গালী হিন্দু পাঠকের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, "বাসুদেব-চরিত" ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। যে "বাসুদেব-চরিতে" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত, তাহা খৃষ্টান সাহেব সিবিলিয়ন্ কর্তৃক যে অননুমোদিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

"বাসুদেব-চরিতে" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণলীলা প্রকটিত; পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ভগবদাবির্ভাবের পূর্ণ প্রকটন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশ্য মনে করিয়াছিলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বিকশিত হইলেও, সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদমাত্র ভাবিয়া সাহেব সিবিলিয়ন্‌গণ ইহাকে সাদরে উপাদেয় বাঙ্গালা-পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গ্রন্থ হইলেও অনুবাদের গুণে, ভাষার লালিত্য-মাধুর্য্যে, বর্ণনার বিকাশচাতুর্য্যে এবং ভাব-সম্ভারের যথাযথ বিন্যাসে, ইহা বাঙ্গালা ভাষা-শিক্ষার্থী সাহেব-সিবিলিয়ন্‌দের যে অতি আদরণীয় পাঠ্য হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত এমন সুন্দর বাঙ্গালা গদ্য-গ্রন্থ আর ছিল না। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পাঠ্যার্থীদের জন্য বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন পাঠ্যই এমন সুপাঠ্য হয় নাই; সুপাঠ্য কি, কদর্য্য ভাষার জন্য তাহার অধিকাংশই অপাঠ্য হইয়াছিল। * কেবল "ফোর্ট উইলিয়ম্" কলেজের পাঠ্য কেন, যে সময় "বাসুদেব-চরিত" রচিত হয়, সেই সময় এবং তাহার পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা গদ্য রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনখানি ভাষা পরিপাটিতে, বাসুদেব-চরিতের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। ভাষার নমুনাস্বরূপ "বাসুদেব-চরিতে"র কিয়দংশমাত্র এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"এক দিবস দেবর্ষি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান কর না; এই যাবৎ গোপ ও

---

* কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ নামক যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত ছিল, তাহার ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। কেরি সাহেব ঐ স্থানে আসিয়াই বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে ব্যাকরণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; কিন্তু অভিধান এখন অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।......

সাহেব ভিন্ন কয়েকজন বাঙ্গালী ঐ কলেজের অধ্যাপক হইয়া কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামরাম বসু অতি কদর্য্য গদ্যে প্রতাপাদিত্য চরিত নামে এক পুস্তক লেখেন এবং পণ্ডিতবর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রবোধ-চন্দ্রিকা রচনা করেন।—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ২০৩।২০৪ পৃঃ।

যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন এবং তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবান্ধবেরা তোমার পক্ষ ও হিতাকাঙ্খী নহেন ; অতএব, মহারাজ। অতঃপর সাবধান হও, অদ্যাপি সময় অতীত হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা কর। এই বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন। কংস শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সপুত্র বসুদেব দেবকীকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ করিল এবং তাঁহাদিগকে কারাগারে নিগড় বন্ধনে রাখিল। অনন্তর নিজ পিতা উগ্রসেনকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিল এবং প্রলম্ব, বক, চামুর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দুর্বৃত্ত সৈন্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যদুবংশীদের উপরি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাঁহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া কুরু, কেকয়, শাল্ব, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, নিষধ আদি নানাদেশে প্রচ্ছন্নবেশে বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কংসের শরণাপন্ন ও মতানুযায়ী হইয়া মথুরাতে অবস্থান করিলেন।

"অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্র সময়ে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল বাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল, প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকরগীতে ও কোকিল কলকলে আমোদিত হইল এবং শীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বগণ গীতিস্তুতি করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেব ও দেবর্ষিগণ হর্ষিতমনে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল।"

কেবল সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের রচিত বাঙ্গালা ভাষায় এ পরিপাটী কি কম প্রশংসনীয়? সংস্কৃতে অভিজ্ঞ হইলেই যে এরূপ বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার শক্তি হয়, এ কথা বলিতে পারি না। রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তো সংস্কৃত ভাষায় অল্প-বিস্তর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন জন্য সামান্য প্রয়াস পান নাই। বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন কল্পে তাঁহারাও কম সহায় নহেন। সে জন্য তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইবার

যোগ্যপাত্র, সন্দেহ নাই।* তাঁহারাও কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক প্রণয়নে সমর্থ হন নাই। তুলনায় সমালোচনা করিবার জন্য, তাঁহাদেরও প্রত্যেক্যের ভাষার একটু একটু নমুনা প্রকাশ করিলাম।

রাজা রামমোহন রায় "পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্ম প্রণালী", "বেদান্তের অনুবাদ" "কঠোপনিষদ্", "বাজসনের-সংহিতোপনিষদ্", "মাণ্ডুক্যোপনিষদ্", "পথ্যপ্রদান" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। "পথ্যপ্রদান' হইতে ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনকারী নাম গ্রহণপূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমুদায়ে দুই শত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন। এই দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে, ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন—এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপুষ্ট হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে, দ্বেষ মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদচ্ছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল।"

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "ষড়্দর্শন সংগ্রহ" "বিদ্যাকল্পদ্রুম"† প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম হইতে ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

"এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক অনেক নরপতি ও বীরদিগের

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঠ্যাবস্থায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় বিলাতে ব্রিষ্টল সহরে ৬১ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারে প্রবৃত্ত ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে ইংরেজিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ বন্দ্য খৃষ্টান হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বাঙ্গালা ভাষার হিতৈষণ প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮৫ বৎসর বয়সে কৃষ্ণ বন্দ্য মানবলীলা সংবরণ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক সময় অনেকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। "ওয়ার্ডস ইনষ্টীটিউশনের" কোন কার্য্যালোচনার পর উভয়ের সে ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন হয়। কৃষ্ণ বন্দ্যর সহিত মৌখিক আলাপ প্রীতিমাত্র ছিল।

† বিদ্যাকল্পদ্রুম কোষগ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছিল। ইহাতে প্রথম জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। পুস্তকের এক দিকে ইংরেজি ও অন্য দিকে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে।

দেবপুত্ররূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয়, পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল এবং পুরাণলেখকেরা কবিতার ছন্দোলালিত্যাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দবিন্যাস করত পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন-পুরঃসর বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; সুতরাং অবিকল ইতিবৃত্ত লিখিয়া স্ব স্ব কল্পনা-শক্তিকে খর্ব্ব করেন নাই। কাব্য ও অলঙ্কারের রসে রসিক হইয়া স্ব স্ব কবিত্ব ও নৈপুণ্য প্রকাশপূর্ব্বক সাধারণের সন্তোষ করিয়া উল্লিখিত সুরবীর রাজাদিগের মানের গৌরব করিবেন, তাঁহাদিগের ইহাই বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও গবেষণার পরিচয়ের সঙ্গে, বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন কামনারও পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

"পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জনসকল যদি একত্র হওত ঈষদনু-গ্রহাবলোকন করিয়া স্বদেশীয় মঙ্গলবৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায় দ্বারা তদভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে গ্রামে সাধারণের সার্ব্বকালিক বংশ পরম্পরায় উপকারার্থে গ্রামভেটি ও বারইয়ারির ধন অথবা তত্রত্য প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক দান দ্বারা গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে কোন ব্যক্তির ব্যয়ক্লেশ হইবে না, অথচ অতুল উপকার। গ্রন্থের অভাব প্রযুক্ত অনেকে নানা শাস্ত্রালোচনার যোগ্য হইয়াও স্বয়ং গ্রন্থসংগ্রহ অপারকবোধে আলস্যের হস্তে পতিত হন। অনেকের ইতিহাস ও ভূগোল-বৃত্তান্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতই ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থাদির অভাবপ্রযুক্ত নিরর্থক ভৌতিক ও তান্ত্রিক গল্পজল্পনাতে কালযাপন করেন।"

"আমরা পল্লিগ্রামবাসী জনের প্রতি অমর্যান্বিত হইয়া দুর্ব্বল পরামর্শপক্ষের উল্লেখ করিতেছি ; কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্রেরই রীতি হউক, এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে।"

"এতদ্রূপ ভদ্র ধনাঢ্য পল্লীগ্রাম অনেক আছে যে, তাহাতে প্রতি বৎসর মিথ্যা কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্যক্তি শত শত টাকার বারুদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ করেন, মিথ্যা সং নির্ম্মাণ করিয়া কত শত মুদ্রা ব্যয় করেন। এমত সকল গ্রামে এক একটি উত্তম গ্রন্থালয় না থাকা তত্তদ্ গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কি পর্য্যন্ত নিন্দাকর, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

ইঁহাদের গ্রন্থ হইতে অনেক সার কথার শিক্ষা লাভ হয়, সন্দেহ নাই ;

ভাষাও অনেকটা ব্যাকরণ-দোষাদিশূন্য, কিন্তু ভাষার বিশদতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব জন্য ইহাদের রচনা যে অনেকটা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তৎসম্বন্ধে কাহারও দ্বিধা থাকিতে পারে না। বাগ্‌বিন্যাসের দীর্ঘতা ও ছত্র-সন্নিবেশের বিশৃঙ্খলতা হেতু এই সব রচনা মনোহারিণী হইতে পারে নাই। কতকটা ইংরেজি প্রণালীর অনুবর্ত্তী হওয়ায়, ইহাদের লিপিপদ্ধতি অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

এই তিন জনের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের ভাষা দুর্বোধ্য। রাজেন্দ্রলালের ভাষা কতকটা ভাল বটে; কিন্তু ইহা কৃষ্ণ বন্দ্যর অপেক্ষা দুর্বোধ্য। কৃষ্ণ বন্দ্যর ভাষা কতকটা জটিল বটে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। কেবল "বাসুদেব-চরিতে" নহে, ইহার পরে রচিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক গ্রন্থই সংস্কৃত প্রণালীমতে দীর্ঘ সমাসযুক্ত শব্দপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই শব্দ বা বাক্য এমনই যথাভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা কোনরূপে শ্রুতিকটু হয় নাই; বরং তাহা মধুর মৃদঙ্গনিনাদবৎ পাঠক ও শ্রোতার কর্ণমূলে এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অপূর্ব্ব সুখ-সঞ্চার করিয়া থাকে। লিপিপদ্ধতি একরূপ হইলেও বিষয়ের লঘুতা ও গুরুতা অনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত পুস্তকাবলীতে ভাষা-প্রয়োগের সারল্য ও গাম্ভীর্য্যের তারতম্য বহুপ্রকারে দেখিতে পাইবে। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অদ্ভুত শক্তি! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় ব্যর্থ বাক্যপ্রয়োগ অতীব বিরল। তিনি যেখানে যে বাক্যটী প্রয়োগ করিয়াছেন, মনে হয়, তাহা তুলিয়া লইয়া তৎসমসংজ্ঞক অন্য বাক্য প্রয়োগ করা দুরূহ। এ শক্তির পরিচয় প্রথম হইতেই তাঁহার "বাসুদেব-চরিতে"।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত, "বাসুদেব-চরিত" রচিত হইবার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক মহাত্মা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন জন্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এ জন্য কেরি, মার্সমান্ প্রভৃতি মিশনরী বাঙ্গালীর আশীর্ব্বাদপাত্র। তবে ইহারাও যে ভাষার সম্যক্ পরিপাটীকরণে বা পরিপুষ্টি-সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই, বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই তাহা বিদিত আছেন। মিশনরী ভাষার একটু নমুনা এইখানে দিলাম,—

"এক বড় বিলেতে অনেক বেঙ্গের বসতি ছিল। তাহার ধারে কতকগুলি বালক হঠাৎ খাপরা খেলা খেলিতে লাগিল; আর জলে একজাই খাপরা বৃষ্টি করিতে লাগিল; ইহাতে ক্ষীণ ও ভীত বেঙ্গেদের বড় দুঃখ হইল. শেষে সকল হইতে সাহসী এক বেঙ্গ বিল হইতে উপরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, হে প্রিয় বালকেরা! তোমরা এত ত্বরাতেই কেন আপন জাতির নিষ্ঠুর স্বভাব শিক্ষহ?"

যে অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে বুঝা যায়, ভাষা অনেকটা সরল বটে; কিন্তু ইংরেজির ভাব-ভাঙ্গা; আর গঠন-প্রণালী ইংরেজিরই অনুকৃতি। বিজাতীয় লেখকদিগের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক আশা করা যায় না।

কেরি, মার্সমান্ প্রভৃতি মিশনরী ভিন্ন অনেক সিবিলিয়ান্ সাহেব ও বাঙ্গালী মনস্বী, সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি-সাধনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।* স্থানান্তরে যথা প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের আলোচনা করিব। এখানে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিপরিচায়ক কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিব মাত্র। এতদুল্লেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা-প্রকৃষ্টতা ও বাঙ্গালার চরম পুষ্টিকারিতা কতক উপলব্ধ হইবে।

প্রকৃত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি-কাল নির্ণয় করা দুরূহ। তবে আমরা প্রায় তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত যে গদ্য-সাহিত্যের পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার আলোচনা করিলে প্রতীত হয়, প্রকৃত গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি ইহার বহু পূর্ব্বে। ইহার ভাষা তেজোময়ী ও প্রাণময়ী না হউক, ইহার গঠনপ্রকারে মনে হয়, প্রকৃত গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টির কাল নির্ণয় করা দুষ্কর। এইখানে ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

"তাহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িতা। বাহ্যজ্ঞান রহিত। তেঁহ নিত্য চৈতন্য। তাহাকে জানিব কেমনে। তেঁহ আপনাকে আপনাকে আপনি জানান। যে জন চেতন সেই চৈতন্য। অতএব স্বরূপ রূপ এক বস্তু হয়। বর্ত্তমান অনুমান এই, এইরূপ···তাঁহার নাম কি। সপ্ত স্বর্গ পাতাল কি কি। ভূলোক, ভবলোক, স্বরলোক, মহোলোক, জনলোক, তপলোক, শান্তিলোক এই সপ্ত স্বর্গ···। তেঁহ প্রথম পুরুষ। তার নাসাগ্রে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।"

ইহা অবশ্য পুষ্টাঙ্গ ভাষার পরিচায়ক নহে। ক্রিয়া, অব্যয়, বিশেষণ প্রভৃতির

---

* ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড নামক এক সিবিলিয়ান্ সাহেব বঙ্গভাষায় এক ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। চার্লস উইলকিনস্ নামক হালহেড সাহেবের এক বন্ধু স্বহস্তে ক্ষুদিয়া ঢালিয়া এক সাট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এই অক্ষরে হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুরে যে সকল আইন সংগৃহীত করেন ফরষ্টর নামক এক সাহেব তাহা বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মাসন, ওয়ার্ড প্রভৃতি মিসনরী শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। ইঁহারা শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া দেবনাগর, প্রভৃতি নানা অক্ষর প্রস্তুত করেন এবং সংস্কৃত, বাঙ্গালা হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষায় বাইবেল অনুবাদিত করিয়া, ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন গ্রন্থসকলও উহাতে মুদ্রিত হইতে লাগিল.।— বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ২০৩ পৃষ্ঠা।

যথাবিন্যাসে ও যথাপ্রয়োগে ভাষার পুষ্টি-অপুষ্টি বা পরিণতি অপরিণতির-বিচার হয়। ইহাতে তাহার পরিচয় প্রমাণের সম্যক্ অসদ্ভাব। গ্রন্থখানি নরোত্তম দাস নামক এক ব্যক্তির লিখিত। পুঁথিখানি আট পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; প্রশ্নোত্তর-সমাবেশে কতকগুলি শাস্ত্রীয় গূঢ়তত্ত্ব অবলম্বনে রচিত। "তেঁহ" এই কর্ত্তৃ-কারকের প্রয়োগে অনুভব হয়, ইহা চৈতন্যের সময়ে বা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে প্রণীত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহাকেও ভাষার সৃষ্টিকল্প বলিয়া ধরিয়া লইলে এবং ইহার ভাষা-প্রণালীর আলোচনা করিলে বলা যাইতে পারে, ইংরেজি গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টিকল্প প্রাচীনত্বের বড গৌরব করিতে পারে না।

স্যর জন্ মাণ্ডেভাইল্ ইংরেজি সাহিত্য-গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ইংরেজি সাহিত্য-সমাজে পরিচিত।* ১৩০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাণ্ডেভাইলের আবির্ভাব কাল। তাঁহার পূর্ব্বে রচিত দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর যে রচনাখণ্ড পাওয়া যায়, তাহা ইংরেজি গদ্য-সাহিত্যের মধ্যে গণ্য নহে। মাণ্ডেভাইলের রচিত ইংরেজি গ্রন্থের ভাষা-গঠনের সহিত অধুনা ইংরেজি ভাষা-গঠনের তুলনা করিলে যে তারতম্য অনুভূত হয়, নরোত্তমদাস-রচিত গ্রন্থের ভাষার সহিত আধুনিক ভাষার তুলনা করিলে, সে তারতম্য বোধ হয় না। প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা কি হিন্দী ভাষার যে তারতম্য, মাণ্ডেভাইল-রচিত পুস্তকের ভাষার সহিত আধুনিক ভাষার সেইরূপ তারতম্য বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। একটুকু বুঝাইবার জন্য মাণ্ডেভাইলের ভাষার একটু নমুনা দিই—

"And zee schulle understonds that I have put this Boke out of Latyn in to French, and transolater it azen out of Frensche in to Enghysche, that very man of my Nacioun undirstonde it."

নরোত্তম-রচিত ভাষার সহিত, আধুনিক ভাষার তুলনা করিলে, গঠন প্রক্রিয়ার তারতম্য বড় অনুভূত হইবে না। অবশ্য রচনার প্রণালী ও প্রথার তারতম্য অনেকটা পরিলক্ষিত হইবে। মাণ্ডেভাইলের ভাষার সৃষ্টির পরিচয় হইতে পারে, পুষ্টির নহে। নরোত্তমের ভাষার ঈষদ্ পুষ্টিরই লক্ষণ। তবে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বাঙ্গালা-গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃত পুষ্টি-প্রারম্ভ।

নরোত্তমদাস-রচিত গদ্য-সাহিত্য-রচনার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর

* Wilina Minto's Manual of English Prose Literature, P. 183.

প্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন এ পর্য্যন্ত পাই নাই। তবে এই সময়ের মধ্যে লিখিত চিঠিপত্র, কবুলতি প্রভৃতিকে গদ্য-সাহিত্যের নিদর্শনস্বরূপ ধরিলে, গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টি সম্বন্ধে নিতান্ত নিরাশ হইতে হয়।

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ইংরেজি সাহিত্যসৃষ্টির নিকট অনেকটা গৌরবশালী হইলেও পুষ্টি সম্বন্ধে প্রকৃতই হীনতর, তাহার আর সন্দেহ কি? ইংরেজি গদ্য-সাহিত্যের যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ ক্রম-পুষ্টিসাধন হইয়াছে, বাঙ্গালায় সেরূপ হয় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সব ইংরেজি গ্রন্থকার আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থাদির সমালোচনা করিলে, ইংরেজি গদ্য সাহিত্যের পুষ্টি-প্রক্রিয়া, অতীব বিস্ময়াবহ ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হয়। ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তার ও রাজ্যপ্রসার ইংরেজি গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টি-প্রসারে অবশ্য প্রধান সহায়। ইংরেজি প্রসারের অন্যতম একটা বিশিষ্ট কারণ লক্ষিত হয়, ইংরেজি গদ্য সাহিত্যে একটী সু-আদর্শ পাইয়াছিল। ফরাসীর পরিপুষ্ট গদ্য-সাহিত্য, ইংরেজি গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট আদর্শ। বাঙ্গালার পরাধীনতা ও দরিদ্রতা সাহিত্যপুষ্টির প্রবল অন্তরায়। ইংরেজি শিক্ষার প্রাধান্য-হেতু বাঙ্গালা পাঠের প্রবৃত্তিহ্রাস এবং প্রকৃত আদর্শের অসদ্ভাব বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতিপক্ষে অন্যতম অনাহত প্রতিবন্ধক। অধুনা ইংরেজি কতকটা আদর্শ বটে। কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙ্গালা-সাহিত্য বিসদৃশ বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়। তবে ইহা অনেকটা পুষ্টির দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

"বাসুদেব চরিত" রচিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা-ভাষার পুষ্টিসাধক যে সব পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের আলোচনা করিয়া, ভাষার বিজ্ঞান-সম্মত ক্রমোন্নতির প্রমাণ প্রদর্শন করা এখানে একরূপ অসম্ভব। যাঁহারা পুষ্টি-ক্রমের একটা সোজা পরিচয় লইতে চাহেন, তাঁহারা পাদরী ইয়াট্‌স্ সাহেব প্রণীত "বঙ্গভাষার উপক্রমণিকা" ("**Introduction to the Bengali Language**") নামক গ্রন্থের দুই খণ্ড পুস্তক পাঠ করিলে কতকটা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ইয়াট্‌স্ সাহেব তাঁহাদের অধিকাংশের ভাষা নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ইয়াট্‌স্ সাহেবই বলিয়াছেন,—"প্রকৃত বাঙ্গালা অতি সম্ভ্রান্ত ভাষা। এমন কোন ভাব নাই, যাহা ন্যায়ত তেজের সহিত, বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তবে বাঙ্গালা পাঠ্য

বিরল।"* অদ্য ইয়াট্‌স্ সাহেব জীবিত থাকিলে, তাঁহার মনের এ ক্লেশ একেবারে না হউক, কতকটা দূরীকৃত হইতে পারিত।

ভাষার পুষ্টিতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, প্রাচীনতম সাহিত্যের আলোচনা করা কর্ত্তব্য; অন্ততঃ বিদ্যাসাগর-বিরচিত "বাসুদেব চরিতে"র ভাষা বুঝাইতেও তাহার প্রয়োজন; কিন্তু এখানে সে সম্বন্ধে আলোচনার স্থানাভাব; এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাঠকের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা, তবে কতকটা কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিলাম।

প্রথমে "তোতা-ইতিহাসে"র উল্লেখ করা উচিত। এখানি "তোতা-কাহিনী" নামক উর্দ্দু পুস্তকের অনুবাদ। হিন্দীতেও "শুকবাহাত্তরী" নামক এইরূপ একখানি পুস্তক আছে। তোতা অর্থাৎ শুকপক্ষীর মুখে গল্পচ্ছলে কয়েকটি প্রসঙ্গ। ইহার লিপিপ্রণালী বিশুদ্ধ নয়, ভাষাও গ্রাম্যদোষ বর্জ্জিত নয়, স্থানে স্থানে বিজাতীয় ভাব-ব্যক্তিরও অভাব নাই সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অযথা গ্রাম্যবাক্য প্রয়োগে অনেক স্থান শ্রুতিকটু হইয়াছে। তবে শব্দপ্রয়োগ সরল ও সহজ। একটু নমুনা দিলাম,—

"পূর্ব্বকালে ধনবানদের মধ্যে আমদ-সুলতান নামে একজন ছিলেন, তাঁহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্য-সামন্ত ছিল, একসহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাঁহার দ্বারে হাজির থাকিত। কিন্তু তাঁহার সন্তান-সন্ততি ছিল না। এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকদের নিকট গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদনচন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ সুলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্লিতচিত্ত পুষ্পবৎ বিকসিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন। যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন আমদ সুলতান একজন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারসী শাস্ত্রের সমুদয় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার ধারামতে কথোপথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকদের পসন্দেতে উৎকৃষ্ট হইলেন।"

"তোতা ইতিহাস" কাহার লিখিত, তাহা জানিতে পারা যায় নাই, তবে যে ইহা এদেশীয় লোকের লিখিত, ইয়াট্‌স্ সাহেব তাহার স্পষ্ট পরিচয়

দিয়াছেন। এদেশীয়ের লিখিত হইলেও ইহার বাঙ্গালা কতকটা পাদরীদের বাঙ্গালার মত।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসুর লিখিত "লিপিমালা" প্রকাশিত হয়। পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তরচ্ছলে সকল প্রবন্ধই লিখিত। লিখনপ্রণালী প্রায়ই পূর্ব্বোক্তরূপ। তবে অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত; কিন্তু ভাষা জটিল। নমুনা এই—

"তোমাদিগের মঙ্গলাদি সমাচার অনেক দিবস পাই নাই, তাহাতেই ভাবিত আছি, সামাচার বিশেষরূপ লিখিবা। চিরকাল হইল তোমার খুল্লতাত গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন হেতু সমাচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।'

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে "রাজাবলী" নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লইয়া ইহা লিখিত। ইহার ভাষা কতকটা পুষ্টতর বটে; কিন্তু দূরান্বয়তাপ্রযুক্ত শ্রুতিকঠোর। নমুনা,—

"শকাদি পাহাড়ী রাজার অধর্ম্ম ব্যবহার শুনিয়া, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে দিল্লিতে আসিয়া শকাদিত্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে জয় করিয়া আপনি দিল্লীতে সাম্রাট্ হইলেন। ... এক দিবস ধাররাজ বিক্রমাদিত্যকে ও ভৃত্য হরিকে আপন নিকটে আনাইয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন, অরে বাছারা, বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু; অতএব নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদের প্রমুখাৎ আপনার হিত শুনিয়া ও বেদ ও ব্যাকারণাদি বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর, এই সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও; ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না ও হস্তি, অশ্ব রথা-রোহণেতে সুদৃঢ় ও নিত্য ব্যায়াম কর ও লম্ফেতে ও ধাবনেতে ও গড়চক্র-ভেদেতে ও ব্যূহরচনাতে ও ব্যূহভঙ্গেতে নিপুণ হও।"

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার লিখিত "বত্রিশসিংহাসন"ও এই সময়ে কতকটা এই প্রণালীতে লিখিত হয়। ইহার ভাষা "তোতা ইতিহাস" ও "লিপিমালা" অপেক্ষা অনেকটা ভাল; তবে কষ্ট-কল্পিত; সুতরাং ইহাতে রসমাধুর্য্যের অভাব। নমুনা,—

"এক দিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভা মধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন, ইতোমধ্যে এক দরিদ্রপুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কথা কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে, লোক যাত্রা করিতে উপস্থিত হয়, তাহার মরণকালে যেমন শরীরের কম্প হয় এবং

মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না ইহারও সেইমত দেখিতেছি, অতএব বুঝিলাম ইনি যাত্রা করিতে আসিয়াছেন, কহিতে পারেন না।"

ইহার পর রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র" উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথমে শ্রীরামপুরে ও পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজি ধরণে বাঙ্গালা জীবনী, বোধ হয় ইহাই প্রথম। ইহার ভাষা সরল ও সহজ ; পরন্তু ইহাতে অধিকতর পুষ্টিরও পরিচয় ; কিন্তু শব্দ-লালিত্যের বড়ই অসদ্ভাব। নমুনা এই,—

"তাহাতে পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র, কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজা বা আর আর প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন, যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন আমি অতি বৃহৎ যজ্ঞ করিব, তুমি আয়োজন কর।"

ইহার পর এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বাসুদেব চরিত" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রামজয় তর্কালঙ্কার প্রণীত "সাংখ্যভাষা-সংগ্রহ", লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত "মিতাক্ষরাদর্পণ," কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রণীত "ন্যায়-দর্শন", "পুরুষ-পরীক্ষা," "হিতোপদেশ", "জ্ঞান-চন্দ্রিকা," "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে "পুরুষ-পরীক্ষা," "হিতোপদেশ," "প্রবোধ-চন্দ্রিকা," প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পাঠ্য ছিল।* এই কয়খানি পুস্তক প্রায় এক প্রণালীতে লিখিত, তবে ইহাদের ভাষা পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ভাষা অপেক্ষা পুষ্টতর, লিপি পদ্ধতি বিশুদ্ধতর, সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগ বহুল। বাক্যাড়ম্বরে ও দুরান্বয়তা হেতু জটিল, নীরস ও সন্ধি প্রয়োগদোষে কঠোর। শ্রুতিসুখকারিতার জন্যই তো সন্ধি-নিয়ম। সকল পুস্তকের ভাষা-নমুনা উদ্ধার করিবার স্থান হইবে না। "পুরুষ-পরীক্ষা" হইতে একটু নমুনা দিলাম,—

"বঞ্চক কহিতেছে, ভো রাজকুমার আমি স্বাভাবিক লুব্ধ বণিক্ তোমার ধন লইয়া বাণিজ্যার্থে বৃহন্নৌকারোহণ করিয়া সাগর-পারে গিয়াছিলাম। সেখানে ক্রীতবস্তু বিক্রয় করিয়া মূল ধন হইতে একশত গুণ লাভ পাইয়া তথা হইতে আসিতে সমুদ্রের তটের নিকটে আমার বৃহত্তরণী মগ্ন হইল, তাহাতেই আমার সকল ধন নষ্ট হইল, এখন প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া আসিয়াছি। সে যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তুমি আমার প্রাণ-দণ্ড কর।"

---

* এই সব পুস্তক মুদ্রিত হয়, অনেক অমুদ্রিত হস্তলিখিত পুস্তকপাঠ্য ছিল। আমরা হস্তলিখিত ভগবদ্গীতার একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি, ইহা পদ্যে অনুবাদিত।

এখানে আর একখানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। এ খানি জন্‌সন্‌কৃত "রসলাসে"র অনুবাদ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা জটিল; পরন্তু ইহা শব্দালঙ্কারপূর্ণ। ভাষা অশুদ্ধ নহে; তবে ব্যাকরণ অলঙ্কারের অসামঞ্জস্য এবং অন্বয়ের দোষ আছে। সেই জন্য জটিল। নমুনা এই,—

"ইমলোক উত্তর করিলেন, সুখ দুঃখের কারণ নানাবিধ এবং অনিশ্চিত আর সদা পরস্পর ক্লান্ত এবং নানাসম্বন্ধে চিত্রবিচিত্র ও অপূর্ব্ব নানাঘটনাধীন হয়। অতএব যিনি আপনাকে অতি নির্ব্বিবাদে নির্দ্ধারিত করেন, তিনি অবশ্য জীবিত থাকিয়া, বিবেচনায় ও অনুসন্ধানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন।"

ভাষার যে নমুনা দিলাম ইহাতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যের যে কয়টী ক্রম হইয়াছে, পাঠক তাহার কতক আভাস পাইলেন। প্রথম ক্রম,—পাদরীদের লেখা। দ্বিতীয় ক্রম, এদেশীয় লেখকদের লিখিত "তোতা ইতিহাস," "লিপিমালা," "রাজাবলী," "কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র," "বত্রিশ সিংহাসন" প্রভৃতি;—তৃতীয় ক্রম,—ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের পাঠ্য পুস্তক,—"পুরুষ-পরীক্ষা," "হিতোপদেশ" প্রভৃতি। তিনটী ক্রমেই পুষ্টতরতার পরিচয়। এখন পাঠক বুঝুন, "বাসুদেব চরিতে"র ভাষা আরও কত পুষ্টতর। ইহার প্রণালী-পথ সম্পূর্ণ নূতন। এমন বিশুদ্ধ ও সুখবোধ ভাষা পূর্ব্বে কোন গ্রন্থেরই ছিল কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার সরলতা ও সুখবোধতার প্রমাণ স্বরূপ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় একটী রহস্যজনক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—

"এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে স্থানীয় কোনও বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক করিয়াছিলেন,—এ কি হয়েছে? এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে। এ যে অনায়াসে বোঝা যায়।"

ভাষা পুষ্টিকারিত্বের কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের অনুবাদে আরম্ভ। বিলাতের জন্‌সন, মিল্টন্‌, স্কট্‌, কাদ্‌লাইল্‌ প্রভৃতি প্রায় সকল প্রতিপত্তিশালী লেখককে প্রথম প্রথম অনুবাদে হাত পাকাইতে হইয়াছিল। অনুবাদ হউক, "বাসুদেব-চরিতে" উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় আছে। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কিরূপে অবিকল সুন্দর অনুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পথ দেখাইলেন। তবে "বাসুদেব-চরিতে"র অনুবাদের ভাষা ও লিপিভঙ্গী অপেক্ষা তাহার পরবর্ত্তী অনুবাদ ও প্রবন্ধাদির লিপিভঙ্গী যে অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও

বিশুদ্ধীকৃত হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। **Voyage to Abysinia** (ভয়েজ টু আবিসিনিয়া) নামক গ্রন্থের জন্‌সন্ সর্ব্বপ্রথম যে গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার লিপিপদ্ধতির সহিত তৎকৃত পরবর্ত্তী পুস্তকাদির লিপিপদ্ধতির তুলনা করিলে যেমন তারতম্য অনুভূত হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরবর্ত্তী গ্রন্থাদির লিপিপদ্ধতির সহিত এ অনুবাদের লিপিপদ্ধতির তুলনা করিলে তেমনই তারতম্য বোধ হইবে।

ভঙ্গভাষার যতই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হউক বঙ্গবাসীকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট চিরঋণী থাকিতে হইবে। তাঁহার লিপিভঙ্গী ও বাগ্‌বিন্যাস-চাতুরী যেন "নিতুই নব"। অবিকল অনুবাদ হইয়াছে; কিন্তু ভাবভঙ্গ আদৌ হয় নাই।

স্বল্পাক্ষরে যিনি বহু ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি শক্তিশালী লেখক বলিয়া পরিচিত। ভাব-পূর্ণ সংযমিত শব্দপ্রয়োগে যিনি নিপুণ তিনি সুলেখক নামে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে এ প্রতিষ্ঠা আছে, তাঁহার ভাষান্তরিত ও প্রণীত পুস্তক এবং অন্যান্য ভাষান্তরিত ও সঙ্কলিত পুস্তকাবলীর মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা প্রভৃতি পাঠ করিলে সহজে উপলব্ধ হয়।

অনুবাদে এবং লিপিচাতুর্য্যে অক্ষয়কুমার দত্তের কৃতিত্ব কম নহে। ভাষার পরিশুদ্ধি ও সুপদ্ধতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ; তবে বিদ্যাসাগরের ন্যায় অক্ষয়কুমারের ভাষায় বৈচিত্র্য নাই, বিদ্যাসাগরের ভাষা এক সুরে বাঁধা, কিন্তু তাহাতে রাগালাপের বৈচিত্র্য বহুল। এ ভাষায় খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা, চুট্‌কী সবই আছে। অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা এক সুরে বাঁধা, কিন্তু ইহাতে রাগালাপের বৈচিত্র্য নাই। বিদ্যাসাগরের ভাষায় মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোল, খোল সকল যন্ত্রের তাল পাইবে; অক্ষয় কুমারের ভাষায় কেবল মৃদঙ্গের আওয়াজ।

যাহা হউক, "বাসুদেব-চরিতে"র ন্যায় উপাদেয় পাঠ্যও ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টান সাহেবেরা এ পুস্তকের অনুমোদন করেন নাই; তজ্জন্য দুঃখ নাই; দুঃখ এই, একখানি সুপাঠ্য পুস্তকে হিন্দুসন্তানেরা বঞ্চিত হইয়াছেন; দুঃখ এই, বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ ভগবানের অবতারত্বপ্রতিপাদক পুস্তক আর লেখেন নাই। চিরকাল কিন্তু তাঁহাকে সাহেব সিবিলিয়নদের জন্য পাঠ্য লিখিতে হয় নাই। প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা থাকিলে তিনি হিন্দু-সন্তানদের জন্য এইরূপ ইহপরকালের শিক্ষণীয় সুপাঠ্য পুস্তক লিখিতে পারিতেন। তিনি সাহেবদের জন্য এরূপ গদ্য লেখেন নাই, হিন্দু-সন্তানদের জন্যই বা লিখিয়াছেন কৈ? সে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা থাকিলে ভাষা-সম্পদ্ সীতার বনবাসেও তাহার পরিচয় পাইতাম। আরও দুঃখের বিষয়, "বাসুদের-চরিত"

মুদ্রিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিতাবস্থায় এ পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে সময় তিনি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার পুত্র নারায়ণ বাবু ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদিনী আদ্যন্ত লীলা-কথা সম্বন্ধে এক হিন্দী প্রেমসাগর* ভিন্ন বাঙ্গালায় এমন সুললিত গদ্য আর দ্বিতীয় নাই। আমরা নারায়ণ বাবুর নিকট পুস্তকের জীর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। ইহাতে কোন বৎসর বা তারিখের উল্লেখ নাই, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন সময়ে ইহা লিখিত হইয়াছিল।

দশম অধ্যায়

প্রতিপত্তি-পরিচয়, ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কার্য্যত্যাগ, সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ, কলেজের সংস্কার, তেজস্বিতা, গুণগ্রাহিতা, ভ্রাতৃবিয়োগ, কলেজের কার্য্য ত্যাগ ও সখের কাজ

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে চাকুরি করিবার সময় কেবল সিবিলিয়ন সাহেব সম্প্রদায় কেন ; তাৎকালিক এ দেশীয় অনেক সম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিতও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এই সময় মুরশিদাবাদের স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। মুরশিদাবাদ রাজপরিবারের কর্মচারিগণ তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১২৫৪ সালে মৃত রাজার উইল সম্বন্ধে যে মোকদ্দামা হয়, তাহাতে নবীনচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছিলেন,—"রাজা কৃষ্ণনাথ ইংরেজিতে যে উইল করিয়াছিলেন, রাজার ইচ্ছানুসারে আমি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যে সেই উইলের বাঙ্গালা অনুবাদ করি। আমি অনুবাদ করি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা লিখেন। উইল অনুবাদের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। এক্ষনে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারী।"†

* আগ্রার লল্লুজি "প্রেমসাগর" প্রণেতা। ইনি হিন্দীভাষার প্রথম উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থকর্ত্তা। "প্রেমসাগর" উৎকৃষ্ট হিন্দী গ্রন্থ। ইঁহার প্রণীত "সভা বিলাস" নামক পদ্য গ্রন্থও সাধারণের পরম প্রিয়পাঠ্য। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গিলক্রাইষ্ট সাহেবের অনুরোধে "প্রেম-সাগর" লিখিত হইয়া কতকাংশে মুদ্রিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা পূর্ণাকারে মুদ্রিত হয়।

† **The Bengal Hurkara and India Gazette, Thursday, 22 July, 1847.**

পরে মুরশিদাবাদ রাজ-পরিবার এবং স্বয়ং মহারাণী স্বর্ণময়ীর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আবশ্যক হইলে, মহারাণীর নিকট অর্থ ঋণ লইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজ-পরিবারের কর্মচারিগণকে যেরূপ নানা বিষয়ে সাহায্য করিতেন, মহারাণীর নিকটও তিনি সেইরূপ অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইতেন। এ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি যথাপ্রসঙ্গে স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কার্য পরিত্যাগ করেন। এই সময় সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যু হয়। বাবু রসময় দত্ত তখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন সবিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিলে সংস্কৃত কলেজের প্রকৃতই অনেক উন্নতি হইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তবে এ পদের বেতন পঞ্চাশ টাকা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজেও পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন ; সুতরাং এ পদের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পদ ত্যাগ করিবেন না, রসময় বাবুর ইহাও ধারণ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা, বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদ গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদে অধিষ্ঠিত করিবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ শিক্ষা-বিভাগে এক পত্র লেখেন। এই পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী করিবার জন্য তাঁহার সবিনয় অনুরোধ ছিল। এই পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্যও তিনি যথেষ্ট উপরোধ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, এ পদের বেতন বৃদ্ধি না হইলে বিদ্যাসাগরের ন্যায় এক জন উপযুক্ত লোক পাওয়া দুরূহ। রসময় বাবু যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদপ্রার্থনার আবেদন-পত্র ও প্রশংসাপত্রাদি পাঠান হইয়াছিল।

রসময় দত্তের পত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা-পত্রাদি পাইয়া, শিক্ষা-বিভাগের তাৎকালিক সেক্রেটারী এফ. জে. মৌয়েট্ এম. ডি. সাহেব অতি সন্তোষ-সহকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিতে স্বীকার করেন। তবে তিনি সে সময় পদের বেতন বৃদ্ধি করিতে সম্মত হন নাই।

মৌয়েট্ সাহেব ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রেল রসময় বাবুকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন,—"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হইল,

কিন্তু আপাততঃ তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইবে না। পরে কার্য্য বুঝিয়া বেতন বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা রহিল।"

৪ঠা এপ্রেল এই পত্রের এক অনুলিপি ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। রসময় বাবু তাঁহাকে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বুঝাইয়া বলেন,—"তুমি যদি এ পদ গ্রহণ কর, তাহা হইলে কলেজের উন্নতি হইবে। কলেজের উন্নতি হইলে নিশ্চিতই বেতন বৃদ্ধি হইবে।"

বেতন বৃদ্ধির আশা বুঝিয়া এবং রসময় বাবুর অনুরোধ রক্ষা না করা অন্যায় ভাবিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় পদগ্রহণে সম্মত হন। এই এপ্রেল মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হন।

সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্সেল সাহেবকে বলিয়া কহিয়া কলিকাতার তালতলা নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের হেড-রাইটার-পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অনেক সংস্কার সাধন করেন। পূর্ব্বে শিক্ষকই কি, আর ছাত্রই কি, কলেজে আসিবার বা যাইবার কাহারও কোন বাঁধাবাঁধি, আঁটা-আঁটি নিয়ম ছিল না। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল অধ্যাপকের আগমনের বহু পূর্ব্বে সমাগত হইয়া কলেজের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখভাগে আপন মনে পদচারণা করিতেছিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্মার্ত্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তাহা লক্ষ্য করিয়া অপরাপর অধ্যাপক-দিগকে কহিলেন,—"ওগো আর আমাদের বিলম্বে আসা চলিবে না, বিদ্যাসাগর অগ্রে আসিয়া কৌশলে আমাদিগকে তাহা জানাইতেছেন।" তৎপর দিবস হইতে তাঁহারা সকলে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর, শিরোমণি প্রভৃতির ছাত্র ছিলেন; সুতরাং তিনি মুখে কোন কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অনেক বিষয়ে সুকৌশলে সুব্যবস্থা ও সুনিয়ম করিয়া দেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রথম কাষ্ঠের পাশ প্রচলিত করেন। কোন ছাত্র এই পাশ না লইয়া বাহিরে যাইতে পারিত না। কাহারও সেক্রেটারীর অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করিবার অধিকার ছিল না। ইনি যে সকল কবিতা অশ্লীল মনে করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত পাঠ্যসাহিত্য হইতে তুলিয়া দেন।

সাহিত্য শ্রেণীতে অঙ্কশিক্ষার ব্যবস্থা ইঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে এ ব্যবস্থা ছিল না।

এই সময়ে হিন্দু কলেজের "প্রিন্‌সিপল্" কার্ সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটু মনোবাদ ঘটিয়াছিল। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কার্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সাহেব তখন টেবিলের উপর পা তুলিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি তদবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করেন; কিন্তু সে দিন তৎসম্বন্ধে কোন কথা না কহিয়া ফিরিয়া আসেন। আর একদিন কার্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া আপনার পাদুকা-শোভিত পা দুখানি টেবিলের উপর তুলিয়া দেন, অধিকন্তু সাহেবকে বসিতেও বলেন নাই। সাহেব সে দিন সংক্ষুব্ধ মনে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহারের কথা শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারী মৌয়েট্ সাহেবকে বিদিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। কৈফিয়তে বিদ্যাসাগর মহাশয় কার্ সাহেবের দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। মৌয়েট্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তীব্র তেজস্বিতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকাল গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময় সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকপদ শূন্য হয়। বাবু রসময় দত্ত তখনও কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। শুনিতে পাই, এ পদ গ্রহণ করিলে অনেকটা কর্ত্তৃত্ব লোপ হইবে এবং কর্ত্তৃত্ব লোপ হইলে, কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেকটা অন্তরায় ঘটিবে ভাবিয়া, তিনি এ পদ গ্রহণে অসম্মত হন; তবে এ পদে যাহাতে একজন প্রকৃত গুণবান্ উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হন, ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল। সেই সময় তাঁহার বাল্য-সহাধ্যায়ী মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহিত্য-শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি যোগাড়যন্ত্র করিয়া, তর্কালঙ্কার মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আসিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় দিনকতক সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়াইয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা দ্বাদশবর্ষীয় বালক হরচন্দ্রের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। ভ্রাতৃ-শোকে বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত-কল্প হন। ভ্রাতার মৃত্যু সময়ে তিনি দেশে উপস্থিত ছিলেন। কার্য্যবশে তাঁহাকে কলিকাতায়

আসিতে হইয়াছিল বটে ; কিন্তু ভ্রাতৃ-শোকে তিনি পাঁচ ছয় মাস এক রকম আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলে হয়।

এই দুর্ঘটনার পর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্তের সহিত তাঁহার মনোবাদ ঘটে। তিনি শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব করিতেন, তাহা সময় সময় সেক্রেটারীর অনুমোদিত হইত না। মতান্তর মনোবাদের কারণ। তেজস্বী বিদ্যাসাগর কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। পদত্যাগ করিতে দেখিয়া আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, স্বজন, পরিজন সকলে অবাক্ হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন বটে ; কিন্তু এত বড় সংসার চালাইবেন কিসে ? সত্য সত্য ইহা ঘোরতর অবিমৃষ্যকারিতা ; কিন্তু তেজস্বী বিদ্যাসাগর দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় অচল অটল ভাবে ও অম্লান বদনে উত্তর দিলেন,—"আলু, পটোল বেচিয়া খাইব, মুদীর দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ লইব না।" এ সময় তাঁহার বাসায় অনেকগুলি অনাথ বালক অন্নবস্ত্র পাইত। তিনি তাহাদের কাহাকেও অন্নবস্ত্রে বঞ্চিত করেন নাই। মধ্যম ভ্রাতা ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে চাকুরি করিয়া যে পঞ্চাশটী টাকা পাইতেন, তাহাই একমাত্র উপায় ছিল। এই টাকায় বাসাখরচ চলিতে লাগিল। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ঋণ করিয়া বাড়ীতে পাঠাইতে হইত। রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট শুনিয়াছি, "পদ পরিত্যাগের পর তাঁহাকে একটী দিনের জন্যও মলিন বা বিষণ্ণ দেখা যায় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় তিনি তেমনই হিমগিরিবৎ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। মুখ দেখিয়া মনে হইত না, তাঁহার মনে কোন কষ্ট কি দুঃখ আছে।" অনন্যোপায় সামান্যা-বস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ পদত্যাগ দুষ্কর নিশ্চিতই ; কিন্তু যাঁহাদের ভিতরে তেজ আছে, যাঁহাদের আত্মশক্তি ও সামর্থ্যের উপর অচল বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিচিত্র কিছুই নহে।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন চাকুরিতে পুনঃ প্রবৃত্ত হন নাই। এই সময় হিন্দী ও ইংরেজি বিদ্যায় তাঁহার অনেকটা ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। আনন্দকৃষ্ণ বাবু বলিয়াছিলেন,—"তাঁহার মুখে সেক্সপিয়রের আবৃত্তি শুনিয়া আমরা বিমোহিত হইতাম।" শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মার্সেল্ সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাপ্তেন ব্যাঙ্ক সাহেবকে কয়েক মাস হিন্দী ও বাইবেল শিক্ষা দেন। ব্যাঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার হিসাবে তাঁহাকে কয়েক মাসের বেতন একেবারে দিতে চাহেন ; তিনি কিন্তু তাহা লয়েন নাই।

একাদশ অধ্যায়

বেতাল-পঞ্চবিংশতি, সংস্কৃত-যন্ত্র ও কবি-প্রীতি

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৪ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্সেল সাহেবের অনুরোধে হিন্দী "বৈতাল পঁচ্চিসী" নামক গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। "বেতাল-পঞ্চবিংশকা" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও আছে।*

বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বয়ং সুগভীর সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও, মূল সংস্কৃত-প্রসঙ্গের অনুবাদ না করিয়া, অনুবাদিত হিন্দী গ্রন্থ অবলম্বন করিলেন কেন, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। এই সময় তিনি হিন্দী ভাষায় যথেষ্ট অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার পরিচয়-স্বরূপই বোধ হয় হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ। বস্তুতই অনুদিত "বেতালে" তাঁহার নবার্জ্জিত হিন্দী-ভাষাভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

হিন্দী "বৈতাল পচ্চিসী"র যে যে স্থান অশ্লীল বলিয়া মনে হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেতালের ভাষা প্রাঞ্জল, ললিত, মধুর ও বিশুদ্ধ। তবে প্রথম সংস্করণে দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসসমন্বিত রচনা হেতু "বেতাল" বড় শ্রুতিকঠোর হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে এইরূপ শ্রুতিকঠোর সমাসসমন্বিত বাক্যের প্রয়োগ ছিল,—"উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল উৎফুল্ল ফেন-নিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি মকর নক্র চক্র ভীষণ স্রোতস্বতীপতি প্রবাহমধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল।" এরূপ ভাষা বাঙ্গালার উপযোগী নয় বলিয়া পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য আধুনিক সংস্করণে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। মনস্বী ও বিচক্ষণ লেখকেরা সহজেই আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লয়েন। জন্‌সনের "রাস্বালা"র বাক্যাড়ম্বরে অনেকটা শ্রুতিকটু হইয়াছিল। ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া "কবিদিগের জীবনী"তে এ দোষ পরিত্যাগ করিতে সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। "রাস্বালা"র অপেক্ষা "কবি-জীবনী"র ভাষা অধিকতর সরল ও সহজ হইয়াছে। "বেতালে"র প্রথম সংস্করণের বাক্যাড়ম্বর প্রমাণ জন্য যে স্থল উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে এখনকার সংস্করণে এইরূপ আছে,—"কল্লোলিনী-

* এই গ্রন্থ শিবদাস ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত। সংবৎ ১৮৯৬ কৃষ্ণ-অষ্টমীতে বৃহস্পতিবার এই পুস্তকের রচনা সমাপ্ত হয়।

বল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল।"

—বেতাল, একাদশ উপাখ্যান, ৯৫ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক স্থলেই ঠিক অনুবাদ করেন নাই। যে স্থান উদ্ধৃত হইল, তাহার মূলেই ইহার প্রমাণ। হিন্দী মূলে এইরূপ আছে,—

"**सागरमेंसे एक सोनेका तरवर निकला। बहु जमुरुद्के पात, पुखराजके फूल, मुक्तेके फलों से ऐसा खुब छदा हुआ था, कि जिसका बयान नहीं हो सकता और उसपर महा सुन्दरी बीन हाथमें लिये मीठे मीठे सुरोंसे गाती थी।**"

মূলে সাগরের বাক্যাড়ম্বরময় বিশেষণ নাই; কিন্তু বৃক্ষের পাতা, মূল ও ফলের প্রকার আছে। অনুবাদে বিশেষণ আছে, কিন্তু ফলাদির প্রকার নাই।

"বাসুদেব-চরিতে"র ভাষা অপেক্ষা বেতালের ভাষা অধিকতর সংযমিত ও মার্জ্জিত। ভাষার একটু নমুনা এই,—

"উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে নৃপতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইল, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি, রাজ্য-ভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বয়ং রাজেশ্বর হইলেন; এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে, লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।"

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথমে যেমন সমাদৃত হয় নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল"ও প্রথমে সেরূপ সমাদর পায় নাই। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ইহার আদর প্রথম বাড়াইয়া দেন। অসম্ভবই বা কি? স্কটের "ওয়েভার্লি" প্রকাশিত হইবামাত্র সমাদৃত হয় নাই। তাহার সমাদর হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। সেক্সপিয়রের আদর তদীয় জীবিতকালে হয় নাই। জর্ম্মণ পণ্ডিতের গুণগ্রাহিতাগুণে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই; নহিলে সে প্রতিপত্তি প্রস্ফুটিত হইতে হয় তো আরও অনেক সময় লাগিত। মিল্‌টনের জীবদবস্থায় "প্যারাডাইস্ লষ্টে"র প্রতিপত্তি ছিল না। এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যাহাই হউক, "বেতালে"র আদর প্রথমে হউক বা না হউক, যখন ইহা আদরণীয় হইয়া উঠে, তখন অনেকে বেতালের অনেক অংশ মুখস্থ করিয়া রাখিতেন।

"বেতালে"র প্রথম কয়েক সংস্করণে বিরাম-চিহ্ন অর্থাৎ কমা, সেমিকোলন

প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় নাই; পরে সাধারণের সুবিধার্থ ব্যবহৃত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তিন শত টাকা দিয়া একশত খণ্ড বেতাল ক্রয় করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্. এ. তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত লেখেন। এই জীবন-চরিতের ৪২ পৃষ্ঠায় "বেতাল"-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র লিখিত হয়,—

"বিদ্যাসাগর-প্রণীত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় উহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে "বেতাল" পড়াইয়া শুনান হইয়াছিল মাত্র। তাঁহাদের কথামতে দুই একটী শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণার্থ তিনি ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এই পত্র লেখেন,—

অশেষগুণাশ্রয়
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃপ্রেমাস্পদেষু
সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত কলেজের ভূত-পূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কারের দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত বইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" বেতাল-পঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্র বাবুর উক্ত বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতাল পঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্রখানি আমার ব্যক্তব্যের সহিত প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ

১০ই বৈশাখ, ১২৮৬ সাল। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

বিদ্যারত্ন মহাশয় তদুত্তরে যে পত্র লেখেন, তাহা এইখানে সন্নিবেশিত হইল,—

পরমশ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়
জ্যৈষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত; আমার বিবেচনায় এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্রনাথ বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি, রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটী শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয় করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

কলিকাতা। সোদরাভিমানিনঃ
১২৮৬ সাল, ১২ই বৈশাখ। শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নাকি পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট উহা শুনিয়াছিলেন। যখন এই পত্র লেখালেখি হয়, তখন বাচস্পতি মহাশয় জীবিত ছিলেন না। প্রথমাবস্থায় সকলকেই যে একটুকু অধিক সতর্ক, কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত থাকিতে হয়, এই ঘটনায় তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া

বিদ্যাসাগর মহাশয় "সংস্কৃত-যন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত করেন।* ৬০০৲ ছয়শত টাকা ঋণ করিয়া একটী প্রেস ক্রয় করা হয়। এই প্রেসে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কৃষ্ণনগরের মহারাজার বাড়ী হইতে আনীত হয়। মার্সেল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের জন্য ৬০০৲ ছয় শত টাকায় এক শত খণ্ড ভারতচন্দ্র ক্রয় করেন। এই টাকায় দেনা শোধ হয়। এই প্রেসে সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ক্রমে "প্রেসটী" লাভবান্ হইতে থাকে।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড় প্রিয় ছিল। ভারতচন্দ্রকে তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস, কালিদাস যেমন সংস্কৃতে; ভারতচন্দ্র তেমনই বাঙ্গালায়; কালিদাসের গ্রন্থে যেমন সংস্কৃতের; ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে তেমনই বাঙ্গালার পরিপাটী। অন্নদামঙ্গলের পরিমার্জ্জিত ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি ভাবিতেন, বাঙ্গালার ভারতচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী কবি। ভারতচন্দ্রের পর দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রসিকচন্দ্র রায় খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি-ভাজন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মতের মিল না থাকিলেও, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রকৃত বাঙ্গালা কবি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন. পরন্তু তাঁহার রচনা প্রকৃত বাঙ্গালা কবিতার আদর্শ ভাবিয়া তাঁহার কবিতাকে আদর করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় ইংরেজি ভাব বা ছায়া থাকিত না, অথচ তাঁহার রচনার ভাষা তাঁহার নিজস্ব—বাঙ্গালা-ভাষার নিজস্ব। বাঙ্গালা ভাষার—বাঙ্গালী জাতির ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়াই, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার খ্যাতি প্রচার করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় কবি রসিকচন্দ্রের কবিতায়ও তিনি পরম প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। রসিকচন্দ্র প্রকৃত বাঙ্গালী-কবিশ্রেণীর শেষ কবি। রসিকচন্দ্রের দেহান্তরে খাঁটি বাঙ্গালী কবি-শ্রেণীর অবসান হইবে বলিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ছিল। রসিকচন্দ্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, যথেষ্ট বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। রসিকচন্দ্রের কোন কোন কবিতা-পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে পাঠ্য-পুস্তকরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। রসিকচন্দ্রের কবিতা তিনি এত ভালবাসিতেন যে, আপনার দৌহিত্রদিগকেও

* বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় উভয়েই এই মুদ্রাযন্ত্রের সমান অংশীদার ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতান্তর হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কারণে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপর বিরক্ত হইয়া, তাঁহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হন। ৺শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সালিসি হইয়া গোল মিটাইয়া দেন। প্রেস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পত্তি হয়।

তদ্রচিত অনেক কবিতা মুখস্থ করাইতেন। রসিকচন্দ্র আধুনিক সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যেরূপ উৎসাহ পাইতেন, তেমন আর কাহারও নিকট পাইতেন না। শ্রীরামপুর বড়া গ্রামে রসিকচন্দ্রের নিবাস ছিল। কলিকাতায় আসিলে তিনি সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার যথেষ্ট আদর করিতেন। রসিকচন্দ্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি শতমুখে বিদ্যাসাগরের সহৃদয়তা ও বদান্যতার কীর্ত্তন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর রসিকচন্দ্র একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক বার বৃদ্ধ রসিকচন্দ্রের মুখে অনেক রস-ভাষা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বার্দ্ধক্যজরা বদন-মণ্ডলেও যৌবনসুলভ হাস্য-কৌতুকের লহরী দেখিয়াছি; এবার কিন্তু আর তাঁহার সে ভাব দেখি নাই, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে বৃদ্ধের দেহ-যষ্টি ভগ্ন হইয়াছিল। পরম সুহৃদ্ বিদ্যাসাগরের গুণগরিমা ও বান্ধববাৎসল্য স্মরণ করিয়া তিনি কেবলমাত্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। রসিকচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যখন বিদ্যাসাগর নাই, তখন আমিও আর নাই। আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর বৎসর দুই পর রসিকচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন। সুহৃদয় সুহৃদের নিদারুণ শোক অনেকটা রসিকচন্দ্রের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাঙ্গালা-ইতিহাস, দুর্গাচরণের পরিচয়, ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে পুনঃ প্রবেশ, ইংরেজি লিপি-পটুতা, শুভঙ্করী, জুনিয়র সিনিয়র পরীক্ষা, গুণবানের পুরস্কার, পুত্রের জন্ম ও ভ্রাতৃবিয়োগ

১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শমান্ সাহেব কৃত হিষ্টরি অব্ বেঙ্গল (History of Bengal) অর্থাৎ ইংরেজিতে লিখিত বঙ্গদেশের ইতিহাস নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন। সর্ব্বত্র ইহার আদর হইয়াছিল। ভাষা মনোহর, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।

এই ইতিহাসে নবাব সিরাজুদ্দৌলার রাজত্বকাল হইতে বড় লাট লর্ড বেণ্টিকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত শাসনবিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের মার্শেল-সাহেবের অনুরোধে ইহা রচিত হইয়াছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সিরাজুদ্দৌলার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা লইয়া একখানি ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ইতিহাসকে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়াছেন।

প্রথম সংস্করণে, এই ইতিহাস "মার্সেল সাহেবের অনুমত্যানুসারে লিখিত" এইরূপ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজি পুস্তক হইতে এই প্রথম অনুবাদ করিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এই ইতিহাসেও সেই কৃতিত্বের পরিচয় পাই। ইংরেজি হইতে হউক, হিন্দী হইতে হউক, আর সংস্কৃত হইতে হউক, অনুবাদ-কৃতিত্বে বিদ্যাসাগর অতুলনীয়। তবে ইতিহাসে অনুবাদের কৃতিত্ব প্রমাণ যেরূপ, গবেষণা ও প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ের কৃতিত্বপ্রমাণ সেরূপ নহে। মার্শমান্ সাহেব, সিরাজুদ্দৌলাকে যেরূপ নিষ্ঠুর, নৃশংস ও অরাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, গবেষণাফলে তাহার বিপরীত প্রমাণ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে যে সব ইতিহাস সংগ্রহ দেখিতে পাই, একটু মনোযোগ সহকারে তাহার আলোচনা করিলে, সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রের তাহাতেই বিপরীত প্রমাণ হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ইতিহাসসমূহের সাহায্যে, আমি জন্মভূমিতে সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রের কলঙ্ক-প্রক্ষালনে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। মনে হয়, তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি। এই সব ইতিহাসের পর্য্যালোচনায়, অন্ধকূপের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।* ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবেন বলিয়াই, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাচীনতম ও অধুনাতম ইতিহাস গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া, এক দিন আলমারিবদ্ধ এই সমুদয় ইতিহাস পুস্তক দেখিতে দেখিতে অবিরল-ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।

১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের "হেড রাইটার" এবং "ট্রেজারের" পদ শূন্য হয়। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কাজ করিতেন। এই পদে নিযুক্ত থাকিয়াই দুর্গাচরণ বাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। ইনিই পরে প্রসিদ্ধ ডাক্তার হন। ইনি মেডিকেল কলেজের "আউট ষ্টুডেণ্ট" ছিলেন; অর্থাৎ বিনা বেতনে পড়িতে পাইতেন; পরীক্ষা দিয়া উপাধি পাইবার অধিকারী ছিলেন না। কেবল মার্সেল্ সাহেবের অনুগ্রহে তাঁহার পড়া-শুনা চলিত। চাকুরি করিতে করিতে একবার মার্সেল্ সাহেব, ছুটি লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। সেই সময় কর্ণেল রাইলি সাহেব তাঁহার স্থানে কাজ করিতে-ছিলেন। দুর্গাচরণ কাজ করিতে করিতে পড়া শুনা করেন, রাইলি সাহেবের এমন ইচ্ছা ছিল না। এই জন্য, দুর্গাচরণকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল।

---

* ইহার বিশেষ বিবরণ আমার রচিত "ইংরেজের জয়" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, মার্সেল্ সাহেব ফিরিয়া আসিলে, দুর্গাচরণের আবার একটু সুবিধা হইয়াছিল। পরে ১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি "হেড রাইটারী" পদ পরিত্যাগ করেন। দুর্গাচরণের জীবনেও অনেক অলৌকিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাহার যে সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্ক-সংঘটিত ঘটনাবলী একে একে বিবৃত করিলে, একখানি অতি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। দুর্গাচরণ বাবুর একখানি সম্পূর্ণ জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাঁহার একখানি ইংরেজি জীবন-চরিত দেখিয়াছি। তাহাও সম্পূর্ণ নহে।

মার্সেল্ সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে দুর্গাচরণ বাবুর পদ গ্রহণ করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের "হেড রাইটারে"র বেতন ছিল ৮০্ আশী টাকা। এইবার বিদ্যাগর মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থা কতক সচ্ছল হইল। তিনি এ সময়ে স্বকীয় ইংরেজি বিদ্যার উন্নতিসাধনে অধিকতর যত্নশীল হইয়াছিলেন। যত্নে সিদ্ধি নিশ্চিতই। তাঁহার ইংরেজি লেখার লিপি-নৈপুণ্য দেখিয়া সিবিলিয়ন্ সাহেবগণও সন্তুষ্ট হইতেন। বাঙ্গালা হস্তাক্ষরের ন্যায় তাঁহার ইংরেজি হস্তাক্ষরও সুন্দর হইয়াছিল। ইংরেজি হস্তাক্ষরের ছত্রগুলিও মুক্তাপঙ্‌ক্তিবৎ প্রতীয়মান হইত। তাঁহার বাঙ্গালা ও ইংরেজি হস্তাক্ষরের নমুনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। লিপিনৈপুণ্যেরও পরিচয় যথাস্থানে পাইবেন।

১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজের কয়েকজন ছাত্র "শুভকরী" নামে এক পত্রিকার প্রচার করেন।* বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি লোকের অনুরোধ-পরবশ হইয়া এই কাগজে বাল্যবিবাহের দোষ উল্লেখ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখেন। কাহারও কাহারও মতে "চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে লোকে যে জিহ্বা বিদ্ধ করে, পিঠ ফুঁড়িয়া চড়ক করিয়া থাকে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে যে গঙ্গায় অন্তর্জ্জলি করে, এই দ্বিবিধ প্রথার নিবারণার্থে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের সুলেখক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত গোস্বামীর প্রতি বিদ্যাসাগর ভার দিয়াছিলেন।" রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার গুণে "শুভকরী" কতকটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত মাধবচন্দ্র গোস্বামীর লিপি কৌশলেও উহার সুনাম হওয়া

* পুরাতন শুভকরী পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। চেষ্টা বিফল হইয়াছে। "উত্তরপাড়া" লাইব্রেরীতে "ফাইল" ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফাইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ১৩০১ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ এই সংবাদ দেন।

যে ঠিক সংবাদ, তাহা আমরা অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় শ্রদ্ধেয় ও বিশ্বস্ত লোকমুখে অবগত হইয়াছি। শুভকরীর অস্তিত্ব কিন্তু অল্প দিন মাত্র ছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, হিন্দু কলেজ হুগলী কলেজ এবং ঢাকা কলেজের সিনিয়ার ছাত্রদিগের বাঙ্গালা পাঠ্যের পরীক্ষক হন। রচনার প্রশ্ন ছিল, স্ত্রী-শিক্ষা হওয়া উচিত কি না। এই সূত্রে কলিকাতার বর্ত্তমান বালিকা বা মহিলা বিদ্যালয় বীটন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন্ সাহেবের সহিত তাঁহার সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়।*

যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের "হেড্ রাইটার," সেই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের "জুনিয়র" ও "সিনিয়র" বিভাগের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবার ভার প্রাপ্ত হন। এ কাজেও তাঁহাকে সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হইয়াছিল। তিনি এবং জর্ম্মাণ-পণ্ডিত ডাক্তার রোয়ার সাহেব উপরি-উক্ত দুই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত করিতেন। রোয়ার সাহেব † সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বটে ; কিন্তু, সংস্কৃত প্রশ্নপ্রণয়নে তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেকটা সাহায্য লইতে হইত। প্রশ্ন-সঙ্কলনের জন্য প্রকৃত পারিশ্রমিক না হউক, পুরস্কার স্বরূপ উভয়েই কিছু কিছু অর্থ পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী সৎকার্য্যে সে অর্থের ব্যয় করেন। সিনিয়র পরীক্ষায় রামকমল ভট্টাচার্য্য, কাব্যে ও অলঙ্কারে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পারিশ্রমিক প্রাপ্ত অর্থ হইতে তাঁহাকে সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। যে অর্থ অবশিষ্ট ছিল, তাহা দীনদরিদ্রে বিতরিত হইয়াছিল।

রামকমল ভট্টাচার্য্যকে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পুরস্কার দিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের (এডুকেশন কৌন্সিলের) কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি লইতে হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুমতি পাইবার জন্য কৌন্সিলে পত্র লিখিয়াছিলেন। কৌন্সিল ২ই ডিসেম্বর পত্র লিখিয়া সম্মতি প্রদান করেন। কৌন্সিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কাজটীকে তাঁহার বদান্যতার উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

১২৫৬ সালে ৩০শে কার্ত্তিক বা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ [সন্তান] পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কিছু-

*১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৬ সালে বীটন্ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নাম প্রথম ছিল হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়। প্রথমে ২৫ পঁচিশটী বালিকা লইয়া এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

† ইনি সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ ও ভাষা-পরিচ্ছেদ নামক ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছেন।

দিন পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবার ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার পঞ্চম সহোদর হরিশ্চন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বয়স তাঁহার আট বৎসর মাত্র। কলিকাতায় আসিবার কিয়দ্দিন পরে তাঁহার ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভ্রাতৃশোকে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কলিকাতায় আসিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবুর মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মাতাও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শোক কিছু শান্ত হইলে ৫/৬ পাঁচ ছয় মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় জননীকে বীরসিংহে পাঠাইয়া দেন। তিনি নিজে কিন্তু সহজে ও শীঘ্র ভ্রাতৃশোক ভুলিতে পারেন নাই। বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন। এই সময় তাঁহার মৃত ভ্রাতার কথা হৃদয়ে জাগরূক হইত। হরিশ্চন্দ্র এক দিন কোন বিবাহের বাজনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "দাদা! আমার বিয়ের সময় তোমায় এমনই বাজনা কর্‌তে হবে।" কনিষ্ঠের সেই সুধাবর্ষিণী সুমিষ্ট কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে শক্তিশেল সম বিদ্ধ হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাহিত্যাধ্যাপকতা, কৈফিয়ৎ, তর্কালঙ্কারের পত্র, রিপোর্ট ও জীবন-চরিত

১২৫৭ সালে ২৫শে অগ্রহায়ণ বা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর সোমবার বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকপদ প্রাপ্ত হন। এই পদের বেতন ছিল ৯০৲ নব্বুই টাকা। তিনি ৮ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের "হেড রাইটারী" পদ পরিত্যাগ করেন। শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মার্সেল সাহেবের অনুরোধে তিনি সংস্কৃত কলেজের পদগ্রহণে সম্মত হন। ইহার পূর্ব্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিতেন। তিনি মুরশিদাবাদের জজপণ্ডিত হওয়ায় এই পদ শূন্য হয়।* বিদ্যাসাগরের অনুরোধে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সোদরসম মিত্র রাজকৃষ্ণ বাবু ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের "হেড রাইটার" পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ বাবু জর্ডিন কোম্পানীর বাড়ীতে "খাজাঞ্চি" ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সাহিত্যধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "আমাকে যদি শীঘ্রই কলেজের

* "জজপাণ্ডিত" পদ প্রাপ্ত হইবার কয়েক মাস পর তর্কালঙ্কার মহাশয় ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে এ পদ গ্রহণ করিব।” শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মোয়েট সাহেব তাঁহার নিকট হইতে এই মর্ম্মে পত্র লিখাইয়া লয়েন।

“জজপণ্ডিতি” পদ প্রাপ্ত হইবার কয়েক মাস পর তর্কালঙ্কার মহাশয় ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শ্বশুরের জীবনীতে লিখিয়াছেন, “কলেজের অধ্যক্ষপদ তর্কালঙ্কার মহাশয়কেই দিবার প্রস্তাব হয়; তিনি তাহা স্বয়ং না লইয়া বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সেই পদে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন।” বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা অস্বীকার করেন। তিনি নিজ-পদ-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই,—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি নানা কারণ দর্শাইয়া প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমি বলিয়াছিলাম, ‘যদি শিক্ষা-সমাজ আমাকে প্রিন্‌সিপলের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি।’ তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অবস্থা ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা কার্য্য, সেক্রেটারী ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল। এই দুই পদ রহিত হইয়া প্রিন্‌সিপলের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্‌সিপল্ অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।*”

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবার জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যে অনুরোধ ছিল না, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহা

* বেতাল পঞ্চবিংশতির দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

স্পষ্টই বলিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদোন্নতি হইয়াছিল, তাহা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ পায়। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মনান্তর হয়, তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় দুঃখ করিয়া পরম মিত্র শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই উক্ত কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। পত্রখানি এই,—

"ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডিপুটি ম্যাজেষ্ট্রেটী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলই বিদ্যাসাগরের সহায়তাবলে হইয়াছে। এতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন, তবে আর আমার এই চাকুরী করার কাজ নাই, আমার এখনি ইহাতে ইস্তফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব; আমি এই সবডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহা অপরাধীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্ত্তিহীনচিত্তে কর্ম্ম-কাজ করিতেছি। অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথা-মুণ্ডু জানাইব, আমার বাল্যসহচর, এক-হৃদয়, অমায়িক সহোদরাধিক পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই। আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমার সকল জান, এই জন্যে তোমার নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।"

তর্কালঙ্কার মহোদয়ের জামাতা ও তদীয় চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই পত্রকে অপ্রামাণিক পত্র বলিয়াছেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, "এডুকেশন কৌন্সিলে"র সেক্রেটারী মৌয়েট্ সাহেবের নির্ব্বন্ধতাতিশয্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে" এই কথাই লিখিয়াছেল।

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক হইয়াই কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে "রিপোর্ট" লিখিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় মৌয়েট্ সাহেব কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সময় সংস্কৃত কলেজের অচির-অস্তিত্বলোপের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এইরূপ আশঙ্কার কারণও ছিল। সংস্কৃত কলেজে পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্র ভর্ত্তি হইত না। ক্রমেই ছাত্রসংখ্যা কম হইয়া আসিতে ছিল। ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের বলবৎ কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের পাঠসমাপনে অনেক সময় লাগিত; পরন্তু সেই সময় ইংরেজি-বিদ্যার বেগও অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত

ইংরেজি বিদ্যার প্রসার বাড়াইবার জন্য তখন শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষেরাও অধিকতর যত্নশীল হইয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে "এডুকেশন কৌন্সিলে"র উপর শিক্ষা-বিভাগের ভার পড়িয়াছিল। কৌন্সিল উচ্চশ্রেণী ইংরেজি ও বাঙ্গালা শিক্ষার উৎকর্ষসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এতদর্থে তাঁহারা পরীক্ষা ও বৃত্তির যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহারা বেশ কৃতকার্য্য হইত, তাহাদিগের সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবারও বেশ সুবিধা হইত। ইংরেজি শিক্ষার জন্য পাঠ্যনির্দ্ধারণ, পরীক্ষা-গ্রহণ, শিক্ষক নিয়োজন প্রভৃতি কার্য্যে কৌন্সিল কোনরূপ ক্রটি করিতেন না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৮টী স্কুল ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কৌন্সিলের যত্নে ও চেষ্টায় ১৫১টী হইয়াছিল। ছাত্র ছিল, ৪,৬৩২টী ; হইয়াছিল ১৩,১৬৩টী। শিক্ষক ছিল, ১৯১টী ; হইয়াছিল ৪৫টী। যাহারা ভাল ইংরেজি লেখা পড়া শিখিত তাহারা সহজেই চাকুরী পাইত। ইংরেজি বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা হইয়াছিল ; সংস্কৃত বিদ্যা তো আর তাহা ছিল না ; পরন্তু সংস্কৃত পাঠ সমাপনে অনেক সময় লাগিত। কাজেই সংস্কৃত পড়িবার প্রবৃত্তিও লোকের কম হইয়াছিল। ক্রমেই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র কমিতে আরম্ভ হয়। এই জন্য কৌন্সিলের কর্তৃপক্ষরা সংস্কৃত কলেজের লোপাকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহারা সংস্কৃত কলেজটী উঠাইয়া দিবারও একরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তবে কলেজটী একেবারে না উঠাইয়া কোনরূপ ইহার সংস্কার হইতে পারে কি না, ইহাও তাহাদের আলোচ্য হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, কলেজের শিক্ষা-প্রণালী কোনরূপে সহজ করিতে পারিলে ও, কোনরূপে ইহাতে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করিতে পারিলে, অনেকের সংস্কৃত কলেজে পড়িবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। এই সব ভাবিয়া, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইহার একটী রিপোর্ট লিখিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে দক্ষ, তাঁহাদের এইরূপই ধারণা ছিল।

কৌন্সিলের কর্তৃপক্ষ কি অভিপ্রায়ে রিপোর্ট লিখিতে বলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কি উপায়ে সংস্কৃত কলেজে সহজ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। সহজ প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে না পারিলে যে সংস্কৃত কলেজ থাকা ভার হইবে, তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই সহজ প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া, কৌন্সিলের অনুমত্যানুসারে তিনি প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন। এইখানে বাঙ্গালায় তাহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিলাম।

এফ. জে. মৌয়েট্,

কৌন্সিল অব্ এডুকেশন, (শিক্ষা-সমিতির) সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, কৌন্সিল অব্ এডুকেশনের অবগতির জন্য আমি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট দিতেছি।

ব্যাকরণ বিভাগ

বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগ পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুইটী মাত্র ব্যাকরণের শ্রেণী ছিল। একটী মুগ্ধবোধ শ্রেণী ও অপরটী পাণিনি। দ্বিতীয় মুগ্ধবোধ বানান শ্রেণী ১৮২৫ খৃঃ জানুয়ারি মাসে খোলা হয়। তৃতীয়টী ১৮২৫ খৃঃ নবেম্বর, চতুর্থটী ১৮৪৬ খৃঃ মে, পঞ্চমটী ১৮৪৭ খৃঃ জানুয়ারি। পাণিনি শ্রেণী ১৮২৮ খৃঃ উঠিয়া যায়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পঠিত হইয়া থাকে। মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ ও ভট্টিকাব্য। পঞ্চম শ্রেণীতে মুগ্ধবোধের ১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পঠিত হয়। চতুর্থ শ্রেণীতে উক্ত পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে ১০০ শত পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উক্ত পুস্তকের অবশিষ্ঠ ৯১ পৃষ্ঠা ও ধাতুপাঠ। প্রথম শ্রেণীতে ভট্টিকাব্যের কয়েক সর্গ ও অমরকোষের কিয়দংশ অধীত হয়। এই বিভাগে অধ্যয়ন করিতে চারি বৎসর কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত পঞ্চ বিভাগে অধ্যয়ন করিতে হইলে পাঁচ বৎসর সময় অতিবাহিত করা প্রয়োজনীয় বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রণালীর অভাবে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বালকেরা এই বিভাগে পাঠকালে যে সময় অতিবাহিত করে, সময়ের সহিত তুলনা করিলে, তাহাদিগের শিক্ষা যৎসামান্য বলিতে হইবে। মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। ইহার প্রণেতা বোপদেব, সংক্ষিপ্ততার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় থাকাতে তিনি তাঁহার পুস্তককে অতিশয় দুরূহ করিয়াছেন। একে সংস্কৃত ভাষা অতিশয় কঠিন, তাহাতে একখানি দুরূহ ব্যাকরণ সহকারে ইহার শিক্ষা সুরু করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এতাদৃশ ব্যাকরণে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে যেরূপ কষ্টে পতিত হইতে হয়, তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সুকুমারমতি বালকবৃন্দ সংস্কৃত শিক্ষার আরম্ভকালে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কাঠিন্যপ্রযুক্ত তাহাদিগের শিক্ষকগণের উচ্চারিত কথাগুলি কেবল মুখস্ত করিয়া রাখে। তাহারা যে পুস্তক পাঠ করে, তাহার বিন্দুবিসর্গও নিজে নিজে বুঝিতে পারে না। এরূপে কেবল ব্যাকরণ অধ্যয়নেই পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয়। কিন্তু ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশাধিকার জন্মে না। ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর যে, এক ব্যক্তি ক্রমাগত ভাষাশিক্ষায়

পাঁচ বৎসর কাল ব্যয় করিল, অথচ তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে সমর্থ হইল না। বিশেষতঃ মুগ্ধবোধের বৃহদাকার টীকা টিপ্পনি সত্ত্বেও উহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। সুতরাং বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের প্রথম পাঁচ বৎসর বৃথা ব্যয় হয়। তাহার সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্টের ফল এইমাত্র হয় যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাহার অধীত-বিদ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এই বিভাগে ধাতুপাঠ নামে যে অপর পুস্তক অধীত হয়, তাহার ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত ধাতুসংগ্রহমাত্র। অমরকোষ একখানি ছন্দোনিবন্ধ অভিধান। আমি স্বীকার করি যে, এই দুই গ্রন্থ সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইলে সাহিত্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন-কালে কিছু সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয় মুখস্ত করিতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার তুলনায় প্রাপ্ত উপকার অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ প্রচলিত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের ভূষণস্বরূপ, প্রায়ই প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যায় অলঙ্কৃত; সুতরাং উক্ত পুস্তকদ্বয়ের অধ্যয়ন নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়।

এস্থলে ইহার উল্লেখ আবশ্যক যে, উপরোক্ত টীকাকার তাঁহার অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় নহেন। তাঁহারা গ্রন্থের দুরূহ অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল অংশগুলি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই সকল বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ প্রতীতি হইবে যে, মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও অমরকোষ পাঠে পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই বিভাগে অপর পাঠ্যপুস্তক ভট্টিকাব্য। ইহা রাম ও তাঁহার কার্য্য-কলাপ সমন্বিত একখানি পদ্যগ্রন্থ। এই পুস্তকখানি ব্যাকরণশাস্ত্রের সূত্রসকলের উদাহরণ প্রদর্শনাভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যাকরণ-বিভাগের নিতান্ত অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না।

এক্ষণে ব্যাকরণবিভাগে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি। আমার সামান্য বিবেচনায় ইহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, যে চারি বৎসর ব্যাকরণ বিভাগে অতিবাহিত করা নির্দ্ধারিত আছে, উক্ত সময়ের মধ্যে যে ছাত্রেরা কেবল ব্যাকরণেই পারদর্শিতা লাভ করিবে, তাহা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সাহিত্যেও কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তাহারা সাহিত্য বিভাগে যে ক্লেশ অনুভব করে, তাহাদিগকে আদৌ তাহা করিতে হইবে না। একখানি অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ অধ্যয়নানন্তর তাহাদিগকে সাহিত্যবিভাগে প্রবেশ করিতে হয় এবং ভাষায় তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান জন্মে না।

আমি যে প্রণালী প্রচলনের পক্ষপাতী, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ পাঠ করিবার পরিবর্ত্তে এদেশীয় ভাষায় রচিত ব্যাকরণের প্রধান প্রধান নিয়ম ও সূত্রগুলি পাঠ করিবে। তৎপরে তাহারা দুই কিংবা তিনখানি সংস্কৃত পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে। এই সকল গ্রন্থে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ হইতে বালকদিগের পাঠোপযোগী উদ্ধৃত অংশ থাকিবে। এই সমস্ত পাঠে ছাত্রদিগের দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইবে। তৎপরে তাহারা সিদ্ধান্ত-কৌমুদী আরম্ভ করিবে ও তাহা ব্যাকরণ-বিভাগে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে। সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে এইখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও ব্যাকরণশাস্ত্রে একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা যেরূপ সম্পূর্ণ, তাদৃশ সরল। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা রঘুবংশ ও ভট্টিকাব্য হইতে উদ্ধৃত অংশ ও দশকুমার চরিত পাঠ করিবে। আমার প্রস্তাব এই যে, পাঁচটী শ্রেণীর পরিবর্ত্তে চারিটীমাত্র শ্রেণী থাকিবে ও পঞ্চবটী চতুর্থ শ্রেণীর একটী বিভাগ বলিয়া গণ্য হইবে। উভয় বিভাগেই একই পুস্তক অধীত হইবে। এই বন্দোবস্ত দ্বারা একটী বৎসর বাঁচিয়া যাইবে এবং ব্যাকরণ বিভাগে পাঁচ বৎসরের পরিবর্ত্তে চারি বৎসর নির্দ্ধারিত হইবে।

সাহিত্য-বিভাগ

ব্যাকরণ বিভাগ হইতে ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে উন্নীত হইলে তাহাদিগকে এখানে দুই বৎসর কাল পাঠ করিতে হয়। তাহারা এখানে নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি অধ্যয়ন করে। (১) রঘুবংশ, (২) কুমারসম্ভব, (৩) মেঘদূত, (৪) কিরাতার্জ্জুনীয়, (৫) শিশুপালবধ, (৬) নৈষধ-চরিত (৭) শকুন্তলা, (৮) বিক্রমোর্ব্বশী, (৯) রত্নাবলী. (১০) মুদ্রারাক্ষস, (১১) উত্তর-চরিত, (১২) দশকুমার-চরিত ও (১৩) কাদম্বরী।

তাহারা এখানে বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত ও সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে অভ্যাস করে ও গণিত শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। উপরোক্ত ত্রয়োদশখানি পুস্তকের মধ্যে ছয়খানি প্রসিদ্ধ পদ্য-গ্রন্থ। সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ নাটক ; অবশিষ্ট দুখানি গদ্য। রঘুবংশ একখানি ঐতিহাসিক পদ্য-গ্রন্থ ও উনবিংশ সর্গে বিভক্ত। রামচন্দ্র, তাঁহার উপরিতন তিন পুরুষ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণের কার্য্যকলাপ রঘুবংশের বর্ণিত বিষয়। ইহাতে রাজা অগ্নিবর্ণের বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

"কুমারসম্ভব" এই নামকরণেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত ইহার বর্ণিত বিষয়। কিন্তু ইহার প্রচলিত সাতসর্গ পাঠে দৃষ্ট হইবে যে, ইহাতে বর্ণিত বিষয়ের কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্ত্তিকেয়ের মাতা পার্ব্বতীর জন্ম, শিব কর্ত্তৃক কামদেব ভস্ম, পার্ব্বতীর তপস্যা ও তাঁহার সহিত শিবের বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারও ইহাতে বর্ণিত আছে।

মেঘদূত ১১৮ শ্লোকে রচিত একখানি পদ্য গ্রন্থ। কোন যক্ষ তাঁহার প্রভু ধনাধিপতি কুবেরের কোনও কারণে ক্রোধভাজন হওয়াতে তাহার প্রভু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, সুদূরবর্ত্তী প্রদেশে প্রিয়াবিরহিত হইয়া, পূর্ণ এক বৎসরকাল বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রণয়ী যক্ষ এই বিপৎপাতে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, নিজ প্রিয়ার নিকট তাঁহার বার্ত্তাবহনের জন্য একখণ্ড মেঘকে কুবেরের রাজধানী অলকা-নগরীতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী দুইখানি নাটক। প্রথমখানি কণ্বঋষি প্রতিপালিতা শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপার অবলম্বনে লিখিত ; দ্বিতীয়খানি রাজা পুরু ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত-ঘটিত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অমরকবি কালিদাসের রসময়ী লেখনী-প্রসূত। প্রত্যেক গ্রন্থে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় দেদীপ্যমান আছে। শিশুপালবধ কিরাতার্জ্জুনীয় ও নৈষধ-চরিত বীররসপ্রধান কাব্য। প্রথমখানি মহাকবি মাঘ-রচিত ও বিংশ সর্গে বিভক্ত। দ্বিতীয়, কবি ভারবি-রচিত ও সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তৃতীয়খানি শ্রীহর্ষ-রচিত ও দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শিশুপালের মৃত্যু কবি মাঘের পদ্য-গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়। কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থের বর্ণিত-বিষয়, অর্জ্জুনের তপস্যা। ছদ্মবেশধারী কিরাতরূপী শিবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ও অবশেষে তাঁহার বীরত্বের পারিতোষিক স্বরূপ মহাদেবের নিকট হইতে তাঁহার পাশুপত অস্ত্রলাভ। রাজা নলের কার্য্য-কলাপ নৈষধ-চরিতের বর্ণিত বিষয়। উপরোক্ত প্রথম দুইখানি পুস্তকে উৎকৃষ্ট বীররসাত্মক কাব্যের সমস্ত গুণ লক্ষিত হয়। কেবল মধ্যে মধ্যে ক্লেশকর দুই একটী স্থান দৃষ্ট হয়। শিশুপাল-বধের সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ সর্গ উন্নত ভাবগর্ভ কবিতায় পরিপূর্ণ ; কিন্তু উহাতে ও কিরাতার্জ্জুনীয়ের স্থানে স্থানে অশ্লীল শ্লোক দৃষ্ট হয়। নৈষধ-চরিত আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শব্দাডম্বর ও অত্যুক্তি বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বা প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে শ্লোকসকল সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ। ভবভূতি-প্রণীত উত্তরচরিত একখানি নাটকবিশেষ। ইহাতে রামচন্দ্রের জীবনের শেষ অংশ বর্ণিত আছে। রত্নাবলী একখানি নাটক। দক্ষ ইহার গ্রন্থকর্ত্তা।

রাজা শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক অর্থদানে পুরস্কৃত হইয়া তিনি উক্ত পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন, তিনি ঐরূপ আর একখানি রচনা করিয়া উভয় পুস্তক রাজা শ্রীহর্ষ রচিত বলিয়া প্রচারিত করেন। রাজা উদয়ন ও রত্নাবলী-ঘটিত প্রণয়-কাহিনী অবলম্বনে উক্ত নাটকখানি রচিত। এই উভয় পুস্তক সর্ব্ববিধায়ে অতি উৎকৃষ্ট। বিশাখদত্ত-প্রণীত মুদ্রারাক্ষস একখানি রাজনৈতিক নাটক নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে,গ্রীকদিগের বর্ণিত চান্দ্রকোটাসের (চন্দ্রগুপ্তের) প্রধান মন্ত্রী চাণক্য স্বীয় প্রভুর নূতন অধিকৃত রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য কুটনীতিপূর্ণ কৌশলপ্রয়োগ দ্বারা নন্দবংশোদ্ভব শেষ রাজার প্রভুভক্ত প্রধান মন্ত্রী রাক্ষসের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। ইহাও একখানি সুকৌশলসম্পন্ন সুন্দর গ্রন্থ। দশকুমারচরিত ও কাদম্বরী গদ্য গ্রন্থ। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কতকগুলি বন্ধু নিজ নিজ ইতিহাস বর্ণনা করিতেছে। ভাষা বিশুদ্ধ ও সুন্দর ; কিন্তু ইহাতে স্থানে স্থানে দোষপূর্ণ অংশ আছে। দণ্ডী ইহার গ্রন্থকর্ত্তা। কাদম্বরী একখানি উপন্যাস বা গদ্য-রসাত্মক কাব্য। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ সংস্কৃত রচনার একখানি আদর্শ-গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা বাণভট্ট এই সর্ব্বজন প্রশংসনীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। পুত্রের রচনা পিতার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্ট। এ সম্বন্ধে আর অধিক বক্তব্যের প্রয়োজন নাই।

গণিত-শিক্ষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য, জ্যোতিষ শিক্ষা-প্রকরণে প্রকাশ করিব।

আমি যে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করি, তাহা এই। ব্যাকরণ-বিভাগ-সংক্রান্ত রিপোর্টে আমি উল্লেখ করিয়াছি,রঘুবংশ প্রথম ব্যাকরণ শ্রেণীতে অধীত হউক ও দশকুমারচরিতের উদ্ধৃত অংশ-সকল অপর একটী ব্যাকরণবিভাগে পঠিত হউক এবং শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয় ও নৈষধ-চরিতে অনেক অশ্লীল শ্লোক থাকা-প্রযুক্ত সমস্ত পঠিত হইবার পরিবর্ত্তে উহার উদ্ধৃত অংশসমূহ পঠিত হউক। কাদম্বরীর পূর্ব্বভাগ পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হউক। অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থ সমস্তই পঠিত হউক। আমি ইহাও প্রস্তাব করিতেছি যে, বীরচরিত ও শান্তিশতক— এই শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হউক। বীরচরিত ও উত্তরচরিত একখানি নাটকরূপে পরিগণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বীরচরিত পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরচরিত অপরার্দ্ধ। বীরচরিতও উত্তরচরিত অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। শান্তিশতক একখানি সুন্দর নীতিপূর্ণ পদ্য-গ্রন্থ। ছাত্রেরা এ সময় অনুবাদ ও সংস্কৃত বঙ্গভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিত অভ্যাস করিবে।

অলঙ্কার শ্রেণী

সাহিত্যচর্চ্চার পর ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে আসে ও এখানে দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করে। তাহারা এই শ্রেণীতে অলঙ্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করে।

(১) সাহিত্য-দর্পণ (২) কাব্য-প্রকাশ (৩) কাব্য-দর্শন (৪) রসগঙ্গাধর।

সাহিত্য-শ্রেণীতে যে সমস্ত পদ্য-গ্রন্থ পাঠ করিবার তাহাদিগের অবসর থাকে, এস্থলে তাহারা সেই পদ্য-গ্রন্থসমূহ পাঠ করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে অনুবাদ ও রচনা শিক্ষা করিতে হয়। তাহাদিগকে আবার গণিতশ্রেণীতে গমন করিতে হয়। এই গণিত শ্রেণীসম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। অলঙ্কার সম্বন্ধে কাব্য-প্রকাশ ও দশরূপক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কিন্তু সচরাচর সাহিত্য-দর্পণই পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি নিম্নলিখিত কারণে কাব্য-প্রকাশ ও দশরূপক গ্রন্থদ্বয়কে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করি।

কাব্য-প্রকাশ, সাহিত্য-দর্পণ অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ গ্রন্থ। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ে ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মল্লিনাথের ন্যায় উৎকৃষ্ট টীকাকারগণ তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় পুনঃ পুনঃ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কাব্য-প্রকাশে নাটকরচনা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। দশরূপকে অলঙ্কারশাস্ত্রের উক্ত বিভাগে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ নিজ বিভাগে ইহাঅতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। সাহিত্য-দর্পণ অপেক্ষা কাব্য-প্রকাশ ও দশরূপক, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পঠিত হইতে পারে। তন্নিমিত্ত কাব্য-প্রকাশ ও দশরূপক, সাহিত্য-দর্পণের স্থান অধিকার করিতে পারে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিবার পরে অপরটী অধ্যয়ন করা কেবল সময় নষ্ট মাত্র। যদি ব্যাকরণ শ্রেণী-সংক্রান্ত আমার বক্তব্যগুলি গৃহীত হয়, তবে অলঙ্কার শ্রেণীতে কেবল সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠের আবশ্যকতা থাকে না। এ কারণে যে সময় উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা গণিত ও অন্যান্য বিষয়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার উল্লেখ পরে করিব।*

জ্যোতিষ ও গণিত শ্রেণী

সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রেরা এই শ্রেণীতেও অধ্যয়ন করে। এখানে তাহারা লীলাবতী ও বীজগণিত পাঠ করে। লীলাবতী ভাস্করাচার্য্য প্রণীত

* পূর্ব্বে এই অলঙ্কার শ্রেণীতে এক বৎসর পড়িতে হইত। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ২৮শে নভেম্বর দুই বৎসর পড়িবার নিয়ম হয়।

একখানি অঙ্ক ও পরিমিতি-বিষয়ক গ্রন্থ। বীজগণিত উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। উভয় গ্রন্থই অতি সংক্ষিপ্ত। পুস্তকদ্বয়ে কোন প্রকার শৃঙ্খলা নাই ও ইংলণ্ডীয় ভাষায় রচিত তৎসদৃশ পুস্তকের ন্যায় উহাতে কিছুই নাই। তাহা অকারণে অতিশয় কঠিন করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রশ্নাবলী ছন্দে নিবদ্ধ। এই দুইখানি পুস্তক শিক্ষা করিতে ছাত্রগণের দুই বৎসর লাগে। অধ্যয়ন বিভাগের এই স্থানে সবিশেষ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে অঙ্ক, বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে পুস্তকাদি সংগ্রহ হওয়া উচিত। এই সকল পুস্তক অধ্যয়নের পর বালকেরা অতি সহজে লীলাবতী ও বীজগণিত পুস্তক শিক্ষা করিতে পারিবে। গণিতবিদ্যার উচ্চ শাখসমূহ অনুবাদিত ও পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত। মার্সেল সাহেব কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রের ন্যায় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত ও গণিত শ্রেণীতে তাহার পঠনা হওয়া আবশ্যক। ঐ সমস্ত পুস্তক ইংরেজি ভাষাতেই পাঠ্য হইতে পারে; কিন্তু বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইলে, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বিশেষ উপযোগী হইবে। সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্যতীত স্মৃতি ও ন্যায় শ্রেণীর ছাত্রদিগেরও গণিতাধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ করা উচিত। এস্থলে সংস্কৃত কলেজের নিম্নশ্রেণী কাব্যের শেষ হইল, ইহা বিবেচিত হইতে পারে। এই বিভাগের শ্রেণীসমূহে মনোহর অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়সংবলিত বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তক সকল অধীত হইবার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি; সুতরাং এই প্রস্তাব করি যে উক্ত পুস্তকসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট থাকে।

ব্যাকরণের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য—পশু সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য—রুডিমেণ্টস্ অব্ নলেজ ও চেম্বার্স সাহেব-কৃত গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য—চেম্বার্স সাহেব-কৃত মরাল ক্লাস বুক।

প্রথম শ্রেণীর জন্য—বিবিধ বিষয়। যথা—মুদ্রাঙ্কণ, চুম্বকাকর্ষণ, নৌ-বিদ্যা, ভূমিকম্প, পিড়ামিড, চীনদেশীয় প্রাচীর, মধুমক্ষিক ইত্যাদি।

সাহিত্য শ্রেণীর জন্য—চেম্বার্স সাহেব-কৃত জীবনচরিত ও অন্যান্য মনোহর ও প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ। যথা—টেলিমেক্স, রাসেলাস্, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনুবাদসমূহ।

অলঙ্কার শ্রেণীর জন্য—নৈতিক, রাজনীতিক ও সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকাবলী ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকাদি।

যদি এডুকেশন কৌন্সিলের অধ্যক্ষ এই সকল ভাষায় রচিত গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক-রূপে নির্দ্দিষ্ট করেন, তবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা অল্পায়াসে বঙ্গভাষায় সুন্দর

পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে ও ইংরেজি ভাষাশিক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে ও চিত্তবৃত্তির বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে। বোধোদয় ও নীতিবোধ মুদ্রিত হইতেছে এবং অন্যান্য পুস্তকগুলি প্রস্তুত হইতেছে। এই সমস্ত পুস্তক প্রচলনের জন্য কৌন্সিলকে কোন অতিরিক্ত ব্যয় গ্রহণ করিতে হইবে না। এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সঙ্কলনগুলি প্রস্তুত করিতে কোন আর্থিক আনুকূল্যের প্রয়োজন হইবে না।

সংস্কৃত কলেজের গণিত-শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাবলী। যথা,—অঙ্কবিদ্যা, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্র। এই সকল গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য কৌন্সিল অব্ এডুকেশনের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক ও কৌন্সিলের সঞ্চিত অর্থ হইতে এ বিষয়ে সহজেই সাহায্য করা যাইতে পারে।

স্মৃতি বা আইন শ্রেণী

অলঙ্কার শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে উন্নীত হয় ও এখানে তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করে। পাঠ্যপুস্তকগুলি এই,—মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা দ্বিতীয় অধ্যায়, বিবাদচিন্তামণি, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। হিন্দু আইন সম্বন্ধে মনুসংহিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে সামাজিক, নৈতিক, রাজনীতিক, ধর্ম্মসংক্রান্ত ও অর্থশাস্ত্রবিষয়ক নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট আছে। প্রাচীনকালের আদর্শ হিন্দু-সমাজের বিষয় ইহাতে বর্ণিত আছে। বিজ্ঞানেশ্বর-রচিত মিতাক্ষরা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত গ্রন্থের টীকা মাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায়সম্বন্ধীয় আইন-কানুন বিবৃত আছে। পশ্চিমোত্তরাঞ্চলে মিতাক্ষরা একখানি সর্ব্ব-সম্মত প্রমাণ-গ্রন্থ।

বিবাদ-চিন্তামণি বাচস্পতিমিশ্র-প্রণীত। ইহাতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধি বিবৃত। বিহারে ইহা প্রমাণ-গ্রন্থ। জীমূত-বাহন দায়ভাগের প্রণেতা উত্তরাধিকারিত্ব ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা বাঙ্গালায় সর্ব্বসম্মত প্রমাণ-গ্রন্থ। পোষ্যপুত্র-গ্রহণ ও তাহাদের দেওয়ানি অধিকার বিষয় লইয়া দত্তক-মীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা। মীমাংসা পশ্চিমোত্তরাঞ্চলে এবং চন্দ্রিকা বাঙ্গালায় প্রমাণ-গ্রন্থ।

দায়-তত্ত্ব, ব্যবহার-তত্ত্ব এবং অন্যান্য বিষয়ক ছাব্বিশখানি গ্রন্থ লইয়া অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব। ইহা রঘুনন্দন-প্রণীত, প্রথমোক্তখানি দায়সম্বন্ধে, দ্বিতীয়খানি

আদালতের কার্য্যবিধি সম্বন্ধে। অন্য ছাব্বিশখানি ধর্ম্মানুষ্ঠানসংক্রান্ত। এই শ্রেণীসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অধ্যাপনা বন্ধ হওয়া উচিত। ইহা যাজন-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদিগের শিক্ষোপযোগী। এরূপ গ্রন্থাদি বিদ্যালয়ে অধীত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অপর পুস্তকগুলি পাঠে কোন প্রতিবন্ধক নাই ও প্রচলিত থাকিতে পারে। উক্ত গ্রন্থাদির অনুশীলনে ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় প্রদেশের হিন্দু আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে।

ন্যায় শ্রেণী

তর্কশাস্ত্র ও দর্শন-বিদ্যাঘটিত ব্যাপার লইয়াই ন্যায়শাস্ত্র। মধ্যে মধ্যে রসায়ন, দৃষ্টিবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। মীমাংসা ও পাতঞ্জল ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রসম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। মীমাংসা ও পাতঞ্জলে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তার বিষয় উল্লিখিত আছে। চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হয়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট—ভাষা-পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্যায়সূত্র, কুসুমাঞ্জলি, অনুমান-চিন্তামণি, দীধিতি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, পরিভাষা, তত্ত্ব-কৌমুদী, খণ্ডনা ও তত্ত্ববিবেক। ভাষা-পরিচ্ছেদ শ্রীবিশ্বনাথ-পঞ্চানন-প্রণীত। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের সকল শাখাসম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থকার স্বরচিত ভাষাপরিচ্ছেদ সম্বন্ধে একখানি টীকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহার নাম সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। ন্যায়সূত্র গৌতমঋষি-প্রণীত। কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল সংক্রান্ত বিষয় উল্লিখিত আছে। ইহাতে যে তর্কপ্রণালী অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ আধুনিক ইউরোপীয়গণের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে অবলম্বিত তর্কপ্রণালী তুল্য। ইহার গ্রন্থ-কর্ত্তার নাম উদয়নাচার্য্য। অনুমানচিন্তামণি বর্ত্তমান ন্যায়শাস্ত্রসম্প্রদায়সম্মত একখানি উপপত্তি-(Deduction) বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার গ্রন্থকর্ত্তার নাম গঙ্গেশ উপাধ্যায়। ইউরোপের মধ্যযুগের পণ্ডিতদিগের অবলম্বিত বিচারপ্রণালী সদৃশ এই গ্রন্থকর্ত্তার বিচারপ্রণালী। যাহাকে বেকন "বিদ্যার উর্ণনাভ জাল" বলিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থ সেইরূপ।

এই গ্রন্থের অধ্যয়নকালে বিস্তর কষ্ট অনুভব করিতে হয়। বর্ত্তমান ন্যায়-সম্প্রদায়ের অধিনায়ক রঘুনাথ শিরোমণি-প্রণীত অনুমানদীধিতি নামে ইহার একখানি টীকা আছে। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা বাক্যের অর্থসংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ। ধর্ম্মরাজ-প্রণীত "পরিভাষা" গ্রন্থখানি বৈদান্তিক মতের সমর্থনকারী। বাচস্পতি মিশ্র-প্রণীত তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থখানি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে একখানি বিস্তীর্ণ

পুস্তক। শ্রীহর্ষ-প্রণীত গ্রন্থের নাম খণ্ডনা। গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, অন্যান্য সমুদয় দর্শনসম্প্রদায়ের মতগুলি খণ্ডন করিয়া নিজের প্রিয় বৈদান্তিক মতের প্রতিষ্ঠা করা। গ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণিত-বিষয় অতি দুর্ব্বোধ ভাষায় অবতারণা করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য-প্রণীত তত্ত্ব-বিবেকে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তর্কসকল উত্থাপিত ও সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন স্বষ্টিকর্ত্তার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা যেরূপ দুরূহ, তেমনই অসংলগ্ন।

এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, উক্ত শ্রেণীকে ন্যায়-শ্রেণী নামে অভিহিত না করিয়া, দর্শন-শ্রেণী নামে অভিহিত করা উচিত। অনুমান-চিন্তামণি, দীধিতি, খণ্ডনা ও তত্ত্ববিবেকের অধ্যাপনা বন্ধ হউক ও তাহার পরিবর্ত্তে মীমাংসা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান-সম্বলিত নিম্নলিখিত দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি অধীত হউক,—

(১) সাঙ্খ্য প্রবচন (২) পাতঞ্জলসূত্র (৩) পঞ্চদশী (৪) সর্ব্বসারসংগ্রহ।

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার কাল পনের বৎসর মাত্র। তাহাতে এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে একব্যক্তি এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যায় উত্তম পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, কেহই সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা অতি সত্য কথা যে, হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত আধুনিক সময়ের উন্নত চিন্তার সৌসাদৃশ্য অল্পই লক্ষিত হয়। তথাপি ইহা কখনই অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, একজন সংস্কৃতাভিজ্ঞের পক্ষে উক্ত দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ইংরেজি বিভাগ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলি রিপোর্টের স্থানান্তরে উল্লেখ করিব। যদি কৌন্সিল অব্‌ এডুকেশন আমার মন্তব্যগুলি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা দর্শন শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের শিক্ষিত ইংরেজি ভাষাজ্ঞান অনায়াসেই, তাহাদিগকে ইউরোপখণ্ডের দর্শনশাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ প্রণিধান করিতে সমর্থ করিবে। তাহারা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তাহাদিগের স্বদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের তুলনা করিতে সহজেই পারগ হইবে। যুবকেরা এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত হইলে সহজেই প্রাচীন হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে ; কিন্তু যদি তাহাদিগকে হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান ইউরোপীয়-দিগের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, তবে উপরোক্ত সুবিধা তাহাদিগের কখনই ঘটিয়া উঠিবে না। ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা সহজেই অনুভব করিতে পারিবে যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ

পরস্পরের ভ্রমপ্রমাদাদি প্রদর্শন করিবার ত্রুটী করেন নাই। ছাত্রের পক্ষে এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া তথ্য নির্ণয় করিবার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। তাহার ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রজ্ঞান, বিভিন্ন দর্শন-সম্প্রদায়ের দোষগুণ বিচারের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক হইবে।

ইংরেজি বিভাগ*

যে পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগটী অধুনা গঠিত, তাহা অতীব অসন্তোষকর। এ বিভাগে কি শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা ছাত্রের ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা সে তাহার পাঠ আরম্ভ করে ও ইচ্ছানুসারে তাহা পরিত্যাগ করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পরেই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু একেবারে দুইটী নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্রই, হয় ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করে; প্রায়ই পরীক্ষার পূর্ব্বে অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজি বিভাগ হইতে পলাইয়া আইসে। সেই ছাত্রেরাই আবার পর বৎসরের আরম্ভে ভর্ত্তি হইতে আইসে। অন্য একটী কারণে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

একটী ইংরেজি বিভাগের শ্রেণীতে অনেক সংস্কৃত বিভাগের শ্রেণীর ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের বিষয় দেখা যাউক। তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রয়োদশটী ছাত্র পাঠ করে। তন্মধ্যে চারিটী স্মৃতি শ্রেণীর ছাত্র, একটী ন্যায় শ্রেণীর একটী অলঙ্কার শ্রেণীর, তৃতীয় ব্যাকরণ শ্রেণীর তিনটী ও অবশিষ্ট চারিটী চতুর্থ ব্যাকরণ শ্রেণীর ছাত্র। চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৩টী বালক অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে ২টী অলঙ্কার শ্রেণীর, ৫টী সাহিত্য শ্রেণীর, ২টী প্রথম ব্যাকরণ শ্রেণীর, ৬টী দ্বিতীয়, ১০টী তৃতীয়, ৬টী চতুর্থ এবং ২টী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

বিভিন্ন সংস্কৃত শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা ইংরেজি-বিভাগে পাঠ করিতে আইসে। ইহাতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় যে, ছাত্রগণ উক্ত সংস্কৃত শ্রেণীতে নিয়মমত উপস্থিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ ইংরেজি শিক্ষা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং সংস্কৃত শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই ইংরেজি বিভাগে অধ্যয়ন করে।

* ইংরেজি বিভাগ প্রথমতঃ ১৮২৭ খৃঃ স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ নভেম্বর মাসে সাধারণ শিক্ষার জেনারেল-কমিটীর আদেশানুসারে ইহা উঠিয়া যায়। পুনরায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উক্ত কমিটীর আদেশানুসারে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ছাত্রগণ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা উভয়বিধ শিক্ষায় এক সময়ে মনোযোগ দিতে অক্ষম ; সুতরাং শিক্ষাবিষয়ে তাহাদিগের তাদৃশ উন্নতি দৃষ্ট হয় না।

যদি ইংরেজি বিভাগ বর্ত্তমান নিয়মে পরিচালিত হয়, তবে ইহার ফল যে নিতান্তই অসন্তোষজনক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইংরেজি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ঈদৃশ নিয়মে পরিচালিত হওয়াতেই উহা নিতান্ত মন্দ ফল উৎপন্ন করে ও অবশেষে সাধারণ শিক্ষার জেনারেল কমিটির আদেশে একেবারে উঠিয়া যায়। যদি অপেক্ষাকৃত সুবন্দোবস্ত না করা হয়, তবে পূর্ব্বের ন্যায় ইহা হইতে মন্দ ফল ফলিবে। তজ্জন্য আমি যে কয়েকটী বন্দোবস্তের অবতারণা করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে নিশ্চয়ই সুফল উৎপন্ন হইবে। আমার মন্তব্যগুলি এই—

ছাত্রেরা সংস্কৃতভাষায় কিছু পারদর্শিতা না দেখাইতে পারিলে তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা আরম্ভ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সংস্কৃত শ্রেণীর ছাত্রেরা সেই সঙ্গে তাহাদিগের নিজের শ্রেণীতে ইংরেজি ভাষাও শিক্ষা করিবে। ইংরেজি শিক্ষা ইচ্ছাধীন না হইয়া অন্যান্য পাঠের ন্যায় অবশ্যপাঠ্য হইবে। কোন ছাত্র যদি ইংরেজি শিক্ষা করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রদর্শন করে, তবে তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলবান্ হইবে যে, পরে কোন সময়েই সে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকালীন ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারিবে না। তাহার জন্য অন্য একটী ইংরেজি শিক্ষার শ্রেণী সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব। সংস্কৃত শিক্ষার প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করিতেছি যে, অলঙ্কার শ্রেণীতেই ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ হউক। তাহা হইলে, ছাত্রগণ ইংরেজি বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্যূন দ্বিগুণ সময় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহাদিগের চিত্ত এক্ষণে সুমার্জ্জিত হওয়াতে তাহাদিগকে সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না। অলঙ্কার শ্রেণী হইতে কলেজের শ্রেষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিতে যাইলে ৭।৮ বৎসর লাগে। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্ ও শ্রমশীল ছাত্র আনায়াসেই ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে।

আমি আর একটী বিশেষ ঘটনা কৌন্সিলের সমক্ষে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি। ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে বিশেষ সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে

অপারগ। অল্পবয়স্ক বালকগণের শ্রেণীতে সুন্দররূপে কাব্য পড়াইতে হইলে যে কার্য্যতৎপরতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। প্রাচীন বলিয়া তিনি কাহারও উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং তাঁহার শ্রেণীতেই বিশেষ গোলযোগের প্রভাব। তন্নিমিত্ত আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তাঁহার বর্ত্তমান বেতন মাসিক ৪০ টাকা দিয়া তাঁহাকে লাইব্রেরির ভার দেওয়া হয় ও লাইব্রেরির বর্ত্তমান অধ্যক্ষ, এই বিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ৩০ টাকা বেতনে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। পরিশেষে সুবিধা ঘটিলে তাহার বেতন ৩০ টাকা হইতে ৪০ টাকায় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন।

বালকগণের এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন সম্বন্ধে কলেজের বর্ত্তমান পদ্ধতি এই যে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত এক শ্রেণীতে পাঠ করে। পরে সময় অতীত হইলেই, তাহাদিগের বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ হইল কি না, সে বিষয় দৃষ্টি না করিয়া তাহাদিগকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এই পদ্ধতি হইতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় যে-কোন শ্রেণীতে কেহ পাঠ শেষ করিলেও তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত না হইলে উপরকার শ্রেণীতে উঠিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যদি অপর কোন ছাত্র, সকল বিষয়ে অনুপযুক্ত হইয়াও কোন শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট সময় সমাপ্ত করে, তবে তাহাকে উপরকার শ্রেণীতে পাঠ করিতে দেওয়া হয়। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করি যে, গুণানুসারে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক। আরও এই নিয়ম প্রচলিত হউক যে, বৃত্তিসংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী সময়ের অতিরিক্ত-কাল কেহই কলেজে পাঠ করিতে পারিবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত হইলে, মধ্যবিৎ ছাত্রাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ছাত্রেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের কমেও নিজ নিজ পাঠ শেষ করিতে সমর্থ হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে সুবন্দোবস্তের অভাব সকলেই বিশেষ পরিচিত। বালকগণের উপস্থিতি, সামান্য কারণে শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাওয়া ও অনাবশ্যক গোলমাল ও কথাবার্ত্তা এবং সর্ব্বপ্রকার গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অন্যান্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়মাদি ও সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, এই বিদ্যালয়ে কেন যে তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে না, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না, সেইরূপ প্রণালী এ বিদ্যালয়েও প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত উচিত।

অবশেষে নিবেদন এই যে, কলেজের সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত আমি যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা বহু দিবসের প্রগাঢ় চিন্তা ও বিবেচনার ফল। আমার বিবেচনায় যে প্রণালীর অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, আমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি ও আশাকরি যে, যদি কৌন্সিল আমার প্রস্তাবিত পরামর্শগুলি কার্য্যে পরিণত করেন, তবে অল্পদিনের মধ্যেই অতি সু-ফল উৎপন্ন হইবে ও বিদ্যালয়টী পবিত্র ও প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যার আগার স্বরূপ হইবে। বিশেষতঃ ইহা হইতে জাতীয়-সাহিত্যের উৎপত্তি ও সুশিক্ষকের সংঘটন হইতে থাকিবে ও এই বিদ্যালয় হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সুদক্ষ শিক্ষকগণ সাধারণের মধ্যে জাতীয় বিদ্যা প্রচার করিয়া দেশের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলসাধন করিতে থাকিবেন।

সংস্কৃত কলেজ
১৫ই ডিসেম্বর ৮৫৮ সাল স্বাক্ষর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

রিপোর্টে কেবল সহজ শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত নহে ; সংস্কৃত কলেজের সমগ্র সংস্কৃত পাঠ্য সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে। একাধারে একত্র সংস্কৃত পাঠ্যের এরূপ সমালোচনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ বিরতির প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরও একটা গতি নির্ণয় হয়। রিপোর্টের ইংরেজি সহজ, সরল ও সংযত। প্রয়োজনীয় কথাগুলি বিনা বাক্যাড়ম্বরে সাজাইয়া গুছাইয়া বলা হইয়াছে।

রিপোর্ট-পাঠে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের লোপাশঙ্কা তাঁহাদের অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ রিপোর্ট লেখার গুণে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর এক ভূদেববাবু ভিন্ন রিপোর্ট লিখিয়া শিক্ষা বিভাগে এতাদৃশ যশস্বী কেহই হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ভূদেববাবুর চরিত্রে ও কর্ম্মে বৈচিত্র্য যতই থাকুক, নানাগুণে তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালায় বরণীয় ; পরন্তু শিক্ষা বিভাগেরও চিরস্মরণীয়। আর কোন কারণ না থাকিলেও, তাঁহারা এক শিক্ষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিতেন। রিপোর্ট লেখার গুণে উভয়েই পদ, সম্পদ্, সম্মান, সম্ভ্রম,—এই সকল বিষয়েরই পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক রিপোর্ট-ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরম পদোন্নতি। সাংসারিক সুখ-শ্রীবৃদ্ধির মূলাধার ইহাই। তিনি রিপোর্টে শিক্ষাপ্রণালীর পথাবলম্বন স্বরূপ যে বাঙ্গালা পাঠের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারই অধিকাংশ স্বয়ং প্রণয়ন করিবেন

বলিয়া তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। কেবল শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুমোদন মাত্র অপেক্ষা ছিল। উল্লিখিত পুস্তকগুলি একে একে পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি কেবল পাঠ্যসঙ্কল্পে জীবনচরিত নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই সেপ্টেম্বর বা ১২৫৬ সালের ২৬শে ভাদ্র সোমবার জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত জীবনচরিতের কতিপয় চরিত্র লইয়া "জীবনচরিত" লিখিত। এই জীবন-চরিতে কোপর্ণিকস্, গালিলেও, নিউটন, হর্শল, গ্রোসিয়স্ লিনীয়স্, ডুবাল, জেঙ্কিন্স, জোন্স—এই কয়টী চরিত অনুবাদিত হইয়াছে।

অনুবাদে কৃতিত্ব পূর্ব্ববৎ। তবে অনুবাদে কোন কোন শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় অসঙ্গতি আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এ কথা স্বীকার করিয়াছেন; নহিলে ভাষা তেজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইত না।

জীবনচরিতে যে সকল বিজাতীয় ও বিদেশীয় চরিত্রের অবতারণা হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষণীয় গুণ থাকিতে পারে; ফলে কিন্তু অলক্ষ্যে ইহাতে কেমন একটা কু-শিক্ষা আসিয়া পড়ে। জীবনচরিতের বিষয়ীভূত চরিত্রপাঠে ধারণা জন্মে, তাঁহারা মনুষ্যের আদর্শ; সুতরাং তাঁহাদের অন্যান্য আচার, ব্যবহার, শিক্ষা. দীক্ষা প্রভৃতিও অনুকরণীয়। কাজেই সেই সকলের অনুকরণেই প্রবৃত্তি সহজে ধাবিত হয়। মনে হয়, এই সকলের অনুকরণেই সেইরূপ আদর্শে উপস্থিত হওয়া যায়। সত্য সত্য সে সব কিছু আর হিন্দুসন্তানের শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় নহে। হিন্দুর তাহাতেই অধঃপতন। হিন্দুর অধুনাতন অধঃপতনও ত এইরূপ কারণে। অকাজের অনুকরণ করিতে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধেরও সহজেই প্রবৃত্তি হয়; সুকুমারমতি বালকদিগের ত কথাই নাই। স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুর অথবা পুরাণান্তর্গত পুণ্যশ্লোক পবিত্র চরিত্রাবলীর যে কোন গুণ যে কোন আকারে প্রকটিত হউক না কেন, তাহা হিন্দুসন্তানের শিক্ষণীয়। সেই প্রকটিত গুণানুসরণে হিন্দুসন্তান চরিত্রসৃষ্টির যেখানে গিয়া উপস্থিত হউক না, দেখিবে, হিন্দুর চরিত্র-গঠনোপযোগী উপকরণ তথায় জাজ্বল্যমান। সংস্কৃতভাষা পারদর্শী ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এইরূপ চরিত্র সংগ্রহে সমর্থ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহা হয় নাই; শুদ্ধ দেশের দুরদৃষ্টদোষে। শিক্ষার স্রোত তখন বিপথে ধাবিত হইয়াছিল।

শোভাবাজার-রাজ ৺রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরেজির শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসুজ মহাশয়

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্বদেশীয় লোকের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সম্মতও হইয়াছিলেন। একবার তিনি এ দেশীর ব্যক্তিগণের জীবনী লিখিবার জন্য সবিশেষ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে অনেক পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কার্য্যে তাহা ঘটে নাই। ডাক্তার ৺অমূল্যচরণ বসু এম বি মহাশয়ের মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি। জীবনচরিত লিখিবার জন্য অমূল্যবাবুই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

রসময় দত্তের কর্ম্মত্যাগ, বিদ্যাসাগরের প্রিন্সিপাল পদ, কার্য্যব্যবস্থা, ছাত্র-প্রীতি, কায়িক দণ্ডবিধানের নিষেধাজ্ঞা, রহস্যপটুতা, শিরঃপীড়া, বীটন্ স্কুলের সম্বন্ধ ও বোধোদয়

বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে রিপোর্ট শিক্ষা বিভাগে প্রদত্ত হইলে পর, কলেজের সেক্রেটরী বাবু রসময় দত্ত, কর্ম্ম-ত্যাগের জন্য আবেদন করেন। এই আবেদন করিবার পূর্ব্বে রসময়বাবুর কোন কার্য্য পর্য্যালোচনা জন্য একটী কমিটী বসিয়াছিল। কমিটীর ফলে রসময়-বাবু বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ থাকাতেও যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে আদিষ্ট হন, তখন তাঁহার ধারণা হইয়াছিল. কর্তৃপক্ষীয়েরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত করিবেন। এই সকল ভাবিয়াই তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

"মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হইয়া আসিলে, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। মৌয়েট্ সাহেব পীড়াপীড়ি করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ৯০৲ টাকার বেতনে বিদ্যাসাগরকে এ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ নিয়োগকালে এডুকেশন কাউন্সিলের মেম্বরেরা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং উহা উত্তরকালে কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সেক্রেটরী রসময়বাবু কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।"—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ২৩৮ পৃষ্ঠা।

৪ঠা জানুয়ারি, শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটরী মৌয়েট্ সাহেব এক পত্র লিখিয়া, রসময়বাবুর কর্ম্মত্যাগের আবেদন গ্রাহ্য করেন। এই পত্রে রসময়বাবুর কার্য্য-দক্ষতার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল।* পরন্তু মৌয়েট্ সাহেব তাঁহার পদত্যাগ মঞ্জুর করিয়া, তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিবার আদেশ করেন। ২০শে জানুয়ারি তাৎকালিক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটরী ডবলিউ. সিটনকর সাহেব, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রসময়বাবুর পদে অধিষ্ঠিত করেন।† এই নিয়োগের পর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ উঠিয়া যায়। এই দুই পদে এক পদ হইল,—"প্রিন্সিপাল"। এ পদের বেতন ১৫০৲ টাকা।‡

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের শিক্ষা-পরিবর্ত্তনে আত্মনিয়োগ করেন। তাৎকালিক পণ্ডিত-মণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহার অসাধারণ শ্রম শক্তি অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

প্রিন্সিপাল-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, "প্রিন্সিপালের" কার্য্য ব্যতীত, তাঁহাকে অন্যান্য বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তিনি ত কখন উপজীব্য-পদের "লেফাফা-দোরস্ত" কার্য্য করিয়া, দিনের অবশিষ্ট কাল, স্বভাব-বিলাসী বাঙ্গালীর ন্যায় বিলাস-ব্যসনে অতিবাহিত করিতেন না। বিদ্যাসাগর স্বভাবতঃ কর্ম্মবীর। তাঁহার বিরাম-বিরতি কবে? কলেজের কার্য্য ব্যতীত ক্ষুদ্র দেহে তিনি দেশের ও সমাজের জন্য, কি অমানুষিক শক্তিবলে অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, পাঠক! একে একে তাহার পরিচয় পাইবেন। এই "প্রিন্সিপাল" কার্য্যের সময়ে বিদ্যাসাগরের নাম যশঃ দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল। এই "প্রিন্সিপালে"র কার্য্যেও তাঁহাকে যেরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। তিনি শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তদনুসারে কার্য্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন; সুতরাং সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসম্বন্ধে তিনি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত করাই তাঁহার অতি কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে তিনি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে, ফলে যাহাই হউক, কলেজের আভ্যন্তরীণ সংস্কার-সাধনে তাঁহাকে সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইয়াছিল।

* সংস্কৃত কলেজের এই কয়জন সেক্রেটরী ছিলেন—ডঃ, জি. টি. মার্শেল, কাপ্তেন ট্রয়ার, রামকমল সেন ও রসময় দত্ত।

† Letter NO. 70.

‡ Letter NO. 77.

ছাত্রদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার আভ্যন্তরীণ সংস্কারের মূলাধার বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। ছাত্রদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে, কলেজের নির্ণীত নিয়মে ও প্রচলিত পাঠ্যে বালকদিগের মনোভিনিবেশ হইবে, ইহা তিনি বুঝিতেন। এই জন্য তিনি কলেজের ছাত্রদিগের প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন।

এই লেখকের সাহিত্য-গুরু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য ভূতপূর্ব দৈনিক-সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছেন,—"আমরা যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতাম, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই সংস্কৃত কলেজে থাকিতেন।* কলেজের ছুটী হইলে পর অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি সেই সু-প্রসন্ন সহাস্যবদনে সকলকেই যথারীতি সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া নানা প্রসঙ্গে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও রহস্যপূর্ণ কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাঁহার কাছে যাইলেই ছাত্রেরা প্রায়ই রসগোল্লা, সন্দেশ খাইতে পাইত। তাঁহার প্রীতিসম্ভাষণে কেহই বিমুখ হইত না। বালকদিগের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই বান্ধব-ব্যবহার করিতেন, তা কি সংস্কৃত কলেজে আর কি স্বকৃত বিদ্যালয়ে। ছাত্রবর্গকে সর্ব্বদা মধুর আত্মীয়-সম্ভাষণে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তাঁহার মুখে সেই অমৃতায়মান "তুই" সম্বোধন শুনিয়া, প্রিয় ছাত্রবর্গ আপনাদিগকে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় বিবেচনা করিত। সত্য সত্যই সেই "তুই"-টুকু যেন স্বর্গীয় স্নেহের ক্ষীরভরা। যেন সেই "তুই"-টুকুরই মধ্যে বিশ্বম্ভরা আত্মীয়তা নিহিত ছিল। বালকদিগের প্রতি যেমন তিনি সততই কোমল ব্যবহার করিতেন, আবার আবশ্যক হইলে, কর্ত্তব্যানুরোধে তেমনই কঠোর হইতেন। বলা বাহুল্য, স্কুলের বা কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের এইরূপ কখন কঠোরতা, কখন বা কোমলতা, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয়। কারুণ্য যাঁহার স্বভাব সিদ্ধ, কঠোরতা তাঁহার কিন্তু অল্পক্ষণস্থায়ী। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তব্যে কঠোর হইতেন বটে, কিন্তু কঠোরতার কারণ দূর হইলেই, কারুণ্যে ভাসিয়া যাইতেন। তখন সেই মুখে কি যেন একটা শোভনীয় সুন্দর স্বর্গীয় শ্রীর আবির্ভাব হইত। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে তাঁহার উত্তরকালীন্ ছাত্রপ্রীতির একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি।

একবার তিনি স্ব-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজের শ্যামবাজারস্থ শাখা-

* রাজকৃষ্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিধবা-বিবাহের আন্দোলনকালে তিনি প্রায়ই সংস্কৃত কলেজেই রাত্রি যাপন করিতেন এবং নিজ মত সমর্থনার্থ নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। কলেজের সম্মুখেই শ্যামাচরণ বিশ্বাসের বাটী। রাত্রিকালে কখন কখন তিনি শ্যামাচরণবাবুর বাটীতে আহার করিতেন; কখনও বা কলেজেই খাইতেন। প্রাতে কিন্তু প্রত্যহ রাজকৃষ্ণবাবুর বাটীতে আহারের ব্যবস্থা ছিল। শ্যামাচরণবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্ ছিলেন।

বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে অবাধ্যতা দোষের জন্য তাড়াইয়া দেন। কর্ত্তব্যানুরোধে দ্বিতীয় শ্রেণী একবারে উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ বিতাড়িত হইয়া পরদিন প্রাতে তাঁহার বাদুড়-বাগানস্থিত বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং কাতরকণ্ঠে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বালকদিগের কোমল-করুণ মুখ দেখিয়া দয়ার্ণব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই দুরন্ত ক্রোধ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। তখন তিনি সস্নেহ-সম্ভাষণে বলিলেন,—'যা, আর এ কাজ করিস না; এবার মাপ করলেম।' ছাত্রগণ এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। তখন বেলা বারটা। বাড়ী ফিরিবার জন্য বিদায় লইয়া ঠিক সিঁড়িতে নামিবার সময় তাহাদের একজন হাসিতে হাসিতে অনুচ্চ শব্দে বলিল,—'কি কঠোর প্রাণ! এতখানি বেলা হ'ল তা বললে না, একটু জল খেয়ে যা।' কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়া সকলকে বলিলেন,—'ঠিক বলেছিস্, আমার কঠোর প্রাণ বটে, অন্যমনস্কে তোদিগে একটু জল খেতেও বলি নাই; আয় আয় একটু একটু জল খেয়ে যা।' ছাত্রগণ তখন অপ্রস্তুত হইল। কেহ কেহ হাত যোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল; কেহ কেহ বা তাড়াতাড়ি পলাইবার চেষ্টা করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। পরে তিনি সকলকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। উপরে গিয়া সকলকে জল খাইতে হইল। তখন তাঁহার সেই প্রফুল্ল প্রসন্ন বদনখানি দেখিয়া একজন অন্য জনকে বলিয়াছিল;—'এ লোকের রাগ হয় কেমন করিয়া?'

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রদিগের কায়িক দণ্ড-বিধানের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এক দিন তিনি দেখিতে পান, সংস্কৃত কলেজের কোন অধ্যাপক, ক্লাসের ছেলেগুলিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অধ্যাপককে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, একটু রহস্য করিয়া বলিলেন,—'কি হে! তুমি যাত্রার দল করিয়াছ নাকি? তাই ছোকরাদিগকে তালিম দিতেছ? তুমি বুঝি দূতী সাজিবে?'

অধ্যাপক একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন।

আর একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অধ্যাপকের টেবিলে একগাছি বেত দেখিয়া অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করেন,—'বেত কেন হে?' অধ্যাপক মহাশয় বলেন,—'মানচিত্র দেখাইবার সুবিধা হয়।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন—'রথ দেখা, কলা বেচা দুই হয়। ম্যাপ দেখানও হয়, ছেলেদের পিঠেও পড়ে।'

বলা বাহুল্য এই অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রায়ই

রহস্যালাপ হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই সময় বুঝিয়া, লোক বুঝিয়া রহস্য করিতেন। তিনি স্বাভাবিক রহস্যপটু ছিলেন। কর্ম্ম-বীরের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চরিত্রে স্বাভাবিক রহস্য-রঙ্গের ভাব বড়ই মনোহর। যেন তরুণ অরুণ-কিরণো-দ্ভাসিত প্রভাতের "কাঞ্চনজঙ্ঘা"। বীরের গাম্ভীর্য্য, তরলের রসমাধুর্য্য অনেক সময় বিরল বটে; কিন্তু যে চরিত্রে এই দুয়েরই সমাবেশ, তাহা অতি মহান্। "সুদন"-বীর জেনারেল গর্ডনের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বদনমণ্ডলের বিস্ফারিত নীলনয়নদ্বয়ে সতত রহস্য-ভাব উদ্ভাসিত হইত। কার্য্যের সময় গর্ডন, গাম্ভীর্য্যে যেন হিমালয়; কিন্তু কার্য্যাবসরে বিশ্রম্ভালাপে যেন আলোক-পুলকিত-স্ফুট কোরক-কদম্ব। তিনি যখন গল্প করিতে বসিতেন, তখন তিনি এমনই মিষ্ট করিয়া, উপমা দিয়া, গল্পগুলি সাজাইয়া বলিতেন, সঙ্গে সঙ্গে এমনই রস-তরঙ্গ ছুটাইতেন যে, দিনরাত্রি সে গল্প শুনিলেও, শ্রোতৃমণ্ডলীর মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না। তাঁহার উপমার গুণে মনে হইত, গল্পের বর্ণিত বিষয়, যেন চিত্রের মত চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত হইতেছে।"*

গর্ডন রণ-বীর; বিদ্যাসাগর কর্ম-বীর। গর্ডনের জীবনীলেখক বাট্‌লর্ সাহেব, যে ভাষায় গর্ডনের রহস্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সে ভাষায় বলিবার শক্তি আমাদের নাই। তবে বাট্‌লর্ সাহেব, রণ-বীর গর্ডনের চরিত্র-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা কর্ম্ম-বীর বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও তাই বলি। গর্ডনের এক জন বন্ধু তৎসম্বন্ধে বলিতেন,—"**He was the most cheerful of all my friends,**" বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তদীয় বন্ধু আনন্দকৃষ্ণবাবু ঠিক্ এই কথাই বলেন। আনন্দবাবু বলেন,—"বিদ্যাসাগর আমাদের বাড়ীতে আসিলে ৭।৮ ঘণ্টার কমে বাড়ী ফিরিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার মুখে রহস্য-রসালাপময় গল্প শুনিতাম। কখন হাসিতাম, কখন কাঁদিতাম, কখন ছবির মত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, কখন তাঁহাকে আহ্লাদে আলিঙ্গন করিতাম। তিনি উপমার অক্ষয় ভাণ্ডার। নিত্য নূতন গল্প, নিত্য নূতন উপমা। গল্পে আমোদ করিতে এমন আর কেহ পারিতেন না।" মধ্যে মধ্যে পাঠক, বিদ্যাসাগরের এই রহস্য পটুতার পরিচয় পাইবেন।

রহস্য-রঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজ ভুলিতেন না। তিনি পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত রহস্য রঙ্গ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অধ্যাপক মহাশয় এই রহস্যে অবশ্য সাবধান হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্যান্য সকলকে সাবধান করিবার জন্য, তিনি শারীরিক দণ্ডবিধান নিষেধ করিয়া এক স্মরকুলার জারি করিয়াছিলেন।

---

* **Charles George Gordon by Colonel William F. Butler, p. 83.**

প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫।৬ মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হন। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন। এই সময় তাঁহার শিরঃপীড়া সূত্র হয়, তবে তিনি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, শিরঃপীড়ায় তাঁহাকে বড় কাতর করিতে পারিত না। দেহে তখন বল এবং শরীরে রক্ত যথেষ্ট ছিল। সকাল সন্ধ্যা তিনি "মুগুর" ভাঁজিতেন; "ডন" ফেলিতেন; এমন কি রীতিমত ব্যায়াম্ করিতেন। ইহাতে তাঁহার দেহে এত রক্ত জন্মে যে, ডাক্তারেরা তাঁহার একটা কঠোর পীড়া হইবে বলিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি তখন ভাল করিয়া ঘাড় বাঁকাইতে পারিতেন না। কঠোর পীড়ার আশঙ্কা করিয়া ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় দুই বার তাঁহার ঘাড়ের ফস্ত খুলিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার সে তেজস্বিনী মূর্ত্তির একখানি প্রতিকৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে এখনও দেখা যায়। সে প্রতিকৃতি দেখিলে মনে হয় যে, উন্নত-ললাট, তেজঃপুঞ্জ, সুন্দর পুরুষের গণ্ডস্থলে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক মাস পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বীটন্ সাহেবের মৃত্যু জন্য দারুণ মনস্তাপ পাইতে হইয়াছিল। বীটন সাহেব ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য ও শিক্ষা-সমাজের সভাপতি ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার বহু বিস্তার উদ্দেশে ইনি কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।* বিদ্যাসাগর এতৎপক্ষে বীটন্ সাহেবের যথেষ্ট সাহায্য

* এই স্কুল অধুনা বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় বলিয়া প্রথিত। ইহার প্রকৃত নাম কিন্তু "বীটন"। বাঙ্গালায় বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা এই প্রথম নহে। বালিকা-বিদ্যালয় প্রসারের চেষ্টাও প্রথমে বীটন্ সাহেবের নহে। পূর্ব্বে "স্কুল সোসাইটী"র চেষ্টায় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বালিকাদের জন্য কলিকাতার নন্দন বাগানে "জুবেনাইল পাঠশালা" নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পঞ্চাশটী স্ত্রী-পাঠশালা হয়। সাকুল্যে ৮০০টী বালিকা শিক্ষা পাইত। রাধাকান্ত দেব-প্রণীত বলিয়া খ্যাত স্ত্রী-শিক্ষা-বিধায়ক নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতার "ফিমেল জুবেনাইল সোসাইটী," মিস্ কুক বা মিসেস্ উইলশন্ এবং অন্যান্য মিসনরীরা অনেকটা কৃতিত্বভাগী। কোন কোন হিন্দু, খৃষ্টান হওয়ায়, হিন্দু ও খৃষ্টানের মধ্যে সদ্ভাবের খর্ব্বতা হয়। এইজন্য বালিকা-বিদ্যালয়ের অভাব হয়। এই অভাব দূরীকরণ উদ্দেশেই বীটন্ সাহেব, প্রথমে সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠক-খানায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে গোলদীঘির দক্ষিণ কোণে হেয়ার সাহেবের স্কুলগৃহে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়। পরে ইহা সীমুলিয়াস্থ বর্ত্তমান বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীটন্ সাহেব সহৃদয় সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ফলে যাহাই হউক. তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া শিখান, হিন্দু-সমাজের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায়। যাহাতে তৎপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে কোনরূপে খৃষ্টানী ভাব সংপৃক্ত না হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল বিশ্বাসে তিনি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন

করিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেব স্ব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবৈতনিক সেক্রেটরী করেন। মেয়েদের লেখাপড়া শিখান কর্ত্তব্য, এ ধারণা ছিল বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সম্বন্ধে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিরুদ্ধবাদীর সহিত তাঁহাকে অনেক বাগবিতণ্ডা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এ ধারণার অন্যতম কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী শ্লোক,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখান উচিত; এবং বীটন্ সাহেবকেও বুঝাইয়াছিলেন এইরূপ। যে গাড়ী করিয়া মেয়েরা স্কুলে যাতায়াত করিত তাহাতেও লেখা থাকিত এই কয়েকটি কথা। আমরা অধম হিন্দু, এখনও এই বুঝি, আমাদের পূর্ব্বতন রমণীরা যে শিক্ষায় অন্নপূর্ণারূপে কীর্ত্তিমতী হইয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষা এই শ্লোকের উপপাদ্য। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণা, যাহাতে এই পরকালের কর্ত্তব্য সাধন হয়, তাহাই হিন্দু রমণীর শিক্ষণীয়। লেখা পড়া না শিখিয়া হিন্দু রমণীরা যদি সে কর্ত্তব্যসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে বলিব, তাহাদের শিক্ষা হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা সেই শিক্ষায় লক্ষ্য রাখিয়া এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন। কেবল গুরুপদেশ শুনিয়া সীতা দ্রৌপদী যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন সেই শিক্ষা হিন্দু রমণীর গ্রহণীয়। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, লেখাপড়া শিখিলে হিন্দুর সংসার সুখময় হইবে। তিনি এইটী ভাল ভাবিতেন, তাই ইহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই বীটন্ সাহেবের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বালকের ন্যায় তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যাহা ভাবিয়া যাহা করুন, ফলে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখায় এ মুহূর্ত্তে গরল উদ্গীর্ণ হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ লোকান্তরিত; কিন্তু যদি তাঁহার মত কোন ভাগ্যবান্ তাঁহার, প্রতিনিধিরূপে উত্থিত হন তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চিত বলিতে হইবে—

"সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু, আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।"

বাঙ্গালী যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করে, তৎপক্ষে বীটন্ সাহেবের সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা ছিল। ইহা তাঁহার সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে কি? বালিকা-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধনে ব্রাহ্মেরাও অনেকটা সহায় হইয়াছিলেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের পুষ্টিতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করুন। ইহা ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসে, ১৩০০ সালের মাঘ ও ফাল্গুন মাসে এবং ১৩০১ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছে।

ফলে যাহা হউক তাঁহার উদ্দেশ্যে সাধুতার আরোপ করিতে আপত্তি বোধ হয়, কাহারও হইবে না। তৎকালিক শাসন-কর্ত্তৃপক্ষেরও সে সম্বন্ধে সন্দেহ কিছুই ছিল না। সেই জন্য তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সবিশেষ সম্মান করিতেন; বীটন্ সাহেবের সমাধিকালে তদানীন্তন ডেপুটী-লাট হেলিডে সাহেব, তাঁহাকে আপন শকটে আরোহণ করাইয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেবের মৃত্যুর পর গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী বীটন্-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল এতদর্থে ৮০০০ আট হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। "হোম ডিপার্টমেণ্টে"র তাৎকালিক সেক্রেটরী স্যার সিসিল বিডন সাহেব বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।* বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীটন্ সাহেবের শোকে এত অধীর হইয়াছিলেন যে তিনি বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী-পদ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন,—"যে মহাত্মার অবিচলিত অধ্যবসায়ে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, যিনি উহার প্রাণ, তিনিই যখন জন্মের মতন চলিয়া গেলেন, তখন আর এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে প্রবৃত্তি হন না।" বীটন্ সাহেবের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতাদৃশ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল বলিয়া, তাঁহার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া আপন বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন।† কর্ত্তৃপক্ষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ-নিবন্ধন বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটরী-পদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ বা ১২৭৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধান-সময়ে বীটন্ স্কুলের প্রতিষ্ঠা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। বোম্বাই-অঞ্চলে এক জন পারসী কলিকাতার বীটন্ বিদ্যালয়ের মতন একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সেখানকার সিবিলিয়ন আস্কিন্ সাহেব সেই পারসী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, বীটন্ বিদ্যালয়ের বাটীর একটা নক্সা পাইবার জন্য সিটনকর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সিটনকর সাহেব সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সুহৃদ্‌ভাবে পত্র লেখেন।

যত দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বীটন্ বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী ছিলেন, তত দিন তিনি কায়মনোবাক্যে ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে তিনি কন্যার মত ভালবাসিতেন। ভালবাসা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ

---

* ১৮৫৪ সাল হইতে ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয় এ দেশীয় ব্যক্তিদিগের একটী সভার অধীন ছিল। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এ সভার সভ্য ছিলেন। —"নব্যভারত,"১২৯৯ সাল, ফাল্গুন মাস, ৫৬৩ পৃষ্ঠা।

† এখন পুত্র নারায়ণবাবু সেই প্রতিকৃতি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন।

গুণ ছিল। তিনি কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী, কাহাকেও মা, ইত্যাদি-রূপ সম্বোধন করিয়া সকলেরই সহিত সাদর-সম্ভাষণ করিতেন। একবার রাজা দিনকর রাও, তাঁহার সহিত বীটন্ বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া, বালিকা-দিগকে মিঠাই খাইবার জন্য ৩০০৲ তিন শত টাকা দিয়াছিলেন। মিঠাই খাইলে মেয়েদের পেটের পীড়া হইতে পারে, প্রেসিডেন্ট বিডন্ সাহেবের এই ধারণা ছিল, সুতরাং তিনি মিঠাই খাওয়াইতে নিষেধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সেই টাকায় বালিকাদিগকে কাপড় কিনিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি মাসী, মা, দিদি ইত্যাদি সম্ভাষণে প্রত্যেক বালিকাকে ডাকিয়া প্রত্যেকের মত চাহেন। অধিকাংশের কাপড় লওয়া মত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ঢাকাই শাড়ী ক্রয় করিয়া বালিকাদিগকে বিতরণ করিলেন। বীটন্ বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী-পদ পরিত্যাগ করিবার পরও বিদ্যালয়ের উপর তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ও মমতা ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, বীটন্ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর পরিচালন-প্রথা তাদৃশ মনোমত না হওয়ায়, তিনি ইহার প্রতি শেষে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৮৫১ সালের ৬ই এপ্রিল বা ১২৫৭ সালের ২৫শে চৈত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় চেম্বর সাহেবের "Rudiments of Knowledge" নামক গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করেন। ইহার নাম বোধোদয়। বীটন্ বিদ্যালয়ের পাঠ্য জন্য এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কলঙ্কার-প্রণীত শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। এই জন্য বোধ হয় বোধোদয়ের প্রথম নাম হইয়াছিল, শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ।*

বোধোদয় হিন্দু-সন্তানের সম্যক পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা। "পদার্থ তিন প্রকার—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্" ; আর "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" ইহা বালক ত বালক, কয়জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধের বোধগম্য হয় বল দেখি ?"

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—"সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশয়ে অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।" যত্ন ঠিক সফল হয় নাই। বোধোদয়ের ভাষা স্থানে স্থানে এইরূপ,—"ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত" ; "ন্যূনাধিক্যবশতঃ" ; "গম্ভীর শব্দজনক" ; "ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য" ; "চা অনুসারে তারতম্য" ইত্যাদি। এক এক স্থলে বোধোদয়ের

* "নব্যভারত" ১২৯৯ সাল, ফাল্গুন মাস, ৫৬৭ পৃষ্ঠা।

‡ অধুনা নারায়ণবাবু বোধোদয়ের কতক সংস্কার করিয়াছেন।

পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগ সম্যক্ হয় নাই। পদার্থ শব্দ ধরুন। বোধোদয়ে ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান বস্তু সমুদয় পদার্থ আখ্যা পাইয়াছে। পদার্থ শব্দের এরূপ অর্থগ্রহ বড় সঙ্কীর্ণ। সংস্কৃত দর্শনে যাহা কিছু শব্দবাচ্য, তাহাই পদার্থ। জাতি, গুণ, অধিক কি অভাবও পদার্থ।

পক্ষান্তরে, জন্তু শব্দের প্রয়োগস্থল বড বিস্তীর্ণ হইয়াছে। বোধোদয়ের মতে পক্ষী, মৎস্য, কীট, পতঙ্গ সকলই জন্তু। আমরা এখন জন্তু শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহার করি না। জীব বা প্রাণী শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি। বোধোদয়ে আছে জন্তুগণ মুখ দ্বারা আহার গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। জন্তু অর্থে যদি প্রাণী হয়, তবে এ কথা ঠিক নহে, কারণ এক এক প্রাণীর মুখ নাই ; অথচ সে সজীব।

বোধোদয়ে অনেক বিষয় শিখাইবার প্রয়াস হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ব, নীতি-বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্ক, ব্যাকরণ ইত্যাদি। বিজ্ঞান ও দর্শনের যে অংশ বোধোদয়ে শিক্ষণীয়, তাহা প্রায় উপযোগী, কিন্তু স্থানে স্থানে এরূপ কথা আছে যে, তাহা শিশুবুদ্ধির অধিগম্য নহে। যথা,—চন্দ্রসূর্য্য জোয়ার ভাঁটার কারণ ; শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ নহে, কর্ণপটাহে শব্দের প্রতিঘাত ইত্যাদি। দুই একটা কথা বোধ হয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নহে ; যথা,—স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তামাত্র ; অভিজ্ঞতা জন্মিলে হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি হয়। অঙ্কশাস্ত্রোক্ত সংখ্যা, পরিমাণ, মাপ ইত্যাদি বিষয়ের স্থান বোধ হয়, বোধোদয়ে না হইয়া পাটীগণিতে হইলে ভাল হইত। ব্যাকরণোক্ত কথা সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যায়। (পূরণবাচক শব্দ, বিভিন্ন ভাষা ইত্যাদি)।

প্রাণিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান-সম্বন্ধে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথা আছে। ছেলেদের সে সকল কথা জানা ভাল। এরূপ গ্রন্থের উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান শিক্ষা না হইয়া, বিজ্ঞানে যে সকল বিস্ময়ের কথা আছে, যাহাতে শিশুর মন গল্পপাঠের মত উৎসাহী ও উৎফুল্ল হইতে পারে, সে সকল কথার (ইংরেজিতে যাহা Romance of Science) অবতারণা থাকা ভাল। বোধোদয়ে সে প্রণালী আদৌ অনুসৃত হয় নাই। ফলে বোধোদয়ের বোধ নীরস, সরস নহে।

এতদ্ব্যতীত বোধোদয়ের অসঙ্গতি দোষের যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে বা ১২৯৩ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত "পঞ্চানন্দ" দেখিবার জন্য অনুরোধ করি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সংস্কৃত কলেজে শূদ্র-ছাত্র গ্রহণের ব্যবস্থা, কলেজের বেতন-ব্যবস্থা, উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, বীরসিংহে ডাকাইতি, আত্মরক্ষার কৈফিয়ত, ডাকাইতির কারণ, নীতিবোধের রচনা, ঋজুপাঠ ও ব্যাকরণ কৌমুদী, শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন, পাঠ্যপ্রণয়ন সভা, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যালয়, বেতনবৃদ্ধি ও বিদ্যালয়ের ব্যয়

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিতেন, সংস্কৃত কলেজে শূদ্র জাতিরাও শিক্ষা পাইবে না কেন? তখন কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য জাতি শিক্ষা পাইতেন। যাহাতে কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি সংস্কৃত-শিক্ষা-লাভ করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তৎপক্ষে বদ্ধপরিকর হন। তিনি শিক্ষা-সভায় আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কলেজের প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন পক্ষ সমর্থনার্থ স্বকীয় স্বভাবোচিত দৃঢ়তাসহকারে, নানা বচন-প্রমাণ-প্রয়োগে এবং ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জক বহুবিধ যুক্তি-তর্কবলে বিপক্ষ-পক্ষের মত খণ্ডন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন।* তাঁহাকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন,—"যদি এ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে এ ছার পদ পরিত্যাগ করিব।" সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাঁহার প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের যাহা মনোগত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাব তাঁহাদের মনোনীত

* সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য বর্ণের ছাত্র লওয়া যাইতে পারে কি না, শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা তৎসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রিপোর্টে লিখিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ২০ মার্চ্চ বা ১২৫৭ সালের ৮ই চৈত্র এক রিপোর্ট লিখেন। রিপোর্টে তিনি মত দেন,—"যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পড়িবে না কেন? বৈদ্য শূদ্র জাতি। আর যখন শোভাবাজারের ৺রাধাকান্ত দেবের জামাতা হিন্দু স্কুলের ছাত্র-অমৃতলাল মিত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছে, তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িতে পারিবে না কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয়, আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহার প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কায়স্থেরা অধুনা বাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত জাতি। আপাততঃ কায়স্থদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়া উচিত।"

এই রিপোর্টে তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"The opinions of the principal professors of this college on this subject are averse to this innovation".

না হইবে কেন? ইহার পর কায়স্থেতর বর্ণও সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র পড়িবার অধিকার প্রাপ্ত হয়?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা শূদ্র—যে কোন বর্ণের ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল, তাহার নিকট হইতে বেতন লইবার ব্যবস্থা হয়। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিন্সিপাল হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বেতনের ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। গবর্ণমেণ্ট বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। সেই গবর্ণমেণ্টই শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে বেতনের ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত কলেজের ইংরেজ-কর্ত্তৃপক্ষ যাহা করিতে পারেন নাই, বিদ্যাসাগর তাহা করিলেন।

১৯০৮ সংবৎ, ১২৫৮ সালে ১লা অগ্রহায়ণ বা, ৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় উপক্রমণিকা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। বঙ্গের বিদ্যার্থিমাত্রের নিকট উপক্রমণিকা পরিচিত। উপক্রমণিকার প্রণালী সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের "কড়চা" হইতে অনুকৃত। অনুকরণ হইলেও কোন কোন বিষয়ে উদ্ভাবনী-শক্তি উপলব্ধ হয়। উপক্রমণিকা-পাঠে ব্যাকরণের অবশ্য তলস্পর্শিনী ব্যুৎপত্তি জন্মে না; কিন্তু সাধারণের সংস্কৃত শিক্ষার এমন সহজ প্রবেশ পথ আর দ্বিতীয় নাই।

১৮৫২ সালের ১১ই মে বা ১২৫৯ সাল ৩০শে বৈশাখ মঙ্গলবার বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাইতি হইয়াছিল। ৩০/৪০ জন লোক তাঁহার বাড়ীতে পড়িয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে ছিলেন। ডাকাইতি পড়িলে, তিনি পরিবারবর্গসহ খিড়কীর দ্বার দিয়া পলায়ন করেন। এই ডাকাইতি কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় সপরিবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। তখন পিতা ঠাকুরদাস জীবিত ছিলেন। বাড়ীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাহাতে কিছুমাত্র ভাবনাচিন্তা ছিল না। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত পরমানন্দে কপাটী খেলিয়াছিলেন। যে দারোগা তদন্তে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন, এই নিশ্চিন্ত যুবা দেশের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষেরও সম্মানাস্পদ, তখন তাঁহার মুণ্ড হেঁট হইয়াছিল। যাহা হউক তদন্তে ডাকাইতির কোন কিনারা হয় নাই। গ্রীষ্মাবকাশের অবসানে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এইখানে বলিয়া রাখি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় বাঙ্গালার স্কুলসমূহে গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্ত্তিত হয়।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তদানীন্তন ছোট লাট হেলিডে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোট লাট বাহাদুর তাঁহার মুখে ডাকাইতির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি তো বড় কাপুরুষ, বাড়ীতে ডাকাইতি পড়িল, আর তুমি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলে ?" তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"এখন আমার প্রতি কাপুরুষতার অভিযোগ আরোপ করিতে পারেন; কিন্তু এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী যুবক যদি একাকী সেই ৩০/৪০ জন সবল ডাকাইতের সহিত যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে নিশ্চিতই তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইত। তখন বিদ্যাসাগরের নির্ব্বুদ্ধিতার কলঙ্ক জগতময় রাষ্ট্র হইত। আপনি হয় তো সর্ব্বাগ্রে তাহার রটনা করিতেন। যখন প্রাণ লইয়া, আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি, তখন লুণ্ঠিত সর্ব্বস্বের জন্য আর ভাবনা কি বলুন !"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে হঠাৎ ডাকাইতি হইল কেন, এ প্রশ্ন স্বতই উত্থিত হইতে পারে। বাস্তবিকই কি তিনি তখন তাদৃশ বিষয়-বিভব-সম্পন্ন হইয়াছিলেন ? এ বিষয়ের সন্ধানে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা এইখানে বিবৃত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীতে যাইলে, বীরসিংহ ও নিকটবর্ত্তী দীন-দরিদ্র অবস্থাহীন ব্যক্তিবর্গকে আপনার সাধ্যমত অর্থ-সাহায্য করিতেন। সন্ধ্যার পর তিনি চাদরের খুঁটে টাকা বাঁধিয়া, লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া, গোপনে অর্থ-সাহায্য করিয়া আসিতেন। এইরূপ গোপনে অর্থ-সাহায্য করিবার কারণ এই যে, এই সকল লোক অবস্থাধীন বটে, কিন্তু ভদ্র-পরিবার-ভুক্ত; সুতরাং প্রকাশ্যে অর্থ-সাহায্যের প্রার্থনা করা নিশ্চিত তাঁহাদের পক্ষে ঘোরতর লজ্জাকর।

এইরূপ অকাতর অর্থ বিতরণ করিতেন বলিয়া, লোকের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবার বিলক্ষণ বিষয়-বিভব-সম্পন্ন। তাৎকালিক দস্যু ডাকাইত-সম্প্রদায়ের মনেও সেই ধারণা হইয়াছিল। কোনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঞ্চয়বাসনা ছিল না। তাঁহার পিতা মাতা পুত্রকে সঞ্চিত সম্পত্তি মনে করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী একবার হারিসন্ সাহেবকে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাই বলিয়াছিলেন।*

---

* ১২৬১ সালে বা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হারিসন সাহেব ইনকম ট্যাক্সের তদন্তের জন্য কমিশনর নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন হারিসন সাহেবকে বীরসিংহের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। হারিসন সাহেব বলেন, "হিন্দুপ্রথানুসারে বাড়ীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী নিমন্ত্রণ না করিলে নিমন্ত্রণ লইব না।" নিমন্ত্রণ সুতরাং স্থগিত রহিল। সময়ান্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

প্রিন্সিপাল হইবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজি মরাল্ ক্লাশ বুক (**Moral class book**) নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার নাম নীতিবোধ হইয়াছিল।

সময়াভাব হেতু [এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই] তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে পুস্তকখানির স্বত্ব প্রদান করেন। রাজকৃষ্ণবাবু নীতিবোধের বিজ্ঞাপনে ১৯০৮ সংবতের ৪ঠা শ্রাবণ বা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—

"পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পুত্রগণের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, বিনয়— এই কয়েকটী প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ-স্বরূপ যে সকল-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কথাও তাঁহার রচনা, কিন্তু তাঁহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন ; তদনুসারে আমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই।"*

এইখানে "কথামালা"র কথা বলি। নীতিশিক্ষা-সূত্রে ইহা রচিত। বালকদিগের দিব্য মুখরোচক। বাঘ, বক, প্রভৃতির কথোপকথনের গল্পচ্ছলে নানা গল্পের সমাবেশ আছে। ইহাও অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর।

উপক্রমণিকার সমসাময়িক সংস্কৃত ঋজুপাঠের প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। অধিক কি, একই দিনে (১৯০৮ সংবতে ১লা অগ্রহায়ণে) উভয় পুস্তকের বিজ্ঞাপন লিখিত হইয়াছিল। ইহা সংগ্রহ। সু-সংগ্রহ বটে। ১২৫৯ সালে ১২ই চৈত্র বা

জননী হারিসন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। সাহেব বীরসিংহ গ্রামে গিয়া হিন্দুপ্রথামতে দণ্ডবৎ হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীকে প্রণাম করেন। তিনি আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক বিদ্যাসাগরের জননীকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনার কত ধন ?" জননী সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন,—"চারি ঘড়া ধন।" সাহেব বলিলেন,—"এত ধন ?" জননী তখন সহাস্যবদনে জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অপর তিনটী পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—"এই আমার চারি ঘড়া ধন।" সাহেব বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"ইনি দ্বিতীয় রোমক রমণী কর্নিলিয়া।"

* ১২৬২ সালের ১৪শে জ্যৈষ্ঠ বা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই টেলিমেকসের বিজ্ঞাপনেও রাজকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন,— 'এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে উভয়ই উপযোগী। উভয়ই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-পুরাণের সার-সঙ্কলন মাত্র, সুতরাং হিন্দু পাঠার্থীরও পাঠোপযোগী।

এই সকল পুস্তক প্রণয়ণের পর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা-বিভাগের আদেশানুসারে পূর্ব্বলিখিত রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষা প্রণালীর আরম্ভ হয়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ভাগ ঋজুপাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল। তৃতীয় ভাগ প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। ইহাও সংগ্রহ-গ্রন্থ; পরন্তু সু-সংগ্রহ। প্রাচীন ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিরচিত "পঞ্চতন্ত্র" প্রভৃতি হইতে ইহা সংগৃহীত।

ঐ খৃষ্টাব্দেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাকরণ-কৌমুদীর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। পর বৎসর তৃতীয় ভাগ কৌমুদী মুদ্রিত হয়। কৌমুদী তিন ভাগ উপক্রমণিকার উচ্চতম সোপান। সংস্কৃত মুগ্ধবোধ, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ পড়িলে যে তলস্পর্শিনী শিক্ষা হয়, কয়খানি কৌমুদী পড়িলে, তাহা নিশ্চিতই হয় না।

ইহার পর রিপোর্টানুযায়ী শিক্ষার পূর্ণ প্রচলন হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে ইংরেজি ছাত্রদিগের ঐচ্ছিক পাঠ্য ছিল, এক্ষণে উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অবশ্যপাঠ্য হইল। সংস্কৃতেও নিম্নশ্রেণীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমিকা, এবং ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ ব্যাকরণ কৌমুদী অধ্যাপিত হইতে লাগিল। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সঙ্কলনপূর্ব্বক যে তিন ভাগ ঋজুপাঠ প্রস্তুত হইল, তাহাও উহারই সঙ্গে সঙ্গে পঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কয়েকজন বুদ্ধিমান্ বালক উপক্রমণিকা হইতে সংস্কৃত আরম্ভ করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে লাগিল দেখিয়া, ঐ সকল ভাষা ব্যাকরণ পাঠের পর, সংস্কৃত সিদ্ধান্ত কৌমুদীর পঠনা হইবে, পূর্ব্বে যে এই প্রস্তাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর আর বড় মনোযোগ করিলেন না।"

এ অবস্থায় সাধারণের সংস্কৃত শিক্ষার সুবিধা হইল; কলেজও টিকিয়া গেল; কিন্তু কলেজের প্রতিষ্ঠা-উদ্দেশ্য বহুদূর সরিয়া দাঁড়াইল। সংস্কৃতে আর পূর্ব্ববৎ তলস্পর্শিনী শিক্ষা হইত না। এই ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে কলেজে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় প্রগাঢ় বিদ্যাশালী এ ব্যবস্থার পর কয়জন হইয়াছেন?

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বাঙ্গালা পাঠ্য রচনা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

যে সকল সভা পাঠ্য-প্রণয়নে ব্রতী ছিল, তাহাদের কোন কোনটীতেও তিনি যোগ দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এই সময় স্কুলবুক-সোসাইটী এবং বর্ণেকিউলার-লিটারেচার সোসাইটী দ্বারা অনেক পুস্তক প্রচারিত হইত। এই সভাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ত্তৃত্ব ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই সভা নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন যে, মুদ্রাঙ্কণোদ্দেশে কেহ কোন গ্রন্থ রচনা করিলে তাহার আদর্শ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পাদরি রবিন্‌সন্ সাহেব দেখিবেন। তাঁহারা মনোনীত করিলে সেই আদর্শ লঙ্ সাহেবের নিকট অর্পিত হইবে। পাদরি লঙ্ তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, ঐ রচনা গ্রাম্য বালকদিগের বোধগম্য হয় কি না।

কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় নহেন, তদানীন্তন নিম্নলিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণও উক্ত সভার সহিত সংপৃক্ত ছিলেন।

ওয়াইলি সাহেব, সিটনকার সাহেব, বেলি সাহেব, কালবিন্ সাহেব, প্রাট্ সাহেব, পাদরি লঙ্ সাহেব, উডরো সাহেব, রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রসময় দত্ত।*

১২৬০ সালে বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ বিদ্যালয়ে রাত্রিকালে কৃষকপুত্রেরা লেখা পড়া শিক্ষা করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের অর্থে বিদ্যালয়ের জমি ক্রয় করেন। বিদ্যালয়ের বাটী-নির্ম্মাণও তাঁহারই অর্থে হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কোদাল ধরিয়া গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রথমে মৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। এই সময়ে একটী বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিদ্যালয়ের ব্যয়-ভার তিনি সকলই স্বয়ং বহন করিতেন। এ ব্যয়-ভার বহনের একটা সুবিধাও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে যে শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অনুমোদিত হইয়াছিল। তাঁহার সংস্কার-ফলে কলেজে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় ছাত্র হইয়াছিল। ইহাকে শিক্ষা-প্রণালীর সুফল ভাবিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা আপন ইচ্ছায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি বা ১২৬০ সালের পৌষ মাসে তাঁহার ১৫০ দেড় শত-টাকা হইতে ৩০০ তিনশত টাকা বেতন করিয়া দেন।

প্রতি মাসে বীরসিংহের বিদ্যালয়ে শিক্ষকাদির বেতনে ৩০০ তিন শত টাকা ও শ্লেট পুস্তক প্রভৃতিতে ১০০ এক শত টাকা ব্যয় হইত। বালিকা বিদ্যালয় ও নৈশ-বিদ্যালয়ের ব্যয় মাসে চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ টাকার কমে হইত না। এই

* "নব্যভারত"—১৩০০ সাল, মাঘ ও ফাল্গুন মাস, ৫৪৬ পৃষ্ঠা।

সময় গ্রামের দীন-দরিদ্রের চিকিৎসার্থ দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হয়। সকলে বিনামূল্যে ঔষধ পাইত। বিনা দর্শনীতে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন। একান্ত অবস্থাহীন দীন দরিদ্র লোককে সাগু, বাতাসা প্রভৃতি দিবার জন্য ব্যবস্থা ছিল। তাহাতেও মাসিক এক শত টাকা খরচ পড়িত। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজে তিন শত টাকা মাত্র বেতন পাইতেন, এবং পুস্তকাদির বিক্রয়ে তাঁহার চারি-পাঁচ শত টাকা আয় হইত। তবে সঞ্চিত কিছুই থাকিত না! এইরূপে দান কার্য্যেই আয়ের পর্য্যবসান হইত। স্বভাবদাতা কি সঞ্চয়ের প্রত্যাশা রাখেন? বৃহত্তর হৃদয়ে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি প্রায়ই স্থান পায় না।

ষোড়শ অধ্যায়

স্কুল ইন্সপেক্টরী পদপ্রাপ্তি, নর্ম্মাল স্কুল, সফরে সহৃদয়তা, মাতৃনামে উচ্ছ্বাস, জননীর দয়া, আনুগত্য-পালন, বন্ধুর আদর, সংগ্রহে আগ্রহ, সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব, দান-পদ্ধতি, সংস্কৃত কলেজে ইংরেজির প্রসার ও শকুন্তলা।

১২৬২ সালে বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে মফঃস্বলে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা রাজপুরুষদের অভিপ্রেত হয়, তখন হালিডে সাহেব, বিদ্যাসাগরকে তাঁহার মতে যে প্রণালীতে বাঙ্গালা শিক্ষা হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রিপোর্ট লেখেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আসিষ্টাণ্ট স্কুল ইন্সপেক্টরী পদ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রিন্সিপালের পদ ছাড়া ইন্সপেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এ পদের বেতন দুইশত টাকা। মোট বেতন হইল পাঁচশত টাকা। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলার স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন করাই ইন্সপেক্টরের কার্য্য হইল।

ঐ বৎসর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। নর্ম্মাল স্কুলে পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, অন্যান্য স্কুলে শিক্ষকতা করিবার অধিকার জন্মিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং পরে পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নর্ম্মাল স্কুলের কাজ প্রথমে প্রাতঃকালে সংস্কৃত কলেজের প্রশস্ত ভবনে সম্পন্ন হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা সংশোধন করিয়া নিরস্ত হন নাই। তিনি নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ অক্ষয়কুমারবাবুকে প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"যে অপরিহার্য্য কারণে এবারে অক্ষয়বাবুকে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়, এস্থলে তাহার নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। শ্রীনাথবাবু ও অমৃতলালবাবুর অভিমতানুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়-বাবুকে ঐ কর্ম্ম দিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া ফেলেন। পরে অমৃতলালবাবু ইঁহাকে ঐ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে ইনি বলেন, 'আমি এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তত্ত্ববোধিনীর কার্য্য পরিত্যাগ করিলে পত্রিকাখানি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমি এ কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আপনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ কথা বলিবেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়বাবুর ঐ কার্য্য গ্রহণের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন, তাঁহাতে অক্ষয়বাবু বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, 'কেন? অমৃতলালবাবু কি আপনাকে কোন কথা বলেন নাই? আমি ও কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ও কার্য্য গ্রহণ করিলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাখানি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিমর্ষভাবে বলিলেন, 'এ বিষয়ের যে সমস্ত প্রায় নিরূপিত হইয়াছে। এরূপ হইলে আমাকে সাহেবের নিকট অপ্রতিভ হইতে হয়। আমি যে লোকের জন্য অনুরোধ করিয়াছি, বাস্তবিক সে ব্যক্তি সেই কর্ম্মের প্রার্থী নহেন, সাহেব এ কথা শুনিলে আমাকে অপদস্থ হইতে হইবে যিনি কর্ম্ম করিবেন, তাঁহার মত না লইয়া এরূপ করা আমার ভাল হয় নাই, এখন বুঝিতেছি।' অক্ষয়বাবু পরে বলিলেন,—'এখনও যদি ঐ বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নের কোনরূপ ত্রুটি করা না হয়।' বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। কিন্তু শেষে জানা গেল, পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাব করিবামাত্র ঐ কার্য্য অক্ষয়বাবুকে দিবারই ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইঁহাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে হইল।"—অক্ষয়-কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত। ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠা।

ইন্সপেক্টর হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, হুগলী, বৰ্দ্ধমান এবং নদীয়া জেলার অনেক গ্রামে বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অনেক স্থানের সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন লোকদিগকে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দেন।* তাঁহাকে তখন

* এই সময় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শেও অনেক স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও স্বগ্রামে (থানাকুল কৃষ্ণনগরান্তঃপাতী রাধানগরে) বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রায় মফঃস্বল পরিদর্শনে যাইতে হইত। পরিভ্রমণকালে পথে কোন পীড়িত চলৎশক্তিহীন লোককে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে, তিনি আপন পাল্কি হইতে অবতরণ করিয়া সেই আতুর লোককে পাল্কীর ভিতর তুলিয়া দিতেন এবং স্বয়ং পদব্রজে চলিয়া যাইতেন; পরে কোন চটি পাইলে, পীড়িত ব্যক্তিকে সেই চটিতে রাখিয়া, চটির কর্ত্তাকে টাকা-কড়ি দিতেন। পরিভ্রমণকালে তিনি সঙ্গে টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি রাখিয়া দিতেন; দরিদ্র লোককে অবস্থানুসারে তাহা দান করিতেন। দয়ার সীমা নাই। অভাব জানাইয়া কেহ কখন বিমুখ হইত না। কত অভিভাবকহীন বালককে যে তিনি পুস্তক, বস্ত্র, বেতন প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন, তাহার কি গণনা হয়? কোথাও গিয়া যদি শুনিতেন, অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কাহারও লেখাপড়া হইতেছে না, তাহা হইলে তিনি তখনই তাহাকে আপনার বাসায় আনাইয়া অথবা অন্য কোন রকম বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। শুনিয়াছি, একবার পরিদর্শনকালে ২৪ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নিবাধই-দত্তপুকুর নিবাসী কালীকৃষ্ণ দত্তের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে একটী দীন-হীন অনাথ ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাতর-কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে আপনার অভাব ও দুঃখের কথা নিবেদন করে। তাহার অবস্থার কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি পরে সেই ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আপনার বাসায় আনাইয়া তাহার লেখা-পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এইরূপ কত জনের অন্নসংস্থান ও অভাব মোচন হইয়াছে, তাহা কত বলিব? কলিকাতার বাসায় এবং বীরসিংহ গ্রামের বাড়ীতে প্রত্যহ শতাবধি লোক অন্ন পাইত। অনেকের লেখাপড়া শিখিবার ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেন।

কেহ বিদ্যাসাগরের নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া, প্রায় রিক্তহস্তে ফিরিত না। কেহ যদি ভিক্ষা করিতে গিয়া বলিত,—"আমার মা নাই", তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। মাতৃপরায়ণ বিদ্যাসাগর তখন শতকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সেই মাতৃহীন ভিক্ষুককে যাচ্ঞাতীত সাহায্য করিতেন। "মা নাই" শুনিলে বিদ্যাসাগর, বিচারাচার করিতেন না, এ কথা অনেকেই জানিতেন। তাঁহার একজন প্রতিবেশী মুদী একবার একটী ভিক্ষুককে শিখাইয়া দিয়াছিল,—"বলিস্ আমার মা নাই।" বস্তুতঃ তাহার মা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কারণে জানিতে পারেন, ভিক্ষুকের কথা মিথ্যা। সে যে মুদী দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন। ভিক্ষুককে

তিনি বঞ্চিত করেন নাই; পরন্তু পুনরায় এরূপ মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়া দেন। প্রকৃতই অনেকেই মা নাই বলিয়া, তাঁহার নিকট ফাঁকি দিয়া অর্থ লইত।

"মা" নামে বিদ্যাসাগর মন্ত্রমুগ্ধ হইতেন। "মা"ই যে তাঁহার জীবনের সাধন-মন্ত্র ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গানবাজনায় বড় সখ ছিল না। তবে কেহ কখন "মা" "মা" বলিয়া গান গাহিলে, তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। গায়ককে তিনি যেন বুকের কলিজার ভিতর পুরিয়া রাখিতেন। একজন অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক, বেহালা বাজাইয়া শ্যামা সঙ্গীত গাহিত। সে সঙ্গীতে "মা" "মা"-ধ্বনি থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ডাকাইয়া প্রায়ই তাহার গান শুনিতেন। গান শুনিতে শুনিতে তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেন না। এই মুসলমান-ভিক্ষুক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সময় সময় যথেষ্ট সাহায্য পাইত। একবার ইহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে গৃহনির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈবাহিক (কনিষ্ঠা কন্যার শ্বশুর) ৺জগদ্দুর্ল্লভ চট্টোপাধ্যায় ভাল গাহিতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রায়ই বাড়ীতে আহ্বান করিয়া তাঁহার গান শুনিতেন; অন্য গান শুনিতেন না; কেবল যে গানে "মা" "মা" থাকিত, সেই গানই শুনিতেন। গানে সখ্ ছিল না; কিন্তু মাতৃনামপূর্ণ গানে প্রাণ মাতিয়া উঠিত। মাতৃ-ভক্তের এমনই প্রাণ বটে!

বিদ্যাসাগর যেমন, তাঁহার পিতামাতাও তদ্রূপ। অন্নদানে পিতার অপার আনন্দ। প্রতিপাল্য অন্নার্থীদিগের জন্য তিনি প্রত্যহ স্বয়ং বাজার-হাট করিয়া আনিতেন। আর অন্নপূর্ণারূপিণী বিদ্যাসাগর-জননী অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিতেন। এ সম্বন্ধে, অনেক কথা শুনা যায়। নারায়ণবাবু বলিয়াছেন,—"ঠাকুর-মা গ্রামের অবস্থাহীন চাষাভুযো লোককে টাকা কড়ি ধার দিতেন। যাহারা সহজে ধার শুধিতে পারিত না, তিনি স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে টাকা আদায় করিতে যাইতেন; কখন কখন খুব চটিয়া গিয়া টাকা চাহিতেন। বলিতেন,—'তোরা যদি টাকা না দিবি, তবে আমি আর কি করে টাকা ধার দিব?' তাঁহাকে রাগিতে দেখিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে নানা কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা দু-ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া দুঃখের কথা জানাইত; আর কেহ বা বিদ্যাসাগরের নাম করিয়া ভগবানের কাছে, তাঁহার মঙ্গল কামনা করিত। তখন ঠাকুর-মার রাগ থাকিত না। আগুন জল হইয়া যাইত। তিনি তখন বলিতেন,—'ভাল ভাল, যখন সুবিধা হ'বে, তখন দিস্।

আজ কিন্তু আমার বাড়ীতে চারিটী প্রসাদ পাস্।' কৃষককন্যারা তাঁহাকে আদর করিয়া মুড়ি, নারিকেল, বাতাসা প্রভৃতি জলখাবার দিলে, তিনি আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া আসিতেন। ঠাকুর-মা প্রত্যহ মধ্যাহ্নে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া এবং আশ্রিত অতিথিদিগকে আহারাদি করাইয়া, বাড়ীর দরজার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন। হেটোরা হাট হইতে ফিরিবার সময় দরজার সম্মুখ দিয়া যাইলে, তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। কাহারও মুখখানি শুক্নো দেখিলে তিনি বলিতেন,—'আহা! আজ বুঝি তোর খাওয়া হয় নি? আয়্ আয়্, আমার বাড়ীতে খাবি আয়।' ঠাকুর-মা বড় বড় মাছ ভালবাসিতেন। মাছ কুটিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইবেন, এই তাঁর সাধ। এইজন্য ঠাকুর-মা কখন কখন ঠাকুরদাদার উপর রাগ করিলে, ঠাকুরদাদা বড় বড় মাছ আনিয়া তাঁর মান ভঞ্জন করিতেন। কোন দিন যদি ঠাকুর-মা রাগ করিয়া ঘরের দরজা দিয়া শুইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ঠাকুরদাদা যেখান হইতেই হউক, একটা বড় মাছ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ঘরের দরজায় মাছটাকে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিতেন। ঠাকুর-মা ঘরের ভিতর হইতে মাছ-আছড়ানির সাড়া পাইয়া তখন খিল খুলিয়া বাহিরে আসিতেন এবং হাসিতে হাসিতে আপনি মাছ কুটিতে বসিতেন।"

যাহাকে যেরূপ সাহায্য করিলে উপকার হইত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার জন্য তাহাই করিতেন। ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অনেক পাঠকেরই পরিচিত। ইনি হিন্দু স্কুল হইতে ৪০৲ চল্লিশ টাকার বৃত্তি পাইয়া, কলেজের শিক্ষক হইয়াছিলেন। সে কার্য্যে সুবিধা না হওয়ায়, তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে পদত্যাগ করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আপনার বাসায় আনেন এবং পরে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া হিন্দু স্কুলে তাঁহার একটী চাকুরী করিয়া দেন। এই প্রসন্নবাবু পরে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমারবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বীরসিংহ গ্রামে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অধিক বয়সেও প্রসন্নবাবুর নিকট ইংরেজি পড়িতেন।

কি আত্মীয়-পরিজন, কি ভ্রাতা-ভগিনী, কি বন্ধু-বান্ধব সকলের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় সমান প্রীতিমান্ ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্যামাচরণ বিশ্বাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। ইঁহার বাড়ী সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে? ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান,

হুগলী জেলার অন্তর্গত পাঁইতেল গ্রামে। উহা কলিকাতা হইতে আট নয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্যামাচরণবাবুর অনুরোধে একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় পাঁইতেল গ্রামে গিয়াছিলেন। লেখকের পিতৃ-মাতুলালয় এই পাঁইতেল গ্রামে। পূজনীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁইতেলে গিয়া তত্রত্য অনেক দীন দরিদ্রকে দান করিয়াছিলেন। পাঁইতেল ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য দলে দলে বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পাঁইতেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হন। জ্বরের সঙ্গে নানা রোগের সঞ্চার হয়। শুনা যায় এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, নস্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন ; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি নস্য ছাড়িয়া দেন। তিনি ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সে তামাক ধরিয়াছিলেন। নারায়ণবাবু বলেন,—"বারাসত নিবাসী ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্রের সহিত বাবার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য ছিল। ইঁহার সহোদর কালীকৃষ্ণবাবুও বাবার বন্ধু ছিলেন। নবীনবাবু কলিকাতায় ঝামাপুকুরে থাকিতেন। বাবা প্রায়ই তাঁহার বাসায় যাইতেন। নবীনবাবু বড় তামাকপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি বাবাকে তামাক খাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বাবা কিছুতেই তামাক খাইতে সম্মত হন নাই ; কিন্তু নবীনবাবু তাঁহাকে একবার তামাক না টানাইয়া ছাড়িলেন না। পর দিন নবীনবাবুকে আর তামাক খাইবার কথা বলিতে হয় নাই। বাবা স্বয়ংই হুকুম করিয়া তামাক আনাইলেন। বন্ধু নবীনবাবু কিন্তু সে তামাকের কলিকা পাইলেন না। এই সময় হইতে বাবা তামাকে অভ্যস্ত হন। তিনি তামাক ও পান বড় ভালবাসিতেন। বাবা তামাক খাইতেন বটে ; কিন্তু ইহার জন্য চাকর চাকরাণীকে কখন বিরক্ত করিতেন না। চাকরগুলো ঘুমাইয়া পড়িলে বা ক্লান্ত হইলে, তিনি কাহাকেও না ডাকিয়া স্বয়ং তামাক সাজিয়া খাইতেন। কেবল তামাক কেন, তিনি পানও স্বহস্তে সাজিয়া খাইতেন। পানের সুপারি কাটা থাকিত ; খয়ের চূণ প্রভৃতি অন্যান্য মসলা থাকিত, তিনি পান চিরিয়া সাজিয়া খাইতেন। উদ্বৃত্ত সুপারির কুচিগুলি শিশির ভিতর পুরিয়া রাখিতেন। এখনও সুপারির কুচি-ভরা অনেক শিশি আছে। কেবল সুপারির কুচি কেন, টুক্‌রো দড়ি, টুক্‌রো কাগজ, কোন জিনিসই তিনি ফেলিতেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"যাকে রাখ, সেই রাখে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে বীটন্ সাহেবের স্মরণার্থ "বীটন্-সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় তল্লিখিত সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক

প্রস্তাব প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।* এই প্রবন্ধ ১৯১৩ সংবতের ১৪ই চৈত্র বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল ; সংস্কৃত ভাষা,—সাহিত্যশাস্ত্র,— মহাকাব্য)—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধ-চরিত, ভট্টিকাব্য রাঘবপাণ্ডবীয়, গীত-গোবিন্দ ; (খণ্ডকাব্য)—মেঘদূত, ঋতুসংহার, নলোদয়, সূর্য শতক ; (কোষকাব্য)—অমরুশতক, শান্তিশতক, নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক, আর্য্যাসপ্তশতী ; (চম্পূকাব্য)—কাদম্বরী, দশকুমার-চরিত, বাসবদত্তা ; (দৃশ্য-কাব্য)—অভিজ্ঞান-শকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বীরচরিত, উত্তর-চরিত, মালতী-মাধব, রত্নাবলী, নাগানন্দ, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার ; (নীতি গ্রন্থ)—পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং কথাসরিৎসাগর।

১২ পেজি ডিমাই আকারে ৮৯ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। বিষয়-বিবেচনায় আলোচনায় যে অতি সংক্ষিপ্তসার হইয়াছে, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"এই প্রস্তাব প্রথমতঃ, কলিকাতাস্থ বীটন্ সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে, এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুত ডাক্তার মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।

"যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সে প্রস্তাব সে সমাজের স্বত্বাস্পদীভূত হইয়া থাকে ; এজন্য আমি উক্ত ডাক্তার মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি, অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে বিনামূল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে, আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

"আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক কোনও ক্রমেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে। ...বীটন সোসাইটিতে, এক ঘণ্টা মাত্র সময় প্রস্তাবপাঠের নিমিত্ত, নিরূপিত আছে ; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয় সে বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।"

* শুনা যায় ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু অনবকাশহেতু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, ইহা বঙ্গের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও ভাষা প্রাঞ্জলতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া অবধি বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দুঃস্থ ও নিঃস্ব ব্যক্তির মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর ও তৎপিতার আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্ল্লভ সিংহের মৃত্যুর পর সিংহ পবিপারের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপুত্র ভুবনমোহন সিংহের ত্রিশ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ভুবন সিংহের জামাতার প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল। জামাতা প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্যামাচরণ ঘোষাল নামক এক আত্মীয়ের ১০৲ টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মাসহারা বন্দোবস্ত অনেকরই ছিল। মাস-হারা ব্যতীত অনেকে অন্য প্রকারে সাহায্য পাইত। সকল জানিবার উপায় নাই। কেননা, পাছে লজ্জা পায় বলিয়া অনেককেই তিনি গোপনে গোপনে সাহায্য করিতেন। নারায়ণবাবু বলেন,—"বাবা অনেককে সাহায্য করিতেন বটে; দেখিতাম, অনেকেই তাঁহার নিকট সাহায্য লইতে আসিতেন; কিন্তু তাঁহাদের অনেকের নামধাম জানিতাম না; এমন কি, অনেক দানের কথা খাতায় খরচ পর্য্যন্ত লেখা হইত না, তবে যাঁহাদের মাসিক বন্দোবস্ত ছিল, তাঁহাদের নাম পাওয়া যায়।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন কলেজে ইংরেজি পড়িবার ব্যবস্থা ছিল বটে; কিন্তু তাহার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় তাহার প্রাদুর্ভাব হয়। নিয়ম হইল, সংস্কৃত পরীক্ষায় যেরূপ নম্বর রাখিতে হয়, ইংরেজিতে সেরূপ নম্বর রাখিতে হইবে। কাজেই, তখন ছাত্রগণ ইংরেজি শিক্ষায় পূর্ব্বাপেক্ষা মনোবিবেশ করিল। সেই হইতে রীতিমত ইংরেজি শিক্ষা চালাইবার উদ্দেশ্যে ভাল ভাল ইংরেজি শিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ দাস, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরেজি-বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ তাঁহার সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সংস্কৃত শিক্ষাস্রোত অনেকটা তেজোহীন হয়। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে আপত্তি তুলিয়া যিনি ইহাকে ইংরেজি স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ

দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় তাঁহার প্রেতাত্মার অর্দ্ধাধিক তৃপ্তি হইয়াছিল, অধুনা প্রায় পূর্ণ।*

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব সচিব এবং বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নীলাম্বর ভবিষ্যতে বড় লোক হইবেন।†

পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে লীলাবতী ও বীজগণিত পড়ান হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার স্থানে ইংরেজিতে অঙ্ক শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাৎকালিক বীজগণিতের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে সিবিল আইন শিক্ষা করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুন্সেফ পদ পাইয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর বা ১২৬১ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা "শকুন্তলা' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহা সংস্কৃত "অভিজ্ঞান শকুন্তলে"র অনুবাদ। এ অনুবাদ অবশ্য নাটকাকারে নহে। অনেক স্থলে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ ; অনেক স্থলে ভাবানুবাদ। বলা বাহুল্য, শকুন্তলার এমন অনুবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "শকুন্তলা" পড়িয়া "অভিজ্ঞান শকুন্তলে"র মাহাত্ম্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

এই শকুন্তলায় দোষগুণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা সংক্ষেপে এইখানে বলিব,—অভিজ্ঞান শকুন্তলের বহু কবিত্বসৌন্দর্য্য পরিত্যক্ত হইলেও, গদ্যাংশের সঙ্গতি-সৌন্দর্য্য অব্যাহত আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেক স্থলে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ, অনেক স্থলে ভাবানুবাদ। ভাবানুবাদের দুই চারিটীর উল্লেখ করিলাম,—সর্ব্বপ্রথমে নান্দী, প্রস্তাবনা ও পাত্র প্রবেশ পরিত্যাগ করিয়া, তাহার স্থানে "অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট" ইত্যাদি আছে, ১২ পৃঃ ৭ পংক্তি হইতে ৮।৯ পংক্তি। ১৭ পৃঃ শকুন্তলার নামকরণটী মহাভারত হইতে

* সংস্কৃত কলেজের পরিণাম-স্মরণে দুঃখ করিয়া একদিন ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বলিয়াছিলেন,—"হায়! সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সেই সুখের সময় এবং বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন স্মরণ করিলে প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। কি শোচনীয় পরিণাম!"—শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবনচরিত। ৭৮ পৃষ্ঠা।

† নীলাম্বরবাবু উচ্চপদ পাইয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভুলিয়া যান নাই। তিনি সেখান হইতে প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্রাদি লিখিয়া নানা বিষয়ের পরামর্শ লইতেন। পদত্যাগের সময় নীলাম্বরবাবু পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইয়াছিলেন।

গৃহীত না হইলে মিষ্ট হয় না। ১৯ পৃঃ ১১ পংক্তি। ২য় পরিচ্ছেদে ২২ পৃঃ প্রথমাবধি ৮ পংক্তি পর্য্যন্ত। ৩য় পরিচ্ছেদে প্রথমাবধি ১০ পংক্তি। স্থূলতর এইগুলি দেখিলাম। নাটকের গৌরবরক্ষার্থ যাহা লেখা হয়, তাহা নাটকেই ভাল লাগে, এমন বিষয় অনেক পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুই একটী দেখাই,—"যদালোকে সূক্ষ্মং—" ইত্যাদির অনুবাদ। ষষ্ঠ অঙ্কে "মিশ্রকেশীর অবতারণা" ইত্যাদি। অনুবাদের কৃতিত্ব বুঝাইবার জন্য দুই-একটী দৃষ্টান্ত দিলাম,—

"নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ ॥
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥

—অভিজ্ঞান শকুন্তলং ॥ প্রথমোঙ্কঃ।

অনুবাদ,—'কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে, তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে ঐ দেখ, কুরুভূমিতে হরিণশিশু সকল নিঃশঙ্কচিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে এবং যজ্ঞীয় ধূমের সমাগমে নব পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে।"

কি সুন্দর মধুর অনুবাদ এমন সুন্দর অনুবাদ সর্ব্বত্রই। এ অনুবাদের তুলনা নাই। অভিজ্ঞান শকুন্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই শকুন্তলার বাঙ্গালা তেমনই মধুর। এক কথায় বলি, অভিজ্ঞান শকুন্তল পড়িয়া যাহা বুঝি নাই, ইহাতে তাহা বুঝিয়াছি। শকুন্তলার দুষ্মন্তভবনে গমন কালে, শকুন্তলা, মহর্ষি কণ্ব ও সখিদ্বয়ের শোকভাব এমনই সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। মহর্ষি কণ্বের মর্ম্মস্পর্শিনী,—বৈক্লব্যং মমতাবদীদৃশমিদং—কি মর্ম্মান্তিক করুণভাবে অনুবাদিত হইয়াছে।

দুই-এক স্থানে পরিবর্ত্তনে অসাবধানতা ঘটিয়াছে এক স্থানের পরিহারে হিন্দু-সন্তানের আক্ষেপ করিবার কথা আছে।

শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের সম্মিলন সময়, গৌতমী যখন শকুন্তলাকে অসুস্থ ভাবিয়া দেখিতে আসেন, তখন রাজা সরিয়া গিয়া আত্মগোপন করেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলে, এই কথাটী আছে,—"আত্মানামাবৃত্য তিষ্ঠতি"। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইখানে লিখিয়াছেন,—"লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।" এইখানে অসাবধানতা। শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে হইলে, গৌতমীকেও ত নিরীক্ষণ করা যায়। গৌতমীকে নিরীক্ষণ করান অসঙ্গত। কেননা, এই গৌতমী শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তালয়ে

গিয়াছিলেন। অভিশাপ-প্রভাবে রাজা শকুন্তলাকে যেন ভুলিয়া গিয়াছেন, সঙ্গী ঋষি-শিষ্যদ্বয় শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতকে রাজা কখন দেখেন নাই, সুতরাং রাজা তাঁহাদিগকে যেন চিনিতে পারিলেন না। গৌতমীকে রাজা দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ত কোন অভিশাপ ছিল না চিনিবেন কিসে? কবি কালিদাস, ভবিষ্যতের এই অসঙ্গতি বুঝিয়া বলিয়া রাখিয়াছিলেন, রাজা আত্মগোপন করিয়াছিলেন; "নিরীক্ষণে''র কথা বলেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন অসাবধান হইলেন, বলিতে পারি না।

শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তপুরে যাইবার উদ্যোগ করেন, তখন তাঁহাকে সজ্জিত করিবার জন্য, কবি কালিদাস দেব-প্রদত্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋষিশক্তি বা ব্রাহ্মণ্য-মহিমা বুঝাইবার জন্য কালিদাসের এই সৃষ্টি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; হিন্দুসন্তানের ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি?

সপ্তদশ অধ্যায়

বিধবা-বিবাহ*

এইবার সেই বিরাট ব্যাপার; তাহাতে হিন্দুসমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘোরতর অখ্যাতি, এবং অহিন্দু ও অহিন্দুভাবাপন্ন সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি; সুতরাং যাহার জন্য তাঁহার নাম বিশ্বব্যাপী; এবার সেই বিধবা-বিবাহের কথা আসিয়া পড়িল। এ সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে সবিস্তার সমালোচনার স্থান হইবে না; তবে এইখানে এই পর্য্যন্ত বলাই পর্য্যাপ্ত যে, তিনি এতদর্থে যেরূপ অটুট অধ্যবসায়-সহকারে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হন নাই। এ অহিন্দু আচার হিন্দুসমাজে যে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই, ইহা হিন্দুসমাজের সম্যক্ সৌভাগ্যের পরিচয় বলিতে হইবে। কারুণ্য প্রাবল্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মসংযমে সমর্থ হন নাই। তাই তিনি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে এই অকীর্ত্তিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রাহার্থ শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য অনেকে তাঁহাতে শাস্ত্রানুরাগিতা

---

* হিন্দু রমণীর একবার বিবাহ হইবার পর আর বিবাহ হইতে পারে না। হিন্দু বিবাহের পবিত্র ভাব হিন্দু বুঝে। হিন্দু স্ত্রী-স্বামীর সম্বন্ধ ইহ-পরকালের। হিন্দু রমণীর পতিবিয়োগের পর বিবাহ হইতে পারে না; সুতরাং 'বিবাহ' কথার প্রয়োগ করা চলে না। আজকাল 'বিবাহ কথা' চলিয়া গিয়াছে, তাই সেই কথা রহিল এ বিবাহ হিন্দুর বিবাহ নহে।

আরোপিত করেন ; কিন্তু অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। শেষোক্তের মতে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে, তিনি স্বেচ্ছামতে ও সজ্ঞানে অকার্য্য করিবার লোক নহেন। ভ্রান্তবিশ্বাস মূলাধার। সারল্য ও কারুণ্যের পরিচয় পদে পদে।

বাল-বিধবার দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় ব্যথিত হইতেন। তাই তিনি বাল্যকাল হইতে বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন।

বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের প্রবৃত্তি কেন হইল, তৎসম্বন্ধে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁহার স্বগ্রামবাসী স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ মহাশয়কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এইখানে উদ্ধৃত হইল,—

"বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী বাল্য-সহচরী ছিল। এই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। বালিকাটী বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্ব্বদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয় ; কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটী বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বাড়ী যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল ? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্যসহচরী কিছু খায় নাই ; সে দিন তাহার একাদশী ; বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব ; যদি বাঁচি, তবে যাহা হয়, একটা করিব তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩।১৪ বৎসর মাত্র হইবে।"

৺আনন্দকৃষ্ণবাবু বলিয়াছিলেন,—"কোন বালিকা বিধবা হইয়াছে শুনিলে, বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এই জন্য তাঁহাকে বলিতাম, তুমি কি ইহার কোন উপায় করিতে পার না ? তাহাতে তিনি বলিতেন, শাস্ত্র প্রমাণ ভিন্ন বিধবা-বিবাহের প্রচলন করা দুষ্কর। আমি শাস্ত্র প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

শাস্ত্রানুসারে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করা বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু প্রথমতঃ তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু বলেন,—"১২৬০ সালের বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে এক দিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আমি একত্র বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতে-

ছিলাম। তিনি একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি পরাশর-সংহিতা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দ বেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন,—'পাইয়াছি, পাইয়াছি।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'কি পাইয়াছ?' তিনি তখনই পরাশর-সংহিতার সেই শ্লোকটী আওড়াইলেন,*—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে।'

বিধবা-বিবাহের ইহাই অকাট্য প্রমাণ ভাবিয়া, তিনি তখন লিখিতে বসিয়াছিলেন। সারা রাত্রি লিখিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পরে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন।†

সহরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকেই বাদ-প্রতিবাদের ধূম লাগিয়া গেল। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় গুরুতর পরিশ্রম সহকারে নানা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। এক একটি শ্লোকের অর্থ-নির্ণয় করিতে কখন কখন সারা রাত্রি কাটিয়া যাইত। ১২৬০ সালের ১০ই মাঘ বা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।' নামক ২২ পৃষ্ঠায় একখানি পুস্তিকা লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় লিপিচাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এক সপ্তাহ কালের মধ্যে এই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

অতঃপর যে আলোচনা হইয়াছিল, ৺আনন্দকৃষ্ণবাবু তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—"বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না, এই সম্বন্ধে পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিদ্যাসাগর আমাদের বাড়ীতে আসেন। তাঁহার পুস্তিকার সুন্দর লিপিচতুরতা ও তর্ক-প্রখরতা দেখিয়া আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। আমরা বলিলাম,—'এখন তুমি পুস্তিকা প্রচার করিয়া তোমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা

---

* ১২৯৮ সালের ৬ই ভাদ্র বা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট হিতবাদীতে ডাক্তার ৺অমূল্যচরণ বসু লিখিয়াছিলেন—তিনি স্কুল পরিদর্শনে কৃষ্ণনগরে গমন করেন। তথাকার রাজবাটীতে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে কথা উঠে। সেই আদর্শ ফলেই 'পরাশর-কৃত' এই বচনটী শুনিতে পাইলেন। অমূল্যবাবু স্বয়ং টীকা করিয়া লিখিয়াছেন,—"এ বিষয় কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বা অন্য সূত্রে শুনিয়াছিলাম, আমার ঠিক স্মরণ নাই। সুতরাং ইহার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না! এরূপ অবস্থায় রাজকৃষ্ণবাবুর কথাই প্রমাণ।

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, ঐ পত্রিকায় উহার আদ্যন্ত মুদ্রিত করেন।

কর।' বিদ্যাসাগর বলিলেন,—'যখন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ইহার জন্য প্রাণান্ত পণ জানিও। ইহার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিব। তবে তোমার মাতামহ যদি সহায় হন, তবে এ কার্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও সহজে সিদ্ধ হইবে। সমাজে ও রাজদরবারে তাঁহার যেরূপ সম্মান, তিনি সহায় হইলে, সমাজে সহজে আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে।'* আমি বলিলাম, 'দাদা মহাশয়ের সম্মুখীন হইয়া, এ কথা বলিতে সাহস হয় না। তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসেন সত্য; তাঁহার নিকট এরূপ সামাজিক কথার উত্থাপন করাকে ধৃষ্টতা মনে করি। তুমি স্বয়ং একখানি পত্র লিখিয়া একখণ্ড পুস্তিকা তাঁহার নিকট প্রেরণ কর।' বিদ্যাসাগর আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পত্রসহ একখণ্ড পুস্তিকা মাতামহ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। মাতামহ মহাশয় তাঁহার পুস্তিকা পড়িয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া বলেন,—'দেখ তুমি যে প্রণালীতে পুস্তিকা লিখিয়াছ, তাহা অতি মনোহর। তবে আমি বিষয়ী লোক, এ সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করা আমার সাধ্যাতীত এবং অসঙ্গত। এক দিন পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে বিচার করাইবার ইচ্ছা করি। তুমি যদি সম্মত হও, তাহা হইলে দিন ধার্য্য করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করি।' বিদ্যাসাগর সম্মত হইলেন। নির্দ্ধারিত দিনে অনেক পণ্ডিত ও বিদ্যাসাগর আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে দিন কোন মীমাংসা হয় নাই বটে, তবে, বিদ্যাসাগরের তর্কপ্রণালীতে মাতামহ মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একখানি শাল উপহার দিয়াছিলেন।† বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত হইতে দেখিয়া, তাৎকালিক সমাজপতিরা সিদ্ধান্ত করিলেন, রাজা রাধাকান্তদেব বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী। একদিন বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের প্রধান ব্যক্তিপ্রমুখ সমাজপতিরা মাতামহ মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন,—'আপনি কি সর্ব্বনাশ করিলেন! আপনি কি হিন্দু-সমাজে-বিধবা বিবাহরূপ পাপ প্রথার প্রচলন করিতে চাহেন? বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত করিলেন কেন?' ইহাতে মাতামহ মহাশয় উত্তর দিলেন,—'আমি বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী নহি। আমার তাহাতে অধিকার কি? আমি বিষয়ী লোক, শাস্ত্রবিচারের বা কি জানি তবে বিদ্যাসাগরের তর্ক-প্রণালীতে তুষ্ট হইয়া,

* বাস্তবিকই সমাজে-রাজদরবারে তখন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের যেরূপ সম্মান ছিল, সেরূপ আর অল্প লোকের ছিল। তাঁহার পিতামহ রাজা নবকৃষ্ণ গোষ্ঠীপতি হইয়া সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। এইজন্য সমাজে রাজা রাধাকান্ত দেবেরও যথেষ্ট সম্মান ছিল। তিনি নিজ বুদ্ধিবলে রাজদরবারের সম্মান পাইতেন।

† বার্দ্ধক্যে স্মৃতিহ্রাস জন্য এই শাল-উপহারের কথা আনন্দবাবু দৃঢ় করিয়া বলেন নাই।

তাঁহাকে শাল পুরস্কার দিয়াছিলাম। ভাল, এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা করিয়া, আর একদিন বিচার করাইলেই হইবে।' অতঃপর আমাদের বাড়ীতে আর একদিন পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা হইয়াছিল। ঐ দিন নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যাবত্ন উপস্থিত ছিলেন। এ দিনেও বিচারে কিছুই মীমাংসা হয় নাই। বিচারকালে কেবল একটা গণ্ডগোল হইয়াছিল মাত্র। এ দিন মাতামহ মহাশয়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে শাল পুরস্কার দিয়াছিলেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন, মাতামহ মহাশয়ের নিকট তিনি কোনরূপ সাহায্য পাইবেন না। তাহাতেও ব্রাহ্মণ বিচলিত হন নাই। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, অটুট-বিক্রমে, অটল-সাহসে, আপন কর্ত্তব্য-সাধনে আত্ম-সমর্পণ করেন। সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন করাই তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞা। সে বিরাট পুরুষের সে প্রতিজ্ঞা কে ভঙ্গ করিতে পারে? ব্যূহ-বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় বিদ্যাসাগর সংসার-সংগ্রামে বিপক্ষ-বেষ্টিত হইয়া, অসমসাহসে অকুতোভয়ে শত্রুপক্ষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের তাৎকালিক ভীষণ সংগ্রামমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমরা বাস্তবিকই বিস্ময়াভি-ভূত হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, ইহার পর বিদ্যাসাগর আমাদের বাটীতে বড় আসিতেন না। মাতামহ মহাশয় তাঁহার জীবন-ব্রতের সহায় না হইলেও তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।"

বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার পর চারিদিকেই নানা পণ্ডিত-সমাজ হইতে ইহার প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। মুরশিদাবাদের বৈদ্য-প্রধান গঙ্গাধর কবিরাজ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। সে সময়ে যে সকল প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সকল সংগ্রহ করিতে পারি নাই, যে কয়খানি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাদের নাম এইখানে প্রকাশ করিলাম—

"বিধবা-বিবাহের নিষেধক বিচারঃ।"—শ্রীউমাকান্ত তর্কলঙ্কার-সংশোধিতঃ। আঁটপুরনিবাসি দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীতঃ পুনঃপ্রকাশিতশ্চ —"বিধবা বিবাহ-নিষেধক-প্রমাণাবলী। দ্বিতীয়া।" কাশীপুরবাসি শ্রীশশিজীবন তর্করত্ন ও শ্রীজানকীজীবন ন্যায়রত্ন সংগৃহীতা। সপ্তক্ষীরাবাসি শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ রায়-চতুর্ধুরীণাদেশতঃ। —"পৌনর্ভবখণ্ডনম্ অর্থাৎ শ্রীমদীশ্বর-বিদ্যাসাগরেণ কলৌ বিধবা-বিবাহ প্রচলিতার্থনির্ম্মিতনিবন্ধস্য প্রত্যুত্তরম্।" শ্রীমৎ কালিদাস মৈত্র বিরচিতম্—"শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কল্পিত বিধবা-বিবাহ

* বার্দ্ধক্যে স্মৃতিহ্রাস জন্য এই শাল-উপহারের কথা আনন্দবাবু দৃঢ় করিয়া বলেন নাই।

ব্যবস্থার বিধবোদ্বাহ বারকঃ।" শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্যের মতানুসারে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্রেয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।— "বিধবা-বিবাহ-প্রতিবাদ।" শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে।" শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ-ভ্রমসূচক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিতসম্মত প্রত্যুত্তর। "ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিত সভা হইতে বিধবা-বিবাহবাদ প্রথমখণ্ড।" "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর।" —শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদ্‌গণ কর্ত্তৃক শ্রুতিস্মৃত্যাদি প্রমাণাবলী সংকলনপূর্ব্বক লিখিত। "বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত নহে।" "বিচিত্র স্বপ্নবি রণম্।" শ্রীপীতাম্বর কবিরত্ন বিরচিতম্। "বিধবা-বিবাহ-নিষেধ-বিষয়িনী ব্যবস্থা।"*

যশোহর হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা ও কলিকাতা ধর্ম্ম-সভা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত বিধবা-বিবাহ প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ হইয়াছিল। যশোহর হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ সংবৎসরিক অধিবেশনের সময় নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যায় আহূত হন। সকলেই বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় ও অকর্ত্তব্য বলিয়া বক্তৃতা করেন। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া উপযুক্ত ভাইপো প্রণীতম "ব্রজবিলাস" এবং উপযুক্ত ভাইপোসহোচর প্রণীত "রত্নপরীক্ষা" নামক দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই দুই খানি পুস্তকের প্রকৃত গ্রন্থাকারের নাম নাই। রাষ্ট্র এইরূপ, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রণেতা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণবাবু আমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত সমুদায় পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাহার মধ্যে "রত্নপরীক্ষা" প্রাপ্ত হইয়াছি। "ব্রজবিলাস" ও "রত্নপরীক্ষা"য় পণ্ডিতগণের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে। ইহাদের ভাষা-ভাব বদরসিকতায় পূর্ণ। যদিও রাষ্ট্র, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ গম্ভীর-চরিত্র লোক এরূপ চপলতা করিবেন, ইহা প্রত্যয় করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যশোহর-ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহারই প্রতিবাদ করিয়া "বিনয় পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের নাম নাই। রাষ্ট্র, ইহাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত। ইহাতে

---

* গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক বিধবা-বিষয়িণী পুস্তিকা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীতে প্রেরিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর তাৎকালিক সম্পাদক উইলিয়ম থিওবোল্ড ইহার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য নির্ণয়ার্থ ধর্ম্মসভার মত চাহেন। ধর্ম্মসভা তদুত্তরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই লইয়া এই পুস্তিকা।

নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে। ইহার ভাষা ও ভাব আলোচনা করিলে, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহাও চপলতাদোষে সম্পূর্ণ কলঙ্কিত। তবে নারায়ণবাবুর নিকট হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বলিয়া যে সব পুস্তক উপহার পাইয়াছি, তাহার মধ্যে এ পুস্তকও ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-বিষয়িণী পুস্তিকা প্রচারিত হইবার পর, তৎপ্রতিবাদে যে সব পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশেই গভীর একটা যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র-বাক্যের সমাবেশ হইয়াছিল। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকা যেরূপ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছিল এবং তাঁহার যুক্তিখ্যাপন যেরূপ সহজ প্রণালীতে সমাবেশিত হইয়াছিল, এ সব পুস্তকে সেরূপ হয় নাই। যথার্থ শাস্ত্রদর্শী শাস্ত্রশাসিত ব্যক্তিদিগের নিকট এ সব পুস্তকের আদর হইয়াছিল। তবে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী তাৎকালিক ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা এই সব পুস্তক উপেক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই জয় ঘোষণা রাজপুরুষদিগের কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রাজপুরুষদের সঙ্গে তাৎকালিক ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না।

এই সময়ে সমাজে তিন সম্প্রদায়ের সংঘর্ষণ চলিয়াছিল। প্রথম সম্প্রদায়—, শাস্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণ-পরিচালিত হিন্দু, ইঁহারা বিধবা-বিবাহের ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়,—ইংরেজি-শিক্ষিত প্রৌঢ় হিন্দু-সন্তান। ইঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তৃতীয় সম্প্রদায়,—ইংরেজি-শিক্ষিত, ইংরেজি সভ্যতানুপ্রাণিত হিন্দু-সন্তান। ইঁহারা বিধবা-বিবাহের প্রগাঢ় পক্ষপাতী। ইঁহাদের দুন্দুভিনাদে বিদ্যাসাগরের জয়বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছিল। এখনও এইরূপ সম্প্রদায়ের সংঘর্ষণ চলিতেছে।

তবে এখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেককে শাস্ত্র-পথে চলিতে দেখা যায়। এরূপ মতিগতি বেশী দিন থাকিবে না। এক দিন শাস্ত্রাচারের বিলোপ হইবে, ইহা শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী। তবে এখনও সমাজ যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে বিধবা-বিবাহ যে শীঘ্র প্রচলিত হইবে না, তাহা বুঝা যাইতেছে। তখন ব্রাহ্মণ-পরিচালিত হিন্দুর প্রাধান্য জন্য বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয় নাই; এখনও হইবে না, যত দিন হিন্দুর প্রাধান্য থাকিবে, তত দিন হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের আন্দোলন

প্রথম উত্থাপিত করেন, এমন নহে। তাঁহার প্রায় ১৯ কি ২০ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশ-নাগপুরের এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এ বিষয়ের আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। সে আন্দোলনে ফল হয় নাই। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিধবা বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলে, রাজবল্লভের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ কি চালাইতে পারিতেন না? সে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কোন কোন ভ্রান্ত পণ্ডিত বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময় কোটার রাজাও বিধবা-বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। যখন একজন শক্তিশালী রাজা ব্যর্থ-মনোরথ, তখন অন্যে পরে কা কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-বিষয়িণী পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার ২০ বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজের এক ব্রাহ্মণ এতৎসম্বন্ধে আইন করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার আন্দোলন হইয়াছিল। এ আন্দোলন নিষ্ফল হয়। সুবর্ণ বণিক্ জাতীয় কলিকাতা সহরের প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য মতিলাল শীল বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই।* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে পটলডাঙ্গা-নিবাসী শ্যামাচরণ দাস নামক কর্ম্মকার-জাতীয় এক ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ এ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন,—কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভাস্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। পরে ইঁহাদের অনেকের ভ্রান্তি দূর হইয়াছিল। শ্যামাচরণ দাস বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই।

যাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, যাহা দেশাচার বহির্ভূত, তাহা কোটি কোটি অর্থব্যয়েও সাধারণে প্রচলিত হয় কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি সহায় হইয়াছিলেন। ভ্রান্তিবশে কোথায় হয় ত কেহ বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধবা-বিবাহ কি সমাজে চলিল? যতদিন

* ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারির সংবাদ প্রভাকরে ইহার প্রমাণ পাইবেন।

‡ যুগলসেতু-নিবাসী কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, 'যে ব্যক্তি প্রথম বিধবা-বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে এক সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদান করিব।' —"সংবাদ প্রভাকর,' ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ, ২৭শে নভেম্বর।

সমাজের বন্ধনগ্রন্থি দৃঢ় থাকিবে, ততদিন বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইবে না।

বিধবা-বিবাহের সমর্থনী পুস্তিকার প্রতিবাদসমূহ প্রকাশিত হইলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বা ১২৬১ সালের কার্ত্তিক মাসে "বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না" নামক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। যে সকল পণ্ডিত বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন, এ পুস্তকে তাঁহাদের অধিকাংশেরই মত খণ্ডনের প্রয়াস আছে। নিম্নলিখিত পণ্ডিতদের মত খণ্ডন এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য,—আগড়পাড়া-নিবাসী মহেশচন্দ্র চূড়ামণি; কোন্নগর-নিবাসী দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন; কাশীপুর-নিবাসী শশিজীবন তর্করত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন; আরিয়াদহ-নিবাসী শ্রীরাম তর্কালঙ্কার; পুটিয়া-নিবাসী ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ; মরদাবাদ-নিবাসী গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণমোহন ন্যায়-পঞ্চানন, রামগোপাল তর্কালঙ্কার, মাধবরাম ন্যায়রত্ন, রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার, জনাই-নিবাসী জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, আন্দুলীর রাজসভার সভাপতি রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত; ভবানীপুর-নিবাসী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন; আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি, হারাধন কবিরাজ, ভাটপাড়া-নিবাসী রামদয়াল তর্করত্ন; শ্রীরামপুর-নিবাসী কালিদাস মৈত্র; মুরশিদাবাদ-নিবাসী রামধন বিদ্যাবাগীশ। এই সকল পণ্ডিতের মত খণ্ডন জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা শাস্ত্রের বচনোদ্ধার করিয়াছেন।

এ পুস্তকের ভাষা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। ইহার গাম্ভীর্য্যাত্মসন্ধিৎসুতা আলোচনা করিলে কে সহজে বিশ্বাস করিবে, বিদ্যাসাগর নাম ভাঁড়াইয়া ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা * প্রভৃতি পুস্তকে বালসুলভ বদরসিকতার পরিচয় দিবেন? "রত্ন-পরীক্ষা"র ভাষা- ভাবের একটু নমুনা দেখুন,—

"তিনি নিতান্ত ম্লান বদনে কহিলেন, দেখুন, আমি ব্রজবিলাস লিখিয়া, বিদ্যারত্ন খুড়র মানবলীলাসংবরণের কারণ হইয়াছি। মদীয় বিষময়ী লেখনীর আঘাতেই, তদীয় জীবনযাত্রার সমাপন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের সমাজে, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া পরি-গণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রজবিলাস লিখিয়া কোন্ পাপে লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। এ অবস্থায়, আর আমার মধুবিলাস লিখিতে সাহস ও প্রবৃত্তি

* ইহা একরূপ সর্ব্বজনবিদিত, যিনি উপযুক্ত ভাইপোরূপে "ব্রজবিলাস" লিখিয়াছেন, তিনি উপযুক্ত ভাইপোসহচর বলিয়া "রত্নপরীক্ষা" লিখিয়াছেন। এই উভয়েই স্বয়ং বিদ্যাসাগর বলিয়া রাষ্ট্র। ব্রজবিলাসে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে ও রত্নপরীক্ষায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নকে আক্রমণ আছে। ভাষা ও বিরামচিহ্নাদির আলোচনায় সহজে ধারণা হইতে পারে, ইহা বিদ্যাসাগরের লিখিত। সত্য সত্য যদি ইহা তাঁহার লিখিত হয়, তাহা হইলে, তাঁহার কলঙ্কের কথা বলিতে হইবে।

হইতেছে না। মধুবিলাস দেখিলে, হয়ত, আমায় পুনরায় ঐরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হইবেক। বিশেষতঃ স্মৃতিরত্ন খুড়ী বুড়ী নহেন; তাঁহাকে ইদানীন্তন প্রচলিত-প্রণালী অনুসারে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইবেক, সেটীও নিতান্ত সহজ ভাবনা নহে। যদি বল, আমরা উদ্যোগী হইয়া পুনঃসংস্কার সম্পন্ন করিব; সে প্রত্যাশাও সুদূরপরাহত। এই সমস্ত কারণবশতঃ, আর আমার কোনও মতে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইতেছে না।”

যাহা হউক, বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পূর্ণ পরিচয় সন্দেহ নাই। তবে সেই সময়ে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। ৺কাশীধামের খ্যাতনামা বহু পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাধাকান্ত দেব কলিকাতার শক্তিশালী সর্ব্বোন্নত সমাজপতি। তিনি বিধবা-বিবাহের অযৌক্তিকতা প্রমাণ জন্য বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাৎকালীন ধর্ম্মসভা হিন্দু-সমাজের প্রধান প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। এই সভার পণ্ডিতমণ্ডলী বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপন মত সমর্থনকারীদের মধ্যে এই কয়টী পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন,—পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ বাচস্পতি ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ইঁহারা তাঁহার মতপোষক কতকগুলি বচন উদ্ধার করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা তৎকালে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে চাকুরী করিতেন।

জন কতক ভ্রান্ত পণ্ডিত, ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় যুবক এবং ধনাঢ্য জমিদার বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন মাত্র। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত হইলে, দেশের এত বড় বড় বিজ্ঞ পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য মহোদয়গণ, কখন কি ইহার বিপক্ষবাদী হইতেন? শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু বুঝে, বৈধব্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল; ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার পালনীয়। যাঁহারা মনে করেন এবং বলেন, বিধবা কন্যা বা ভগিনী, পিতা বা ভ্রাতাকে বনিতা-সুখসম্ভোগ করিতে দেখিয়া, তপ্তশ্বাস পরিত্যাগ করেন, এবং হিন্দু-বিধবা কন্যা বা ভগিনীর আজীবন কঠোরতার ব্যবস্থা করিয়া, আপন সুখসাধনে লালায়িত, তাঁহারা প্রকৃতই হিন্দুর কৃপাপাত্র। বিধবা কন্যা বা ভগিনীর বৈধব্য, পিতা বা ভ্রাতার মর্ম্মান্তিক ক্লেশকর, সন্দেহ কি? তবে ইহা পরকালবিশ্বাসী হিন্দুর স্তোক-সান্ত্বনা কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফল স্মরণে।

বিধবা-বিবাহের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

জীবিতাবস্থায় অনেকের প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ৺প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী মহাশয়ের পুস্তক উল্লেখযোগ্য। হিন্দু পাঠকগণকে সে পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। তবে দানিয়াড়ী মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর যে কাপট্য আরোপিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তিনি বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন মত সমর্থনার্থ অনেক গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার বিচার অবশ্য পণ্ডিতজনই করিবেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত সমালোচনা করিলে, এ কাপট্যাচরণ আরোপিত করিতে প্রকৃতই প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয়, গ্রন্থে প্রকৃতই পাঠান্তর আছে। বিদ্যাসাগর কপট, এ কথা স্বপ্নেও আসে না। ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও হিন্দুসন্তানের পাঠ্য। বঙ্গবাসী আফিস হইতে যে পরাশর-সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তর্করত্ন মহাশয়ের মত প্রকাশ পাইয়াছে।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

তর্করত্ন মহাশয় এই শ্লোকের এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন,—

"যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে; তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে, ঐ কন্যা পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।"

এইরূপ অনুবাদ করিয়া তর্করত্ন মহাশয় ইহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

"যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু পণ্ডিতসম্মত। আরও একটী যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার প্রচলনীয় নহে। 'স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।'* এ বচনের ইহাই অনুবাদ, কিন্তু এই বচনের অনুমতি রক্ষা বর্ত্তমান সময়ে নিষিদ্ধ। যথা পরাশর ভাষ্যকৃত আদিত্যপুরাণ।

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং———
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা-কন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণনাং বিবাহশ্চ-দ্বিজাতিভিঃ॥

*মূল শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন করিয়াছেন।

দত্তৌরসেতরেষাস্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য————
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥”

অর্থাৎ কলি-প্রারম্ভের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপ্রচলিত এই সকল কর্ম্ম সমাজরক্ষার্থ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দেবরের দ্বারা পুত্র উৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিদের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস, গোপাল, কুলমিত্র অর্দ্ধসীরী শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদিগের অন্নভোজন ইত্যাদি কলিযুগারম্ভের পরেও এই বচন-নিষিদ্ধ কতিপয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্রসম্মত, এই প্রমাণে কেহ কেহ এই বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি, তাহা নহে। ঐ সকল কর্ম্ম কলিযুগ-প্রারম্ভের পরে যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা ঐ বচন প্রদর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। তবে ঠিক কোন সময়ে যে ঐ নিষেধবিধি প্রচলিত হয়, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, যত দিন ঐ নিষেধ প্রচারিত হয় নাই, তত দিন কলিযুগেও ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশর-সংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্ম্মনির্ণয়ক হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা, পরাশরের মত কলিতে কিছু দিন প্রচলিত ছিল, একেবারে স্থিতিশূন্য হইতেছে না। পরাশরমতে ইতিপূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ পুত্র উক্ত হইয়াছে ভবিষ্যতে দাস গোপালক, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী শূদ্রদিগের অন্ন-ভোজন বিহিত হইবে, এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কলিযুগের এই ধর্ম্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির বচন স্থিতিশূন্য হইয়া পড়ে। প্রবলমতের সঙ্কোচ করিয়াও অপ্রবল মতের স্থিতিশূন্যতা দোষ পরিহার করা চিরপ্রচলিত শাস্ত্রকারীর ব্যবস্থা। আর সমাজিক নিয়মও দেখ, এক্ষণে ঔরস ও দত্তক ব্যতীত পুত্র নাই। কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করে না। অতএব সর্ব্বজন-পরিগৃহীত আদিপুরাণাদি বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদনপ্রয়াস সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য ইত্যাদি। বিবিধ কারণে বিধবা-বিবাহ যে এখনকার অপ্রচলনীয়, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত।” —পরাশর-সংহিতার বঙ্গানুবাদ ৭ পৃষ্ঠা।

বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর যে সব প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার আর প্রতিবাদ করেন নাই।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিচার বহু প্রকার হইয়াছে। সে বিচারবিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। আমি কেবল ইহার কতক ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। শাস্ত্রীয় বিচার ভিন্ন অন্য প্রকার বিচারও অনেক হইয়া গিয়াছে। এখনও হইতেছে। ১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের বিপক্ষে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমাজহিতাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত। সে প্রবন্ধের এই কয়টী কথা স্মরণীয়,—

"অনেকে বলেন, বঙ্গ বিধবাগণ চিরদুঃখিনী, তাহাদের কোন কার্য্যেই সুখ নাই, কোন প্রকার আমোদে তাহারা মিশিতে পারে না, মনের দুঃখে তাহারা সর্ব্বদাই দুঃখিত, তাহাদিগকে আজন্ম এইরূপ কষ্টে রাখা অতি নৃশংসের কার্য্য, যাহার দয়া নাই, মায়া নাই, যে স্নেহমমতা কাহাকে বলে জানে না. পরের দুঃখে যাহার মন গলিয়া না যায়, সেই এইরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু বিধবাদিগের দুঃখ যে অসহ্য, এমত আমাদের বোধ হয় না। যদি বাস্তবিক অসহ্য হয়, অথচ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মোচন করিবার আবশ্যক কি? পাঁচ জন বিধবার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে, সমাজস্থ সহস্র সহস্র লোকের জন্য তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাওয়া উচিত। যিনি এক জনের অঙ্গে সূচ ফোটা দেখিতে পারেন না, তিনি শত শত লোকের বলিদান কিরূপে দেখিবেন? যদি পাঁচ জন বিধবার দুঃখ মোচন না করিলে নিষ্ঠুরতা হয়, তবে বিধবা-বিবাহ চালাইয়া সমাজের সহস্র ব্যক্তির অপকার করা চণ্ডালতা—গোরু মেরে জুতা দান ধর্ম্ম নহে। বিধবার যদি দুশ্চরিত্রা হইবার আশঙ্কা থাকে, বিবাহ দিলেও সে আশঙ্কা একেবারে নির্ম্মূল হয় না। অনেক সধবাও দুশ্চরিত্রা হয়। আমরা নরম প্রকৃতির লোক, এই জন্য কেবল দয়া করিতে শিখিয়াছি.—ন্যায়পরতার উগ্র মূর্ত্তি আমরা সহ্য করিতে পারি না; সুতরাং ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অনুভবশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাকে স্পেন্সার সাহেব Emotional Bias অর্থাৎ আনুভাবিক পক্ষপাত বলিয়াছেন।"

বিচারফলে যাহা হউক, বিধবা-বিবাহের প্রচলন-প্রসঙ্গে একটা তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। সে আন্দোলন বাত্যাবিক্ষোভিত বারিধিবৎ সমগ্র বঙ্গভূমি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, স্ত্রী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলের মুখে দিবারাত্র এতৎসম্বন্ধে অবিরাম জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। হিন্দুর গৃহে প্রকৃতই একটা বিস্ময়-বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। পক্ষে বিপক্ষে কত রকম ছড়া, গান রচিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পথে, ঘাটে মাঠে, সর্ব্বত্রই নানারূপ গান গীত হইত। গাড়োয়ানেরা গাড়ী হাঁকাইতে

হাঁকাইতে, কৃষক লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে, তাঁতি তাঁত বুনিতে বুনিতে গান গাহিত। শান্তিপুরে বিদ্যাসাগর পেড়ে নামক এক রকম কাপড় উঠিয়াছিল। তাহার পাড়ে এই গান লেখা ছিল—

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হ'য়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম,
মনের সুখে থাকবো মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে॥"

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন,—

"বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী, প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ো আদি করি, মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখাপরে, কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো, পাঁজি পুঁথি খুলে॥
এক দলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে থাপা-থাপি, ছাপাছাপি কত॥
বচন রচন করি, কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে॥
"পরাশর" প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এষে দেখি, সাগরের ঢেউ॥
কোথা বা করিছে লোক, শুধু হেউ হেউ।
কোথা বা বাঘের পিছে, লাগিয়াছে ফেউ॥

অনেকেই এই মত, দিতেছে বিধান।
'অক্ষত যোনির' বটে, বিবাহ-বিধান ॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কিবা আর আছে?
একেবারে তরে যাক, যত রাঁড়ী আছে ॥
কেহ কহে এই বিধি, কেমনে হইবে?
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী, সিঁদুর পরিবে ॥
বুকে ছেলে, কাঁকে ছেলে, ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে ॥
গিলে গিলে ভাত খায়, দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে, আঁত-খালি, হাত চাপা বুকে ॥
ঘাটে যারে নিয়ে যান, চড়াইয়া খাটে।
শাড়ী-পরা চুড়ী হাতে, তারে নাকি খাটে ॥
শুনিয়া বিয়ের নাম, "কোনে" সেজে বুড়া।
কেমনে বলিবে মুখে, "খুড়ী খুড়ী খুড়ী" ॥
পোড়া-মুখ পোড়াইয়া, কোন্ পোড়া-মুখী।
'সুখী' 'সুখী' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী ॥
ব্যাটা আছে যার তরে, বেলগাছ এঁচে।
তুড়ি মেরে খুড়ী বলে, সে বলিবে কেঁচে ॥
গমনের আয়োজন, শমনের বরে।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে ॥
যেখানে সেখানে শুনি, এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজী আছে সব ॥
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে ॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা ॥
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাই পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সৎবাপ' মায়ের কল্যাণে ॥"

—কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ, ৭৯—৮১ পৃষ্ঠা।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কবি দাশরথী রায় অনেক ছড়া গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে একটী ছড়া ও একটী গান উদ্ধৃত হইল,—

"বিধবার বিবাহ কথা কলির প্রধান স্থান কলিকাতা,
নগরে উঠেছে অতি রব।
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ ক্রমে দেখছি বলবান্,
হবার কথা হয়ে উঠেছে সব॥
ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণধাম,
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।
তিনি কর্ত্তা বাঙ্গালীর, তাতে আবার কোম্পানীর,
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক।
বিবাহ দিতে ত্বরায়, হাকিমের হয়েছে রায়,
আগে কেউ টের পায় নাই সেটা।
তারা কল্লে অর্ডর, যেতে করে অর্ডর,
চটীকে বুদ্ধি আটিকে রাখবে কেটা॥
হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রজা বৃদ্ধি,
এ বিবাহ সিদ্ধি হলে পরে।
বিধবা করে গর্ভপাত, অমঙ্গল উৎপাত,
তাতে রাজার রাজ্যে হতে পারে॥
হিন্দু ধর্ম্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,
হয়ে না বলে করিতেছে উক্ত।
ইহাদের যে উত্তর, টিকিবে নাকো উত্তর,
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত॥"

গীত।

"তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কি রূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বর-দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর-রূপে॥
রাজ আজ্ঞায় দূতে আসি, কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,
রশি বেন্ধে ফেলে অন্ধকূপে।
তা বলে দূতে কখন দূষী হয় না সেই পাপে॥
কি আর ভাব সকলেতে, হবে যেতে জেতে হতে,
জেতের অভিমান সাগরে দাও সঁপে।
এ কর্ম্ম প্রায় জগত, ভারত আদি পুরাণ যত,
ভারতে চলিবে না কোন রূপে।"

পল্লীগ্রামে চাষা-ভুষার মধ্যে বিদ্যাসাগরের নাম—"বিধবার বিয়ে দেওয়া বিদ্যাসাগর" হইয়াছিল।

দেশ জুড়িয়া আন্দোলন হইয়াছিল। রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করাইতে না পারিলে প্রকৃত কার্য্য হওয়া দুষ্কর ভাবিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, "বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না" পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ করেন। আনন্দকৃষ্ণবাবু, প্রভৃতি অনেকেই অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনুবাদ মুদ্রিত হইবার সময় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ইহার প্রুফ সংশোধন করিয়া দেন।

ইংরাজি অনুবাদ হওয়ায়, বাস্তবিকই সবিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আইন-বিষয়ক অনেক অন্তরায় ছিল। সেই অন্তরায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা আইন করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়া, হিন্দু বিধবাদের বড় কষ্ট, হিন্দু-বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত, এতৎসম্বন্ধে আইন-সংক্রান্ত রায় দূরীভূত হওয়া উচিত, রাজপুরুষদের মনে এইরূপ একটা সুদৃঢ় ধারণা হইয়া যায়। ইংরাজি অনুবাদ প্রচারিত হইবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন করাইবার জন্য তাৎকালিক প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের সহিত পরামর্শ করিতেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বা ১২৬২ সালের আশ্বিন মাসে এক হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। আবেদন ইংরাজিতে হইয়াছিল। তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

"ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সভা-সমীপেষু,—

"বঙ্গদেশস্থ নিম্নস্বাক্ষরকারী হিন্দু প্রজাদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে,—

"বহুদিন প্রচলিত দেশাচারানুসারে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

"আবেদনকারিগণের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক দেশাচার নীতিবিরুদ্ধ এবং সমাজের বহুতর অনিষ্টকারক। হিন্দু-দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে। অনেক হিন্দু কন্যা চলিতে বলিতে শিখিবার পূর্ব্বেও বিধবা হয়। ইহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী।

"আবেদনকারীদিগের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দেশাচার-প্রবর্ত্তিত প্রথা শাস্ত্রসঙ্গত নয় কিংবা হিন্দু অনুশাসনবিধির প্রকৃত অর্থসঙ্গতও নয়।

"বিধবা-বিবাহে আবেদনকারিগণের এবং অন্যান্য হিন্দুর এমন কোন বাধা নাই, যাহা বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ। এবম্প্রকার বিবাহে সমাজ-প্রচলিত অভ্যাস হেতু এবং শাস্ত্রের কদর্থ জন্য ভ্রমাত্মক বিশ্বাসহেতু যে বাধা বিঘ্ন হইতে পারে,

তাহা তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন।

"আবেদনকারিগণ অবগত আছেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আদালতসমূহে প্রচলিত হিন্দু আইন-বিধি অনুসারে উক্ত প্রকার বিবাহ আইনবিরুদ্ধ এবং উক্ত প্রকার বিবাহে যে সমস্ত সন্তানসন্ততি হইবে, তাহারা বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

"যে হিন্দুরা এরূপ বিবাহ বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং সামাজিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমসংস্কার সত্ত্বেও যাঁহারা উক্তপ্রকার বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উপরোক্ত হিন্দু-আইন-প্রচলন কারণ এই প্রকার বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে অক্ষম।

"এবম্প্রকার গুরুতর সামাজিক অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার পক্ষে যে সব আইন-সঙ্গত বাধা আছে, তাহা দূর করা ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তব্য। এই অনিষ্ট দেশচারঅনুমত হইলেও বহুতর হিন্দুর পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টের কারণ এবং হিন্দু অনুশাসনবিধির প্রকৃত মর্ম্মবিরুদ্ধ।

"এই বিবাহের আইনসঙ্গত বাধা অন্তর্হিত হওয়া, স্বধর্ম্মপরায়ণ আস্থাবান্ বহুসংখ্যক হিন্দুর একান্ত অভিপ্রেত ও অনুমত যাঁহারা বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বিশেষ বিশেষ কারণে (কারণগুলি যদিও ভ্রান্তিপরিপূর্ণ) এইরূপ ব্যবস্থা সমাজের মঙ্গলজনক বলিয়া পোষকতা করেন, আইন সঙ্গত বাধা অন্তর্হিত হইলে, তাঁহাদের ভ্রমসংস্কার বিরুদ্ধ বলিয়া বিস্ময়ের কারণ হইলেও কোনপ্রকার অনিষ্টের কারণ হইবে না।

"এরূপ বিবাহ স্বভাববিরুদ্ধ নয় কিংবা অন্য কোন দেশে দেশাচারে বা আইনে নিষিদ্ধও নয়।

"যাহাতে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ পক্ষে বাধা না থাকে এবং সেই বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি যাহাতে বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহার জন্য আইন প্রচলন করিবার সঙ্গতিবিষয়ে মহামান্য ব্যবস্থাপক সভা আশু বিবেচনা করুন।"

পরে এতৎসম্বন্ধ আইনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর বা ১২৬২ সালের ২রা অগ্রহায়ণ ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য গ্রাণ্ট সাহেব, আইনের যে পাণ্ডুলিপি পেশ করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

এতদ্দ্বারা সকলে অবগত আছেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে ভারতের দেওয়ানী আদালতসমূহে প্রচলিত আইন-অনুসারে, হিন্দু বিধবারা, দুই এক স্থলবিশেষ ব্যতিরেকে, একবার বিবাহ হইয়াছে বলিয়া, দ্বিতীয় বার আইন-

সঙ্গত বিবাহ করিতে পারে না এবং যদি করেন, তাহা হইলে সেই বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি মধ্যে পরিগণিত হয় না ; কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, ইহা যদিও দেশাচার অনুমত, তথাপি শাস্ত্রসম্মত নয়। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে বিবেকবুদ্ধি-প্রবর্ত্তিত হইয়া যদি কোন হিন্দু এইরূপ বিধবা-বিবাহ দেন তাহা হইলে আদালত প্রচলিত আইন যেন সে বিবাহে বাধা না দেয় এবং এইরূপ বাধার জন্য যে সকল হিন্দু কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের কষ্ট নিবারণ করাই উচিত। হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ পক্ষে আইনসঙ্গত বাধা রহিত হইলে, হিন্দুদিগের ভিতরে সুনীতি স্থাপিত হইলে তাহাদের অনেক মঙ্গলের কারণ হইবে। সেই জন্য আইন করা যাইতেছে যে,—

১. মৃতভর্ত্তৃকা হিন্দু কন্যা, কিংবা যাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু হওয়াতে বিবাহ হয় নাই, এমন অবস্থায় কোন হিন্দু কন্যা যদি বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই বিবাহ আইনে অসঙ্গত বলিয়া ধরা হইবে না ; এবং সেই বিবাহ হইতে যে সন্তান-সন্ততি হইবে, তাহারা বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া অস্বীকৃত হইবে না। দেশাচারপ্রবর্ত্তিত প্রথা এবং হিন্দু অনুশাসনবিধি এই আইনবিরুদ্ধ হইলেও, এই আইন নামঞ্জুর হইবে না।

২. মৃত স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে কিম্বা খোরাকপোষাক-সূত্রে যে কোন দাবী-দাওয়া, তাহা দ্বিতীয়বার বিবাহে রদ হইয়া যাইবে এবং সেই কন্যা তাঁহার প্রথম স্বামীর পক্ষে মৃত বলিয়া পরিগৃহীতা হইবেন। তাঁহার মৃত স্বামীর অবর্ত্তমানে যে উত্তরাধিকারী সেই ঐ স্বামীর বিষয়ে অধিকারী হইবে ; কিন্তু ইহাও নিয়ম করা যাইতেছে যে, স্বামী ভিন্ন উত্তরাধিকারসূত্রে কোন বিধবার কোন সম্পত্তিতে যে দাবী দাওয়া, কিম্বা স্ত্রী-ধন বলিয়া কোন বিষয় সম্পত্তির উপর দাবী-দাওয়া, কিম্বা স্বামীর জীবদ্দশায় কিম্বা তাহার মৃত্যুর পর স্বোপার্জ্জিত বলিয়া কোন বিষয় সম্পত্তিতে যে দাবী-দাওয়া থাকিবে, পুনর্বিবাহ করিলে তাহার সেই দাবী-দাওয়া অব্যাহত রহিবে।

গ্রাণ্ট সাহেব আইনের যে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

"১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতাস্থ এবং কলিকাতার নিকটস্থ সম্ভ্রান্তবংশীয় আন্দাজ সহস্র হিন্দু দ্বারা স্বাক্ষরিত এই আবেদন পেশ হয়। আবেদনের উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন আইন করা হউক, যাহাতে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত যে বাধা, তাহা রদ হইবে এবং এরূপ নিয়ম হউক যে, ঐ বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি

বলিয়া গৃহীত হইবে।

আবেদনকারিগণ বলেন, বহুদিন-প্রচলিত প্রথা-অনুসারে এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ। এই প্রকার দেশাচার কিন্তু নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, অস্বাভাবিক, নীতি বিরুদ্ধ এবং অনিষ্টজনক। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এই প্রচলিত প্রথা প্রকৃত শাস্ত্রসঙ্গত নয়; সুতরাং বিবেক-বুদ্ধিপ্রবর্ত্তিত হইয়া অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু আদালতের চলিত আইন-অনুসারে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন-সঙ্গত নয়, কিম্বা এইরূপ বিবাহজাত সন্তানসন্ততিগণ বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া পরিগণিত হয় না। এ কারণ ব্যবস্থাপক সভাসমীপে তাহাদের প্রার্থনা এই যে উক্ত সভা পুনর্বিবাহ-নিবারক-বিধি রদ করিয়া তাঁহাদিগকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন। আইন রদ হইলে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে মতাবলম্বী হিন্দুগণেরও কোন ক্ষতির কারণ হইবে না। তাহারা ব্যবস্থাপক সভাকে ইহাও বিশেষ করিয়া জানাইতেছেন, যে আইন তাঁহাদিগের এই দুঃখ মোচন করিবে, তাহা বহুসংখ্যক স্বধর্ম্মরত হিন্দুর অনুমত ও অভিপ্রেত, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, যাঁহারা এক্ষণে তাঁহাদের মতাবলম্বী এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা তাঁহাদের মতাবলম্বী হইবেন, তাঁহাদের কষ্ট মোচন করাই, এই আইনের উদ্দেশ্য। ইহাতে অন্য কাহারও অনিষ্ট হইবে না।

সকলেই অবগত আছেন যে, সতীদাহ প্রথা যখন উঠিয়া গিয়াছে, তখন হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে হিন্দু-কন্যারা, বিধবা হইলে সহগমন করিতে পারে না। তাঁহাদিগকে অবশিষ্ট জীবন কষ্টকর বৈধব্য-যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। যাঁহারা আবেদনকারিগণের মতাবলম্বী, তাঁহারা বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ অপেক্ষা হিন্দু-বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ মঙ্গলজনক বিবেচনায় তাহার পোষকতা করেন। যাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, তাঁহারা বিধবার বৈধব্য প্রথার পক্ষপাতী। প্রচলিত আইন কিন্তু কোন পক্ষই সমর্থন করে না।"

আবেদন পত্রে যে সমস্ত কথার আলোচনা হইয়াছে, তাহা যে সত্য, তাহার আর সংশয় নাই। যে সকল হিন্দু বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, তাহারা এদেশে প্রচলিত মিউনিসিপাল আইনের জন্য তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারে না। যে হিন্দু বিধবা-বিবাহ প্রচলনের বিশেষ উৎসাহী, এই মিউনিসিপাল আইনের দরুণ তাঁহারা পদে পদে বাধা পান।

সাধারণতঃ দেখিতে গেলে, এই বিধবা-বিবাহ-নিবারক আইন দ্বারা সুনীতি স্থাপিত এবং লোকের কোন সুখ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, ইহা সুনীতিকে

পদদলিত করিতেছে এবং লোকের ভয়ানক ক্লেশের হেতু হইয়াছে। একারণ মোটের উপর এই দেখা যাইতেছে যে, দেওয়ানী কার্য্যবিধির এই বিধিটী প্রচলিত থাকা আর কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

ইহাও বলা উচিত যে, অনেকের বিশ্বাস, যে প্রথা বিধবা-বিবাহের বিরোধী, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত এবং তাহা তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধেয়; সুতরাং তাঁহাদের মতে সুনীতি-পরিচায়ক। এরূপ হইলেও যে মিউনিসিপাল আইন সমাজে দুর্নীতির অবতারণা করে ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে, তাহার কোন সার্থকতা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। যখন দেখা যায় যে, এই আইন প্রচলিত থাকাতে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস না করেন, বরং ভাবেন, যে সব লোক উহাকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া মানে, যে সমস্ত লোক ভ্রান্ত ও শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের বিশেষ পীড়ার কারণ হইতেছে, তখন ইহার সার্থকতা কোথায়? যদি কোন হিন্দুর পিতা শাস্ত্রজ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার কন্যাকে আমৃত্যু কষ্টভোগ কিম্বা ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে কোন আইনে যেন তাঁহাকে বাধা না দেয়। কোন খৃষ্টান কিম্বা মুসলমানকে বিধর্ম্মী বলিয়াই জোর করিয়া তাঁহার কন্যাকে চির-জীবনের জন্য দুঃখের কঠোর ক্রোড়ে অর্পণ করিতে বলাই যে ঘৃণাজনক, তাহা নহে। যে হিন্দু, শাস্ত্রের এই ভয়ানক ভ্রমপরিপূর্ণ অপ্রকৃত অর্থ অবিশ্বাস্য বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাকেও ঐরূপে কন্যাটীকে চিরকাল দুঃখ ভোগ করিবার জন্য বাধ্য করা, কম ঘৃণার বিষয় নয়।

যে বিল এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে, তাহা মিউনিসিপাল আইনের দোষ সংশোধন করিবে কিন্তু ইহা আবেদনকারিগণের ও বিরুদ্ধমতা-বলম্বীদিগের কোন অনিষ্টের কারণ হইবে না। বিবাহসম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন্ প্রমাণটী যথার্থ, কোন্‌টী অযথার্থ, কিংবা এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোন্‌টী অনুসরণ করা উচিত, ইহাতে তাহা প্রতিপন্ন করা হইতেছে না। ইহাতে এমন কোন বিষয় থাকিবে না, যাহাতে ইহা কোন লোকের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু যদি কোন হিন্দু আপনার মতের পোষকতা করিতে গিয়া কোন বিভিন্ন মতাবলম্বী বা অপেক্ষাকৃত হৃদয়বান্ প্রতিবেশিবর্গের দুঃখের কারণ হন কিংবা তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার-বিষ বপন করেন, তাহা হইলে ইহা তাহাই নিবারণ করিবে।

১২৬২ সালের ২রা অগ্রহায়ণ বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর, পাণ্ডুলিপি প্রথম পঠিত হয়। গ্রাণ্ট সাহেব, এই পাণ্ডুলিপির পক্ষ সমর্থনার্থ যে সব কথা

বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শুনিলে প্রকৃত হিন্দু সন্তানকে কর্ণে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ওয়ার্ড সাহেবের নজীর তুলিয়া গ্রাণ্ট সাহেব বলিয়াছিলেন,—"The young widows, being forbidden to marry, almost without exception, become prostitutes" অর্থাৎ হিন্দু বাল-বিধবারা প্রায়ই বেশ্যা হয়। শিব! শিব!

এই গ্রাণ্ট সাহেবই বলিয়াছেন,—"The Hindu practice of Brahmacharjia was an attempt to struggle against nature and like all other attempts to struggle against nature was entirely unsuccessful" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ। এ প্রকৃতির বিরুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য-পালনে হিন্দু অকৃতকার্য্য। এ কি প্রকৃত কথা?

এই গ্রাণ্ট সাহেব বলিয়াছিলেন,—"৩।৪ তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত রঘুনন্দন আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দনের ধর্ম্ম-শাস্ত্রসংগ্রহমতে সমস্ত বঙ্গ পরিচালিত।"

যে রঘুনন্দন বিধবা-বিবাহের পক্ষসমর্থন করেন নাই তিনি আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, গ্রাণ্ট সাহেব এসব কথা কোথায় পাইলেন, তাহার নির্ণয় নাই। হিন্দু সমাজ অবশ্য এ কথা বিশ্বাস করিবে না*।

স্যার জেমস্ কল্‌ভিলও গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাবের পোষকতা করেন।

১২৬২ সালের ৭ই মাঘ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।†

১২৬২ সালের ৫ই চৈত্র বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ আইনের বিরুদ্ধে রাজা রাধাকান্ত দেবপ্রমুখ ছত্রিশ হাজার সাত শত তেষট্টি জন লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র পেশ হয়।

ইহার পর আইনের বিরুদ্ধে নদীয়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, কলিকাতা, এবং অন্যান্য স্থানের বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র পেশ হয়। ইঁহারা সকলেই বলিয়াছিলেন, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

---

* এই প্রবাদ আছে, একদিন গঙ্গাতীরে আহ্নিক করিতে করিতে রঘুনন্দনের সহসা কাছা খুলিয়া গিয়াছে। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কাছা খোলা দেখিয়া মনে করেন, যখন রঘুনন্দনের কাছা খোলা, তখন আমাদেরও খুলিতে হইবে। সকলেই কাছা খুলিলেন। রঘুনন্দন সকলের কাছা খোলা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন তাঁহার কাছা খোলা, তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার কাছা খোলা দেখিয়া সকলে কাছা খুলিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বুঝিলেন, সমাজের উপর তাঁহার অসীম প্রভাব। সমাজের উপর রঘুনন্দনের যে অসীম প্রভাব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এ হেন রঘুনন্দন ইচ্ছা করিলে কি আপন বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে পারিতেন না?

† স্যর জেমস্ কল্‌ভিল, মিঃ ইলিয়েট, মিঃ সি জেকট এবং মিঃ গ্রাণ্ট সিলেক্টকমিটীর সভ্য ছিলেন।

১২৬৩ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে সিলেক্ট কমিটী রিপোর্ট দাখিল করেন। ১২৬৩ সালের ৫ই শ্রাবণ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হয়। ১২৬৩ সালের ১২ই শ্রাবণ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই আইন পাশ হইয়া যায়।

এই আইনের বিরুদ্ধে ৫০।৬০ সহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষরিত ৪০ খানির উপরও আবেদনপত্র পেশ হইয়াছিল। ইহার পক্ষে হইয়াছিল, ৫ সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত ২৫ খানি আবেদনপত্র।

তবুও আইন পাশ হইল। না হইবে কেন, ভারতের ভাগ্যবিধাতা বিধান-কর্ত্তা রাজপুরুষেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কেবল সিদ্ধান্ত কেন, স্পষ্টই বলিয়া-ছিলেন—"হিন্দু-বৈধব্য বড়ই নিষ্ঠুর কাণ্ড; ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধ; এ নিষ্ঠুর কাণ্ড নিবারণের জন্য বিধবা-বিবাহের প্রয়োজন, পুনর্বিবাহে বিধবা যাহাতে আইন-সম্মত অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার জন্য আইন করা প্রয়োজন; সেই প্রয়োজনবশতঃ এই আইন হইল; এ আইনের জন্য যে সকল লোক আবেদন করিয়াছেন, তাঁহারা গণ্য, মান্য ও বুদ্ধিমান*।"

বিধান-বিধাতাদের কলমের আঁচড়ে ৫০ হাজার মান্যগণ্য হিন্দুর আবেদন উপেক্ষিত হইল। আত্ম-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য দেশের ৫০।৬০ হাজার হিন্দুর কথা নগণ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইল। সদস্য কল্‌ভিল স্পষ্টতঃ বলিয়াছিলেন,—"এ আইনে ফল হইবে, আমার এই ধারণা যদি না হয়, তাহা হইলে ইংরেজ নামের জন্য এই আইন পাশ করা উচিত।"

ইহার উপর আর কথা কি ?

আইন যাহা হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ এই,—

উপক্রমণিকা।

যেহেতু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত এবং শাসনাধীন দেশ সমূহের দেওয়ানি আদালতের প্রচলিত আইন অনুসারে সাধারণতঃ হিন্দুবিধবাগণ একবার বিবাহলব্ধ করিয়াছে বলিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অক্ষম এবং এই সকল বিধবার পুনর্বিবাহ-সন্তান জারজ ও পৈতৃক সম্পত্তির অনধিকারী বলিয়া

---

* এই আইন সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহা [illegible] প্রকাশ করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়। এই জন্য পাঠকগণকে পাণ্ডুলিপি [illegible] সঙ্কলিত "A collection containing the Proceedings which led to the passing of Act XV of 1856" পড়িতে অনুরোধ করি।

† A collection containing the Proceedings which led to the passing of Act XV of 1856.

পরিগণিত হয়; এবং যেহেতু অনেকানেক হিন্দু বিশ্বাস করেন যে, চিরাগত আচারসম্মত হইলেও এই কল্পিত বৈধ প্রতিবন্ধকতা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ এবং নিজ ধারণার অনুকূল ভিন্নাচার অবলম্বনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে আর ধর্ম্মাধিকরণের দেওয়ানী আইন কর্ত্তৃক কোনরূপ বাধা না পান, ইহাই তাহাদিগের ইচ্ছা এবং যেহেতু উক্ত হিন্দুগণকে তাহাদিগের আপত্তি অনুসারে আইনের এই প্রতিবন্ধকতা হইতে উদ্ধার করা ন্যায়ানুমোদিত এবং হিন্দুবিধবার বিবাহে সমস্ত বাধা নিরাকৃত করিলে সুনীতির বিস্তার ও জনসাধারণের হিতানুষ্ঠান হইবে, সেই হিন্দু আইন নিম্নলিখিতরূপে বিধিবদ্ধ করা যাইতেছে :—

হিন্দুবিধবার বিবাহ বৈধকরণ।

১. কোনরূপ বিরূপ বিরুদ্ধ আচার এবং হিন্দু 'লয়ের' কোনরূপ বিরুদ্ধ মর্ম্ম থাকিলেও, যে বিবাহকালে স্ত্রীর পূর্ব্বকৃত বিবাহের পতি কিম্বা পূর্ব্বনির্দ্ধারিত বিবাহের বর পরলোকগত হিন্দুদিগের মধ্যে সম্পাদিত সেইরূপ কোন বিবাহ অবৈধ হইবে না এবং সেইরূপ কোন বিবাহের সন্তান জারজ হইবে না।

পুনর্বিবাহে পূর্ব্বপতির সম্পত্তিতে বিধবার স্বত্বাধিকারলোপ।

২. ভরণ-পোষণসূত্রে পতি কিম্বা তাহার কোন্ উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকারসূত্রে কিম্বা কোন উইল, অথবা লিখিত বন্দোবস্ত দ্বারা পুনর্বিবাহের প্রকাশিত অনুজ্ঞা ব্যতীত পতির সম্পত্তিতে হস্তান্তরক্ষমতা বিবর্জ্জিত কেবল সীমাবদ্ধ অধিকার প্রাপ্তিসূত্রে পরলোকগত পতির সম্পত্তিতে বিধবা যে কোন অধিকার বা স্বত্ব পাইবে, তাহা বিধবার পরলোকপ্রাপ্তির পর যেরূপ নষ্ট হয়, পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেও সেইরূপ নষ্ট হইবে; এবং তাহার মৃতপতির তৎপর ওয়ারিসান্ কিম্বা তাহার মৃত্যুর পর যে কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তিতে অধিকারী হওয়া বিধেয়, সেই অধিকারী হইবে।

বিধবার পুনর্বিবাহে মৃত পতির সন্তানদিগের অভিভাবকতা।

৩. মৃত পতির উইল বা লিখিত বন্দোবস্ত দ্বারা যদি তাহার বিধবা স্ত্রী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তাহার (মৃত পতির) সন্তানদিগের অভিভাবক নিযুক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহের পর মৃত পতির পিতা কিম্বা পিতামহ, অথবা মৃত পতির কোন আত্মীয় পুরুষ মৃত পতির মৃত্যুকালীন আইনসঙ্গত বাসস্থানের আদিম বিভাগসম্পন্ন উচ্চতম দেওয়ানি আদালতে উক্ত সন্তানদিগের ন্যায্য অভিভাবক নিযুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, এরূপ স্থলে উক্ত আদালতের বিবেচনানুসারে উক্ত প্রকারের অভিভাবক নিযুক্ত

করা আইনসঙ্গত হইবে ; আর উক্ত অভিভাবক নিযুক্ত হইলে উক্ত সন্তানদিগের অথবা তাহাদিগের মধ্যে কোনটীর নাবালক থাকা পর্য্যন্ত তাহাদের মাতার পরিবর্ত্তে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী হইবে। অভিভাবক নিযুক্তিকল্পে এস্থলে আদালত পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারে চালিত হইবেন।

কিন্তু উক্ত সন্তানদিগের নাবালক কাল পর্য্যন্ত ভরণপোষণ এবং ন্যায্য শিক্ষার উপযোগী সম্পত্তি না থাকিলে মাতার অনুমতি ভিন্ন উক্ত প্রকারের অভিভাবক নিযুক্ত হইবে না। তবে সন্তানদিগের নাবালকত্ব কাল পর্য্যন্ত ভরণপোষণ এবং ন্যায্য শিক্ষা নির্ব্বাহ করিবার প্রমাণ প্রস্তাবিত অভিভাবক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে অভিভাবক নিযুক্ত হইবে।

এই আইনের কোন মর্ম্মানুসারে নিঃসন্তান বিধবা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে না।

৪. এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, কোন নিঃসন্তান বিধবা উক্ত সম্পত্তির অনধিকারিণী বলিয়া যেরূপ পরিগণিত হইত এই আইনের কোনও মর্ম্মানুসারে উক্ত ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, উক্ত নিঃসন্তান বিধবা উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

পূর্ব্ব তিনটি ধারার (২, ৩ এবং ৪) নির্দ্ধারিত বিষয় ভিন্ন পুনর্বিবাহ-কারিণী বিধবার জন্য স্বত্ব রক্ষা।

৫. পূর্ব্ব তিনটি ধারার নির্দ্ধারিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি বা স্বত্বে কোন বিধবার অধিকারিণী হওয়া বিধেয় হইলে, সে পুনর্বিবাহ হেতু তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না এবং পুনর্বিবাহকারিণী বিধবা প্রথম পরিণীতার ন্যায় উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকারিণী হইবে।

বর্ত্তমান আইনসঙ্গত বিবাহে যে সমস্ত ক্রিয়া প্রযোজ্য, তাহা বিধবা-বিবাহে প্রযুক্ত হইলে, সেইরূপ কার্য্যকারিণী হইবে।

৬. অপূর্ব্ব-পরিণীতা হিন্দু স্ত্রীর বিবাহে যে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারিত ক্রিয়া-কলাপ আচরিত কিম্বা নিয়ম প্রতিজ্ঞাত হয়, কিম্বা যে সমস্ত ব্যবহার আইনসঙ্গত বিবাহের জন্য যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, হিন্দু বিধবার বিবাহে সেই সমস্ত উচ্চারিত, আচরিত কিম্বা প্রতিজ্ঞাত হইলে ফলও তদ্রূপ হইবে ; এবং ঐ সমস্ত মন্ত্র, ক্রিয়াকলাপ কিম্বা নিয়ম বিধবার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, এইরূপ আপত্তিতে কোন বিবাহ আইন বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবার পুনর্বিবাহের অনুমতি।

পুনর্বিবাহোদ্যতা বিধবা অপ্রাপ্তবয়স্কা অক্ষতযোনি হইলে, পিতার অবর্ত্তমানে পিতামহের, পিতামহের অবর্ত্তমানে মাতার, ইহাদিগের অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ সহোদরের কিম্বা জ্যেষ্ঠ সহোদরেরও অবর্ত্তমানে তৎপর নিকট-আত্মীয় পুরুষের অনুমতিতে পুনর্বিবাহ করিবে।

এই ধারা-বিরুদ্ধ বিবাহে সহকারিতার দণ্ড।

যে সমস্ত ব্যক্তি এই ধারার মর্ম্মবিরুদ্ধ বিবাহে জ্ঞাতসারে সহকারিতা করিবে, তাহারা এক বৎসরের অনতিরিক্তকাল কারাগার কিম্বা জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

এইরূপ বিবাহের পরিণাম।

এবং এই ধারার মর্ম্মবিরুদ্ধ বিবাহ আদালত কর্ত্তৃক অবৈধ বলিয়া অস্বীকৃত হইতে পারে।

কিন্তু এই ধারার মর্ম্মবিরুদ্ধ বিবাহে কোন রূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। এবং ঐরূপ বিবাহের পর পতিসহবাস হইয়া গেলে আর তাহা অবৈধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে না।

প্রাপ্তবয়স্কা বিধবার পুনর্বিবাহ-সম্মতি।

প্রাপ্তবয়স্কা ক্ষতযোনি বিধবার পক্ষে তাহার আত্মসম্মতিমাত্র পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত এবং গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য যথেষ্ট হইবে।

সেই সময়ে প্রভাকর-সম্পাদক যে কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকটা এইখানে প্রকাশ করিলাম।—

"কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে, প'রে শাঁকা শাড়ী॥
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে?
দেশাচারে, ব্যবহারে, বাধো বাধো করে॥
যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত।
কোন মতে হইবে না, শাস্ত্রের সম্মত॥

বিবাহ করিয়া, তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী বলে সম্বোধন, কিসে করি তবে ?
বিধবার গর্ভজাত, যে হয় সন্তান।
'বৈধ' বোলে কিসে তারে করিবে প্রমাণ ?
যে বিষয় সর্ব্বাদিসম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা, শক্ত অতিশয় ॥
শ্রীমান্ ধীমান্, নীতি-নির্ম্মাণকারক।
যাঁরা সবে হ'তে চান, বিধবাতারক ॥
নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে।
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে ?
গোলে-মালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার ॥
বাক্যের অভাব নাই বদন ভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দূষিবে কারে ?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায় ?
কিছুই না হ'তে পারে, মুখের কথায় ॥
মিছা-মিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা, বলা নয় কাজে করা করা ॥
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি থ্যালে, সাগরের ঢেউ ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন ॥
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ॥
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই, উপহাস সার ॥
কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে।
যাবে যাবে, যায় শত্রু, যাক্ পরে পরে ॥
তখন এরূপ কবে, হ'লে ব্যতিক্রম।
'ফাটায় পড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম' ॥*"

—কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ

* বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকালে বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, এই সব পদ্য তাহার কতক পরিচায়ক।

আইন পাশ হউক, বিধবা-বিবাহ হিন্দু-সমাজ সম্মত নহে। আইন পাশ হইবার পর কয়েকটী মাত্র বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। এরূপ বিবাহে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি হিন্দুর সহানুভূতি নাই। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া হিন্দু সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। **Asiatic Quaterly Review** নামক পত্রিকার **Child Widow** নামক প্রবন্ধলেখক এই কথা লিখিয়াছেন,—

"It has proved a dead letter. Not only does it fail to secure to a widow her civil rights to property inherited from her husband, but it has not in the least degree mitigated the religious abhorrence with which orthodox Hindus regard such re-marriage.*"

বিধবা-বিবাহের আইন পাশ হইল; কিন্তু আইনে বিধবার পুনর্বিবাহে, মৃত স্বামীর বিষয়াধিকার রহিল না। তা না থাকুক, বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতিরা বিধবা-বিবাহ প্রচলন পক্ষে এই আইনটীকে একটী মহদাশ্রয়রূপে অবলম্বন করিলেন। আইন পাশ হইবার পর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বা ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও উদ্যোগে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, প্রসিদ্ধ কথক ৺রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবা-বিবাহ করেন†। এই বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তৎকালে সংবাদ প্রভাকরে যে বিবরণ প্রকটিত হইয়াছিল, এইখানে তাহা প্রকাশিত হইল,—

"গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার বিধবার বিবাহপক্ষ ব্যক্তিব্যূহের বিশেষ স্মরণীয় হইবেক, প্রতি বৎসর তাঁহারা ঐ দিবস পর্ব্বাহ দিবসের ন্যায় বিবেচনা করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিলেও করিতে পারেন, যেহেতু উক্ত দিবা যামিনী-যোগে তাঁহারা বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রতিসংহার পূর্ব্বক আপনাদিগের দলস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত লক্ষ্মীমণি নাম্নী কোন অবীরার বিধবা-কন্যার উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ঐ বিবাহের কন্যাযাত্রিদিগের নিকটে উক্ত অবীরা যে রক্তাকার পত্র প্রেরণ করেন, তাহা এই :—

* **The Woman of India, p, 127.**

† ১৫ই অগ্রহায়ণ বিবাহের কথা ছিল। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মাতৃ-প্রতিবন্ধকের ছল ধরিয়া, বিধবা-বিবাহ করিতে অসম্মত হন। এই কথা লইয়া, তৎকালে ২৭শে নবেম্বর তারিখের ইংলিশ ম্যান বিদ্রূপ করেন। ইহার পর শ্রীশচন্দ্র পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত হন। শ্রীশচন্দ্রের যেদিন বিবাহ হয়,সে দিন নবদ্বীপাধিপতি রাজা শ্রীশচন্দ্র লোকান্তরিত হন। —"সংবাদ প্রভাকর।"

"শ্রীশ্রীহরিঃ।
শরণং।

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ—
সবিনয়ং নিবেদনম্।

২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক। মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমুলিয়ার সুকেস ষ্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি তারিখ ২১শে অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৮।"

জগৎকালীর দ্বিতীয়োদ্বাহের এই রক্তময় পত্র প্রাপ্ত হইয়া বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র, বাবু নৃসিংহচন্দ্র বসু, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভাস্কর সম্পাদক, প্রভৃতি অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ের বালক ও কৌতুকদর্শি লোকসংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোক-সমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সার্জ্জন সাহেবেরা পাহারাওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন, রাত্রি অনুমান ১১ ঘটিকাকালে বর বাহাদুর শকটারোহণে সমাগত হইয়া সভাস্থ হইলে সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন, দুই এক টাকা বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন প্রায় শতাধিক লোক লাল বনাতাবৃত ভট্টাচার্য্য ও রামগতি প্রভৃতি কয়েকজন ঘটক ও পঞ্চুভাট প্রভৃতি কয়েকজন ভাট উপস্থিত থাকিয়া গোল করিয়া হাট বসাইয়াছিল, অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

বিবাহ সময়ে বর বাহাদুর আসনোপবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষের পুরোহিতেরা বিবাহমন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কিছুই রূপান্তর করেন নাই, লক্ষ্মীমণি কন্যাদান করেন, দান সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, পরে বর স্ত্রী-আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথানুসারে "দ্বারষষ্ঠী ঝাঁটা"কে প্রণাম করেন, ও স্ত্রী আচার-স্থলে উলু উলু ধ্বনি, নাকমলা, কানমলা ও "কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে বাঁধলেম, হাতে দিলাম মাকু, একবার ভ্যা করত বাপু" রমণীগণের একান্ত প্রার্থনায় বর বাহাদুর ভ্যাও করিয়াছিলেন।

এইরূপে উদ্বাহ নির্ব্বাহ হইলে আহারের ধূম পড়িয়া যায়। প্রায় ছয় শত লোক রঙ্গ দেখিয়া মোণ্ডা ভাঙ্গিয়া গোল করিয়া ঢোল পিটিয়া পাড়া তোলপাড় করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, বাসর ঘরের ব্যাপার আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, যাহা হউক, এই বিবাহে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, অঙ্গনাগণও বিলক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিয়াছিলেন, দম্পতির উভয় কুল পরিশুদ্ধ

হইল, "যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা" মিলিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদনুসঙ্গে বিধবার বিবাহ-রঙ্গিগণের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদিগকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

পাঠকগণ! আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এবং এইক্ষণেও লিখিতেছি যে হিন্দু-বিধবার এই প্রথম বিবাহ কোন ক্রমেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জ্ঞাতি-কুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় নাই এবং কন্যার খুড়া কিম্বা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বরপাত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন, পরিশেষে কি হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহা হউক, তিনি প্রথমতঃ সাহসিকরূপে বুক বাঁধিয়া এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে বিধবার বিবাহ-পক্ষগণ অবশ্য তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।

* * *

অপিচ এই নূতন বিবাহের কথা অধুনা সর্ব্বত্রই বাহুল্যরূপে আন্দোলন হইতেছে, এবং কত লোকে কত প্রকার আকাশভেদি কথার উত্থাপন করিতেছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। কেহ বলিতেছেন যে, মান্যবর মেং হালিডে সাহেব বিবাহ-সমাজে সমাগত হইয়া দম্পতিকে মূল্যবান্ অঙ্গুরী যৌতুক দিয়াছেন, কেহ বা কৌতুক-তৎপর হইয়া বলিতেছেন যে, কৌন্সেলের বিজ্ঞবর মেম্বর মেং গ্রাণ্ট প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ সভাস্থ হইয়াছেন, লর্ড কেনিং বাহাদুরের আসিবার কথা ছিল কেবল কার্য্য-প্রতিবন্ধকতা জন্য তিনি আগমন করিতে পারেন নাই, এইরূপ বাজার গল্প বিস্তর, কি ইহার একটী কথাও সত্য নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ অতি সুবিবেচনাপূর্ব্বক হিন্দু-বিধবার এই প্রথম বিবাহে সাহেব নিমন্ত্রণ করেন নাই, কারণ সাহেবেরা আগমন করিলেই সাধারণে শ্রীশচন্দ্রের এই বিবাহকে সাহেব বিবাহ বলিবেন, অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করিয়া কাহাকেও চারি টাকা বিদায় দিয়াছেন, এবং পুস্তকে তাঁহাদিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন, আর পূর্ব্বে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই নূতন প্রকার বিবাহের নিমন্ত্রণে আগমনপূর্ব্বক যাহারা উৎসাহ প্রদানের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকটে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল; অতএব আমরা বোধ করি যে এই বিবাহ-বিবরণ যখন সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ হইবেক, তখন সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের নাম প্রকাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।...

শুনিলাম উক্ত বৈধব্যদশাবিগতা সধবাদশাপ্রাপ্তা রমণীর বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর হইবেক।"

সেই সময়ে শ্রীগোপীমোহন মিত্র এই স্বাক্ষর করিয়া এক ব্যক্তি এতৎসম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারও কয়েকটী কথা পাঠকগণের অবশ্য-মনোযোগ্য বলিয়া উদ্ধৃত হইল :—

"অনেক স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ভদ্র হিন্দু-সন্তান আশ্চর্য্য ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কিরূপে চিরকাল-প্রচলিত ও সনাতন-ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিধবা বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ হয়, এবং কন্যার শ্বশুরকুল অথবা পিতৃকুল কিংবা মাতৃকুলের মধ্যে কেহ বা সম্প্রদান করে, ইত্যাদি বিবিধ প্রকার বিচিত্র স্বপ্নবৎ অভাবনীয় রঙ্গ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সভায় দুই সহস্র লোক উপস্থিত ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশ অনিমন্ত্রিত রঙ্গদর্শক। ইঁহারা কেহই তথায় ভোজন করেন নাই এবং বিধবা-বিবাহ বৈধ বলিয়া নাম স্বাক্ষরও করেন নাই; সুতরাং ইঁহাদিগকে তন্মতাবলম্বি বলা যাইতে পারে না। ইংরাজগণের বিবাহ অথবা সমাধি দর্শনে অনেক ক্রিয়াকলাপ বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত হিন্দু গমন করিয়া থাকেন, অনেকে অগত্যা কসাইটোলার গোহত্যাও দর্শন করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের কোন দোষ আইসে না। এক্ষণে আমি গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিনয় বচনে জিজ্ঞাসা করি, গত রবিবাসরীয় নিশাতে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ অনিশ্চিত থাকাতে আর দুই তিন বর বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিল কি* ?"

এই বিবাহে যে সাধারণ হিন্দু-সমাজ সম্মত হয় নাই তাহার আর সন্দেহ কি? এই বিবাহ-সংস্পর্শ জন্য সমাজচ্যুতি-দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

বিধবা-বিবাহ করিয়া এবং বিধবা-বিবাহের সম্পর্কে থাকিয়া, অনেককেই পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সাহায্য লইতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় কয়েকটী মাত্র বিধবা-বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সাহায্যার্থ তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ঋণ ৪০।৫০ সহস্র টাকার কম নহে।†

* এই সময় সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর ও ভাস্কর প্রধান সংবাদপত্র ছিল। ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ভাস্করের সম্পাদক ছিলেন। ভাস্করে বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন হইয়াছিল। ভাস্করে প্রভাকরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত।

† শুনিয়াছি, বিধবা-বিবাহের সঙ্কল্পে কোটার রাজা ১৪ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। যিনি বিধবা-কন্যা বিবাহ দিবেন এবং যিনি বিবাহ করিবেন, তাহাদের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা দিব বলিয়া ধনকুবের মতিলাল শীল সঙ্কল্প করিয়াছিলেন মাত্র।— "সংবাদ প্রভাকর"।

তাহাতেও বিদ্যাসাগর ক্ষণমাত্র বিচলিত হন নাই। প্রতিজ্ঞায় বিদ্যাসাগর ভীষ্মের ন্যায় অটল। অকার্য্যেও চরম আত্মোৎসর্গ। ভ্রমেও লাঞ্ছনা-তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ ছিল না। প্রকৃতই অনেকে তাঁহাকে এ ব্যাপারে প্রথমতঃ উৎসাহ দিয়া, পরে ভ্রম বুঝিয়াই হউক, আর যে কোন কারণেই হউক, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বয়ং একাকী বিশ্ববিজয়ী বীরের ন্যায় যুঝিয়াছিলেন।

হিন্দু-সন্তানকে বলি, বিদ্যাসাগরে ভ্রমে ভুলিও না। তাঁহার দৃঢ়তা, একাগ্রতা, আত্মনির্ভরতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা শিখিয়া লও। ভগবদিচ্ছায় একটু বাতাস ফিরিয়াছে। ইংরেজিশিক্ষিত অনেক হিন্দু-সন্তানের মতিগতিও ফিরিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম উদ্যোগে যতটা উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল, এখন ততটা নাই। স্রোতস্বতীর উৎপত্তি-স্থলে প্রথম জলোচ্ছ্বাস উত্তাল তরঙ্গে পাহাড় ভাঙ্গিয়া দুকূল ভাসাইয়া লইয়া যায়। পরে নদীরূপে স্রোতপ্রবাহে সে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে না। ইংরেজি শিক্ষাস্রোতে এখন কতক সেই ভাব। শাস্ত্র-শিক্ষা-প্রচার বাহুল্য জন্য ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উচ্ছৃঙ্খলতা কতক প্রশমিত। বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। তবে আজকাল ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুই চারিজন বিধবা-বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্য সভায় লেখককে এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

বিধবা-বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক লাঞ্ছনা ও তাড়না সহিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার প্রাণনাশেরও সঙ্কল্প করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাতেও বিচলিত হন নাই। তাড়না ও লাঞ্ছনা সম্বন্ধে ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু ১২৯৮ সালের ২০শে ভাদ্রের "হিতবাদী"তে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত, কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার—এমন কি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার কোনও বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিদ্যাসাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্তেরা প্রভুর আজ্ঞাপালনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ মহোদয় মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া প্রহরীরক্ষিত অট্টালিকায় বিদ্যাসাগরের

ভবিষ্যৎ-প্রহারের উদ্দেশ্যে কাল্পনিক সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর একবারে সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই অপ্রস্তুত ও নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে এক জন পারিষদ্ বিদ্যাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, লোকপরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মারিবার জন্য আপনাদের নিযুক্ত লোকেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও খুঁজিতেছে; তাই আমি ভাবিলাম, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি, আমি নিজেই যাই। এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহার অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না। লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন।"

বিধবা-বিবাহের বিপক্ষবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অজস্র গালিমন্দ দিত। এতৎসম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে,—"এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ীর যে কামরায় ছিলেন, পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে সেই কামরায় একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে জানিতেন না। তিনি বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ করিয়া গালিমন্দ দিতেছিলেন। পরে হুগলী ষ্টেশনে নামিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাতেই বিদ্যাসাগরকে গালি দেওয়া হইয়াছে। অকস্মাৎ এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ কেমন যেন সংজ্ঞাহীন হইয়া, ষ্টেশনের প্লাটফরমে পড়িয়া গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার শুশ্রূষা করেন এবং পাথেয়-স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যও করেন।"

বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ সম্বন্ধে অমূল্যবাবু হিতবাদীতে এই রহস্যজনক গল্প লিখিয়াছিলেন,—"স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর প্রাট্ সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার পুস্তকের যে সব প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাহার প্রতিবাদ ভাল? যে ব্যক্তি বেশী গাল দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রহস্য কহিয়া তাঁহার নাম করেন। প্রাট্ সাহেব, কথাটা সত্য ভাবিয়া তাঁহার নাম টুকিয়া লন। পরে তিনি সেই ব্যক্তিকে ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। সেই ব্যক্তি এক দিন প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেন, 'যাহা হইবার হইয়াছে. দেখিবেন যেন চাকুরিটী না যায়।' বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলেন,—'তাহা হইলে আর চাকুরী হইত না'।"

কেহ কেহ বলেন, বীরসিংহ গ্রামে একবার একটী বালিকার বৈধব্য সংঘটনে ব্যথিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, শাস্ত্রীয় মতে বিধবার বিবাহ হইতে

পারে কি, পুত্রকে এই প্রশ্ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দিন হইতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতে থাকেন। এ কথা কতদূর সত্য, তা জানি না, তবে নারায়ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর ধারণা ছিল, তাঁহার পুত্র এ বিষয়ে অভ্রান্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল বিধবা-বিবাহ দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত আহার করিতেন। এক দিন নারায়ণবাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর মা! তুমি যে ইহাদের সহিত বসিয়া আহার করিতেছ? ইহাদের যে জাতি যাইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী উত্তর করিলেন,—"দোষ কি? ঈশ্বর বহুশাস্ত্রজ্ঞ, ঈশ্বর কি অন্যায় কার্য্য করিতে পারে?"

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার কি মত ছিল, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন,—'তাঁহার মত ছিল না; বিধবা-বিবাহের সম্পর্ক হেতু নানা সামাজিক লাঞ্ছনা ও তাড়না সহিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি কাশীবাসী হন।'' কেহ বলেন—'তাঁহার মত ছিল। বিধবা-বিবাহ যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, পুত্র তাহা প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে বিধবা-বিবাহে ক্ষতি কি, এইরূপ। তাঁহার মত ছিল। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে পর, পিতা ঠাকুরদাস পুত্রকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন।

লেখকের কোন বন্ধুকে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয় বলিয়াছিলেন,—"পিতামাতার মত না থাকিলে, অন্ততঃ তাঁহাদের জীবদ্দশায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।" হিতবাদীতে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমরা অন্য কোন সূত্রে এ কথা শুনি নাই। যিনি পিতাকে ভগবান্ ভাবিতেন, তিনি পিতার নিষিদ্ধ কথা তাঁহার জীবদ্দশায় মানিবেন আর তাঁহার দেহান্তে মানিবেন না, এরূপ ভাবিতেও আমাদের কেমন কষ্ট হয়। তবে পুত্রকে যখন পিতার শাস্ত্রদর্শী বলিয়া ধারণা, আর পুত্রও যখন শাস্ত্রমতে বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের প্রয়াসী, তখন তাঁহার সম্মতি থাকিতে পারে। মাতা সম্বন্ধেও অন্য কথা কি?

পিতামাতার অমত হইলে, বিদ্যাসাগর নিশ্চিতই বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের প্রয়াসে বিরত হইতেন। পিতামাতাই যে তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিলেন। তিনি প্রায়ই বন্ধুবান্ধবকে বলিতেন — "পিতামাতাই ঈশ্বর।" পিতামাতার তুষ্টি-সাধনই তাঁহার জীবনের চরম কামনা ছিল। নিজের বিশ্বাস থাকুক বা নাই থাকুক, পিতামাতার যাহাতে তুষ্টি, তৎসাধন পক্ষে তিনি কখন কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না। এক বার বীরসিংহ গ্রামে জগদ্ধাত্রী পূজা-উপলক্ষে তাঁহার পিতা

ও মাতার মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। পিতার ইচ্ছা—পূজা উপলক্ষে বাদ্যবাজনা ধূমধাম হয়! মাতার ইচ্ছা—এ সব না করিয়া, কেবল গরীব-কাঙ্গালীদিগকে খাওয়ান হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা হইতে বীরসিংহ গ্রামে গমন করিতে, পিতা-মাতা উভয়েই আপনাদের মনোগত অভিপ্রায় তাঁহাকে বিদিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন,—"উভয়েরই কথা থাকিবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয়েরই মনস্তুষ্টি-সাধক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পিতামাতার প্রতি তাঁহার এরূপ ভাব, তিনি তাঁহাদের অসম্মতিক্রমে কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না। পিতামাতা ব্যতীত তিনি জগতে আর কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া, অনুষ্ঠিত কার্য্য হইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মত ছিল না, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা এইখানে উদ্ধৃত হইল :—

"এক দিন তর্কবাগীশ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,—'ঈশ্বর, বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া প্রবল জনরব। কতদূর কি হইয়াছে, জানি না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলীকে স্বমতে আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না? যদি না হইয়া থাক, তবে অপরিণামদর্শী নব্যদলের কয়েকজনমাত্র লোক লইয়াই এইরূপ গুরুতর কার্য্যে তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিবে।' বিদ্যাসাগর বলিলেন,—'মহাশয়! আপনার প্রশ্ন ভঙ্গিতে আমার উদ্যমভঙ্গের আশঙ্কা দেখিতেছি; আপনাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি! নচেৎ আপনাকে'—তর্কবাগীশ তাঁহার কথা শেষ না হইতেই বলিলেন, 'নচেৎ আমাকে এই আসন হইতে এখনই উঠাইয়া দিতে! ঈশ্বর! তুমি এই কার্য্যে যেরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প এবং একাগ্রচিত্ত হইয়াছ, তাহাতে আমি এইরূপ উত্তর পাইব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। ইহাতে অণুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি।' বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'আমি তত সাহসের কথা বলিতেছিলাম না। আপনি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলী বলিয়া যাহা কহিতেছেন, ইহাতে কলিকাতার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি আপনার লক্ষ্য কিনা? আমি উঁহাদের অনেক উপাসনা করিয়াছি। অনেককেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি। সকলেই ক্ষীণ-বীর্য্য ও ধর্ম্মকঞ্চুকে সংস্কৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি।

মহাশয়! আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন আমায় আর যেন প্রতিনিবৃত্ত করিবার কথা বলা না হয়।' তর্কবাগীশ বলিলেন, —'ঈশ্বর! বাল্যাবধি তোমার প্রকৃতি ও অদম্য মানসিক শক্তির প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে। তোমায় ভগ্নোদ্যম ও প্রতিনিবৃত্ত করা আমার সংকল্প নহে।* তুমি যে কার্য্যটীকে লোকের হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং যাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিয়াছ, সেই কার্য্যের মূল বন্ধন সম্যক্‌রূপে দৃঢ়তর হয় এবং অর্দ্ধসম্পন্ন হইয়াই বিলীন না হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। কেবল কলিকাতার কয়েকটী বৃদ্ধ আমার লক্ষ্য নহে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বোম্বে, মাদ্রাজ, প্রভৃতি স্থানে যথায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত—ততদূর দৌড়িতে হইবে, ধর্ম্মবিপ্লব ও লোকমর্য্যাদার অতিক্রম করা হইতেছে বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে হইবে; সকলকে বুঝান সহজ নহে সত্য। প্রধান প্রধান স্থানের সমাজপতিদিগকে অন্ততঃ স্বমতে আনিতে হইবে। এইরূপে সমাজসংস্কার করা কেবল রাজার সাধ্য। অন্য লোকে এরূপ কার্য্যে হাত দিতে গেলে বিপুল অর্থ ও লোকবল আবশ্যক। বিজাতীয় রাজপুরুষ দ্বারা এইরূপ সংস্কারের সম্ভাবনা নাই। বিধবাগর্ভজাত সন্তান দায়ভাক্‌ হইবে বলিয়া যে বিধি হইয়াছে,* তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিতে হইবে। যখন তুমি রাজপুরুষদের সাহায্যে এই বিধি প্রচলিত করাইতে সমর্থ হইয়াছ, তখন পূর্ব্ব-কথিত দেশ বিভাগের সমাজপতিদিগের সহায়তা লাভে যে কৃতকার্য্য হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না। ইহাতে যেমন কালবিলম্ব ঘটিবে, তেমন সময়ে স্রোতঃ তোমারই মতানুকূলে

* বিদ্যাসাগর বাল্যাবস্থা হইতেই তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রীতির পাত্র হন। তর্কবাগীশ মহাশয়ও তাঁহাকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিই:—"তর্কবাগীশ মহাশয় সাহিত্য-দর্পণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। ছাত্রেরা পুঁথির পাতা বাহির করিয়া লইয়া বাসায় যাইত। অধ্যাপনা সময়ে কখন কখন আবশ্যক হইলে পাতা মিলিত না। তর্কবাগীশ মহাশয় পুঁথির পাতা বাসায় লইয়া যাইতে নিষেধ করেন। বিদ্যাসাগর তখন অলঙ্কার-শ্রেণীতে পড়িতেন। তিনি একদিন অপরাহ্নে পুঁথির পাতা চুপি চুপি লইয়া বাসায় যাইতেছিলেন। বৃষ্টি হওয়ার দরুণ তিনি পড়িয়া গিয়াছিলেন। পাতাগুলি ভিজিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর এক ভুনোওয়ালার দোকানে প্রবেশ করিয়া জ্বলন্ত চুলার পাশে পাতাগুলি রাখিয়া শুকাইতে দেন। হঠাৎ তর্কবাগীশ মহাশয় সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে পান। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল বিষয় অবগত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বড় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভিজিয়া গিয়াছেন, তর্কবাগীশ মহাশয় দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হন। তিনি পুঁথির কথা কিছু না বলিয়া, তাঁহাকে আপনার চাদরখানি পরিতে দেন। ঈশ্বরচন্দ্র চাদর পরিতে ইতস্ততঃ করেন। তখন তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে একখানি গাড়ী করিয়া আপন বাসায় লইয়া যান। অনুতপ্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে তর্কবাগীশ মহাশয় বিবিধরূপে সান্ত্বনা করেন।"

বহিবে। লোকবলের নিকটে অর্থাভাব অনুভূত হইবে না। ত্বরায় প্রয়োজন দেখি না। হিন্দুসমাজ এ পর্য্যন্ত অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। দুই চারিটী বিধবা-বিবাহ দিলে আর একটী থাক ঝাড়ান মাত্র হইবে; সমাজ-বন্ধন এইরূপে আরও শিথিল করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর, যাহা বক্তব্য, বলিলাম। তুমি বড় ব্যস্ত দেখিতেছি। চলিলাম, বিবেচনা করিও।" —"প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবন চরিত", ৬১-৬২ পৃষ্ঠা।

ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ঐকান্তিক একাগ্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হায়! হিন্দুর করণীয় কার্য্যে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—এই একাগ্রতা পরিচালিত হইলে, আজি হিন্দু-সমাজ যে অধঃপতনের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার অনেকটা গতিরোধ হইত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বর্ণপরিচয়, চরিতাবলী, বিশ্ব-বিদ্যালয়, হেলিডের নিকট প্রতিষ্ঠা, ইয়ং সাহেবের সহিত মতান্তর ও পদত্যাগ

বহু কঠোরতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠ্য-পুস্তক-প্রণয়নে নিবৃত্ত ছিলেন না। ১২৬২ সালের ১লা বৈশাখ বা ১৮৫৫ সালের ১৩ই এপ্রেল এবং ১২৬২ সালের (১৯১২ সংবতে) ১লা আষাঢ় বা ১৮৫৫ সালের ১৪ই জুন বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বর্ণপরিচয়েও বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনা-শক্তির পরিচয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগে বাংলা বর্ণবিচারে প্রবৃত্ত হন। এ বিচারে তিনি প্রথম। এ সম্বন্ধে আমাদের মতবিরোধ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, তিনি বাংলার স্বরবর্ণের দীর্ঘ "ৠ"র ব্যবহার করেন নাই। সংস্কৃত প্রয়োগানুসারে বাঙ্গালায় দীর্ঘ "ৠ"র ব্যবহার হইতে পারে। যথা—"পিতৄণ"। এ বর্ণবিচার সম্বন্ধে ঢাকার বান্ধব-সম্পাদক বহুযশস্বী স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ও ভট্টপল্লিনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ প্যারীচরণ সরকারের চোরবাগানস্থিত বাটীতে একদিন নির্দ্ধারিত হয় যে প্যারীবাবু ইংরেজিশিক্ষার প্রাথমিক পাঠ্যসমূহ এবং

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা পাঠ্যসমূহ প্রণয়ন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে দুইজনই এই ভার লইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মফঃস্বলে স্কুল-পরিদর্শনে যাইবার সময় পাল্কীতে বসিয়া বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। প্রথম প্রকাশে বর্ণপরিচয়ের আদর হয় নাই। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরাশ হন; কিন্তু ক্রমে ইহার আদর বাড়িতে থাকে।

১২৬৩ সালে বা ১৯১৩ সংবৎ ১লা শ্রাবণ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে "চরিতাবলী" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। দরিদ্র ও হীন অবস্থা হইতে স্বকীয় অধ্যবসায়ে লোকে কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করাই চরিতাবলী রচনার উদ্দেশ্য। এই জন্যই এই গ্রন্থে ডুবাল, উইলিয়ম্ রস্কো প্রভৃতি বৈদেশিক খ্যাতনামা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনাভাস প্রকটিত হইয়াছে। জীবন-চরিত-সম্বন্ধে আমাদের যে মত, চরিতাবলী সম্বন্ধেও সেই মত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার অন্যতম সভ্য হন। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত শিক্ষা উঠাইবার প্রস্তাব হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় একাই সিনেটের অন্যান্য সভ্যদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। অবশেষে তাঁহারই জয় হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় "সেনট্রাল কমিটির" সভ্য হইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ানেরা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পর এই "সেনট্রাল কমিটি"র নিকট এদেশীয় ভাষার পরীক্ষা দিতেন। এই কমিটি বড়লাট বাহাদুর লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে "এডুকেশন কৌন্সিলে"র স্থানে বর্ত্তমান "পবলিক ইনষ্ট্রক্শনে"র প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমান ডাইরেক্টরের পদ-সৃষ্টিও এই সময় হইল। গর্ডন ইয়ঙ্ সাহেব প্রথম ডাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ইয়ঙ্ সাহেব তখন নবীন সিবিলিয়ান। ছোটলাট হেলিডে সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাস কয়েক ইঁহাকে শিক্ষাবিভাগের কার্য্য শিক্ষা দেন। ছোটলাট হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এমন কি ছোটলাট বাহাদুর তাঁহাকে পরমাত্মীয় বন্ধু ভাবিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট বাহাদুরের বাটীতে গিয়া নানা বিষয়ের পরামর্শ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কারণে নির্দ্ধারিত দিনে যাইতে না পারিলে, হেলিডে সাহেব তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন। একবার হেলিডে সাহেবের সহিত রাজেন্দ্রলাল মল্লিক সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি যাইতে পারেন নাই। হেলিডে সাহেব রাজেন্দ্রবাবুকে

অনুরোধ করেন, সেই দিনই যেন তিনি বিদ্যাসাগরের নিকট যাইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। রাজেন্দ্রবাবু সেই দিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হেলিডে সাহেবের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরদিন হেলিডে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক দিন বহু সম্ভ্রান্ত লোক ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহারা যাইলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় তথায় গিয়া উপস্থিত হন। ছোটলাট বাহাদুর সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চটিজুতা পায়ে এবং মোটা চাদর গায়ে দিয়া ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। ছোটলাট বাহাদুর তাঁহাকে চোগা, চাপকান ও পেণ্টুলন পরিয়া যাইতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কথা-মতে দিন কয়েকমাত্র চোগা-চাপকান পরিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে তিনি লজ্জা ও কষ্টবোধ করিতেন। সেই জন্য তিনি সে বেশ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর জীবনে তিনি আর এ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন নাই।

১২৬৪ সালে বা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়, হেলিডে সাহেবের আদেশে বহু স্থানে বহু বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-পণ্ডিত মাসিক বেতনের জন্য বিল করিয়া, বেতন প্রার্থনা করিলে, তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ঙ্ সাহেব, তাহা মঞ্জুর করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখন ইন্স্পেক্টর-পদে নিযুক্ত হন, তখন হইতেই, ইয়ঙ্ সাহেবের সহিত তাঁহার মতান্তর হওয়ায়, একটা মনোবাদ হয়। বর্ত্তমান বিল নামঞ্জুরীসূত্রে সেই মনোবাদ প্রবলতর হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোটলাট বাহাদুরকে এ কথা জানাইলেন। ছোটলাট বাহাদুর, নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নালিশের চিরবিরোধী; কাজেই তিনি স্বয়ং ঋণ করিয়া টাকা দেন*। ক্রমেই মনোবাদ গুরুতর হইয়াছিল।

* বিশ্বকোষ অভিধানে লিখিত আছে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা সময়ে তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী হেলিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ পরিচয় হয়। তিনি নানা বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া, বিদ্যাসাগরকে লইয়া যাইতেন। অনেক সময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারই যত্নে বিদ্যাসাগর "স্কুল ইন্স্পেক্টর" হইয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালা বিভাগের চারিটী জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ কুড়িটী মডেল স্কুল স্থাপিত ছিল। ঐ সময়ে কুড়িটী বিদ্যালয়ের পরিদর্শন-ভার, বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে বীটন সাহেবের মৃত্যু হইলে, তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে যাইল। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর, বীটন স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ইনি স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিতেন। এই সময় হেলিডে সাহেবের উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, বাঙ্গালার স্থানে স্থানে প্রায় ৫০/৬০টী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ কার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। কিছুদিন পরে

কাহারও কাহারও মতে মনোবাদের কারণ এইরূপ,—"বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলি, বর্দ্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর—এই চারি জেলার স্কুল-সমূহের স্পেসিয়াল ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। জেলা-চতুষ্টয়ের বিদ্যালয়গুলির তিনি যেরূপ উন্নতি অবলোকন করেন, তদনুরূপ রিপোর্ট করিতেন। তন্নিবন্ধন তদানীন্তন ডাইরেক্টর (শিক্ষাসমাজের কর্ত্তা) বিদ্যাসাগরকে বলেন, "এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রিপোর্ট করিবে অর্থাৎ গুছাইয়া লিখিবে; নচেৎ সাধারণের নিকট গৌরব হইবে না।" তিনি বলেন, "যেমন দেখিব, তেমনই লিখিব; বাড়াইয়া লেখা আমার কর্ম্ম নহে; যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।" তেজস্বী বিদ্যাসাগরের পক্ষে ইহা অসম্ভবই বা কি?

ইয়ঙ্‌ সাহেবের সহিত মনোবাদের আর একটা কারণ শুনিতে পাই। ইয়ঙ্‌ সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সতেজ পত্র লিখিয়া ইয়ঙ্‌ সাহেবের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন,—"সংস্কৃত কলেজের বেতন বাড়াইলে কলেজ থাকিবে না। ভারতের শিক্ষা-সম্বন্ধে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিলাত হইতে যে কাগজপত্র আসে, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের বেতন-বৃদ্ধি-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। আমি সেই উপদেশ-পত্রের অনুসারে কাজ করিব। ইয়ঙ্‌ সাহেব কলেজের বেতন পাঁচ টাকা করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার পর ইয়ঙ্‌ সাহেবের সহিত মতান্তর ঘোরতর হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তেজস্বিতার সহিত ইয়ঙ্‌ সাহেবকে পত্র লিখিতেন। বাগ্মিবর রামগোপাল ঘোষ, পত্র-লেখা-সম্বন্ধে অনেকটা সাহায্য করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রায়ই বিদ্রূপ করিতেন, "সিবিলিয়ান্‌ সাহেবকে জোর করিয়া পত্র লেখা চালকলা-খেগো বামুনের কর্ম্ম নয়।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইয়ঙ্‌ সাহেবের নামে ছোটলাট বাহাদুরের নিকট অনেক বারই অভিযোগ করিয়াছিলেন। ছোটলাট বাহাদুর, ডাইরেক্টর মহাশয়ের সহিত সম্প্রীতি রাখিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তৎপক্ষে চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইয়ঙ্‌ সাহেবের সহিত সম্প্রীতি হইল না, অথচ ছোটলাট বাহাদুরও কোন সদুপায় করিলেন না,

বিদ্যাসাগর ঐ সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের খরচ-পত্রাদি বিল করিয়া পাঠাইলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা দিতে সম্মত হইলেন না। যাঁহার উৎসাহে ঐ সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই হেলিডে সাহেব তখন নিরুত্তর রহিলেন। তখন বিদ্যাসাগর নিজ হইতে ঐ সমস্ত টাকা দিয়া বিদ্যালয়গুলি কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।"

অগত্যা রাগে দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রিন্সিপাল ও ইন্‌স্পেক্টর পদ পরিত্যাগ করেন।

তেজস্বী বিদ্যাসাগর, এককথায় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদ পরিত্যাগ করেন। পাঁচ শত টাকা বেতনের মোহাকর্ষণ কার্য্য-বীরের সে অটুট দর্পের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণাঘাতে মুহূর্ত্তে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল।

ইয়ঙ্ সাহেবের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর মহাশয় দারুণ মনঃসংক্ষোভে মান্য ছোটলাট বাহাদুর হেলিডে সাহেবকে পদপরিহারকল্পে পত্র লিখেন। পত্র পাইয়া, বঙ্গেশ্বর বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যে সহসা পাঁচ শত টাকা বেতনের পদটা অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, এটা কখনই তিনি ভাবেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার নিকট ইয়ঙ্ সাহেব-সম্বন্ধে অনেক বারই অভিযোগ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত শিক্ষাসম্বন্ধে "ডেসপ্যাচে"র মর্ম্মার্থ লইয়া, ইয়ঙ্ সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের কতকটা মনোবাদ চলিতেছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। তবে সে মনোবাদ, পরিণামে যে এত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে এবং তাহারই ফলে অবশেষে বিদ্যাসাগর যে পদ পরিত্যাগে সংকল্প করিবেন, তাহা তিনি মনে করেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোটলাটের নিকট অভিযোগ করিতেন,—"শিক্ষা সম্প্রসারণ-সম্বন্ধে, বিলাত-প্রেরিত ডেসপ্যাচের যে মর্ম্ম, আমি সেই মর্ম্মানুসারে কার্য্য করি ; কিন্তু ইয়ঙ্ সাহেব, তাহার বিপরীত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, পদে পদে আমার কার্য্যের প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় আমার চাকুরী করা দায়।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিযোগ শুনিয়া, বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে ইয়ঙ্ সাহেবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পরামর্শ দিবেন বলিয়া, আশ্বাস প্রদান করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, ছোটলাট বাহাদুরের আশ্বাসবাক্যানুসারে মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবে সপ্রণয়ে কার্য্যনির্ব্বাহের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, ছোটলাট বাহাদুরের নিকট পুনঃ পুনঃ অনুযোগেরই প্রয়োজন হয়, অথচ অনুযোগ করা বৃথা। ছোটলাট বাহাদুরের আশ্বাসানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও, ইয়ং সাহেবের মতি-গতি-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণা অন্যরূপ হইল না। যে ইয়ঙ্ সাহেবকে তিনি হাতে করিয়া শিক্ষাবিভাগের সকল কাজ শিখাইয়াছেন, সেই ইয়ঙ্ সাহেবই তাঁহার সকল কার্য্যের বিরোধী এবং প্রতিবাদী। অথচ তৎপ্রতিকারেরও আর পথ নাই ; এইরূপ ভাবিয়াই, তিনি ছোটলাট বাহাদুরকে পদপরিত্যাগের পত্র লিখিয়াছেন।

ছোটলাট বাহাদুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট ভালবাসিতেন নিশ্চিতই।

তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন; এবং পত্র প্রত্যাখ্যান করিয়া লইবার জন্যও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্র প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট বাহাদুরের নিকট এ আশ্বাসও পাইয়াছিলেন।

সে আশ্বাস-বাণীতে কিন্তু বিদ্যাসাগর বিচলিত হইলেন না। তখনও তাঁহার হৃদয়, মর্ম্ম-বেদনার প্রচণ্ড উগ্র তাপে জর্জ্জরিত। তিনি পত্র-প্রত্যাখ্যানে বা পুনরায় পদগ্রহণে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি হেলিডে সাহেবকে স্পষ্টই বলেন—"সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছি; আর ফিরিবার পথ দেখি না; ক্ষমা করুন। আমি আর চাকুরী করিব না; আমার আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই।" ছোটলাট বাহাদুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ তেজস্বিতা দেখিয়া, বাস্তবিকই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া, অগত্যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদ-পরিহার মঞ্জুর করেন*।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পদ-পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, তাঁহার মাতা, পিতা, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব—সকলেই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে কোন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর বলিয়াছিলেন,—"বিদ্যাসাগর! তুমি ভাল কাজ করিতেছ না। দেখ, আজকালিকার বাজারে পাঁচ শত টাকা বেতনের পদ দুর্লভ। বিশেষতঃ তোমার মত একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের পক্ষে আরও দুর্লভ। তুমি পদ পরিত্যাগ করিলে বটে; কিন্তু তোমার চলিবে কিসে?"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, এক্ষেত্রে হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি জানি, মানুষের সম্ভ্রমই জগতে দুর্লভ। চলিবার কথা কি বলিতেছ? আমি যখন সংস্কৃত কলেজের

* শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,—"সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অনেকগুলি আহত সিপাহী সংস্কৃত কলেজে আশ্রয় লইয়াছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, ডাইরেক্টরের অনুমতি না লইয়াও সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। সিভিলিয়ান্ ইয়ঙ্ সাহেবের সহিত মনোবাদের ইহাও একটী কারণ। কোথাও কোথাও এরূপ জল্পনা শুনা যায়, ইয়ঙ্ সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য তাঁহার দোষান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি এই দোষ পান যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকারী 'লেফাফার' ভিতর আপনার পুস্তক পুরিয়া, স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলেন। এ কথা ছোটলাটকে অবগত করান হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা জানিতে পারিয়া আপনি পদত্যাগ করেন।" আমি বহু চেষ্টা করিয়াও এ কথার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, এই জন্য এ কথার আদৌ বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য। কি করিয়া এমন কথা উঠিল, ভগবানই জানেন।

সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন আমার কি ছিল? এখন তবু তো আমার প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকের কতক আয় আছে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই পদ-পরিত্যাগে, তাঁহার পরিচিত সরকারী কর্ম্মচারিবর্গ বড ব্যথিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাৎকালিক সেক্রেটরী স্যার সিসিল্ বীডন্ সাহেব। বীডন্ সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়, আর কেহই বীডন সাহেবের বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন না। তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই,—বিধবা-বিবাহের আইন পাশ হইবার পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লোমহর্ষণ সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কোন কোন অঞ্চলে বিধবা-বিবাহের আইনটী এই সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সে কথা লইয়া এখানে তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নাই। ভগবৎ-কৃপায় সে বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর, মহারাণীর অভয়বাণীর ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সেই ঘোষণাপত্র নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। বীডন সাহেব, সেই ঘোষণা-পত্র বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদত্যাগ করিবার একমাস পূর্ব্বে বীডন সাহেব নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লেখেন,—"আমার ইচ্ছা, আপনি ঘোষণাপত্রটী, বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। আগামী কল্য ১১টার সময় অফিসে আসিলে ভাল হয়। কাগজ-পত্র পাঠাইবার নিয়ম নাই; নতুবা পাঠাইতাম। এই চিঠির মর্ম্ম কাহাকেও বলিবেন না। আপনি যে ইহার তর্জ্জমা করিতেছেন, এ কথা কেহই যেন জানিতে না পারে।" ১২৬৫ সালের ৭ই কার্ত্তিকে (১৮৫৮ সালের ২২শে অক্টোবর) এই পত্র লিখিত হয়।

ইহাতে বুঝা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীডন্ সাহেবের কিরূপ বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

স্বাধীন জীবনের আভাস, ওকালতির প্রবৃত্তিত্যাগ, পিতামহীর মৃত্যু, পিতামহীর শ্রাদ্ধ, মন্ত্র গ্রহণে অপ্রবৃত্তি, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃত যন্ত্র ও ডিপজিটরী, পরোপকার ও উপকারে অকৃতজ্ঞতা

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ-পরিত্যাগ, বিদ্যাসাগরের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইল। পরবর্ত্তী জীবন-ঘটনা তাহার প্রমাণ। পরপদসেবায় মানব-জীবনের আত্মোৎকর্ষ-সাধন সহজে সম্ভবপর নয়। রুদ্ধদ্বার পিঞ্জরে আবদ্ধ সুন্দর শুকের যে অবস্থা, পরপদসেবী মানুষের অবস্থা তো তদতিরিক্ত নয়। স্বাধীন প্রাণে

স্বাধীনভাবে কার্য্য-প্রসারণে কার্য্য-বীরের যে সুবিধা, পরাধীন প্রাণে সে সুবিধা নাই। স্বাধীন প্রাণ মুক্ত পথে প্রধাবিত হয়। মানব-জীবনের উৎকর্ষ ও উন্নতি তাহাতেই আছে। যিনি যে পথে যান না কেন, মানুষ, আপন বুদ্ধিবশে, এক পথ দিয়া গিয়া স্বাধীন জীবনপ্রবাহে পার্থিব সুখের চরম সীমায় পৌঁছিতে পারে. আবার অন্য পথে গিয়া অপার্থিব সুখের অন্তিম পর্য্যন্ত পাইতে পারে। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদ পরিত্যাগ করিবার পর হইতে. বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বাধীন প্রাণে কার্য্য করিবার শত শত পথ আবিষ্কার করেন। সে সকল পথ, ঐহিক প্রীতি-প্রতিষ্ঠার সম্যক্ অভিমুখী। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, আধুনিক সভ্য-সমাজে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। যাবৎ এ জগৎ, তাবৎই তাঁহার প্রতিষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয়, নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী লিখিয়াছেন—

"১৮৫৮ খৃঃ অব্দের শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ পরিত্যাগ করেন, ঐ সময়ে কলিকাতার সুপ্রিম-কোর্টের চিফ্ জষ্টিস্ স্যার জেম্‌স্ কলবিল সাহেব মহাদয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উকীল হইবার জন্য পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পরামর্শানুসারে উকীল হওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যার সময়ে. তাৎকালিক প্রধান উকীল দ্বারকানাথ মিত্রের কার্য্যাবলী দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতেন*। তিনি তথায় গিয়া দেখেন যে, টাকার জন্য হিন্দুস্থানী মোক্তারদের সহিত হুড়াহুড়ি করিতে হয়। দেখিয়া শুনিয়া ওকালতী কর্ম্মে তাঁহার ঘৃণা জন্মে। পরে তিনি কলবিল সাহেবকে গিয়া আপনার অভিমত প্রকাশ করেন। কলবিল সাহেব বলেন, 'তোমার মত পণ্ডিত লোককে টাকার জন্য মোক্তারদের সঙ্গে হুড়াহুড়ি করিতে হইবে না। তুমি ওকালতী কর।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে কার্য্য হইল না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রামবাসী তদীয় পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন—

"দ্বারকানাথ মিত্র, কেবল মক্কেলদের কাগজ-পত্র লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। পড়াশুনার সময় থাকিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। মোকদ্দমা লইয়া থাকিলে পড়াশুনা হইবে না ভাবিয়া, তাঁহার ওকালতী করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।"

* এই দ্বারকানাথ মিত্র পরে হাইকোর্টের জজ হন।

আধুনিক আদালতের অনেক উকীলকেই যে টাকার জন্য হুড়াহুড়ি মারামারি করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একজন শান্তিপ্রিয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যে সেটাকে ঘৃণা করিবেন তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান্ উকীল কি টাকার জন্য মোক্তারদের সঙ্গে ঐরূপ হুড়াহুড়ি করিতেন? এ কথাটা মনে স্থান দিতে কোন মতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। শশিভূষণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা এক্ষণে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, অসীম সাহসে সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার পুস্তকের কতকটা আয় ছিল বটে; কিন্তু ঋণও বিস্তর ছিল। দানের তো ত্রুটি হয় নাই। ঋণেও বিদ্যাসাগরের অদ্ভুত তেজস্বিতার পরিচয়।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহীর ৺গঙ্গালাভ হয়। পিতামহীকে পীড়িতাবস্থায় বীরসিংহ গ্রাম হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। এখানে ভাগীরথী-তীরে শালিখা ঘাটে বিশ দিন গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়া তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল।

এতৎসম্বন্ধে বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদিগণ অনেক শত্রুতা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্রাদ্ধোপলক্ষে এ প্রদেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের পিতামহীর শ্রাদ্ধে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে আসিবেন না; তাহা হইলেই পিতৃদেব মনোদুঃখে দেশত্যাগী হইবেন। যাহারা এরূপ মনে করিয়াছিল, তাহারা অতি নির্ব্বোধ। কারণ, অগ্রজ মহাশয়, দেশে অবৈতনিক ইংরেজি, সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; প্রায় চারি পাঁচ শত বালককে বিনা বেতনে শিক্ষা ও ঐ সমস্ত বালককে পুস্তক কাগজ শ্লেট প্রভৃতি প্রদান করিতেন। ইহা ভিন্ন বাটীতে প্রত্যহ ষাটটী বিদেশস্থ সম্ভ্রান্ত অধ্যাপকদের বিদার্থী সন্তানগণকে অন্নবস্ত্র প্রদান করিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে অনেক ভিন্ন গ্রামের ছাত্রগণেরও চাকুরি করিয়া দিতেন। তিনি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ডাক্তার বিনা ভিজিটে গ্রামের ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের ভবনে চিকিৎসা করিতে যাইত। নাইট স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় বাসায় অন্নবস্ত্র পাইয়া, মেডিকেল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া চিকিৎসক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কি ধনশালী, কি

মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র—সকল সম্প্রদায়ের লোকই, বিপদাপন্ন হইয়া আশ্রয় লইলে, বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইত। চাঁদা প্রদান করিয়া, বিস্তর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তিনি সাধারণের বিশিষ্টরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এবম্বিধ লোকের পিতামহীর শ্রাদ্ধে শত্রুপক্ষ কেমন করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে পারে?"

শ্রাদ্ধে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা যে না হইয়াছিল, এমন নহে; কিন্তু উক্ত অংশের কথাগুলি অত্যন্ত সন্দেহোদ্দীপক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কোন সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বাধ্য নহেন, এমন কোন প্রকৃত ধর্ম্মাচারী শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রাদ্ধোপলক্ষে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন কি না, লোকে ইহা জানিতে ইচ্ছুক হয়। যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়, পিতামহীর সপিণ্ড উপলক্ষেও পিতাকে অনেক অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মীয় পরিবারের স্ব-বিশ্বাসোচিত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোনরূপ ব্যাঘাত করিতেন না; বরং আবশ্যকমত অর্থসাহায্য করিতেন। এরূপ কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহার মতামত, কেহই জানিতে পারিতেন না; কিন্তু কোনরূপ ব্যাঘাত দেওয়া যে অকর্ত্তব্য, তাহা তিনি অনেক সময়েই বলিতেন।

পিতামহীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় শোকাকুল হইয়াছিলেন। পিতামহী তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তিনিও পিতামহীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বাল্য-কালে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়া হইলে, এই পিতামহী বীরসিংহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং রোগ অসাধ্য হইলে, সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেন। যৌবনে কার্য্যাবস্থায়ও এইরূপ ভাবই ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যা কিছু আদর-আব্দার তাঁহারই নিকট করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে এতই ভালবাসিতেন যে, কোন গুরুতর বিষয়ে অবাধ্য হইলেও, তিনি বিদ্যাসাগরের উপর রাগ করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বংশে নিয়ম ছিল,—পিতা, মাতা, পিতামহ বা পিতামহী, মন্ত্র-দীক্ষা দিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই এক বার মন্ত্র দিবার প্রস্তাব করিয়া, বড় সুবিধা বিবেচনা করেন নাই; সুতরাং তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন। পরে তাঁহার জননী বিদ্যাসাগরকে মন্ত্র দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর বিবেচনা করিয়া লইব বলিয়া স্বীকার করেন। একদিন পিতামহী পীড়াপীড়ি করাতে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্ত্রগ্রহণের একান্ত অব্যাহতি নাই ভাবিয়া পিতামহীকে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পান। মন্ত্রগ্রহণে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা বা মত নাই বুঝিয়া, পিতামহী আর মন্ত্র লইবার কথা বলেন নাই। বেশী বলিলে, পাছে

প্রিয়তম পৌত্রের প্রাণে কষ্ট হয় বলিয়া স্নেহ-বাৎসল্য-বিমুগ্ধা বৃদ্ধা পিতামহী ক্ষান্ত হইলেন। এমনই বাৎসল্য মোহ* ।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আচারানুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলি। তিনি তো পিতামহীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন নাই; পরন্তু সন্ধ্যাহ্নিক পূজাদিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তবে অপর কাহারও সন্ধ্যাহ্নিক-ক্রিয়া দেখিয়া, তিনি নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন না। আপন পরিবারের মধ্যে কাহারও প্রতি তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিষেধও ছিল না। ব্রত-স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়ায় কেহ কখন তাঁহার নিকট বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। সন্ধ্যাহ্নিক আচারানুষ্ঠানে বিরত থাকিলেও, হিন্দুর আচার-সম্মত খাদ্যাখাদ্য-সম্বন্ধে তিনি অনেকটা বিচার করিতেন। মুরগী, মদ প্রভৃতি অখাদ্য-ভোজী তাঁহার সৌহার্দ্দ্য-সৌভাগ্য লাভ করিলেও, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, কখন নিজের বাড়ীতে খাওয়াইতে পারিতেন না। রাজকৃষ্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, কোন এক জন শক্তিশালী ব্যক্তি শ্যামাচরণবাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি অখাদ্য খাইতেন বলিয়া, শ্যামাচরণবাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার বাড়ীতে কখন নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন না।

এই বার বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জনের পথ অবলম্বন করিলে, তাঁহার সংস্কৃত যন্ত্র ও সংস্কৃত ডিপজিটরী প্রধান ভরসাস্থল হয়। প্রেসে পুস্তক ও ডিপজিটরীতে নিজের ও অপরের পুস্তক, বিক্রীত হইত। বলা বাহুল্য, এই প্রেসে ও ডিপজিটরীতে অনেক লোকই প্রতিপালিত হইত। কিন্তু ক্রমে তিনি কোন কোন প্রতিপালিত কর্ম্মচারীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। কার্য্যে বিশৃঙ্খলা বিলক্ষণ হইয়াছিল এবং হিসাবপত্রেও যথেষ্ট গোলযোগ ঘটিয়াছিল। এই সব দেখিয়া, তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে ডিপজিটরীর কার্য্যপরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রাজকৃষ্ণবাবু, তখন ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে আশী টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ১২৬৬ সালের ৪ঠা পৌষ বা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ হইতে ছয় মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া, ডিপজিটরীর কার্য তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়েন। এই ছয় মাসের মধ্যে অসীম অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, তিনি ডিপজিটরীর সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলতা করেন। তখন হিসাবপত্রও এরূপ সুশৃঙ্খল হইয়াছিল যে আবশ্যকমত সকল সময়ে আয়-ব্যয়ের অবস্থা জানিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা, রাজকৃষ্ণবাবুর কার্য্যপ্রণালী

---

* স্বর্গীয় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের মুখে এই বিষয়টী শুনিয়াছিলাম।

সন্দর্শনে এতাদৃশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ডিপজিটরীরই কার্য্যে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। অগত্যা রাজকৃষ্ণবাবু ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ পরিত্যাগ করেন। এ কার্য্যে তাঁহার বেতন দেড় শত টাকা হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৌভাগ্যে এবং রাজকৃষ্ণবাবুর প্রগাঢ় যত্নে প্রেস ও ডিপজিটরীর কার্য্য সবিশেষ সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া অনেকটা লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কেবল পরোপকারার্থে তাঁহাকে পরে এ প্রেসও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। সে কথা যথাস্থানে বলিব।

রাজকৃষ্ণবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আ-যৌবন সুহৃদ্। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধিসাধনের মূলই বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃতজ্ঞতা প্রকটনের ইহা অন্যতম প্রমাণ। যে রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তরতম আত্মীয়ের ন্যায় আহার, শয়ন প্রভৃতি নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, যে রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন, যে রাজকৃষ্ণবাবুর একটী শিশুকন্যার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃতকল্প হইয়াছিলেন *, যে রাজকৃষ্ণবাবুর জননী বিদ্যাসাগরকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, সেই রাজকৃষ্ণবাবুর উন্নতিসাধন করা, বিদ্যাসাগরের পক্ষে বিচিত্র কি? কেবল রাজকৃষ্ণবাবু কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, কত লোকের চাকুরি করিয়া দিয়াছেন, তাহার গণনা হয় কি? রাজকৃষ্ণবাবু তো ঘনিষ্ঠ আত্মসম্পর্কীয়, কত দূর-সম্পর্কীয় অপরিচিত লোকও তাঁহার প্রসাদে চাকুরী পাইয়া, অন্ন-সংস্থাপন করিয়া লইত।

দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসাদে যাঁহারা চাকুরী লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অকৃতজ্ঞ, এমন কি, কোন উচ্চপদস্থ যশস্বী ব্যক্তি, তাঁহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে, লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মাহত হইতে হয়। এক ব্যক্তি, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চাকুরীর জন্য ধরিয়াছিল। তখন ঐ যশস্বী ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। এই উচ্চ পদও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসাদেই প্রাপ্ত। তাঁহার অধীনে চাকুরী খালি ছিল। যে লোকটী চাকুরীর জন্য ধরিয়াছিল, সে ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে উচ্চপদস্থ বাবুর নামে এক সুপারিস্ চিঠি লইয়া এক দিন বাবুর চাকুরী-স্থানে

* রাজকৃষ্ণবাবুর এই কন্যাটির মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে একটী গদ্য-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সে রচনাটী তৃতীয় বর্ষের বৈশাখ মাসের "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা "প্রভাবতী-সম্ভাষণ" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গদ্যে ইহা করুণাত্মক কাব্য। পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল সংবরণ করা যায় না। প্রভাবতী কি করিত, কি বলিত, কি খাইত ইত্যাদি কবিতার ভাষায় লিখিত। ইহা কাব্য রচনা শক্তিমত্তারও পরিচয়।

তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হয়েন। তখন বাবু, ইয়ারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, সোফায় বসিয়া আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন। লোকটী সেই সময় তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত চিঠিখানি দেন। বাবু তখন তামাক টানিতে টানিতে একটু মৃদু হাসিলেন। ইয়ারবর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" বাবু বলিলেন, "ব্যাপার আর কি? বিদ্যাসাগর ব্যবসায় ধরিয়াছে। চাকুরী ক'রে দাও।" বাবুর কথা শুনিয়াই উমেদার অবাক্। কোন কথা না বলিয়াই তিনি তথা হইতে চলিয়া আসেন; কিন্তু লজ্জায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই। সহসা একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; সেই সাক্ষাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাবুর অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পান।

অন্য এক সময়, কোন সরকারী আফিসে চাকুরী খালি হইয়াছিল। আফিসের যে বিভাগে চাকুরী খালি ছিল, বাগবাজারের ৺প্রিয়নাথ দত্ত সেই বিভাগের বড়বাবু ছিলেন। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে উচ্চপদস্থ বাবুর নামে চিঠি লইয়াছিলেন, ইনি এক্ষণে এই চাকুরীর জন্য প্রিয়নাথবাবুর নামে চিঠি লইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যান। প্রিয়-বাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদৌ আলাপ-পরিচয় ছিল না। সেই জন্য তিনি পত্র দিতে ইতস্ততঃ করেন; কিন্তু লোকটির নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পত্র না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। লোকটী চিঠি লইয়া, প্রিয়বাবুর নিকট যান। প্রিয়বাবুর আফিসে পাঁচটী চাকুরি খালি ছিল; কিন্তু এই কয়টী চাকুরীর জন্য পরীক্ষা দিবার নিয়ম হইয়াছিল। প্রিয়বাবু লোকটীকে পরীক্ষা দিতে বলেন। লোকটী সম্মত হন। পরীক্ষায় কিন্তু তিনি সপ্তম হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা রক্ষা হয় না ভাবিয়া, প্রিয়বাবু অত্যন্ত কাতর হন। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়া কহিয়া, তিনি আর দুইটী নূতন পদ বাড়াইয়া লন। ইহার একটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোক প্রাপ্ত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরে এই সংবাদ পাইয়া বলেন,—"বিচিত্র সংসার! আমি যাহার প্রকৃত উপকার করিয়াছি, সে আমার কথা রাখিল না; আর উপকার করা তো দূরের কথা, যাঁহার সহিত আলাপমাত্র নাই, তিনি আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।"

এই কথা বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়, তদ্দণ্ডেই বাগবাজারে গিয়া, প্রিয়নাথ-বাবুর সহিত আলাপ করেন*।

* আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে এই কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে প্রিয়নাথবাবুর সন্ধান লইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিয়নাথবাবুর সহিত আলাপ করিতে যান।

আর একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী লোকের চাকুরী করিয়া দিবার জন্য একটী লোককে অনুরোধ করিতে যান। এই ব্যক্তি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ শুনিয়াই, ইনি বলিয়াছিলেন,—"এমন অনুরোধ করিবেন না। এখন আমি সম্পাদক। আমি যদি সাহেব সুবোকে অনুরোধ করি, তাহা হইলে, স্বাধীন ভাবে আর লেখা চলিবে না।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই কথা শুনিয়া, চলিয়া আসেন। তিনি যখন অনুরোধ করিতেছিলেন, সেই সময় তথায় কোন সওদাগর আফিসের সদর-মেট তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, চলিয়া আসিলে সেই সদর-মেট বাবুটীও, তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসেন। তিনি পথিমধ্যে অতি বিনয়-বাক্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেন,—"মহাশয়! লোকটীর কুড়ি টাকা মাহিনার চাকুরী হইলে চলিবে কি? তাহা যদি হয়, আমার অধীনে একটী চাকুরী খালি আছে। আমি তাহা আপনার লোককে দিতে পারি।"

সদর-মেটের সৌজন্যে বিদ্যাসাগর বিস্মিত হইয়া উপকৃতের অকৃতজ্ঞতা স্মরণে একটু হাস্য করিলেন। তিনি সদর-মেটের মহত্ত্বের প্রশংসা করিয়া, তাঁহারই কথা মত আপনার লোকটিকে তাঁহারই আফিসে পাঠাইতে সম্মত হয়েন।

এরূপ অকৃতজ্ঞতার বহু প্রমাণই পাওয়া যায়।—কেহ নিন্দা করিয়াছেন শুনিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—"সে কি রে, আবার নিন্দা? আমি তো তাহার কোন উপকার কবি নাই।"

তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"তিনি যাঁহার যত উপকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকট তত অধিক প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন *।"

উপকারীর প্রত্যুপকার তো দূরের কথা উপকারীর অপকার করার দৃষ্টান্ত—এ কলুষময় কলিকালে চারিদিকে দেদীপ্যমান†।

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মুখে এই কথা শুনিয়াছি।

† সাবিত্রী লাইব্রেরীর চতুর্দ্দশ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ., বি. এল. মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

বিংশ অধ্যায়

বিধবা-বিবাহে ঋণ, বিধবা-বিবাহ নাটক, দান-দাক্ষিণ্য, ইংরেজি স্কুল, কৃতজ্ঞতা, হিন্দু পেট্রিয়াট, সোম-প্রকাশ, বর্দ্ধমান রাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা, সোম-প্রকাশে বিদ্যাভূষণ, সংবাদ-পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বৎসর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদ পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসর তিনি হুগলী জেলার মধ্যে কতকগুলি গ্রামে নিজ ব্যয়ে পনেরটী বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। অনেক পুনর্বিবাহিত বিধবাদের ভরণ এবং সংরক্ষণ জন্য তাঁহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহার জন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ঋণ করিয়াও, তিনি দীন-হীন ঋণীর ঋণ পরিশোধ করিতেন। তিনি স্বয়ং ঋণগ্রস্ত বটেন ; কিন্তু দানে যে তিনি মুক্ত-হস্ত। দয়ার বা দানে এতাদৃশ অসংযম বিজ্ঞ-জন-সম্মত নহে। অধিকন্তু ইহা সংসারীর সন্ত্রাসকারী। অসংযত কিছুতেই ভাল নয়। বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা বুঝিতেন না, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? কিন্তু তাঁহার দান ও দয়া এইরূপই ছিল। হয় তো তিনি কোন নৈসর্গিক শক্তি বলে বুঝিতেন,—ঋণ যতই হউক, পরিশোধের পথ পরিষ্কৃত করিবই, অথবা স্বভাবদাতার পথ ভগবৎকৃপায় আপনি পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের দান ও দয়ার কথা ভাবিলে, কি যেন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

সেই সময় বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। সেই আন্দোলন সতত প্রবল রাখিবার জন্য নানা দিকে নানা উপায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর উমেশচন্দ্র মিত্র, "বিধবা-বিবাহ নাটক" রচনা করেন। সেই সময় (অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে) উহার অভিনয়। কেশবচন্দ্র সেন, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি অভিনেতা ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের থিয়েটার দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না। একবার একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি বেলগাছিয়া পাইকপাড়ার রাজ-বংশ কর্তৃক অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ নট-কবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বপ্রণীত "সীতার বনবাস" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম উৎসর্গ করিয়া তাঁহার অভিনয় দেখাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি বিধবা-

বিবাহের অভিনয় একাধিক বার দেখিয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন। অভিনয় দেখিতে দেখিতে, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত *। বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের জন্য তিনি প্রাণপণে যত্ন করিতেন। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনোদ্দীপক অভিনয় বলিয়াই তো তাঁহার এত সহানুভূতি ছিল।

কলেজের চাকুরী নাই, আয়েরও নূতন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই, অথচ ঋণ অনেক ; তেমন অবস্থায় বৈঁচিনিবাসী গোকুলচাঁদ এবং গোবিনচাঁদ বসু নামক দুই ভাই আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন,—"নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় † আমাদের বসতি-বাটী ক্রোক করিতে সংকল্প করিয়াছেন। আপনি রক্ষা করুন।" বিদ্যাসাগর শরণাগতের কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইলেন। তিনি তখনই নীলকমলবাবুকে এক সহস্র টাকা দিয়া বসু-পরিবারের বাস্তুভিটার উদ্ধার করিয়া দেন। রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে বলিয়াছেন, তিনি ডিপজিটরীর কার্য্য পরিত্যাগ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় গোকুলচাঁদবাবুকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গোকুলচাঁদের মত কত বিপন্ন ব্যক্তির দায়োদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা, বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেন না তিনি গগন-ভেদী ঢক্কাশব্দে কাঁপাইয়া দান করিতেন না। অনেক সময়ে, তিনি অনেককে এক কালেই দান করিতেন ; কিন্তু সে সব প্রায়ই লিপিবদ্ধ করিতেন না। তবে রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় বন্ধু এবং ভ্রাতৃবর্গ, সে সব দানের কথা জানিতে পারিতেন, তাহা সময়ে সময়ে লোক পরম্পরায় প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

সে সময়ে গোকুলচাঁদের বাস্তুভিটার উদ্ধার সাধন হয়, সেই সময়ে শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির পাঁচ শত টাকার দেনার দায়ে বাটী নীলাম হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপস্থিত দায় জানাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া, তাঁহাকে ঐ পাঁচ শত টাকা দান করেন।

একটা মহত্তর দান ও দয়ার পরিচয় এইখানেই দিই। রাজকৃষ্ণবাবুকে

* The pioneer father of the widow marriage movement pandit Iswar Chandra Vidyasagar came more than once and tender-herated as he is, was moved to floods of tears.—"Life and Teachings of *Keshub* Chandra Sen" by P. C. Mozumder.

† নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণবাবুর ভ্রাতা।

জিজ্ঞাসা করিলেও, তিনি ইহার মূল-তত্ত্ব স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত "বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে" বিবৃত আছে।

"আমাদের বাটীর সন্নিহিত রাধানগর-নিবাসী * জমিদার ৺বৈদ্যনাথ চৌধুরী ...এ প্রদেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য জমিদার ছিলেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের নিকট ইনি, জমিদারী বন্ধক রাখিয়া, পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করেন। ইহার পুত্রও† পঁচিশ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। এই পঁচাত্তর হাজার টাকা কিস্তিবন্দী করিতে যাইয়া, বাবু শিবনারায়ণ চৌধুরী, কলিকাতাস্থ রায় মহাশয়ের দপ্তরখানায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।"

অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পুত্রদ্বয় ও পত্নীর উদ্ধার করেন। এতৎসম্বন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"অনন্তর ক্ষীরপাই রাধানগর নিবাসী মৃত শিবনারায়ণ চৌধুরীর বিধবা-পত্নী, ইঁহারাও কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের রোদনে অগ্রজ মহাশয়েরও চক্ষে জল আসিল। অগ্রজ উঁহাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে রাজা প্রতাপ-চন্দ্র সিংহের আত্মীয় বাবু কালিদাস ঘোষ মহাশয়ের নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অন্য এক ব্যক্তির নিকট পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া টাকা দিলেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই টাকা দিয়া কোন প্রকারে চৌধুরীদের ঋণোদ্ধার করিয়া দেন। ঋণোদ্ধার হইল বটে; কিন্তু এ বিষয় রহিল না। বিদ্যারত্ন মহাশয় সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অতঃপর কয়েক বৎসর চৌধুরী-বাবুরা পরম-সুখে কালাপতিপাত করেন। সুখের বিষয় এই, ভ্রাতৃবিরোধ ও বন্দোবস্ত না হওয়াতে দুই এক মহাজন পরিবর্ত্তের পর ঐ সম্পত্তি ক্রোকে নীলামে বিক্রয় হয়। তন্নিবন্ধন উঁহাদের কষ্ট উপস্থিত হইলে, মৃত শিবনারায়ণ চৌধুরীর পত্নী ও সদানন্দ চৌধুরীর পত্নীকে মাসিক ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে অগ্রজ মহাশয়, প্রতি মাসে প্রত্যেককে সমানভাবে ৩০৲ টাকা মাসহারা প্রেরণ করিতেন। কিছুদিন পরে মোনপুরের কাশীনাথ ঘোষ ৮০০ শত টাকার জন্য উক্ত চৌধুরীদের নামে অভিযোগ করিয়া বসতবাটী ক্রোক করিলে, আমি উক্ত মহাশয়দের অনুরোধে কাশীনাথ ঘোষের সহিত ১৫০ টাকার রফা করিয়া দাদার নিকট ঐ টাকা লইয়া উক্ত বিষয় খোলসা করিয়া দিয়াছিলাম।"

* এই রাধানগর "ক্ষীরপাই রাধানগর" বলিয়া খ্যাত।—গ্রন্থকার।

† হরিনারায়ণের পুত্রের নাম শিবনারায়ণ চৌধুরী।—গ্রন্থকার।

কলেজের চাকুরীর সময় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভাবিয়া শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই যত্ন করিতেন। চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াও তৎপক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। বরং সে সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার প্রশস্ততর পথ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে ও উদ্যমে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার সুবিস্তর সংপ্রসারণে এ দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয়, এটা অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুদৃঢ় ধারণা ছিল। সেই জন্য কি পরাধীন অবস্থা, কি স্বাধীন অবস্থা, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি ইংরেজি শিক্ষার সংপ্রসারণ-সংকল্পে আত্ম-প্রাণ নিয়োজিত করিতেন। ইংরেজি আদর্শে গঠিত চরিত্রবান্ অনেকেই ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত কৃতকর্ম্মা কয় জন? চাকুরীর সময়ে তিনি যেমন নানা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, চাকুরী যাইবার পরেও তাঁহার যত্নে এবং অর্থব্যয়ে নানা স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আপন আর্থিক উন্নতিসাধন অপেক্ষা ঐ কার্য্যকে তিনি জীবনের অধিকতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাহারও পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। চাকুরী পরিত্যাগ করিবার পর প্রথমতঃ ১২৬৫ সালে ২১শে চৈত্র শুক্রবার (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দী গ্রামে একটী ইংরেজি ও সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্দী গ্রাম পাইকপাড়া রাজবংশীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের জন্মস্থান। রাজা বাহাদুরেরা আপন ব্যয়ে স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু উহাতে বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ উত্তেজনা। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সেই সময়ে রাজা প্রতাপচন্দ্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। সিংহ-রাজ-পরিবারও এক সময়ে বিদ্যাসাগরের নিকট যথেষ্ট উপকার ও সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের স্বভাবসিদ্ধ সরলতার এমনই মোহকরী আকর্ষণী শক্তি যে, একবার তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ পরিচয় হইত, তিনি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিতেন।

সেই সময়ে, ঐ কান্দী গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্ব-আশ্রয়দাতা ৺জগদ্দুর্লভ সিংহের কন্যা ক্ষেত্রমণি দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ক্ষেত্রমণি রাজপরিবারের রাজ-বাটীর ভাগিনেয় বধূ। রাজবাটীর ভাগিনেয় লালমোহন ঘোষ তাঁহার স্বামী। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাটী গিয়াছেন শুনিয়া, ক্ষেত্রমণি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। নানা কারণে ক্ষেত্রমণির অবস্থা বড়ই হীন হইয়াছিল। বহুদিনের পর সেই দীন-হীন ক্ষেত্রমণিকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর

মহাশয় চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষেত্রমণির প্রার্থনায় মাসিক দশ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় গুণী ও গুণগ্রাহী। জগতে সকল গুণীরই গুণনির্ণয়ে শক্তি থাকে না। সেই শক্তি অন্তর্ভেদিনী সূক্ষ্ম দৃষ্টির অন্তর্ভূতা। বিদ্যাসাগরের সেই শক্তি অতুলনীয়। চাকুরীর সময়ে তাহার বহু পরিচয় পাইয়াছি। স্বাধীন অবস্থায় হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক নিয়োগেও তিনি সে শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১২৬৮ সালের ১লা আষাঢ় (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন) শুক্রবার বেলা ৯ নয়টার সময় হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক সুলেখক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। ঐ বৎসরে ১২৬৮ সালের ১১ই শ্রাবণ (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই) পেট্রিয়ট কার্য্যালয় ভবানীপুর হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ হাজার টাকা দিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইহা পরিচালিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা তিনি বেশী দিন রাখিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হিন্দুপেট্রিয়টের ভারার্পণ করেন। সেই সময়ে বাবু কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে"র কেরাণী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণদাসবাবু কেবল সম্পাদক নহেন; স্বত্বাধিকারীও হইলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় নাই। উদীয়মান লেখক কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের এরূপ অসম্ভব বিশ্বাস প্রীতি দেখিয়া সেই সময়ে অনেকেই চমকিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘদর্শী বিদ্যাসাগর খুব বুঝিয়াছিলেন,—কৃষ্ণদাসবাবু শক্তিশালী প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। কৃষ্ণদাসের অশেষ শক্তিসম্পন্নতার অনুভবে বিদ্যাসাগর আপনার সুতীক্ষ্ণ-শক্তিশালিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু ও বান্ধবেরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু পরে কৃষ্ণদাসের অসীম শক্তিশালিতার অকাট্য প্রমাণে তাঁহাদিগকেও লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল।

প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ করিবার বৎসর দুই পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল পরপোকারার্থ "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক দিন সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আসিয়া সজল নয়নে বলিলেন, "মহাশয়! রক্ষা করুন। সংসার চলে না।" সারদাপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈববিড়ম্বনায় তাঁহার শ্রুতি-শক্তি নষ্ট

হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দুঃখে বিগলিত হইয়া তৎপরিবার-প্রতিপালনের সদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সারদা প্রসাদের উপকারার্থ "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে সারদাপ্রসাদ পরে বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে এবং লাইব্রেরিয়ান্ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বর্দ্ধমানরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। (১২৫৪ সালে : ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাবু রামগোপাল ঘোষজ ও ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষালের সহিত বর্দ্ধমান দর্শনার্থ গমন করেন। তাঁহারা তিন জনে এক বাসায় ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজবাটীর সিদায় উদর পূর্ণ করিতে অসম্মত হইয়া অপর কোন বন্ধুর বাড়ীতে ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। মহারাজ এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসারর মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বাড়ীতে আনাইবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম যাইতে সম্মত হয়েন নাই; কিন্তু নানা সাধ্য-সাধনায় শেষে অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া মহারাজও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিদায়-সময়ে মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে উপহার স্বরূপ পাঁচ শত টাকা ও এক জোড়া শাল দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কিন্তু উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, "আমি কাহারও দান লই না। কলেজের বেতনেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ এইরূপে বিদায় পাইলে অনেকটা উপকৃত হইতে পারেন।" রাজা বিস্মিত হইলেন! সেই সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখনই বর্দ্ধমানে যাইতেন, তখনই মহারাজ তাঁহার সসম্ভ্রম আদর-অভ্যর্থনা করিতেন। বর্দ্ধমানাধিপতি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এমনই শুভাকাঙ্খী ছিলেন যে, বীরসিংহ গ্রামকে তাঁহার তালুক করিয়া দিবার জন্য তিনি স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবে বিদ্যানাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছিলেন, "আমার যখন এমন অবস্থা হইবে যে, আমি সমুদয় প্রজার খাজানা দিতে পারির তখন তালুক লইব।"*

এই বর্দ্ধমানরাজ বিধবা-বিবাহ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান

* এই ঘটনার কথা উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিধবা-বিবাহের আইন জন্য যে, আবেদন হইয়াছিল, তাহাতে বর্দ্ধমান রাজের স্বাক্ষর ছিল।

যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বর্দ্ধমান-রাজের এত ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা, তাঁহার অনুরোধে-মাত্রেই যে সারদাপ্রসাদ বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে কর্ম্ম পাইবেন, তাহা আর বেশী কথা কি? সারদাপ্রসাদের সংসার পরিচালন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং সোমপ্রকাশে লিখিতেন। সুলেখক মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দুই একটী প্রবন্ধও মধ্যে মধ্যে ইহাতে প্রকাশিত হইত। ক্রমে কিন্তু প্রতি সোমবারে নিয়মিত সোমপ্রকাশ বাহির করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে কিছু ভার-স্বরূপ হইয়া পড়িল। সমায়াভাবপ্রযুক্ত তিনি ইহাতে আর সম্যক্ মনোযোগী হইতে পারিতেন না। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্পষ্টই বলেন, "একে তো আমার সময় নাই, তাহার উপর যথানিয়মে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করা বাস্তবিক চাকুরী অপেক্ষাও কষ্টকর।" অগত্যা এক জন সুদক্ষ সম্পাদকের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। তিনি পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার হস্তে "সোমপ্রকাশ" সমর্পণ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সোমপ্রকাশে"র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হইলেন।

অধুনা যে প্রণালীতে ও যে প্রকরণে ইংরেজি সংবাদপত্র পরিচালিত হইয়া থাকে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেই প্রণালীতে ও সেই প্রকরণে সোমপ্রকাশ পরিচালিত করিতেন। বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগরের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সব সংবাদপত্রের অধিকাংশে সমাজ-বিষয়ক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা অধিক পরিমাণে থাকিত। রাজনীতির আলোচনা যে হইত না, এমন নহে; তবে সোমপ্রকাশের ন্যায় উচ্চতর গভীর প্রণালীতে নহে। ভাষার পুষ্টি-সাধন সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ উচ্চতর আদর্শ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে যে ভাষার পুষ্টিকারিতার উচ্চতর সোপান প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে সোমপ্রকাশের পূর্ব্বে যে সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারাও বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন জন্য বাঙ্গালী মাত্রের বরণীয়। প্রকৃতই বাঙ্গালা গদ্যের পুষ্টি-প্রারম্ভ বাঙ্গালা সংবাদপত্রে। প্রথম সংবাদপত্রে পুষ্টিসঞ্চার, পরে তাহার ক্রমবিকাশ। সোমপ্রকাশের পূর্ব্বে যে সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, "প্রভাকরে"র ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশ-সংখ্যক

"নব-জীবনে",* "বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস" নামক একটি ঘটনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তাহাদের অধিকাংশের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে সংক্ষেপে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম।

"অনেকের ধারণা, মিসনরীরা প্রথমে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ১২২২ সালে বা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক একজন পণ্ডিত কলিকাতা সহরে সর্বপ্রথম "বাঙ্গালা-গেজেট" নামে সংবাদপত্র প্রচার করেন। ১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবেরা "সমাচার দর্পণ"-নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন। ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়, তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "সংবাদকৌমুদী" নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন রায় এই সংবাদপত্রে প্রচলিত সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে ভবানীচরণবাবু উহার সম্পাদকতা ত্যাগ করেন। ১২২৮ সালে ঐ ভবানীচরণ "সমাচার চন্দ্রিকা" নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহা শেষে প্রাত্যহিক হয়। তৎপরে ইহা "বঙ্গবাসী"র কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "দৈনিক" নামক প্রাত্যহিক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। "চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হইবার পর মৃজাপুর-নিবাসী কৃষ্ণমোহন দাস "সংবাদ-তিমিরনাশক" সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করেন। কয়েক বর্ষ পরে এখানি উঠিয়া যায়। "তিমিরনাশক" প্রকাশ হইবার পর রাজা রামমোহন রায়, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের উদ্যোগে "বঙ্গ-দূত" নামক সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয়†। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ শুক্রবারে "সংবাদ-প্রভাকর" প্রকাশিত হয়। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর "সংবাদ-প্রভাকর" প্রকাশের প্রধান উদ্যোগী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১২৩৩ সালে যোগেন্দ্রমোহন মানবলীলা সম্বরণ করিলে "প্রভাকরে"র প্রচার বন্ধ হয়। ঐ বর্ষে গুপ্ত মহাশয় "সংবাদ-রত্নাবলী" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়েন। কিছু দিন পরে তিনি ইহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন। পরে ১২৪৩ সালে ২৭শে শ্রাবণ তিনি আবার "সংবাদ-প্রভাকরে"র প্রকাশ আরম্ভ করেন। সেই সময়ে প্রভাকর সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হইত। ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় ইহা প্রাত্যহিক হয়। ১২৪২ সালে "পূর্ণ চন্দ্রোদয়" প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। উহা ১২৪৩ সালে সাপ্তাহিক ও কয়েক বৎসর পরে প্রাত্যহিক

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত মাসিক পত্র। এখন নাই।

† তৎপরে "বঙ্গ-দূত" ও "সংবাদ সুধাকর," এই দুই পত্র প্রচারিত হয়।

হয়। ১২৩৭ সাল হইতে ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, গোপালবাবু* তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সে তালিকায় প্রকাশকের এবং সম্পাদকের নাম আছে। কোন্ সংবাদপত্রের কত দিনে আরম্ভ, তাহারও উল্লেখ আছে। গণনায় ৮৯ খানি হইবে। "সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়" নামক একখানি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন হইতে সংবাদ পর্য্যন্তও পদ্যে লিখিত হইত। প্রবন্ধ, অনুবন্ধ, সংবাদ প্রভৃতির সর্ব্ববিধ ভাষা, রুচি ও ভাব সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ পূর্ব্ব প্রকাশিত সংবাদপত্র অপেক্ষা উন্নততর।

একবিংশ অধ্যায়

মহাভারতানুবাদ, সীতার বনবাস, অমায়িকতা, যৌবনের বিক্রম, গুরুভক্তি, রাজা ৺ঈশ্বরচন্দ্র, মধুরে কঠোরে, বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও আর্ত্ত-ত্রাণ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদিত মহাভারতের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৯১৬ সংবতে (১২৬৭ সালে) ১লা মাঘে বা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন অন্যান্য মত এ পুস্তক তত লাভজনক হয় নাই ; কিন্তু রচনাটী উত্তম।

মহাভারতের অনুবাদাংশ লাভজনক না হইলেও, বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৯১৮ সংবতে (১২৬৯ সালে) ১লা বৈশাখে বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিলে "সীতার বনবাস" প্রকাশ করেন। "সীতার বনবাসে"র প্রতিপত্তি এবং পরিচয় দিতে হইবে না। ভবভূতি-প্রণীত "উত্তর চরিত" অবলম্বনে "সীতার বনবাস" লিখিত। ইহা স্বীকার্য্য, "উত্তর চরিতের সর্ব্বাংশে" "সীতার বনবাসে"র সামঞ্জস্য নাই। বিয়োগান্ত নাটক সংস্কৃত অলঙ্কার বিরুদ্ধ বলিয়া ভবভূতিকে উত্তরচরিতের উপসংহারে "রাম-সীতার" সম্মিলন সাধন করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিয়োগান্তে" সীতার বনবাসের উপসংহার করিয়াছেন। ভবভূতি-লিখিত ছায়া সীতার অপূর্ব্ব কল্পনা বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসে অনুসৃত হয় নাই! ছায়া সীতার দৃশ্যে রামসীতার অমানুষিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এতৎপ্রতিপাদন বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেত ছিল না। ভাষা-শিক্ষাকল্পে সীতার বনবাস বাঙ্গালী সাহিত্যের উপাদেয় গদ্য গ্রন্থ।

* অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি এম্. এ. এস্. বি. কর্তৃক লিখিত "জন্মভূমি", "সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা" ও "অনুসন্ধান" পত্রে লিখিত বঙ্গীয় সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তও দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চারি দিনে "সীতার বনবাস" লিখিয়া সমাপ্ত করেন। দিবাভাগে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, তিনি লিখিবার অবসর পাইতেন না। রাত্রি আড়াইটার সময় হইতে পর দিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত লিখিতেন। একবার লিখিয়া পুনরালোচনা করিবার তাঁহার সময় ছিল না।

এস্থলে তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা ও সদাশয়তার একটী দৃষ্টান্ত দিব। চাকুরীর অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অবসর পাইলেই বীরসিংহ গ্রামে যাইতেন। স্বাধীন অবস্থায় তাঁহার স্বগ্রামে যাইবার সময় ও সুবিধা অনেকটা হইয়াছিল। তিনি কলিকাতায় থাকিলেও জন্মভূমি বীরসিংহ তাঁহার মনোমধ্যে জাগরুক থাকিত। বীরসিংহ গ্রামে যাইলে পূর্ব্ববৎ তিনি স্বগ্রামস্থ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থাহীন ও অবস্থাপন্ন সকল অধিবাসীর তত্ত্ব লইতেন। আবশ্যক অবস্থাভেদে আকাঙ্খিমাত্রকে প্রকাশ্যে বা অন্য প্রকারে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন. আগন্তুক অভ্যাগত জনের তিনি সাদর-সম্ভাষণে আদর অভ্যর্থনা করিতেন। যিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন, তিনি তাঁহাকে তাহাতে সন্তুষ্ট রাখিতেন। একবার তিনি বাড়ী যাইলে, তাঁহার মাতার মাতুলালয় পাতুলগ্রামনিবাসী রাঘব রায় নামক একজন বাগ্দী আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং প্রণামান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিল, "কি হে আমাকে চিনিতে পার? তোমায় আমায় এক পাঠশালায় লিখিতাম। গুরু মহাশয়ের হাত থেকে তোমায় কতবার বাঁচিয়েচি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় পুরাতন সহপাঠী রাঘবকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমি তো রাঘব?" রাঘব একটু বিমর্ষ হইয়া কর্ণে হস্ত প্রদান করিল। তখন এক জন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কানে কানে বলিয়া দিল—"উহাকে কৃষ্ণ রায় বলুন। রাঘব আপনাকে "বগড়ির কৃষ্ণ রায়" দেবতা বলিয়া মনে করে। উহার উন্মাদের অনেক িট আছে। ও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের চালে চলিয়া থাকে। ও বাগ্দীর অন্ন খায় না। এমন কি, ক্ষুধায় মরিয়া যাইলেও বৈষ্ণব-জাতীয় পৈতাধারীদিগেরও অন্ন গ্রহণ করে না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল ব্যাপার বুঝিলেন। তিনি সহাস্য বদনে রাঘবকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া আনন্দ-গদগদ-স্বরে বলিলেন—"তুমি কৃষ্ণ রায়?" রাঘবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যত দিন বাড়ীতে ছিলেন, তত দিন রাঘবকে আপনার সম্মুখে সর্ব্বক্ষণ বসাইয়া রাখিতেন এবং তাহার সহিত তুষ্টিজনক কথাবার্ত্তা কহিতেন।

এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে আপন ঘরের "দাওয়ায়" বসিয়াছিলেন, এমন সময় মটুক ঘোষ নামক এক সদ্গোপ তাঁহার সহিত দেখা

করিতে আসে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার সাদর-সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে উপরে উঠিয়া বসিতে বলিলেন। সে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাহাকে সেই দাওয়ার উপর হইতে দুই হাত দিয়া বলপূর্ব্বক তুলিয়া উপরে লইয়া বসাইলেন।

এখানে সদাশয়তার দৃষ্টান্ত-উপলক্ষে যৌবনের বল-বিক্রমের কথা কিছু বলিয়া লইব। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যাবস্থার ন্যায় যৌবনেও ভীমপরাক্রম ছিলেন। তিনি বাল্যকালে কপাটী খেলিতে খেলিতে বলবান যুবককেও ধরিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিতেন।

একটী গল্প শুনা গিয়াছে। গদাধর পাল নামক এক অতি অমানুষ-বল-বিক্রমশালী যুবক বীরসিংহ গ্রামে বাস করিত। এক বার এই গদাধর গঙ্গাপার হইতে হইতে নৌকা-মজ্জনে জলমগ্ন হয়। গদাধর তখন দুই জন অপর লোককে বগলে পুরিয়া সাঁতার দিতে দিতে নিকটবর্ত্তী একখানি ষ্টিমারের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। ষ্টিমারের লোকেরা দড়ি ফেলিয়া অপর দুই জন লোককে একবারে তুলিয়া লয়; কিন্তু গদাধরকে তুলিতে দারুণ কষ্ট হইয়াছিল; এমন কি, প্রথম বার ষ্টীমারের লোকেরা তাহাকে একবার খানিকটা তুলিয়াই ফেলিয়া দিয়াছিল। এই বীর গদাধর কপাটী খেলিতে খেলিতে বিদ্যাসাগরের নিকট জব্দ হইত। সেই বিদ্যাসাগর যৌবনে পুষ্টদেহে মটুক ঘোষকে শূন্যে তুলিয়া "দাওয়ায়" বসাইয়া দিলেন। বাল্যের সহৃদয়তা ও বলবত্তা বিদ্যাসাগরের যৌবনেও পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বাল্য-যৌবনে দেহ-মনের একধারে এমন শক্তিসম্পন্নতার পূর্ণ বিকাশ বিরল নহে কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখন বাড়ী যাইতেন, তখন প্রায় তাঁহার সঙ্গে পাঁচশত কি ছয় শত টাকা থাকিত। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রায় চারি-পাঁচ শত টাকার বস্ত্র লইতেন। টাকা ও কাপড় দীনদুঃখীকে বিতরিত হইত। তাঁহার কলিকাতার বাটীতেও বিবিধ প্রকারের অনেক টাকার কাপড় মজুত থাকিত। তিনি যথাপাত্রে যথাযোগ্য বস্ত্র বিতরণ করিতেন।

১২৬৯ সালে (বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) তিনি একবার বীরসিংহ গিয়াছিলেন। এক দিন মধ্যাহ্ন ভোজন কালে তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটী বর্ষীয়সী রমণী ও একটী যুবতী দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছেন। বর্ষীয়সী তাঁহার গুরু-মহাশয়ের স্ত্রী এবং যুবতীটী কন্যা। গুরুমহাশয়ের বহু বিবাহ। তিনি এই স্ত্রী এবং তদীয় কন্যার ভরণপোষণের ভার বহন করিতেন না। তাঁহাদের দুই বেলার অন্ন জুটিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই গুরু-মহাশয়কে ডাকাইয়া স্ত্রী ও কন্যার

ভার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। গুরুমহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় সম্মত হয়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্ব্বে গুরুমহাশয়কে বীরসিংহ গ্রামের স্কুলের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার জন্য তাঁহাকে মাসে মাসে চারি টাকা দিতে স্বীকার করেন। কেবল স্বীকার নহে, তখনই তিনি তিন মাসের অগ্রিম টাকা দিলেন। তিনি তিন মাসের করিয়া অগ্রিম দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন। তাঁহাদের বস্ত্র সরবরাহের ভারও বিদ্যাসাগর মহাশয় লইয়াছিলেন; কিন্তু কিছু দিন পরে গুরুমহাশয় স্ত্রী ও কন্যাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে কথা শুনিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। তিনি গুরুমহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন. এই জন্য তাঁহাকে কিছু বলিতে পারেন নাই।

১২৬৭ সালের ২২শে মাঘ বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতার পাইকপাড়াস্থ রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ গুণগ্রাহী এবং কর্ম্মানুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যেই রাজা বাহাদুরের সবিশেষ সহানুভূতি ছিল। রাজা বাহাদুরের বিয়োগে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরের মৃত্যু-সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। পাইকপাড়া-রাজবংশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নানা কারণে কৃতজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন দীন-বৎসল, তেমনই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গেরও সহায় ও সুহৃদ্ ছিলেন। কাহারও নিকটে তিনি একটী পয়সারও প্রত্যাশা করিতেন না; কিন্তু সকলেরই উপকারার্থ তিনি দেহ-প্রাণ উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন কি. অনেক সময়ে বিপন্ন ধনকুবেরকুলেরও বিপদুদ্ধারার্থ তিনি অকাতরে নিজের অর্থব্যয় করিতেন। তিনি অবিশ্রান্ত স্বেদভারে কখন মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর হইতেন না। আবার কাহারও কোনরূপ কর্ত্তব্যক্রটি দেখিলে, অথবা কাহারও দ্বারা কোনরূপে আত্মসম্ভ্রমের অমর্য্যাদা দেখিলে, তিনি তদ্দণ্ডেই বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়ে কুবেরসম কোটিপতি সুহৃদেরও সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ্য-স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। ঘৃণায় আর তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়াও চাহিয়া দেখিতেন না। তখন রাজকুলেরও সেই সৌধ হর্ম্ম্যাবলী তাঁহার চক্ষে ভীষণ নরকরূপে প্রতীয়মান হইত। যেমন বাহিরে, তেমনই ঘরে। স্বভাব-স্নেহে আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদ-সন্তানের প্রতি যেমন ক্ষীরধারার অনন্ত স্রোত ছুটিত, আবার কাহারও কাহারও কর্ত্তব্যক্রটি দেখিলে, তেমনই দারুণ মনঃক্ষোভে

তাঁহার সহস্র সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ জ্বালাময় তীব্র তাপ ফুটিয়া উঠিত। প্রকৃতই বিদ্যাসাগরের হৃদয় "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুসুমাদপি"।

১২৬৯ সালে বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৺রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল রমাপ্রসাদ রায়ের দেহান্তর হয়। রমাপ্রসাদবাবু হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইবার আজ্ঞাপত্র পাইয়াছিলেন ; তাঁহাকে হাইকোর্টের সেই পবিত্র আসনোপবেশন-সুখ সম্ভোগ করিতে হয় নাই। রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় সখ্য ছিল ; কিন্তু বিধবা-বিবাহের আন্দোলন-কালে একটা মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। শুনিতে পাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে প্রথমত বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের নিকট হইতে সবিশেষ সহানুভূতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যকালে সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে দুই একটী মর্ম্মান্তিক কথা শুনিতে হইয়াছিল।* বিদ্যাসাগর মহাশয় রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন ; কিন্তু ইহার পর গতিবিধি একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যুসংবাদে কিন্তু বিদ্যাসাগর অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। শক্তিসম্পন্ন পুরুষ শক্তিপূজকের চিরকাল পূজনীয়। বিদ্যাসাগর প্রকৃত শক্তিসেবী। রমাপ্রসাদ রায়ও প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তজ্জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় রমাপ্রসাদবাবুর বিয়োগ জন্য দুঃখিত হয়েন।

এই খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে একটী বিধবা-বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন

* এই কথা সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। 'সঞ্জীবনী'তে' প্রকাশিত হইয়াছিল—"শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্ব্ব প্রথম বিধবা-বিবাহ হয়। তখন কলিকাতার অনেক বড় লোক এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয় এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এ বিবাহের পূর্ব্বে তিনি স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন, 'আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব। বিবাহস্থলে নাই গেলাম?' এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।' এরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি মহাশয় 'প্রকৃতি' নামক সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আমার পিতৃদেব গোপীনাথ রায় চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন,—তিনি (রমাপ্রসাদ) বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কহিয়াছিলেন, "আমার পিতা সমাজ সংস্কারের কসুর করেন নাই। তাতে তো কোনও ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বৃথা।" এই বলিয়া বিধবা-বিবাহের সভায় যাইতে তিনি অস্বীকৃত হন। বিদ্যাসাগর ও রামপ্রসাদবাবুর কথোপকথন সময়ে বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অন্যান্য অনেক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকটেই এই কথা শুনিতেছিলাম।"

হয়। বর-কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ। ইহার পর অন্যান্য স্থানে আরও কতগুলি বিধবা-বিবাহ হইয়াছিল।

পুস্তক-বিক্রয়ে ও ছাপাখানার কাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আয় অনেকটা বাড়িয়াছিল বটে; কিন্তু বিধবা-বিবাহের ব্যয়ে ও অন্যান্য বহুবিধ দান-ব্যাপারে তাঁহার ঋণও বিলক্ষণ হইয়াছিল। কখনও কেহ তাঁহার নিকটে হাত পাতিয়া বিমুখ হইত না। বিপন্ন ও শরণাগত জন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে বিদ্যাসাগর স্থির থাকিতে পারিতেন না। হস্তে এক কপর্দ্দক নাই; কিন্তু দশ হাজার টাকা দিয়া এক জন বিপন্নকে রক্ষা করিতে হইবে। অর্থ নাই; কিন্তু বিপন্নের জন্য প্রাণ ব্যাকুল। এ ব্যাকুলতা হৃদয়হীন আমরা কি বুঝিব বল? সে ব্যাকুলতার বেগরোধ করা বিদ্যাসাগরের অসাধ্য হইত। কাজেই ঋণ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ঋণ করিয়া দুঃখীর দুঃখমোচন করা বিদ্যাসাগর বাল্যাবস্থা হইতে অভ্যস্ত। যখন তিনি কলেজে পড়িতেন, তখন কাহারও বস্ত্রাভাব বা অন্নাভাবের কথা শুনিলে, তিনি দ্বারবানের নিকটে চারি পয়সা সুদ দিয়া টাকা ধার লইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "দ্বারবানেরা জানিত, আমি নিঃসম্বল। তবু যে, তারা আমাকে কেন ধার দিত, বলতে পারি না।" বিদ্যাসাগরের জীবনে প্রায় অর্দ্ধ-লক্ষাধিক টাকার ঋণ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে এক কপর্দ্দকও ঋণ রাখিয়া যান নাই। দশ হউক আর দশ হাজারই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। মাইকেল মধুসূদনকে তিনি দশ সহস্র টাকা তাঁহাকে ঋণ করিতে হইয়াছিল। এই টাকা তিনি প্রথমতঃ হাইকোর্টের মৃত জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে ঋণ করিয়াছিলেন। পরে পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা লইয়া তিনি অনুকূলচন্দ্রবাবুর টাকা পরিশোধ করেন। এই শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের মতে প্রথম বিধবা-বিবাহকারী। এই দেনা শোধের নিমিত্ত তাঁহাকে ছাপাখানার অংশ বিক্রয় করিয়া এই টাকা দিতে হয়। সে বৃত্তান্ত পরে যথাস্থানে প্রকটিত হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন

১২৬৯ সালে (১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'বারিষ্টার-এট্-ল' হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ উকীলের মোক্তার তাঁহার জমী জমার পত্তনি লইয়াছিলেন। কোন কায়স্থ বর্ণের রাজা

বাহাদুর সেই পত্তনিদারের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া মাইকেলকে বিলাতে পাঠাইবার ভার-গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেল বারকতক তাঁহার নিকট হইতে টাকা পাইয়াছিলেন! তার পর বার বার পত্র লিখিয়াও টাকা পওয়া দূরে থাক, পত্রের উত্তর পর্য্যন্তও তিনি পান নাই। অর্থাভাবে তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না; এমন কি, তাঁহার কারাবাসের উপক্রম হইয়াছিল। তিনি নিরুপায় হইয়া সকরুণ বাক্যবিন্যাসে পত্র লিখিয়া বিদ্যাসাগরের নিকটে অর্থ-সাহায্যের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, সত্য সত্য মাইকেলের সেই পত্র পাঠ করিতে করিতে, রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না। কিন্তু ছয় সহস্র টাকা ঋণ করিয়া তিনি তদ্দণ্ডেই মাইকেলকে পাঠাইয়া দেন। টাকার প্রয়োজন হইলে, তিনি প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে কোম্পানীর কাগজ লইয়া বন্ধক দিতেন। পরে তিনি সময় মত টাকা সংগ্রহ করিয়া, সুদে আসলে সব পরিশোধ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি তাঁহাকে অর্থসাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে, মাইকেলকে নিশ্চিতই অনাহারে সেই বিদেশেই মৃত্যুমুখে পড়িতে হইত।

মৃতকল্প মাইকেল আদৌ মনে করেন নাই যে, তিনি একেবারে এত অর্থানুকূল্য পাইবেন। বলাই বাহুল্য, সেই সাহায্যে তাঁহার মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি তখনই জীবনদাতা বিদ্যাসাগরকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আনন্দ-বিগলিত-চিত্তে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ কেবল পত্রেই শেষ হয় নাই, কবির অমর "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"তে জ্বলন্ত দিব্যাক্ষরে এখনও তাহা জাজ্বল্যমান। বিদ্যাসাগরের দাতৃত্ব কবির মর্ম্মে মর্ম্মে উচ্ছ্বসিত। সে মর্ম্মোচ্ছ্বাস চৌদ্দছত্রের অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত। বিদ্যাসাগরের সহস্র সহস্র গুণ ছিল সত্য; কিন্তু মাইকেল দাতৃত্বের পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছিলেন, প্রথমেই বিদেশে (বিলাতভূমিতে) অতি বড় সঙ্কটে। তাই কৃতজ্ঞ কবি সেই "দাতৃত্বের" যেন একটা বিরাট সজীব মূর্ত্তি সম্মুখে গড়িয়া, তাহাতে তন্ময় হইয়া, কাতর কণ্ঠে সপ্ত স্বর চড়াইয়া মুক্তপ্রাণে মুক্তোচ্ছ্বাসে গাহিয়াছিলেন,—

* মাইকেল ফরাস রাজ্য হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে, সেই সকল পত্রে প্রায়ই টাকার প্রার্থনা ও প্রাপ্তি স্বীকার। সে সব পত্র প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন; সে সব লিখিয়া মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দ্রবীভূত করিয়াছিলেন। তাহারও অধিকাংশ, মাইকেলের জীবন-বৃত্তান্তে প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তাহারও প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে! পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ শিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি;
পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ ভরে'
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।"
—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, ৮৬ পৃষ্ঠা।

১২৭৩ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) মাইকেল বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তখনও তিনি নিঃস্ব। তাঁহাকে এক রকম নিরন্ন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মাইকেল বিলাত হইতে আসিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগরকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জন্য একটা ত্রিতল বাড়ী সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন। মাইকেল আসিয়া কিন্তু একটা হোটেলে থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সেই হোটেল হইতে তুলিয়া লইয়া আসেন। "ব্যারিষ্টারি" কার্য্যে প্রবেশ করিবার পক্ষে মাইকেলের একটা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে সেই অন্তরায় দূরীকৃত হইতে পারে, মাইকেলের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমানে ছিলেন। মাইকেল বর্দ্ধমানে গিয়া কাতর-কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করেন! বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কথায় কলিকাতায় আসিয়া, নানা যোগাড় যন্ত্র করিয়া মাইকেলকে "বারিষ্টারি" কার্য্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পিতার মত ভক্তি করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। বারিষ্টার হইলেও, পরিবার-পালনোপযোগী উপার্জ্জনে মাইকেল অক্ষম হইয়াছিলেন।

স্বপ্রকাশিত পুস্তকের কতকটা আয় থাকিলেও, তিনি পানদোষে অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে সাহায্য লইতে হইত। হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না। মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, থাকে-থাকে টাকা সাজান রহিয়াছে, দু-দশটা থাক লইবার জন্য তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন। "নিস্‌নে, নিস্‌নে" করিতে করিতে, মুঠো ভরিয়া মাইকেল টাকা তুলিয়া লইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার এরূপ কার্য্যের বিরক্ত হইতেন না।

সহস্র সহস্র স্বভাবদোষ সত্ত্বেও মাইকেল বুদ্ধি-প্রতিভাবলে বিদ্যাসাগরের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মাইকেল "প্রতিভা" জগতের পূজনীয়। সেই প্রতিভা-প্রতিভার পূর্ণাকর বিদ্যাসাগরের যে প্রেমপ্রীতি আকর্ষণ করিবে, তাহার বিচিত্রতা কি? প্রতিভার পূজা প্রতিভার কাছেই হয়। প্রতিভার রাজ্যে প্রেমের প্রস্রবণ ছুটে। প্রতিভা মানুষের দোষ ঢাকিয়া দেয়। প্রতিভা মানুষকে অন্ধ করে। জগতের ইতিহাসে—প্রেমের সংসারে এমন সহস্র দৃষ্টান্ত পাইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মাইকেলের প্রতিভায় এতাদৃশ বিমোহিত ছিলেন যে, অনেক সময়ে মাইকেল কথার অবাধ্য হইলেও তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না। জামাতাপুত্রেরও অশিষ্টতা, অবাধ্যতা, কর্ত্তব্যবিমুখতা এবং দুষ্কৃতিপোষকতা বিদ্যাসাগরের অসহ্য হইত, এমন কি তাঁহাদের মুখাবলোকনেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। সেই বিদ্যাসাগর মাইকেলের শত অপরাধ বুক পাতিয়া লইতেন। প্রতিভাপূজার প্রকৃত পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? মাইকেলের সাহায্যার্থ বিদ্যাসাগরকে আরও চারি সহস্র টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। মাইকেল এক কপর্দ্দকও ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই।

এতদ্ব্যতীত মাইকেলের আরও অনেক টাকার ঋণ ছিল। নিম্নলিখিত পত্রে ও তালিকায় তাহার প্রমাণ,—

ঈশ্বরঃ

শরণম্।

পিতঃ!

পঞ্চকোটের মহারাজার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া অদ্য রাত্রিতেই আমাকে পুরুলিয়ায় যাত্রা করিতে হইল। সুতরাং মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

অক্ষম হইলাম। ভরসা করি, আগামী সোমবার তারিখে পুনরায় শ্রীচরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারিব।

দত্তজ মহাশয়ের ঋণদাতৃগণের 'তালিকা' এই সঙ্গে পাঠাইলাম। মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে বিনীতভাবে আমি এই প্রার্থনা করি যে, যেরূপে পারেন, বিপন্ন দত্তজাকে এবারে রক্ষা করিয়া স্বীয় অপার করুণার আরও সুপরিচয় প্রদান করিবেন। ফলতঃ মহাশয়ের অনুগ্রহ ভিন্ন বর্দ্ধমানে দত্তজার আর উপায়ান্তর নাই। নিবেদন ইতি।

১০ই আশ্বিন,
রাত্রি।

পদানত দাস
শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেনার হিসাব

ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েসান ৫০০ টাকা, বাবু কালিচরণ ঘোষ ৫০০০ টাকা, টালিগঞ্জের মথুর কুণ্ড ৪০০০ টাকা, গোবিন্দচন্দ্র দে, বহুবাজার ৩০০০ টাকা, দ্বারকানাথ মিত্র ২৫০০ টাকা, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, শ্যামবাজার ১১০০ টাকা, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর ১৬০০ টাকা, রাজেন্দ্র দত্ত—ডাক্তার চন্দননগর, ২০০ টাকা, কেদার ডাক্তার ২০০ টাকা, গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী ১০০০ টাকা, লালা, বড়বাজার ৮৫০০ টাকা, গমেজ সাহেব ৫০০ টাকা, বিশ্বনাথ লাহা .০০ টাকা, দে কোং ১০০ টাকা, মানভূম ৫০০ টাকা, মনিরুদ্দিন ৪০০ টাকা, আমিরন আয়া ২০০ টাকা, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ৩৬০০ টাকা, বেনারসের রাজা ১৫০০ টাকা, মতিচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০টাকা, উমেশচন্দ্র বসু ও মুনসীর মিহি আনা ৫০০০ টাকা, বাটী ভাড়া ৩৯০ টাকা, চাকরের মাহিনা ৭০০ টাকা।

ঋণ-সমুদ্র হইতে মাইকেলকে উদ্ধার করা বিদ্যাসাগর মহাশয় দুঃসাধ্য ভাবিয়াছিলেন। ১২৭৯ সালের ১৫ই আশ্বিনে বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মাইকেলকে ইংরেজিতে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, —"তোমার আর আশা ভরসা নাই। আর কেহই অথবা আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। তালি দিয়া আর চলিবে না।"

কোনরূপ দুরভিসন্ধিবশে মাইকেল যে বিদ্যাসাগর মহশেয়ের ঋণপরিশোধ করেন নাই, তাহা নহে; প্রকৃতপক্ষে তিনি ঋণ পরিশোধে অপারগ ছিলেন। এই অপারগতার মূল কারণ অতীব অমিতব্যয়িতা। একে অমিতব্যয়ী, তাহার উপর উপার্জ্জনের তিনি সম্পূর্ণ অমনোযোগী ছিলেন, শুনিয়াছি অনেক সময়

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে জোরজবরদস্তী করিয়া আদালতে পাঠাইয়া দিতেন। এরূপ না হইলে তাঁহাকে অকালে আলিপুরের দাতব্য হাঁসপাতালে দীন-হীন কাঙ্গালের মত দারুণ মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে কেন* ? মাইকেল ঋণ পরিশোধে অপারগ বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তজ্জন্য আদৌ চিন্তা করিতেন না। যাঁহার জন্য মলিন মাতৃভাষার এতাদৃশ মুখ উজ্জ্বল, তাঁহার সাহায্যার্থ অর্থব্যয় করিয়া সে অর্থের পরিশোধ প্রত্যাশা না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মভূমির কৃতজ্ঞ পুত্রের কার্য্য করিয়াছিলেন। ঋণ পরিশোধ না হউক, কাব্যে সাহিত্য-সংসারে মাইকেল জন্মভূমির বহুঋণ পরিশোধ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অধমর্ণের ব্যবহার ও অযাচিত দান

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণ করিয়া যে সব ঋণগ্রস্ত অধমর্ণকে উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও একটী দিনের জন্য তিনি টাকার তাগাদায় বিরক্ত করিতেন না। অনেক ঋণগ্রস্ত অধমর্ণ তাঁহার কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াও ঋণ পরিশোধ করে নাই। কেহ কেহ ক্ষমতা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করেন নাই; কেহ কেহ বা সত্য সত্যই ঋণ পরিশোধে অক্ষম ছিলেন। এমন কত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার নিরূপণ হয় না। তদীয় ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয় যে কয়টী উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গের পরিতৃপ্ত্যর্থ এইখানে তাহায় পুনরুল্লেখ করিলাম,—

১. ক্ষীরপাই রাধানগর নিবাসী রামকমল মিশ্র এবং গঙ্গাদাসপুর-নিবাসী গোরাচাঁদ দত্ত, গঙ্গাপুর-নিবাসী তারাচাঁদ সরকারের ৫০০ টাকা ধারিতেন।

* ১২৮০ সালের ১৬ই আষাঢ় বা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন রবিবার বেলা দুটার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বক্ষঃস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নিজের স্বভাবের দোষাতিরেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিষ্ণুতার সীমা মধ্যে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মাইকেল শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আদৌ সদ্ব্যবহার করেন নাই। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় মাইকেলকে "বাবু" সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। মাইকেল সে পত্র প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাত-ফেরত বাঙ্গালীদিগকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন না।

তারাচাঁদ উভয়ের নামে নালিস করিয়া "ডিক্রী" পান। পরে ঐ দুই জন দেনাদার ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ইঁহারা কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহার নিকট তখন টাকা ছিল না। তিনি তথায় রাখাল মিত্র নামক এক ব্যক্তির নিকট খৎ লেখাইয়া এবং স্বয়ং সাক্ষী হইয়া ৫০০ টাকা তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু ইহার পর আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। রাখালবাবুর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্ত্রীকে সুদসহ টাকা দিয়া খৎ খালাস করেন।

২. এক বার পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ৫০০ টাকার জন্য বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া পড়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ৫০০ টাকা ধার করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ইহার পরে তর্কলঙ্কারের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

৩. এক সময় জাহানাবাদের নিকট কোন গ্রামনিবাসী ভট্টাচার্য্য দুই শত টাকা ঋণ করিয়া পুত্র-পরিজন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। পাওনাদার মহাজন তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিয়া গলদশ্রুলোচনে কাতর-কণ্ঠে আপনার দুঃখের কথা জানাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে দুই শত টাকা দান করিয়াছিলেন।

পাঠক! ভাবুন—গৃহস্থ বিদ্যাসাগরের এ কি অপার করুণা এবং অশ্রুতপূর্ব্ব অসমসাহস! বিদ্যাসাগরের এ বিপন্নোদ্ধারে কোটিপতি ধনকুবেরকে সবিস্ময়ে সহস্র বার মস্তক অবনত করিতে হয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পারসীক,—যে কেহ হউন না, বিদ্যাসাগরের নিকট হাত পাতিয়া কখন কেহ বঞ্চিত হন নাই।

ভাটপাড়ানিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট চতুষ্পাঠীর সাহায্যার্থ প্রার্থনা করিয়া মাসিক ১০ টাকার বৃত্তি চারি বৎসর কাল পাইয়াছিলেন। পরে তিনি উপায়ক্ষম হইয়া বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। মাসিক বৃত্তি ব্যতীত ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও নানারকম সাহায্য পাইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল সাহায্য প্রার্থিমাত্রেরই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। কোথায় কোথায় কিরূপ কষ্ট, কে কোথায় অর্থাভাবে দারুণ দারিদ্র্য-নিষ্পেষণে বিপদাপন্ন অথবা অন্নাভাবে ভীষণ জঠরানলে অবসন্ন, তাহার

সন্ধান লইয়া, তিনি স্বকীয় সাধ্যমত আর্ত্তত্রাণোপযোগী সাহায্য করিতেন। যখনই তিনি বাহির হইতেন তখনই টাকা, আধুলী, দুয়ানী পয়সা সঙ্গে লইতেন। সেগুলি প্রায়ই ফিরিয়া আসিত না। শুনিয়াছি সময়ে সময়ে রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিবার সময় কোন অভাগিনী বেশ্যাকে উপার্জ্জন আশায় কষ্টভোগ করিতে দেখিলে, তিনি তাহাকে টাকা পয়সা দিয়া, সে রাত্রির জন্য তাহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিতেন। এক সময়ে কলিকাতা সহরে এক অতি দরিদ্র দুঃখী মান্দ্রাজী, স্ত্রী ও বহু সন্তান-সন্ততি লইয়া, অতি নীচ জঘন্য মালিন্যপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের দুঃখের পার ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া স্বয়ং তাঁহাদের আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী বন্ধুর সহিত কলিকাতার সিমলা-হেদুয়ার নিকট পাদচারণা করিতেছিলেন। সেই সময় একটী ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া অতি বিষণ্ণ ভাবে তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের চক্ষে জল পড়িতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনি কাঁদিতেছেন কেন?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটি জুতা ও মোটা চাদর দেখিয়া, সামান্য লোক বোধে ব্রাহ্মণের কোন কথাই বলিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে তিনি বলেন,—"আমি এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি; কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম। ঋণদাতা আদালতে আমার নামে নালিস করিয়াছে।" ব্রাহ্মণকে বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন,—"মোকদ্দমা কবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"পরশ্ব।" ক্রমে ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় মোকদ্দমার নম্বর, ব্রাহ্মণের নাম, ধাম প্রভৃতি একে একে সব জানিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে পর তিনি সঙ্গী বন্ধুটীকে মোকদ্দমার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে বলেন। তথ্যানুসন্ধানে ঠিক হয়, ব্রাহ্মণের কথা সত্য বটে; দেনা তাঁর সুদে আসলে ২৪০০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ২৪০০৲ টাকাই আদালতে জমা দেন*। তিনি আদালতের উকিল-আমলাকে বলিয়া রাখেন,—"আমার নাম যেন প্রকাশ না পায়; নাম প্রকাশের জন্য ব্রাহ্মণ যে পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হইবে আমি তাহা দিব।" ব্রাহ্মণ মোকদ্দমার দিন আদালতে উপস্থিত হইয়া বুঝিলেন, কোন

* এ দান-বিবরণটী আমরা ভট্টপল্লীর খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

মহোদয় তাঁহার দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। তিনি বহু চেষ্টায় ঐ উদ্ধার-কর্ত্তার নাম জানিতে না পারিয়া বিষাদ-পুলকে বাড়ী ফিরিয়া যান। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুটীর সহিত ব্রাহ্মণের একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ হইয়াছে, সেই বন্ধু ব্রাহ্মণের মুখে তা শুনিয়াছিলেন. কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তাঁহার উদ্ধার-কর্ত্তা, তিনি তাহা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই। ব্রাহ্মণ সহরের অনেক ধনীর নিকট দুঃখের কথা জানাইয়াও যে এক কপর্দ্দক কাহারও নিকট পান নাই, বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণের মুখে তাহা পূর্ব্ব-সাক্ষাতে শুনিয়াছিলেন।''

কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। একটী মিথ্যা কহিয়া ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের যে অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অসীম দাতৃত্বগুণে সে কর্ম্মফল নিশ্চিতই খণ্ডিত হইবে না। তবে তিনি দাতৃত্ব-কার্য্যের অনুরূপে ও অনুপাতে পরকালে পরম সুখফলভোগী হইয়াছেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পুনরায় কার্য্য-প্রার্থনা, ওয়াড্‌স্ ইনষ্টিটিউশন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা

১২৬৯ সালে বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ব্যাকরণ-কৌমুদীর চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু রাজ-পুরুষগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। সরকারী বৈতনিক কার্য্যে তিনি তৎপরে আর আত্মনিয়োগ করেন নাই। তবে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে গিয়া নানা প্রকারে ঋণ-জালে জড়িত হইয়া তিনি আর একবার সরকারী কর্ম্মের প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহার এ কার্য্য-প্রার্থনা ইহ-সংসারে একান্ত বিস্ময়াবহ ব্যাপারে নহে। অবস্থার আবর্ত্তনে-বিবর্ত্তনে ইহা অসম্ভবপরও নহে। রাজপুতনার বীর প্রতাপ সিংহ পরিবার সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তবুও মুসলমান সম্রাটের হস্তে তিনি আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই; কিন্তু যে তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রাণ-প্রিয়তম শিশুগণ ঘাসের রুটি খাইতেছে, সে রুটিতে সকলের সঙ্কুলান হইতেছে না, সেই দিন সেই দৃশ্য তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল। আর সহিতে না পারিয়া তিনি সম্রাট্ আকবরকে

আত্মবিসর্জ্জন-কল্পে পত্র লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই। প্রতাপ সিংহের ন্যায় তেজস্বী স্বদেশভক্ত আর কে আছে ? যখন অবস্থাভেদে তাঁহারও আত্মত্রুটি হইয়াছিল, তখন "অন্যে পরে কা কথা ?"

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণ-নিপীড়নে পুনরায় সরকারী কর্ম্মের প্রার্থী হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ইহ-জগতের অধিকতর মঙ্গলজনক কার্য্য-সাধন জন্য তাঁহাকে পুনবায় সরকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। সরকারের অনুরোধে সাধারণের হিতার্থ তাঁহাকে অনেক অবৈতনিক সরকারী কার্য্যেই কেবল ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের পবিদর্শনের কার্য্য তাহার অন্যতম।

১২৬৯ সালের ৭ই ফাল্গুন (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি), সরকার বাহাদুর, তাঁহাকে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শনকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখেন,—

"গবর্ণমেণ্ট, ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের জন্য চারি জন কি পাচ জন এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোককে পরিদর্শন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। বৎসরের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্ধারিত মাসে এই পরিদর্শকগণকে ইনষ্টিটিউশন পরিদর্শন করিতে হইবে। ইহার উন্নতিকল্পে যে পরিবর্ত্তন ও সংযোজন তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত মনে করিবেন, তাহা গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট জানেন, বিদ্যাসাগর স্বদেশবাসীর সকল উন্নতিকর কার্য্যে মনোযোগী হয়েন। সেইজন্য ছোটলাট বাহাদুরের একান্ত ইচ্ছা—বিদ্যাসাগর মহাশয় ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শন-কার্য্যভার গ্রহণ করেন।"

অভিভাবক-হীন নাবালক জমিদার-পুত্রগণকে সরকার বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াই এই ইনষ্টিটিউশনের কার্য্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া এবং স্বদেশবাসী জমিদার সন্তানবর্গের উপকার হইবে ভাবিয়া, ১২৭০ সালের অগ্রহায়ণ বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েন। ইনষ্টিটিউশনের উন্নতি-কামনায় তিনি নানা পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজিতে যে সকল স্মারক-লিপি ও রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্য যইতে নিম্নলিখিত স্মারক-লিপি ও রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ প্রয়োজনবোধে প্রকাশ করিলাম,—

স্মারক-লিপি

এক

ইনষ্টিটিউশনের ভিতরকার বন্দোবস্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি ; কিন্তু এক বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করা বড়ই দরকারী। তাহা এই,—বর্ত্তমান বন্দোবস্ত মতে সমস্ত নাবালক, এক ঘরে জড় হইয়া এক টেবিলের চতুর্দ্দিকে পাঠ করিতে বসে। আমি প্রথম দিনই দর্শন করিয়া ইহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক বোধ করি। উত্তরোত্তর দর্শন করিয়া ঐ অসন্তোষই দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। জমিদারপুত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে পড়ে। স্পোলিং বুক হইতে এনট্রান্স কোর্স পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বালকের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এরূপ স্থলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের ছাত্রগণের এক টেবিলের চতুর্দ্দিকে বসিবার দরুণ বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং পরস্পরের বড় ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা মনঃসংযোগী নহে, তাহারা পাঠে একেবারেই অবহেলা করে। প্রাতঃকালে ডাইরেক্টার ঐ স্থলে বসেন এবং বালকগণ স্কুলের জন্য পাঠ তৈয়ারী করিয়াছে কি না, তারা দেখেন ; কিন্তু ঐ সময়ে ঐখানে তাঁহার অধিষ্ঠান, আরও গোল-যোগের কারণ হয়। যেহেতু সে সময়ে তাহার নিকট বাহিরের লোক সর্ব্বদা যাওয়া আসা করে।

একজন শিক্ষকই সমস্ত বালককে সন্ধ্যাকালে পড়াইয়া থাকেন। ইহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ইহা একজনের পক্ষে অসম্ভব। তিনি একজন বালককে ১৫ মিনিটের অধিক কাল দেখিতে পারেন না ; সুতরাং ইহাতে তাহাদিগের উপকার হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহার ফল এই হয় যে, বালকগণ, সন্তোষজনকরূপে লেখা-পড়ায় অগ্রসর হইতে পারে না।

এই সকল দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি,—

প্রথম। প্রত্যেক ক্লাসের একটী করিয়া ভিন্ন টেবিল এবং ভিন্ন স্থান থাকা উচিত।

দ্বিতীয়। প্রত্যেক ক্লাস, এক-এক জন ভিন্ন-ভিন্ন শিক্ষকের অধীন থাকা বিধেয়।

তৃতীয়। নিম্নস্থ শ্রেণীসমূহে শিক্ষকগণের প্রাতে ও বৈকালে হাজির হওয়া আবশ্যক এবং উচ্চ ক্লাসসমূহে তাঁহারা হয় সকালে, নয় বৈকালে হাজির হইবেন।

বালকগণকে ভাল রকম সাহায্য করিবার জন্য আমি এই ভিন্ন-ভিন্ন

শিক্ষকের কথা উত্থাপন করিলাম। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে স্কুলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে ভাল রকম সাহায্য ব্যতীত সাধারণতঃ বালকগণ কিছুই শিখিতে পারে না। এক জন লোক, এক কিংবা দুই ঘণ্টা কাল, এতগুলি লোককে শিক্ষা দিলে, ভাল শিক্ষার আশা করা যাইতে পারে না। নাবালক জমিদার-পুত্রগণ, যাহাতে সম্পূর্ণ মাত্রায় সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

যদি পূর্ব্বোক্ত সংস্কার সকল কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে গোলযোগের সমস্ত কারণই বিদূরিত হইবে। অন্যমনস্ক বালকদিগের পাঠের অবহেলা কমিয়া আসিবে। ভবিষ্যতে আরও সুফল ফলিবার সম্ভাবনা হইবে।

পুনশ্চ।—এই সংস্কৃত বন্দোবস্ত অনুসারে ডাইরেক্টরকে আর প্রত্যহ বালকগণের পাঠ দেখিতে হইবে না। সেই বিরক্তিজনক কার্য্য হইতে তাঁহাকে অবসর দিয়া, আমি তাঁহাকে বালকগণের মানসিক উন্নতিসাধনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ কার্য্য তাঁহার উচ্চ গুণগ্রামের উপযুক্ত হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে যদিও তিনি এই কার্য্য কতকটা করেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে এই বিরক্তিজনক কার্য্য হইতে অবসর দিলে, এই কার্য্য আরও ভালরূপে সুসম্পন্ন হইবে।

না-বালক জমীদারপুত্রগণকে সহরে আনিবার উদ্দেশ্য, তাহাদিগের মনে ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া। কর্ত্তৃপক্ষীয়দের তৎসাধনে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

১২৬৪ খৃষ্টাব্দ ৪ঠা এপ্রেল শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

রিপোর্ট

আর. বি. চাপমান্ স্কোয়ার,
রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরি মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনের গত বৎসরের কার্য্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট দিবার জন্য অনুজ্ঞা করিয়া ১৮ই নবেম্বরে ৪৮৩ নং যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই রিপোর্ট দিবার পূর্ব্বে মহাশয়কে জ্ঞাত করিতে চাই যে, পরিদর্শকবৃন্দের রিপোর্টের সহিত এই রিপোর্টও পাঠান হইবে ইহাই প্রথমে সঙ্কল্প করা হইয়াছিল; কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমার মতদ্বৈধ হওয়ায় আমি স্বতন্ত্র রিপোর্ট পাঠাইতেছি। এই রিপোর্ট পাঠাইতে

উক্ত কারণে যে বিলম্ব হইয়াছে তাহার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ছাত্রসংখ্যা। গত ৩০শে এপ্রেল তারিখে রেজেষ্ট্রীতে ছাত্রসংখ্যা ১২ জন।

শিক্ষোন্নতি। দুই-একটী শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতীত বালকেরা যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহা সন্তোষকর না হওয়ায়, সেইগুলির পুনরালোচনা আবশ্যক। এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

ব্যায়াম-শিক্ষা। ব্যায়াম প্রণালী-শিক্ষা অতি সুন্দর হইয়াছে। স্কুলের বালকবৃন্দ রীতিমত নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে ব্যায়ামশিক্ষা করিয়াছে।

স্বাস্থ্য। সাধারণতঃ বালকবৃন্দের স্বাস্থ্য ভালই ছিল।

খাদ্য। খাদ্য দ্রব্যাদি যত দূর আমি তত্ত্বাবধান করিয়াছি, তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও স্বাস্থ্যকর। তাহাদের নিজের নিজের লোকদ্বারা খাদ্য স্বতন্ত্র রন্ধনাগারে প্রস্তুত হইত।

ব্যয়। বাৎসরিক মোট ব্যয় ৩১,৫২৪৷৴১০ পাই অর্থাৎ গড়-পড়তা প্রতি বালকের প্রতি বাৎসরিক ২,৬২৭৲ টাকা অথবা ২১৯৲ টাকা মাসিক। বালকদিগের যেরূপ অবস্থা অর্থাৎ তাহারা সেরূপ ধনাঢ্য এবং কলিকাতায় থাকা যেরূপ ব্যয়সাধ্য, তাহাতে বাৎসরিক উক্ত ব্যয় আমার বিবেচনায় অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

দর্শকবৃন্দের পরিদর্শন। রেভিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর হইতে গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত ইনষ্টিটিউশনটী পাঁচবার পরিদর্শন করি। প্রথম হইতে আমার ধারণা হয় যে, ওয়ার্ডদিগের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ সুচারু নয়; সুতরাং তাহার সংস্কার হওয়া আবশ্যক। আমি গত ৪ঠা এপ্রেল তারিখে একখানি স্মারকলিপি প্রেরণ করি। তাহাতে উক্ত প্রণালীর যে-যে দোষ আছে, তাহা দেখাইয়াছি এবং যে-যে উপায় অবলম্বন করিলে, আমার বিবেচনায় সেই দোষের সংশোধন হইতে পারে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর উক্ত প্রণালীর সংস্কারের মধ্যে কেবল একটী অতিরিক্ত প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু আমি মহাশয়কে সবিনয় নিবেদন করিতেছি যে, আমি ইহার পর যে কয়েকবার পরিদর্শন করিয়াছি, তাহাতে শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ কোন উন্নতি দেখিতে পাই নাই।

উল্লিখিত স্মারক-লিপি প্রেরণ করিবার পরে আমি সাতিশয় মনোযোগের সহিত এই বিষয়টীর পর্য্যালোচনা করি এবং বোর্ডকে জ্ঞাত করিবার জন্য আমার নিজ মত প্রকটিত করিবার এই সুযোগ লাভ করিয়াছি। আমার মতে ওয়ার্ড-

গণের শিক্ষাপ্রণালীর আদ্যোপান্ত সংস্কার হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ ওয়ার্ডদিগকে এই ইনষ্টিটিউশনে ৪ হইতে ৬ বৎসর রাখা হয় যদি ওয়ার্ডদিগকে সাধারণ স্কুলে পাঠান হয় এবং সেইখানকার প্রণালীমত পড়ান হয়, তাহা হইলে এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের বিশেষ শিক্ষোন্নতি আশা করা যাইতে পারে না। ঐ সকল বিদ্যালয়ে বর্ণপরিচয় হইতে ইউনিভার্সিটির প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে গেলে, সাধারণতঃ বালকবৃন্দের নয় বৎসর লাগে; কিন্তু শিক্ষার্থী পরীক্ষার উপযুক্ত হইলেও তাহার ইংরেজিতে এরূপ দখল জন্মে না, যেরূপ দখল তাহার পাঠাভ্যাস কালের পর অত্যাবশ্যক। অতএব ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া ইতিমধ্যেই পাঠাভ্যাস ত্যাগ করে, তাহাদের শিক্ষা কতদূর হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ওয়ার্ডদিগের শিক্ষা এই প্রকারের হইয়া থাকে। যতদিন সাধারণ স্কুলে তাহাদের পাঠাভ্যাসের বন্দোবস্ত থাকিবে, ততদিন এইরূপই হইতে থাকিবে। যাহা হউক, যখন ইহা বাঞ্ছনীয় যে, ওয়ার্ডগণ ইনষ্টিটিউশনটী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কার্য্যোপযোগী জ্ঞান লাভ করে, তখন আমি বিনয়পুরঃসর নিবেদন করি যে, তাহাদের শিক্ষা-প্রণালীর নূতন বন্দোবস্ত করা হয়।

১. এই ইনষ্টিটিউশনটী এক্ষণে শুদ্ধ ওয়ার্ডগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইহাকে বোর্ডিং বিদ্যালয়ে (এই স্থান, বালকগণের বাসস্থান এবং পাঠাভ্যাস এই উভয় ব্যবস্থাই হয়) পরিণত করা উচিত।

২. ওয়ার্ডদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বতন্ত্র শিক্ষা-পুস্তক সকল প্রদান করা হউক।

৩. তাহাদের শিক্ষা দিবার উপযুক্ত আবশ্যকমত সুযোগ্য শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা হউক।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের পদ্ধতি অনুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার অপেক্ষা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া যে কত সুবিধাজনক, তাহার প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ। তাহার বিস্তারিত বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়সমূহে প্রত্যেক শিক্ষককে অন্যান ৩০ জন বালককে শিক্ষা দিতে হয়। সুতরাং কোন শ্রেণীতে নির্দ্ধারিত পাঠ্য-পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র-মাত্র পড়ান সম্ভব। এই কয়েক ছত্র-মাত্র শিক্ষা করিবার জন্য ওয়ার্ডগণকে প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা করিয়া বিদ্যালয়ে থাকিতে হইবে। সেইটুকু পাঠ অভ্যাস করিতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা করিয়া চার ঘণ্টা কাল বাটীতে অধ্যয়ন

করিতে হইবে। কিন্তু উদ্ভাবিত নিয়ম অনুসারে দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহারা ততটুকু পাঠ যথারীতি অভ্যাস করিতে পারিবে। ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, ওয়ার্ডগণ এই ইনষ্টিটিউশনে যে অল্প সময় অবস্থান করে, সেই সময়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে এবং অনেক বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবে। কিন্তু প্রবর্ত্তিত প্রথা অনুসারে চলিলে, এরূপ ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; এবং এই প্রথা যদ্যপি প্রচলিত থাকে ও ওয়ার্ডগণকে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানলাভ করিয়া যদি ইনষ্টিটিউশন পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় তাহাদিগকে গৃহ হইতে এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে পৃথক করিবার যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সফল হইল না।

এই ইনষ্টিটিউশনে ওয়ার্ডগণকে শাসন করিবার যে নিয়মাবলী আছে, তাহার একাদশ নিয়মটী বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে চাই। ঐ নিয়মটীর তাৎপর্য্য এই যে, কোনপ্রকার গুরুতর অপরাধ না হইলে, ওয়ার্ডগণকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া হইবে না। কিন্তু অর্ডার বুক দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রতিমাসে বালকদিগকে চার হইতে বার পর্য্যন্ত বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। যে-যে অপরাধে তাহারা উক্তরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার একটী ব্যতীত অন্য কোনরূপই "গুরুতর অপরাধ" বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। সেটীরও বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু আমি ইহা সবিনয়ে প্রকাশ করিতে চাহি যে অপরাধ যে প্রকারের হউক না কেন, ওয়ার্ডগণকে শাসন করিতে শারীরিক দণ্ড যেন একবারে রদ করিয়া দেওয়া হয়। শারীরিক দণ্ডবিধানের অনিষ্টকর ফলের জন্য তাহা অপর-সাধারণ সমস্ত বিদ্যালয় হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শত শত বালক বেত্রযষ্টির সাহায্য ব্যতীত শাসিত হইতেছে; সুতরাং ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউ-শনের বালকবৃন্দ যে, এই প্রকার কড় ও কঠিন ব্যবহারের উপযুক্ত, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। বালকদিগের শাসনবিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, শারীরিক দণ্ডবিধানের ফল অনিষ্টকর হওয়ায়, তাহা দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও জঘন্য হইয়া পড়ে। আমি এই কারণে সবিনয়ে মহাশয়কে জ্ঞাত করিতেছি যে, সেই নিয়মটী শীঘ্র রদ হইয়া যাউক।

আর একটী বিষয়ে আমি মহাশয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে অধিকাংশ ওয়ার্ড, একতলা গৃহে অবস্থান করে এবং শয়ন করে। কিন্তু কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এরূপ একতলস্থ গৃহে বাস করিলে স্বাস্থ্য-

হানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; সুতরাং যদি কোন প্রকারে সুবিধা করা যাইতে পরে, তাঁহা হইলে তাহাদের দ্বিতলে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

যে বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করিয়াছি, সেই, বিষয়টী, আমি আগ্রহসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিয়াছি; সুতরাং এ বিষয়ের কতকগুলি সুনিয়ম উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

বংশবদ—

১১ই জানুয়ারি, ১৮৬৫ সাল শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা,

স্মারক-লিপি

দুই

না-বালকগণ ভাল রকম লেখা-পড়া শিখিয়া এবং যথাযোগ্যরূপে কাজের লোক হইয়া পড়ে ভাল জমিদার এবং সমাজের উপকারক হইতে পারে, তৎসাধনই না-বালক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু এইখানে তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা শিক্ষা-নামের উপযুক্তই নহে এবং তাহারা স্কুল পরিত্যাগ করিবার সময় সামান্য-মাত্রই ইংরেজি জ্ঞান লাভ করে। এক্ষণে যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে উহার বেশী ভাল ফলের আশা করা যাইতে পারে না। এই সকল দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত আমি গত ১১ই জানুয়ারির রিপোর্টে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করি। এই বর্ত্তমান সমিতির গঠন হইবার পর হইতে আমি সেইগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি; আমি ঐ মত পরিবর্ত্তন করিবার কোনই কারণ দেখি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যেমন ইনষ্টিটিউশনের সংস্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ঐরূপ সংস্কার হইলে, যে সুফল-সাধনের উদ্দেশ্যে ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

যদি ইনষ্টিটিউশনকে পরে বোর্ডিং স্কুল করা হইবে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে শিক্ষক-নির্ব্বাচন-বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত। উপযুক্ত লেখা-পড়া-জানা শিক্ষক আবশ্যক। কি প্রকারে যুবকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তাঁহাদের ভাল রকম জানা উচিত। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে সকল দোষে দূষিত থাকে, তাহা যেন তাঁহাদের না থাকে। স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার, হেড মাষ্টারের হস্তে থাকা উচিত। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে লোকের এই স্কুলের উপর যে বিতৃষ্ণা আছে (উহা মিথ্যা বলা যাইতে পারে না), আমার বিশ্বাস, তাহা অপনোদিত হইতে পারে এবং ইহার উপর লোকের বিশ্বাস পুনঃসংস্থাপিত হইতে

পারে ; কিন্তু এখন যে অবস্থায় স্কুল চলিতেছে, তাহাতে এই স্কুল যদি উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব না। এইখানে প্রতিপালিত কতকগুলি যুবকের জীবন, এই বিদ্যালয়ের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। যদি এই স্কুলে শিক্ষিত না-বালক-সম্প্রদায়ের সহিত অন্যত্র শিক্ষিত না-বালক জমিদারগণের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে শেষোক্ত সম্প্রদায়কে ভাল বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে না-বালকদিগের এই স্কুলের কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ, তথায় এখন ভয়ানক মড়কের প্রাদুর্ভাব। ইহাকে বীরভূম কিম্বা বহরমপুরে স্থানান্তরিত করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু আমি যে সংস্কারের কথা বলিয়াছি, তাহা যদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এই স্কুল কলিকাতায় থাকা বেশী পছন্দ করি। কারণ, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে নজরের উপর স্কুলের তত্ত্বাবধান ভাল হইবে। দর্শকগণের দ্বারা প্রায়ই পরীক্ষিত হইলে এবং শাসনকারী কর্ত্তৃপক্ষগণের নজরের উপর থাকিলে, স্কুলে খুব সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। ইহা পল্লীগ্রামে আশা করা যাইতে পারে না।

আমার বিবেচনায় না-বালকদিগের সাবালক হইবার বয়স যদি ১৮ বৎসর হইতে ২১ বৎসর করা যায়, তাহা হইলে উহা না-বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে। তাহা হইলে তাহারা আত্মোন্নতি করিবার আরও বেশী সময় পাইবে। এইরূপ বয়সে তাহাদিগকে স্ব-স্ব বিষয় পাওয়া উচিত। এই বয়সে লোকের চরিত্র একরূপ গঠিত হইয়া যায়। বয়সের এই পরিবর্দ্ধন তত্রত্য জমিদারগণের অনভিপ্রেত হইবে না। আমি জানি যে. ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা এই বিষয়ে আইন পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।

২৯শে আগষ্ট, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন রেভিনিউ বোর্ডের অধীন ছিল। রিপোর্টাদি বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্চ্চ, জুলাই ও নভেম্বর মাসে ওয়ার্ড পরিদর্শন করিতেন। বোর্ডের কার্য্যালোচনায় তাঁহার আন্তরিকতা অবিসংবাদিনী। তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্ট ও স্মারক-লিপি ইহার দুই অকাট্য প্রমাণ। আন্তরিকতা মনুষ্যত্বের মূল মর্ম্ম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল কার্য্যেই আন্তরিকতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সব পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ গ্রাহ্য হইয়াছিল। তবে একটী বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই। ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রগণকে বেত্রাঘাত করা হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়

বেত্রদণ্ড উঠাইবার চেষ্টা করেন। ইনষ্টিটিউশনের সেক্রেটারী রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করেন। তৎসম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তন্নির্দ্ধারণার্থ একটী কমিটীও হইয়াছিল। কমিটীতে রাজেন্দ্রলালের প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়।

ইহার পর নানা কারণে রাজেন্দ্রলালবাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতান্তর হয়। অনেকেই বলেন, এই মতান্তর হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইনষ্টিটিউশনের কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

প্রকৃত পক্ষে কি কারণে তিনি ওয়ার্ডের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। এমন কি প্রকৃত কারণ নির্ণয়ার্থে রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সেক্রেটারি মাননীয় স্বর্গীয় নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বোর্ডের কাগজপত্র দেখিয়া শুনিয়া কোন কারণ নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই। এই পর্যন্ত কেবল জানা যায়, ১২৭১ সালের ১৬ই চৈত্র বা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে তাঁহার শেষ পরিদর্শন*। ইহাতে অনুমান হয়, উপরোক্ত শেষ স্মারকলিপি লিখিয়া তিনি ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শন কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

কোন্ পরীক্ষায় কি সংস্কৃত পাঠ্য হওয়া উচিত, তন্নির্দ্ধারণার্থ ১২৭০ সালে বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে একটী কমিটী হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২৭০ সালে ১৪ই ভাদ্র বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট এই কমিটির একজন সভ্য হইয়াছিলেন। উডরো ও কাওয়েল সাহেব ইহার সভ্য ছিলেন।

স্বকীয় ও পরকীয় বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও পরোপকারার্থে সামান্য বিষয়েও বিদ্যাসাগর মহাশয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন না। কেহ একটী সামান্য বিষয়ের প্রশ্ন করিলেও, তিনি তাহার আত্মজ্ঞান সম্মত যথোত্তরদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ কত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইতে, তাহার সংখ্যা হয় না। এক পুরুষের জীবনে অগণিত কার্য্যের প্রতিষ্ঠা।

১২৭১ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে ছোট নাগপুর-রাঁচি হইতে ষ্টেনফার্থ সাহেব একখানি চিঠি লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা করেন।

---

* Record keeper, can you give the last date on which the late Pandit Iswar Chandra Vidyasagar paid a visit to the Ward Institution, Calcutta.

(Sd.) N. K. Basu. 29-7.

The last date is 28th March, 1865.

To Secy. (Sd.) N. N. Seal. 29-7.

"ক নামক এক জমিদার পাগল। তাঁহার প্রজারা তাঁহার বিবাহ দেওয়ায় এ বিবাহ ব্যাপারটা কি, জমিদার তাহার কিছুই বুঝেন নাই! কালে এই বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র হয়। এই পুত্র জমিদারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইতে পারে কি না।"

১২৭১ সালের ১০ই আষাঢ় বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার এইরূপ উত্তর লিখিয়া পাঠান,—

"এই পুত্রই উত্তরাধিকারী হইবে। যখন বিবাহ হয় তখন সেই বিবাহ-ব্যাপারটা কি, যদিও জমিদার তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু এরূপ ত্রুটিসম্পন্ন বিবাহ হিন্দুর আইনের চক্ষে অসিদ্ধ নহে*।"

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মেট্রোপলিটন

১২৭১ সালে বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "ট্রেণিং স্কুলে"র চিতা-ভস্মের উপর বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তিস্তম্ভ "মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, যাদবচন্দ্র পালিত, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য, মাধবচন্দ্র ধাড়া, পতিতপাবন সেন এবং গঙ্গাচরণ সেন কর্ত্তৃক ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শঙ্কর ঘোষের লেনে "ট্রেণিং স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার বহুবাজারের দত্ত পরিবার এই স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য অনেক পুস্তক দান করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ধনী শ্যামাচরণ মল্লিক অনুরূপ সাহায্য করিতেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদ ত্যাগ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্কুলের সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত হন। এই সময় ঐ স্কুল পরিচালনার্থ একটী কমিটী হয়। এই কমিটী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে স্কুল পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই সময় সভ্যদের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ের কোন সভ্যের চরিত্রদোষ সন্দেহে সেই মনোমালিন্য। স্কুলগৃহে এক দিন একটী মাকড়ী পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, এক জন সভ্য রাত্রিযোগে স্কুলগৃহে বেশ্যা আনিতেন। মাকড়ী সেই বেশ্যারই। মনোমালিন্যের মূলোৎপত্তি এইখানেই। পরে যাঁহার উপর সন্দেহ হয়, তাঁহারই কোন প্রিয় পোষ্য শিক্ষকের

* ষ্টেনফার্থ সাহেব কিশোরীচাঁদ মিত্রের মারফৎ এই চিঠিখানি পাঠাইয়া দেন। কিশোরীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন।

পদচ্যুতি লইয়া মতান্তর পাকাপাকি হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুলের সেক্রেটারীপদ পরিত্যাগ করেন। ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী এবং মাধবচন্দ্র ধাড়া "ট্রেণিং স্কুলে"র বেঞ্চি, চেয়ার প্রভৃতি সরঞ্জাম স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, "ট্রেণিং একাডেমি" নামক একটী নূতন স্কুল স্থাপিত করেন। ট্রেণিং স্কুলের অবশিষ্ট অধিষ্ঠাতৃগণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ এবং রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে স্কুল পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত আর সকলেই ভার গ্রহণে সম্মত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "আর তাঁবেদারীতে কাজ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।" প্রতিষ্ঠাতৃগণ বলিলেন—'তাঁবেদারী করিতে হইবে না; স্কুল আপনারই হইল; আমরা পৃষ্ঠপোষক রহিলাম মাত্র।" অনেক সাধ্যসাধনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ভার গ্রহণ করেন।

১২৬৮ সালের বৈশাখ বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে উপরোক্ত সম্রান্ত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী কমিটী হয়। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ সভাপতি ও বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রায় হরচন্দ্র ঘোষ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "ট্রেণিং স্কুলে"র নাম "হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন' হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটনের ভার একা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে নিপতিত হয়।

প্রথম মেট্রোপলিটনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজের অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের বেতন উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত ৩৲ টাকা ছিল বটে, কিন্তু অনেক ছাত্রকেই বিনা বেতনে পড়াইতে হইয়াছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত "ট্রেণিং একাডেমি" তখন "মেট্রোপলিটনে'র ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল। মেট্রোপলিটনের পসার-প্রতিপত্তি শীঘ্রই বাড়িয়া যায়। ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অটুট যত্নে ও অধ্যবসায়ে এবং অনন্য-পূর্ব্ব শিক্ষা প্রণালী-গুণে "মেট্রোপলিটন" একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিগণিত হয়। ক্রমে স্কুলের আয়ে স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে থাকে। তাঁহাকে ইহার জন্য ঘরের পয়সা বাহির করিতে হইত না। স্কুলের পয়সা তিনি কখন ঘরে লইয়া যান নাই।

প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ মিত্র এবং কৃষ্ণদাস পাল এই স্কুল পরিচালন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করিতেন। ইঁহারাও স্কুলের ম্যানেজার ছিলেন। স্কুলে এফ. এ. ক্লাস খুলিবার, জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে যে আবেদন করা

হয়, সেই আবেদনপত্রে ম্যানেজার বলিয়া ইঁহাদের স্বাক্ষর ছিল।

ইংরেজি শিক্ষায় বহু হিন্দুসন্তানের নানা কারণে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য; কিন্তু ইংরেজি এখন হইয়াছে অর্থকরী বিদ্যা। এই ইংরেজি শিক্ষা প্রসারণের কৃতিত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু কষ্টেই লাভ করিয়াছেন। মেট্রোপলিটনের শিক্ষকতায় অনেক এদেশী ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তির অর্থার্জ্জনের উপায় সংস্থান হইয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকেরা ইংরেজি বিদ্যার্জ্জনের সুলভ পথ পাইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা ভিন্ন উদরান্নের সংস্থান হওয়া আজ কাল দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজি বিদ্যা প্রসারণের প্রশস্ততর পথ আবিষ্কার করিয়া যে এ যুগে যশস্বী হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? তিনি যে আপন বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত না করিয়া এদেশীয় শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশী-পোষকতা-প্রবৃত্তির পরিচয় পাই। এদেশী শিক্ষক লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিদ্বন্দিতায় দিগ্বিজয়ী।

পাশ্চাত্য বিদ্যার উৎকর্ষসাধন পক্ষে যে প্রণালী ও পদ্ধতির প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সিদ্ধহস্ত। পরাধীন অবস্থাতেও সংস্কৃত কলেজে তিনি তাহার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বাধীন অবস্থায় নিজের বিদ্যালয়ে যে তিনি সে সম্বন্ধে অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এখানে তো আর প্রভুদিগের রোষকষায়িত কটাক্ষবিক্ষেপের বা শাসনসূচক তর্জ্জনী-তাড়নার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই। সত্য সত্যই তাঁহার কৃতিত্বের যশ এখন বিশ্বব্যাপী। অধুনা এদেশীয় অনেক ব্যক্তি ইংরেজি বিদ্যা প্রচারার্থ সেই প্রণালী-পদ্ধতির পথানুসারী। যখন বিদ্যাসাগর যে কোন ইংরেজি বিদ্যাবিশারদ এদেশী লোক পাইতেন, তখন তাঁহাকে নিজের বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিতেন। বালকদিগের প্রতি কটূ ব্যবহার করিবার বা বেত্রাদি দণ্ড দিবার অধিকার কোন শিক্ষকেরই ছিল না। অথচ প্রায় কোন শিক্ষকেই ছাত্রদিগের দুরন্ত দুর্দ্দমনীয়তার জন্য অভিযোগ করিতে হইত না। যখন কোন ছাত্র দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিত, তখন তাহাকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এমন কি কখনও কখনও অবিনয়ের অপরাধে কোন কোন শ্রেণীর সমুদায় ছাত্র বিতাড়িত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রদিগকে, শিক্ষকগণকে এবং ভৃত্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে সততই সস্নেহ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। আমরা জানি, একবার স্কুলের ছাত্রগণ তাঁহার নিকট পৌষ-পার্ব্বণের ছুটী চাহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছুটী মঞ্জুর করেন; ছাত্র বৃন্দকে সহাস্যে সস্নেহে

বলেন,—"তোমাদের অনেকের তো বিদেশে বাড়ী ; কলিকাতার বাসায় পিঠে পাইবে কোথায় ?" বালকেরা বলিল,—"আপনার বাটীতে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"ভাল, তাহাই হইবে।" তিনি বালকদিগের জন্য বাড়ীতে প্রচুর পিষ্টকের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

স্বচক্ষে বিদ্যালয়-পরিদর্শন করা তাঁহার একটা স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কার্য্যের ভার অপরের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যাহা কিছু করিবার তিনি স্বয়ংই তাহা করিতেন। রুগ্নদেহেও পরনির্ভরতা তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। এইজন্য এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত শিষ্য দুষ্প্রাপ্য।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্কুল-পরিদর্শনে আসিতেন, তখন তিনি কাহাকেও 'পূর্ব্বাহ্নে' তাহা জানিতে দিতেন না। অধ্যাপক অধ্যাপনায় গাঢ় মনোনিবিষ্ট হইয়া আছেন, এমন সময় হয় তো তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিতেন। কোন ক্রমে শিক্ষক বা অধ্যাপক, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি বলিতেন,—"তুমি পড়াইতে পড়াইতে উঠিও না ; তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর ; আমার খাতির করিতে গিয়া, তোমার যেন কর্ত্তব্য-ত্রুটি না হয়।" কখনও কোন ছাত্রকে নিদ্রিত দেখিলে, তিনি তাহাকে স্থানান্তরে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। স্কুল-পরিদর্শনে তাঁহার নিয়মিত কোন সময় ছিল না ; কাজেই ছাত্র, অধ্যাপক, সকলকেই সতত সাবধানে থাকিতে হইত। সেই জন্য কোন ক্রমে কোন সময়ে কাহারও কোন বিষয়ে অমনোযোগিতার সম্ভাবনা ছিল না। শিক্ষার চরমোৎকর্ষও সেই সঙ্গে হইয়াছিল। স্কুলের শিক্ষক বা অধ্যাপক কোন কার্য্যসূত্রে স্কুলের কার্য্যান্তে বাড়ীতে তাঁহার সহিত সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে জলযোগ করাইতেন। এমন শুনিয়াছি যে, তিনি স্বহস্তে আম কাটিয়া খাওয়াইতেন। স্কুলের কোন ভৃত্যের কোনরূপ অসুখ হইলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাহার চিকিৎসা করাইতেন। বিদ্যালয়ের পুরাতন দ্বারবান কাশীর একটা বিষম স্ফোটকে মৃত্যু হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কাশী তাহার ব্যারামের কথা আদৌ জানায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার মৃত্যুর পর, তাহার ব্যারামের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি স্কুলের কর্ম্মচারিবর্গের চিকিৎসার্থ এক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তায় এবং শিক্ষাপ্রণালীর সুশৃঙ্খলায় তাঁহার বিদ্যালয়

প্রকৃতপক্ষে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিল। এ প্রতিপত্তিরও মূলাধার, বিদ্যাসাগরের সাহস, উদ্যম, উৎসাহ ও একাগ্রতা।

মেট্রোপলিটনের বেতন তিন টাকা। অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে বিনা বেতনে পড়িত। কেহ কেহ তাঁহাকে বঞ্চনাও করিতেন। কলিকাতা সহরের কোন লক্ষপতি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়া কহিয়া আপনার শ্যালককে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতে পারেন নাই, এটী লক্ষপতির শ্যালক; পরন্তু জানিয়াছিলেন, সে অতি দরিদ্র। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুলে গিয়া দেখেন, শ্যালকটী দিব্য পরিচ্ছদে ভূষিত; রসগোল্লা পান্তুয়া প্রভৃতি বহু উপাদেয় দ্রব্য জলযোগ করিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে বিস্ময়ান্বিত হন। পরে তিনি অনুসন্ধানে শ্যালকের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারেন। তাহার পর সেই লক্ষপতির নিকট গিয়া তিনি বলেন, "আমার সঙ্গে বঞ্চনা! তোমায় ধিক্! কি করিয়া তুমি শ্যালকটীকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিলে?" লক্ষপতি নির্ব্বাক্। শ্যালকটী স্কুল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

মেট্রোপলিটনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একবার দেওয়ানী মোকদ্দমার আসামী হইতে হইয়াছিল। মেট্রোপলিটন পাথুরিয়া ঘাটার জমিদার খেলাচন্দ্র ঘোষের ভাড়াটীয়া বাটীতে ছিল। ভাড়া পাওনার দরুণ খেলাৎবাবু হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। আসামী হইয়াছিলেন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাড়ী মেরামত করিবার কথা ছিল। মেরামত হয় নাই বলিয়া, ভাড়া দেওয়া হয় নাই। মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্বে রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল ও রামগোপাল ঘোষ গোলযোগ মিটাইবার চেষ্টা করেন। খেলাৎ-বাবু যাহা চাহেন, ইঁহারা তাহাই দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অন্যান্য মেম্বরগণ তাহাতে রাজি হন নাই। এইজন্য শুনা যায়, রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল ও রামগোপাল ঘোষ স্কুলের সম্পর্ক ছাড়িয়া দেন। ১২৭১ সালের ১লা চৈত্র বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ, বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটারী-রূপে খেলাৎবাবুকে এই মর্ম্মে ইংরেজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, "আমি ভাড়ার হিসাবে একেবারে পাঁচ শত টাকা দিতে পারি না। তবে বিল পাঠাইলে মাসিক ভাড়ার হিসাবে বাকি পাওনা ভাড়া দিতে পারি।" যাহা হউক, অবশেষে সকল গোল মিটিয়া গিয়াছিল। ১২৭১ সালে বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "আখ্যানমঞ্জরী"র প্রথম ভাগ প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। চরিতাবলী ও জীবনচরিত সম্বন্ধে যে মত, আখ্যানমঞ্জরী সম্বন্ধেও সেই মত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

বেথুনে নরম্যাল, বেথুনে মিস্ পিগট্, পিতার কাশীবাস, প্রসন্নকুমার ও দুর্ভিক্ষ

বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকাল স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বেথুন স্কুলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৭১ সালের ১লা চৈত্র বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিকের সময় তিনি এক ছড়া সোনার চিক উপহার দিয়াছিলেন। এই পারিতোষিক-সভায় বড়লাট লরেন্স ও তাঁহার পত্নী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে এইরূপ পারিতোষিক দিতেন। বেথুন স্কুলের কোন বিভ্রাট উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইত। ১২৭৪ সালে বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুলকে নরম্যাল স্কুলে পরিণত করিবার কথা প্রস্তাবিত হয়; অর্থাৎ এখানে হিন্দু স্ত্রীলোককে এমনই করিয়া শিখান হইবে যে, তাঁহারা পরে শিক্ষয়িত্রী-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তৎকালে কেশবচন্দ্র সেন, বাবু এম্. এম্. ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা উচিত কি না, তন্নির্দ্ধারণার্থ একটী 'কমিটী' হইয়াছিল। সেই কমিটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজে একটী সভা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, নরম্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠার জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে আবেদন করিতে হইবে। এই মীমাংসাটা অতি তাড়াতাড়ি হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে এত তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত ছিল না। তিনি জানিতেন, এতৎসম্বন্ধে খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের মতামত লওয়া হইবে এবং তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা হইবে, তাহা হয় নাই। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত হইয়া এক পত্র লিখিয়া কমিটী হইতে আপনার নাম উঠাইয়া লয়েন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির মত ছিল যে, সৎকুলজাত ভদ্রমহিলারা মেয়ে পড়াইবার জন্য শিক্ষা লাভ করিতে সম্মত হইবেন না। এজন্য তাঁহাদের আপত্তি ছিল। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার জন্য একটা 'কমিটী' ও সংঘটিত হইয়াছিল। তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য ছিলেন,—
"অনারেবল ডবলিউ. এস. সিটনকর,—সভাপতি; অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত;

---

* বীটন সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি "স্কুলটীর বেথুন স্কুল" নাম চলিয়া আসিতেছে।

ডবলিউ.এস্. আটকিনসন ; রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ; হরচন্দ্র ঘোষ ; কাশীপ্রসাদ ঘোষ ; রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ; হরনাথ রায় ; কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রস্তাব অবশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই বটে ; কিন্তু ক্রমে বেথুন স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনমুমোদিত হইয়া উঠে। সেইজন্য ১২৭৬ সালে বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বেথুন স্কুলের সেক্রেটারী-পদ পরিত্যাগ করেন। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহাকে বেথুন স্কুলের আরও একটী গুরুতর কার্য্যের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকা মিস্ পিগটের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত হয় যে, তাঁহার অমনোযোগিতা হেতু বিদ্যালয়ের অবনতি হইতেছে। তদ্ব্যতীত স্কুলে খৃষ্টানী গান গীত হইত, এইরূপও একটী অতি ভয়ঙ্কর অভিযোগ হয়, অধিকন্তু স্কুলের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। এইজন্য অনেকে স্কুলে আর মেয়ে পাঠাইত না। এই অভিযোগের অনুসন্ধানার্থ এক কমিটী হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই কমিটীর সবকমিটীতে সভ্য ছিলেন। অনুসন্ধানে নির্দ্ধারিত হয়, মিস্ পিগট্ বাস্তবিক অপরাধিনী*। তিনি পদচ্যুত হন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা কাশীবাসী হন। পিতৃভক্ত পুত্র পিতাকে প্রথমতঃ কাশী পাঠাইতে সম্মত হন নাই। পিতার সনির্ব্বন্ধ ব্যগ্রতা দেখিয়া তিনি অবশেষে তাঁহাকে কাশী পাঠাইতে বাধ্য হন। পিতাকে কাশী পাঠাইবার পূর্ব্বে তিনি তিন শত টাকা ব্যয় করিয়া পিতার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া লয়েন। এই প্রতিকৃতি এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে বিরাজমান। অতঃপর তিনি জননীরও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। জননীর প্রতিকৃতিও পিতার প্রতিকৃতির সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি সময়ে সময়ে তাঁহাদের প্রতিকৃতি দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে। প্রত্যহ তিনি দুইবার করিয়া তাঁহাদের প্রতিকৃতি দেখিতেন†।

* মিস্ পিগট্ আত্মপক্ষ-সমর্থনার্থ একটী সুবিস্তৃত মন্তব্য লিখিয়াছিলেন।

† পিতা ঠাকুরদাসের কাশীবাস সম্বন্ধে পুত্র নারায়ণবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়াছি,—পিতার কাশীবাস করিবার প্রস্তাব শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ী যান। তথায় নির্জ্জনে তিনি পিতাকে বলেন,—"আপনি কাশীবাসী হইবেন কেন ? যদি পুণ্যার্থে যান, তবে কথা নাই, যদি সংসার বৈরাগ্যে যান, তাতেও কথা নাই ; কিন্তু সুখস্বচ্ছন্দে সংসার চালাইবার উপযুক্ত টাকা পান না বলিয়া যদি যান, তাহা হইলে আমি টাকার বন্দোবস্ত করিতে পারি।" পিতা বলিলেন,—"পুণ্যার্থেই

১২৭২ সালের ১৬ই বৈশাখ বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পদত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল সার্টক্লিফ্ সাহেবের সহিত তাঁহার মনোবাদ হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের দ্বিতলের একটী গৃহে প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরী ছিল। সেই ঘরে লাইব্রেরীর স্থান সঙ্কুলন হইত না। যে ঘরে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী ছিল, সার্টক্লিফ্ সাহেব প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরীর জন্য সেই ঘরটী চাহেন এবং সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীটীকে নিম্নতলে লইয়া যাইতে বলেন। প্রসন্নবাবু তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাতে সার্টক্লিফ্ সাহেব প্রসন্নবাবুব উপর বিরক্ত হন। পরে প্রসন্নবাবু তাৎকালিক ডাইরেক্টর আটকিনসন্ সাহেবের নিকট হইতে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী স্থানান্তরিত করিবার জন্য আদেশ পত্র প্রাপ্ত হন। প্রসন্নবাবু পত্রখানি বড় অপমানজনক মনে করিয়া তদ্দণ্ডেই একখানি অভিমানসূচক পত্র লিখিয়া পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পদত্যাগের পর সগুর্ম সাহেব ছয় মাস কাল সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট বাহাদুর বিডন্ সাহেবের নিকট গিয়া প্রসন্নবাবুর পদত্যাগের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন,—"আপনার রাজত্বে এ কি অন্যায়!" বিডন্ সাহেব বলেন,—"আমি প্রসন্নকে পুনরায় প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিব।" ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"তিনি যেরূপ স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী, তাহাতে আমার মনে হয় না যে, তিনি আবার পদ গ্রহণ করিবেন।" তদুত্তরে বিডন্ সাহেব বলেন,—"প্রসন্ন আমার ছাত্র, আমার অনুরোধ ঠেলিবে না।" ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন। পরে ১২৭২ সালের ১৬ই ভাদ্র বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট বিডন্ সাহেবের অনুরোধে প্রসন্নবাবু সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদগ্রহণ করিয়াছিলেন *।

যাইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিরুক্তি করেন নাই। পিতা যখন কাশী যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়া কলিকাতায় আসেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্র নারায়ণকে বলিলেন,—"দেখ্, তোর ঠাকুরদাদার যাহাতে কাশী না যাওয়া হয়, তাহার চেষ্টা কর্ দেখি।" অতঃপর নারায়ণচন্দ্র ঠাকুরদাদার সঙ্গ ছাড়লেন না। ঠাকুরদাদা নাতির মায়ায় জড়াইয়া পড়িলেন। ক্রমে কাশী যাওয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র আসিয়া উত্তেজনা-বাক্যে পিতার মত পরিবর্ত্তন করেন।

* ১২৬৯ সালের ১লা পৌষ বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর প্রসন্নবাবুকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদ পরিত্যাগ করিয়া বহরমপুর কলেজে যাইতে হইয়াছিল। তখন এ পদের বেতন হাজার টাকা ছিল। এই বেতনের উল্লেখ করিয়া, শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের স্ত্রী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বলিয়াছিলেন, "এতদিন তোমার বাপের হাজার টাকা মাহিনা হইত।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা বলেন, "তাহা হইলে স্কুল বাড়ী এ সব হইত কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় কন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"হইত বৈকি?" আমরাও বলি, হইত বৈকি, যদি ইয়ং সাহেবের সহিত মতান্তর না হইত।

সরকারী কর্ম্মে বিদ্যাসাগরের আর কোনও সম্পর্ক ছিল না; তবুও রাজপুরুষগণ তাঁহার কত সম্মান করিতেন, তাহা এইখানে বুঝা যায়। তেজস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বঙ্গেশ্বরকে স্পষ্টাক্ষরে কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিতেন, বিডন্ সাহেব তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন; নহিলে তিনি কি অমন করিয়া বলিতে পারেন,—"আপনার রাজত্বে এ কি অন্যায়!" কোথায় সম্ভ্রমক্রটীর সম্ভাবনা আর কোথায় নহে, তাহার বিচার করিয়া তিনি ভাল মন্দ কথা কহিতেন; এবং কহিতে জানিতেন।

১২৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মে ও জুলাই মাসে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিল। সে দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে এবং মস্তক ঘুরিয়া পড়ে। কত লোককে শাক, কচু সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইয়াছে; কত লোক অনাহারে মরিয়াছে; কত পিতামাতা পুত্রকন্যাকে ফেলিয়া, কত স্বামী স্ত্রীর মুখ না চাহিয়া, কত স্ত্রী স্বামীর অপেক্ষা না করিয়া, দগ্ধ জঠরজ্বালায় অস্থির হইয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য সহরে দলে দলে ছুটিয়াছিল, তাহার সবিস্তর বিবৃতির স্থান তো হইবে না। তবে এ দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যতটুকু সম্পর্ক, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হইবে মাত্র। জাহানাবাদ জেলা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-বার্ত্তা প্রথম হিন্দু পেট্রিয়টে একজন লিখিয়া পাঠান। দুর্ভিক্ষদমনে তত্রত্য জমিদারমণ্ডলী প্রথম উদাসীন ছিলেন। তাৎকালিক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রথম প্রথম এ বিষয়ে তত মনোযোগী হন নাই। হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিত হয়, গড়বেতার ডিপুটী ম্যাজিষ্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কর মহাশয় বহু শ্রম স্বীকার করিয়া দেশের অবস্থা পরিদর্শন করেন এবং দেশের লোককে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠান। জাড়ার জমিদার শিবনারায়ণ রায় মহাশয় অনেককে অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় দারুণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ পান নাই। হিন্দু পেট্রিয়টের একজন সংবাদদাতা কাতর-কণ্ঠে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আবেদন করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও গ্রাম হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হন। স্বভাবদাতা বিদ্যাসাগর কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখনই গ্রামে অন্নসত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী অনেককেই অন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দয়াময়ের দয়াময়ী জননী অকাতরে, অকুণ্ঠিত চিত্তে, বহু লোককে অন্নদান করিতেছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়টের সংবাদদাতা ১২৭৩ সালের ১৫ই শ্রাবণ বা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—

"বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা প্রত্যহ ৪।৫ শত লোক খাওয়াইয়া থাকেন।"

ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ এবং নিকটবর্ত্তী ১০।১২ খানি গ্রামের নিরন্ন লোকদিগের জন্য অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম বীরসিংহের অন্নসত্রে এক শত করিয়া লোক অন্ন পাইয়াছিল।

ক্রমে অন্নার্থী দলে দলে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদনুপাতে সাহায্য-পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। তিনি স্বয়ং অন্নসত্রের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যাহাতে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তৎপক্ষে তিনি সর্ব্বাগ্রে যত্নশীল হইয়াছিলেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রথমতঃ উদাসীন ছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে তিনি দুর্ভিক্ষের দারুণতা অনুভব করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লইয়া ঘাটাল-ক্ষীরপাই-রাধানগর-চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া অন্নসত্র স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টনকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এই কয় মাস বহুসংখ্যক লোক সরকারী অন্নছত্রে অন্ন পাইয়াছিল।

যে কয় মাস দুর্ভিক্ষ প্রবল ছিল এবং যে কয় মাস অন্নসত্রের কাজ চলিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই কয় মাস প্রতি মাসে একবার করিয়া বাড়ী যাইতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের উপর অন্নসত্র-পরিদর্শনের ভার ছিল। তাঁহারা কোন রূপই ত্রুটি করিতেন না। যাহারা অন্নসত্রে আহার না করিত, তাহারা প্রত্যহ সিধা পাইত। কেহ পুত্রকন্যা ফেলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, তাহার পুত্রকন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিদ্যাসাগর লইতেন। গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসব করিলে, তাহার নবজাত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

যখন কাঙ্গালীরা খাইতে বসিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়জয়কার ধ্বনিতে গগন-মেদিনী পূর্ণ হইয়া যাইত। সেই সময় মনে হইত, অনন্ত মরুভূমে যেন শতধারে মন্দাকিনীর স্রোত ছুটিতেছে ; এবং সকলের বিষাদক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে যেন প্রীতি প্রফুল্লতায় এক পবিত্র জ্যোতি নিঃসারিত হইতেছে।

সকলে প্রত্যহ খেচরান্ন পাইত। প্রত্যেক সপ্তাহে এক দিন করিয়া ভাত, মৎস্যের ঝোল ও দধির ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং অনেক রুক্ষকেশ দীনহীন মলিন স্ত্রীলোককে তৈল মাখাইয়া দিতেন। যে সব ভদ্রলোক সিধা লইতে কুণ্ঠিত হইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় গোপনে তাঁহাদিগকে

টাকা দিতেন। অনেক ভদ্র মহিলাকে তিনি গোপনে কাপড় বিতরণ করিয়া আসিতেন। অন্নসত্রে রোগীর চিকিৎসা চলিত, মৃতের সৎকার হইত।

ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত অন্নসত্রের কাজ চলিয়াছিল। অন্নসত্রের আবশ্যকতা তিরোহিত হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় পাচক, পরিচারক প্রভৃতি কর্ম্মচারিবর্গকে যথারীতি বেতনাদি দিয়া বিদায় দেন। অন্নকষ্টের অবসানের পরও গ্রামের যে সব লোকের কষ্ট ছিল, তাহাদিগকে তিনি মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিবার ভার জননীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। যেমন পুত্র তেমনই মাতা! গৃহস্থ বিদ্যাসাগরের এই অসীম করুণার কার্য্য দেখিয়া, অনেক কোটিপতিরও মস্তক হেঁট হইয়াছিল, দীন-হীন কাঙ্গালীরা তাঁহাকে দয়ার সাগর বলিয়া ডাকিত।

বিদ্যাসাগর "দয়ার সাগর" হইলেন।

দয়ার কথা তাঁর আর কত বলিব? বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"ইতিমধ্যে গড়বেতার অন্নসত্রের কর্ম্মাধ্যক্ষ বাবু হেমচন্দ্র কর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সাহায্য প্রার্থনায় অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লিখিলেন। তাহাতে অগ্রজ মহাশয় আমার দ্বারা দরিদ্রভোজনের ৫০. আর উহাদের বস্ত্রের জন্য ৫০, একুনে ১০০ টাকা প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত ঐ সময়ে কোন কোন ভদ্রলোক পিতৃহীন অবস্থায় যাজ্ঞা করিতে আইসেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও ৫০ টাকা, কাহাকেও ১০০ টাকা, কাহাকেও ২০০ টাকা দান করেন। ২৮শে শ্রাবণ পৃথক্ বাটীতে অন্নসত্র স্থাপিত হয়। ১লা পৌষ ভোজনের পর অন্নসত্র বন্ধ করা হইয়াছিল; কিন্তু বিদেশীয় নিরুপায় ব্যক্তিগণ ৮ই পৌষ পর্য্যন্ত অন্নসত্র-গৃহে উপস্থিত ছিল। একারণ দুর্ব্বল নিরুপায় প্রায় ৬০ জনকে কয়েক দিন ভোজন করাইতে হইয়াছিল।"

সপ্তবিংশ অধ্যায়

রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজ-পরিবার, অবাধ সাক্ষাৎ, অনাহূতের অত্যাচার, দেবোত্তর সম্পত্তি, দারুণ দুর্ঘটনা ও পারিবারিক পার্থক্য

১২৭৩ সালের ৪ঠা শ্রাবণ বা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই রাত্রি ৩টার সময় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু হয়। রাজা প্রতাপচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যে রাজা বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহায় ও

পোষক ছিলেন*। রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, মুরশিদাবাদে গিয়া তাঁহার যথেষ্ট চিকিৎসা-শুশ্রূষাদি করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার রাজা বাহাদুরের চিকিৎসা করিতেন। এতদর্থে তিনি মাসে সহস্র টাকা পাইতেন। কাশীপুরের গঙ্গাতীরে রাজার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিষয়ের ট্রষ্টি নিযুক্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সম্মত হন নাই।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর পাইকপাড়া রাজ-পরিবারের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পিতামহী রাণী কাত্যায়নীর অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালিক বঙ্গেশ্বর বিডন্ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া পাইকপাডা ষ্টেট, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অন্তর্ভূক্ত করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালিক পাইকপাডার নাবালক রাজপুত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অন্তর্ভূক্ত হইবার সম্বন্ধে অনেকটা গোলযোগ হইয়াছিল। বাহুল্যভয়ে তদুল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম। তবে একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। কলেক্টরি খাজনার দায়ে পাইকপাড়া রাজবংশের বিষয় বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গেশ্বর সে যাত্রা বিক্রয় দায় হইতে উদ্ধার করেন। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে বিষয় গিয়াছিল বটে; কিন্তু নাবালক রাজপুত্রদিগকে ওয়ার্ডসের অধীন বিদ্যালয়ে থাকিতে হয় নাই। যাহাতে রাজকুমারদিগকে ওয়ার্ডসের বিদ্যালয়ে যাইতে না হয়, তাহার জন্য রাণী কাত্যায়নী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাষ্পাকুলিত লোচনে অনুরোধ করেন। একদর্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গেশ্বরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই পাইকপাডা রাজবাটীতে যাইতেন। একদিন পথিমধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত রামধন নামে এক মুদি তাঁহাকে ডাকিয়া আপনার দোকানে লইয়া যায়। রামধন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 'খুড়া খুড়া' বলিয়া ডাকিত। রামধনের সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অম্লান-বদনে তাহার দোকানের সম্মুখে ঘাসের উপর বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় রাজবাটীর কয়েক জন তাঁহাকে দেখিতে পান। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজবাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে কেহ কেহ ও কথার উল্লেখ করেন। "এটা ভবাদৃশ জনোচিত নহে" বলিয়া একটা

* "He was one of the principal suppoters of the female school established and managed by Pandit Issur Chandra Vidysaghar."—"Hindu Patriot", 1865, 23, July.

মৃদু-তীক্ষ্ণ মন্তব্যও প্রকটিত যে না হইয়াছিল, এমন নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, কিন্তু ধীর-গম্ভীর বাক্যে অথচ একটু মৃদু-মন্দ হাস্যে বলিয়াছিলেন, "গরিব বড় মানুষ আমার সবই সমান।"

এক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে দ্বারদেশে এক জন ভিখারী আসিয়া ভিক্ষা চাহে। দ্বারবানেরা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে বড় সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার পর হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজবাড়ী যাওয়া বন্ধ করেন, কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার জন্য রাজবাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করেন নাই কোন কোন রাজকুমারের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাছে আর পূর্ব্ব-সম্মান না থাকে, এই ভাবিয়া তিনি রাজবাটী যাওয়া বন্ধ করেন। রাজকুমারেরা কিন্তু একটী দিনের জন্যও তাঁহার প্রতি ভক্তিশূন্য হন নাই। কুমার ইন্দ্রচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। কেহ তাঁহাকে বাড়ীতে দ্বারবান রাখিবার পরামর্শ দিলে, তিনি রাজবাড়ীর দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিতেন, এমন কি তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"দ্বারবান রাখিলেই তো আমার বাড়ীতে ভিক্ষার্থী এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইবে না, অধিকন্তু প্রায় অনেক সাক্ষাৎকার-প্রার্থী ভদ্র লোকও সাক্ষাৎকারলাভে বঞ্চিত হইবেন, তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে দ্বারবান ছিল না। কখনও কখনও তিনি আপনার দৌহিত্রবর্গকে বলিতেন,—যদি শুনিতে পাই, বাড়ীর কাহারও দ্বারা আমার বাড়ীতে কোন ভদ্রলোকের আসিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব।" দ্বারবান্ রাখিবার কথা হইলেই তিনি বলিতেন,—"আমি অন্যের বাড়ীতে যে অসুবিধা দেখিয়া আসিয়াছি, সে অসুবিধা আমার বাড়ীতে যাহাতে না থাকে, তাহারই ব্যবস্থা করা তো আমার কর্ত্তব্য।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎকার লাভের পক্ষে কখনও কোনরূপ বিঘ্ন-বাধার ব্যবস্থা ছিল না। তিনি যে সময় সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন, সেই সময় এক দিন মধ্যাহ্নে এক ব্যক্তি অতি ব্যস্তভাবে তথায় উপস্থিত হন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। লোকটী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতেন না। তিনি একটু বিরক্ত, একটু উগ্রভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন,—"বিদ্যাসাগর মহাশয় কোথায়?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"কেন?" লোকটী বলিলেন,—"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি? অনেক বড় লোকের বাড়ী যাইলাম; কেহই সাক্ষাৎ করিলেন না, দেখিয়া

যাই, বিদ্যাসাগর কিরূপ।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আহার হইয়াছে ?" উত্তর হইল,—"আহার কি, জলস্পর্শ হয় নাই। তৃষ্ণায় নাভি ফাটিয়া যাইতেছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এখন আপনি কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শান্ত হউন।" লোকটি বলিলেন,—"অগ্রে সাক্ষাৎ চাই।" ইতিমধ্যে দিব্য-রূপ জলযোগ আসিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে লোকটী জলযোগ করিলেন। পরে শান্ত হইয়া, তিনি বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার-প্রার্থী হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আর আত্ম-গোপন করিতে পারেন নাই। তখন লোকটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত মহত্ত্বানুভব করিয়া পরম পুলকে বিদায় গ্রহণ করেন।

অনেকেই আবার সাক্ষাৎকার জন্য অসময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর উৎপীড়ন করিতেন। একবার উত্তরপাড়া হইতে কতকগুলি লোক তাঁহার বাদুড়বাগানের বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। উদ্দেশ্য,—চাকুরী প্রার্থনা। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা সাংঘাতিক-রূপে পীড়িতা ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপরে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। এমন অবস্থায় উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। সেই সময়ে ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু মহাশয় নীচে একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনের অবস্থা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সময়ান্তরে আসিতে বলেন। তাঁহারা তাঁহার কথা শুনিলেন না ; অধিকন্তু চাকরের দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংবাদ পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া পাঠান,—"অদ্য আমার মন বড়ই চঞ্চল। কন্যার কাছ-ছাড়া হইতে পারি না, আপনারা অন্য দিন আসিবেন।" লোক-কয়টী এ কথা না মানিয়া উপরে যাইবার জন্য সিঁড়ির উপরে উঠিলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় উপর হইতে নামিয়া আসিয়া একটু বিরক্তি সহকারে বলিলেন,—"আপনারা বড়ই গরজ বুঝেন। আপনাদের কি দয়া-মায়া নাই ? অদ্য যাউন, আর একদিন আসিবেন।" তখন লোকগুলি অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া যান।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর এইরূপ উৎপীড়ন প্রায়ই হইত। তিনি বলিতেন,—"উৎপীড়ন প্রায়ই হইত বটে ; কিন্তু উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছি।"

এই সময়ে দেবোত্তর বিষয়ের হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে আইন করিবার বিল হয়। সরকার বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে

পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত পত্রে নিম্নলিখিত রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পত্র ইংরেজিতে লিখিত লইয়াছিল, এইখানে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশিত হইল,—

আর বি চ্যাপমান স্কোয়ার,
বোর্ড অব্ রেভিনিউ আপিসের সেক্রেটরি মহোদয় সমীপেষু—
মহাশয়।

আপনি গত ১৮ই জুলাই তারিখে ৬৫৬ নং বি নং পত্রে আমার যে মন্তব্য চাহিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে,—

১ হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রে দেবোত্তর সম্পত্তির বিক্রয় বা প্রতিকূলে কোন প্রকার প্রমাণ-বাক্য দৃষ্ট হয় না, কিন্তু দেশের চিরন্তন পদ্ধতি, এরূপ সম্পত্তির কোন প্রকার হস্তান্তরের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। বস্তুতঃ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেই যখন ঈদৃশ দেবোত্তর সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদিগের তখন প্রধান উদ্দেশ্য এই থাকে যে, এরূপ সম্পত্তি ভবিষ্যতে যেন কোন প্রকারে হস্তান্তরিত না হয় ও চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। এরূপ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা উক্ত প্রকার সম্পত্তি-সংক্রান্ত কতকগুলি নিয়মের নির্দ্দেশ করিয়া দেন। উক্ত সম্পত্তির ট্রষ্টিরা (অধ্যক্ষেরা) তন্নিমিত্ত ঈদৃশ সম্পত্তি কোন প্রকারেই হস্তান্তর বা বিক্রয়াদি করিতে সমর্থ হন না। যদিও এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সুস্পষ্টবিধি হিন্দুশাস্ত্রে লক্ষিত হয় না, তথাপি হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্রের ঈদৃশ সম্পত্তির হস্তান্তর কোন ক্রমেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে কোন প্রকার হস্তান্তর উক্ত সম্পত্তির মালিকের স্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত একেবারেই অসিদ্ধ। যে দেবতার উদ্দেশ্যে দেবোত্তর সম্পত্তির সৃষ্টি হয়, তিনিই আইনানুসারে উক্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক, সুতরাং দেবতার সম্মতি ব্যতীত উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর বা বিক্রয়াদি আদৌ সম্ভবপর নহে। দেবতার নিকট হইতে তাদৃশ সম্মতিগ্রহণ একেবারেই অসম্ভব, সুতরাং দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর কোন মতেই আইনসঙ্গত নহে।

২. দেবোত্তর সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে ট্রষ্টিদিগকে যে প্রকার সময়ে সময়ে কষ্টে পড়িতে হয়, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে, যে কখন কখন সম্পত্তির বন্দোবস্তের জন্য ট্রষ্টিদিগকে দায়গ্রস্ত হইতে হয় ও সম্পত্তির সামান্য আয় হইতে সেরূপ ঋণ পরিশোধ করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্তই দুরূহ হইয়া উঠে। কারণ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় যে, দেবোত্তর সম্পত্তির অনুষ্ঠাতৃগণ উক্ত সম্পত্তির আয় এরূপভাবে

স্বকীয় ব্যয় সঙ্কুলনার্থ প্রয়োগ করেন যে, তাহা হইতে যৎসামান্য অংশমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাহাও মন্দির-সংস্কার, গবর্ণমেণ্ট দেয় রাজস্ব প্রদান (অর্থাৎ যে বৎসর অনাবৃষ্টি ও বন্যা প্রভৃতি কারণবশতঃ প্রজাদিগের নিকট হইতে কর অনাদায় থাকে) প্রভৃতি অতিরিক্ত ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পর্য্যাপ্ত হয় না। ট্রষ্টিরা যে ঈদৃশ অবস্থায় নিজের তহবিল বা সংগৃহীত চাঁদা হইতে উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা কোন মতেই আশা করা যাইতে পারে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আইনের বিধি নিতান্তই আবশ্যক এবং এই কারণবশতঃ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের পাণ্ডুলিপির ১ ধারা অনুসারে যদি এরূপ কোন বিধি স্পষ্টতঃ নির্দ্দিষ্ট হয় যে, দেবোত্তর সম্পত্তির কোন প্রকার বন্দোবস্ত লব্ধ আয় উক্ত সম্পত্তিসংক্রান্ত অতিরিক্ত ব্যয়নির্ব্বাহ ভিন্ন অন্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারিবে না, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এরূপ উদ্দেশে দেবোত্তর সম্পত্তির কোন প্রকার হস্তান্তর আমার সামান্য বিবেচনায় হিন্দুব্যবহার শাস্ত্রের বিরোধী নহে। সকল প্রকার দেবোত্তর সম্পত্তির সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, উহার কোন প্রকার "তছরূপ" যাহাতে না ঘটে। উপরোক্ত অতিরিক্ত ব্যয় দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষার জন্যই প্রয়োজন হয়; সুতরাং ঈদৃশ অবস্থায় কোন ক্রমেই ইহা "তছরূপ" শব্দে অভিহিত হইতে পারে না। অধিকন্তু দেবতা যদি বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইতেন. তাহা হইলে তিনি আপন সম্মতি প্রদান করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইতেন না; বরং এরূপ সঙ্কটে সম্পত্তির হস্তান্তরকরণের পক্ষে তিনি বিশেষ যত্নবান্ হইতেন।

৩. যে অবস্থায় দেবোত্তর সম্পত্তির হস্তান্তর সম্যক্ উচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা উপরে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইল। কিন্তু উপরোক্ত পাণ্ডুলিপির ২ ধারাতে ট্রষ্টিদিগকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আমার বিবেচনায় নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। তাহাতে এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, দেবোত্তর সম্পত্তির বিক্রয় বা বন্ধকদানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, তাহার অনু-সন্ধানের কোন আবশ্যকতা নাই। কিম্বা বিক্রয় ও বন্ধক দ্বারা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সংগৃহীত হইতেছে কি না, তাহারও দেখিবার প্রয়োজন নাই। ট্রষ্টিদিগের এরূপ অসংযত ক্ষমতা এবং ক্রেতা ও বন্ধকগৃহীতাদিগের সম্বন্ধে সকল প্রকার দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলে দেবোত্তর সম্পত্তির বহুবিধ "তছরূপ" নিতান্ত সম্ভবপর হইবে। তাহার বিরুদ্ধে প্রতীকার নিতান্তই আবশ্যক। আমার অনুমান হয়, অপরাপর সম্পত্তির হস্তান্তর সংক্রান্ত ঈদৃশ আইনাদি প্রচলিতআছে যে, উক্ত সম্পত্তির ক্রেতা বা বন্ধকগৃহীতাদিগকে সম্পত্তির

হস্তান্তরে বাস্তবিক প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত অনেক অনুসন্ধান করিতে হয়। অপরাপর ট্রাষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় বা হস্তান্তর আইনসিদ্ধ কি না, ইহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হয় যে, উক্ত প্রকার হস্তান্তর দ্বারা সম্পত্তির কোন মঙ্গল সাধিত হইয়াছে বা কোন প্রকার আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তির বিক্রয় বা হস্তান্তর সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়মাদি পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, কেন বুঝিতে পারিলাম না। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করিতেছি, ২য় ধারা এরূপভাবে লিখিত হয় যে, ভবিষ্যতে সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষয় বা "তছরূপ" একেবারে অসম্ভব হয়। উক্তরূপ প্রতিবিধানগুলি বিনষ্ট হইলে পাণ্ডুলিপি লিখিত আইনটী হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রের বিরোধী বা সাধারণ হিন্দু-সমাজের মনক্ষোভের কারণ হইবে না।

কলিকাতা,
৭ই আগষ্ট, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ } (স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বলা বাহুল্য দেবোত্তর সম্পত্তি-হস্তান্তর-করণ সম্বন্ধে কোন আইন পাশ হয় নাই।

১২৭৩ সালের ২রা পৌষ বা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্ কারপেনণ্টারকে* সঙ্গে লইয়া, উত্তরপাড়ায় বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ গমন করেন। তাৎকালিক শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর আটকিন্সন্ সাহেব এবং স্কুল-ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে সকলেই গাড়ী করিয়া ফিরিয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী ভদ্র লোকের সহিত একখানি বগী করিয়া আসিতেছিলেন। গাড়ী চড়িবার সময় তিনি সঙ্গী ভদ্র লোকটীতে বলেন, "বাপু আমি কখনও বগী চড়ি নাই; হাঁকাইও নাই; দেখো সাবধানে হাঁকাইও।" ভদ্র লোকটী অবশ্য তাঁহাকে খুবই আশা-ভরসা দিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গাড়ীখানি কিছুদূর আসিয়া মোড় ফিরিবার সময় একেবারে উল্টাইয়া পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া যান। তাঁহার যকৃতে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। মিস্ কারপেণ্টার তাঁহাকে বুকে তুলিয়া, আপন রুমাল ছিঁড়িয়া,

* ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া শিক্ষা-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় ইনি ভারতে আসিয়াছিলেন। বৃষ্টলে ইঁহার পিতা পাদরী কারপেণ্টার সাহেবের গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়, তখন ইনি বালিকা।

ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারও উড্রো সাহেবের শুশ্রূষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় চৈতন্য লাভ করেন। পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া অনেক কষ্টে কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ বাসায় ফিরিয়া আসেন। এই দৈব-দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া, তাঁহার বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে দেখিতে যান। পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে নিজের বাটীতে লইয়া যান। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার চিকিৎসা করেন। ভয়ানক আঘাতে উরুদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। এক মাসের সুচিকিৎসায় তিনি এক রকম সারিয়া ওঠেন; কিন্তু যে কালরোগে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়, তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি এইখানে। চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁহার যকৃৎ উল্‌টাইয়া গিয়াছিল। এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ইহার পর তাঁহাকে প্রায়ই শিরঃ-পীড়া ও উদরাময় রোগ ভোগ করিতে হইত। পরিপাক-শক্তি হ্রাস হইয়া যায়; সুতরাং আহারও লঘু হইয়া পড়ে। দুগ্ধ সহ্য হইত না। প্রাতে মাছের ঝোল, ভাত এবং রাত্রিকালে বারলির রুটি, কখন কখন গরম লুচিমাত্র আহার ছিল। পরে তাহাও অসহ্য হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি রাত্রিকালে দুই এক গাল মুড়ি খাইয়া থাকিতেন তিনি প্রায়ই বলিতেন— বাল্যে পয়সার অভাবে দুগ্ধ খাই নাই; বয়সেও রোগের জ্বালায় তাহা হয় নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বমুখে শুনিয়াছি, উত্তরপাড়ার পতনের পর হইতে তাঁহার সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায়, চেষ্টা, নৈতকি ও আধ্যাত্মিক শক্তি যা কিছু সকলেরই হ্রাস হইয়াছিল। আর তিনি শোধরাইতে পারিলেন না। স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ প্রায়ই তাঁহাকে ফরাসডাঙ্গা, বর্দ্ধমান, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হইত। তবুও কিন্তু কার্যাবীরের কার্য্য বিরাম ছিল না।

পতনাঘাত হইতে কতকটা আরোগ্যলাভ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৬৭ সালের প্রারম্ভে বীরসিংহ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় এক সরীরা বিধবার আত্মীয়েরা তাঁহার জমি আত্মোসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই বিধবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া আপন দুঃখ জ্ঞাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার আত্মীয়দিগকে ডাকাইয়া আনিয়া জমি আত্মসাৎ করিতে নিষেধ করেন। তাঁহারা তাঁহার কথা শুনেন নাই। বরং তাঁহারা বিধবার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিধবার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন শুনিয়া তাঁহারা আর আদালতে উপস্থিত হন নাই।

এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহের বাটীতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করেন,—

মধ্যম ও তৃতীয় সহোদর এবং স্বীয় পুত্রের পৃথক পৃথক ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সকলেরই মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহার যেরূপ টাকার আবশ্যক, সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। এরূপ করিবার কারণ এই, একত্র অনেক পরিবার থাকিলে কলহ হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ বহু পরিবার একত্র অবস্থিতি করিলে সকলেরই সকল বিষয়ে কষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে ভগিনীদ্বয়ের পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদেশীয় যে সকল বালক বাটীতে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সমস্ত টাকা দিয়া পাচক ও চাকর দ্বারা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পুত্র নারায়ণের পৃথক্ বাটী প্রস্তুত হয়। এবং নিজের নিকট জননীদেবীর অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা হইল।*

এই ব্যবস্থায় হিন্দুর একান্নভুক্ত করিবার প্রথার বিরোধ প্রমাণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় একান্নভুক্ত পরিবার প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহা তাঁহার দোষ নহে, দোষ তাঁহার শিক্ষার। হিন্দুধর্ম্মের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না; হিন্দু সমাজের গঠনের মূল-তত্ত্বে এই জন্য তিনি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইতেন না। তিনি হিন্দুর যে সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই একান্নভুক্ত পরিবার প্রথার বিরুদ্ধাচরণে করাও সেই বিষয়ের পরিচয় দিতেছে। হিন্দুর সংসারে, সমাজে, অনেক সময় ব্যবহারিক সকল বিষয়ে পরমার্থতত্ত্বলাভের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকট ভাবে অন্তস্তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত হিন্দুর বাহ্য ব্যবহারের সৃষ্টি। একান্তভুক্ত-পরিবার প্রথা হিন্দু-সমাজ-গঠনে একটা প্রধান অঙ্গ—হিন্দুর যোগসাধনে—মোক্ষ-প্রাপ্তির প্রধান পথ। এক অপরের সহিত যুক্ত হইলে যোগ হয়। সমস্ত জগতের সহিত মিশিয়া যাওয়া, আপনাতে সমস্ত জগতের লয় করা, জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে আপনার সত্তা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা, হিন্দুর মুখ্য সাধন-পথ। গৃহে ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়,—প্রথম সূত্রপাত হইয়া একে একে,—অর্থাৎ হয়, গুরু-শিষ্যে না হয় স্বামী-স্ত্রীতে, না হয় পিতা-পুত্রে ইত্যাদি। দুই এক হইয়া দ্বিগুণ বললাভ করিলে অপর এক জনকে গ্রহণ করা অর্থাৎ আপন শক্তিতে মিশাইয়া লওয়া সহজ। এইরূপ দুই ও একে তিন হইলে তখন স্বচ্ছন্দে আর দুই জনকে

* বিদ্যারত্ন মহাশয় এই কথা লিখিয়াছেন। নারায়ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সবই সত্য; তবে কলহের সম্ভাবনা নহে, সত্য সত্যই কলহ ঘটিয়াছিল।

লওয়া চলে—তাহার সুখদুঃখে সুখীদুঃখী হওয়া যায়। যাহারা আত্মীয়, যাহাদের একই রূপ সংস্কারবশে একই বংশে জন্মে, তাহাদের সহিত এরূপ মিল সহজ এবং অধিকতর অল্পায়াসসাধ্য। তাই একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রথার সৃষ্টি।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভ্রাতার অভিমান, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা রাধাকান্ত, হিন্দু পেট্রিয়টে পত্র, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ, রামগোপাল ঘোষ, সারদাপ্রসাদ, ঘাটাল-স্কুল, রাণী কাত্যায়নী, ইন্‌কম্ ট্যাক্স ও হরচন্দ্র ঘোষ

নারায়ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, ভ্রাতারা মধ্যে মধ্যে জ্যেষ্ঠের উপর অভিমান করিয়া মাসহারা লইতেন না। এজন্য সময় সময় তাঁহাদের কষ্ট হইত। সে কষ্টের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে, তিনি বাটী গিয়া গোপনে গোপনে ভ্রাতৃবধূদের অঞ্চলে টাকা বাঁধিয়া দেওয়াইতেন।

১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বহুবিবাহ রহিত করণ সম্বন্ধে আইনের প্রত্যাশায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন হইয়াছিল। ফল হয় নাই।

১২৭৩ সালের ১৮ই পৌষ বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হয়। বেথুন স্কুলের সম্পর্কে ইঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেবারে বেথুন স্কুলে চিক পুরস্কার দেন, সেইবার ইনি সোনার বালা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

১২৭৪ সালে ১লা বৈশাখ, বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হয়। ইনি বিধবা-বিবাহের বিপক্ষবাদী ছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক দেনা ছিল বলিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্রে সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন বীরসিংহ গ্রামে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি এই কথা শুনেন, তখন তাঁহার সেই প্রশান্ত বারিধিবৎ হৃদয়ে যেন মুহূর্ত্তে বিষম বাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি তখনই তাহার একটা প্রতিবাদ করিয়া হিন্দু পেট্রিয়টে এক পত্র লিখেন। পত্রের মর্ম্ম এই,—

"বহু দিনের পর আমি বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম, বিধবা-বিবাহ-সংস্কারের জন্য অনেকগুলি টাকার ঋণ হইয়াছে বলিয়া চাঁদা তুলিয়া সেই ঋণশোধের নিমিত্ত একটা ফণ্ড স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে; বলা হইয়াছে, আমি সেই ঋণ করিয়াছি। শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেশী ইংরেজি সকল সংবাদপত্রেই এ কথা ব্যক্ত হইতেছে; লোকের মুখে মুখে এ কথা ঘুরিতেছে; তথাকথিত ঋণের একটা তালিকাও দেওয়া হইয়াছে।

"কাজেই, যত শীঘ্র সম্ভব, আমাকে প্রতিবাদ করিতে হইল। বলিতে হইল, আমার সম্মতি লওয়া তো দূরের কথা, এ প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে আমাকে একবার জানানও হয় নাই। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বলিতে হইল, না জানিযা শুনিয়া যে পঁয়তাল্লিশ হাজাব টাকা ঋণের কথা কথিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ঋণ তাহার অর্দ্ধাংশেরও অনেক অল্প; আর এই ঋণশোধের নিমিত্ত সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা আমার কখনই নাই। বিধবা-বিবাহ-সংস্কারের অনেক হিতৈষী অতি যৎসামান্য অর্থসাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় আমি সেই স্বেচ্ছাদত্ত অর্থসাহায্যে কখনও প্রত্যাখ্যান করি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে পীডাপীডি করা আমার নীতি-বিরুদ্ধ। কয়েকটী বন্ধুর অর্থসাহায্যে এবং যত অল্পই হউক আমার নিজ আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমি এতাবৎ এই সংস্কারের পথে চলিয়া আসিতেছি; এবং আশা আছে, এখনও এইরূপ চলিতে পারিব। উল্লিখিত কয়েকটী বন্ধু এবং স্বচ্ছায় যাঁহারা অর্থসাহায্য করিতেছেন, এমন কতকগুলি ব্যক্তি এ পক্ষে আমার সহায়। অনেক স্থলে ইঁহারা কথার মত কাজ করিয়াছেন এবং এখনও সাহায্যাদি করিতেছেন।

"ষাটটী বিধবা-বিবাহে বিরাশি হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। শুনিলাম এইজন্য কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা হিন্দুসমাজের অবস্থা জানেন, এক দলাদলির জন্যই এ পক্ষে কত অধিক টাকা ব্যয় হইতে পারে, তাহা বোধকরি, তাঁহারা অজ্ঞাত নহেন। মফঃস্বলের যে সকল গ্রামে বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অনেক স্থলেই এইরূপ দলাদলি; সুতরাং সহজেই প্রতীত হইতেছে, এরূপ স্থলের বিবাহ অবশ্যই কিছু ব্যয়সাপেক্ষ।

"প্রথম বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হয়,—কলিকাতা সহরে। এই প্রথম বিবাহে একটু ধূমধাম করা এবং পণ্ডিত কুলীনাদির বিদায়াদি দেওয়া সংস্কার-সমিতির সভ্যগণের মতে প্রয়োজনীয় বোধ হয়। তাই বহু কুলীন-ব্রাহ্মণাদি এ বিবাহে আহূত হইয়াছিলেন এবং বিদায়াদিও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। শুদ্ধ

এই একটী বিবাহেই দশ সহস্র টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, কিন্তু অতিব্যয়ের শুদ্ধ ইহাই কারণ নহে; মফঃস্বলে যাঁহারা এ সংস্কারের জন্য—বিধবা বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে নানারূপ অন্য বিপদে পড়িতে হইয়াছে; নানারূপ দেওয়ানী ফৌজদারী মামলায় তাঁহাদিগকে জড়িত হইতে হইতেছে; আহত প্রহৃত হইতে হইতেছে; কোথাও কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামাদিতেও লিপ্ত হইতে হইতেছে, ইহার প্রতিবিধান আদালত হইতেই করিতে হইতেছে। বলা বাহুল্য এ কার্য্য কখনই অনল্প-ব্যয়-সাপেক্ষ নহে।

"আমার সম্বন্ধে লোকে কিছু ভাবিবে বা আমাকে লোকে কেহ কিছু বলিবে, —এ ভয়ে আমি এই সকল কথা বলিতেছি না—বলিতেছি, এই বিধবা-বিবাহ-সংস্কার-কার্য্যে ইহা অনুকূল হইবে বলিয়া; তবে এতৎসম্বন্ধে ভাল ভাবিয়া কোন কাজ কবিতে গিয়া যদি মন্দ করিযা ফেলি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে দুঃখিত হইতে হইবে। যাঁহারা এই চাঁদা তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বিধবা-বিবাহ ফণ্ড খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহারা যদি আমার এই ঋণের কথা না পাড়িতেন, তাহা হইলে আমি প্রতিবাদ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতাম না কেন না পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি যাহা ঋণ করিয়াছি, তাহা শোধ করিবার জন্য সাধারণ সমীপে আবেদন করিবার ইচ্ছা আমার লেশমাত্রও নাই। যে জাতীয় অনুষ্ঠান লইয়া আমি এখন বুঝিতেছি, তাহা আমার নিজ ব্যক্তিত্ব লইয়া বড়ই জড়িত। তাই আমি উক্ত প্রচারিত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছি এবং যে সকল ভদ্রলোক এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিতেছি।

ইতি ২৬শে জুন, ১৮৬৭ খৃঃ (স্বাঃ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা"

১২৭৪ সালের শ্রাবণ বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর সহিত নদীয়া জেলার আইসমালী গ্রামবাসী গোপালচন্দ্র সমাজপতির বিবাহ হয়। কন্যা হেমলতা অতি বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মিষ্ঠা। জামাতা সমাজপতি মহাশয়ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোমত হইয়াছিলেন।

১২৭৩-৭৪ সালে বা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেকগুলি বন্ধু-বিয়োগ ঘটিয়াছিল। ১২৭৩ সালের ৯ই মাঘ বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি বেলা ১১॥ টার সময় রামগোপাল ঘোষের* মৃত্যু হয়। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

* "He was a warm advocate of widow marriage and assisted the noble cause with money as well as personal labour."—"Hindu Patriot," 27th January, 1868.

সুহৃদ্ ও সহায় ছিলেন। বিধবা-বিবাহ-ব্যাপারে ইঁহার বেশ সহানুভূতি ছিল। নিমতলায় কলে শবদাহ করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তেজনায় রামগোপালবাবু তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এই শবদাহ ব্যাপার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটীর প্রচার আছে,—

"কলে মৃত দেহের সৎকার হইবে শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মর্ম্মাহত হন। ইহা যাহাতে না হয়, তাহাই করিবার জন্য তাঁহার প্রাণান্ত পণ হইল। সহরের অনেক বড় বড় লোক কিন্তু ইহার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠিক করিলেন, এক রামগোপাল ঘোষই এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত লোক। তিনি তৎক্ষণাৎ রামগোপাল ঘোষের নিকট যাইয়া উপস্থিত হন। রামগোপাল প্রতিবাদ করিতে সম্মত হন নাই। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, রামগোপাল বড় মাতৃভক্ত; মায়ের কথা ঠেলিতে পারিবেন না; অতএব এ সম্বন্ধে তাঁহার মাকে দিয়া অনুরোধ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় রামগোপালের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার ঠাকুরদালানে বসিয়া থাকেন। সেই সময় রামগোপালের জননী গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী আসেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঈশ্বর! তুমি যে এখানে ব'সে?' বিদ্যাসাগর বলিলেন,—'মা! কলে মড়া পোড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে।' রামগোপালের জননী শুনিয়া অবাক্। বলিলেন,—'বাবা! এ ব্যবস্থা যাহাতে না হয়, তাহার উপায় কি নাই?' বিদ্যাসাগর বলিলেন,—'এক উপায় আছে। কাল টাউনহলে সভা করিয়া ইহার মীমাংসা হইবে। আপনার ছেলে যদি সভায় যাইয়া ইহাতে আপত্তি করে, তাহা হইলে এ ব্যবস্থা বন্ধ হইতে পারে।' রামগোপালের জননী বলেন—'তা যদি হয়, আমি এখনই রামগোপালকে বল্‌বো।' পরে তিনি বাড়ীর ভিতর গিয়া রামগোপালকে অনুরোধ করেন। রামগোপাল বাহিরে আসিয়া বিদ্যাসাগরকে বল্লেন,—'মাকে বলেছ কি ব'লবো, মার কথা ঠেলিবার নহে। ভাল, কাল তিনটার সময় এস, সভায় যাইব।' পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া রামগোপাল টাউন হলের সভায় গিয়া কলে শবদাহ করিবার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহার প্রতিবাদে প্রস্তাব রদ হইয়া যায়।"

১২৭৪ সালের ২৯শে ফাল্গুন বা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ বুধবার বর্দ্ধমান-চকদিঘীর জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহ রায়ের মৃত্যু হয়। সারদাবাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সারদাবাবু কোন বিষয়ে বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের মত না লইয়া চলিতেন না। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা উচিত কি না, একবার এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পোষ্যপুত্র লইতে নিষেধ করিয়া স্কুলস্থাপন, ডিস্পেনসারি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে সারদাবাবু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে চকদিঘীতে একটা ডাক্তারখানা এবং ১২৬৮ সালের ১৮ই শ্রাবণ বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই চকদিঘীতে এক দরিদ্র পরিবারকে বিদ্যাসাগর মহাশয় পনের টাকা করিয়া মাসহারা দিতেন। সারদাবাবুর মৃত্যুর পর তদীয় উইল সম্বন্ধে এক মোকদ্দমা হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সাক্ষী ছিলেন। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দারুণ ঋণভারগ্রস্ত, তবুও কিন্তু কাহাকেও অর্থসাহায্য করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলে, যেখান হইতে হউক তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করিতেন। এই সময় মেদিনীপুর-ঘাটাল অঞ্চলে একটী এনট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী স্কুল-স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিত হয়,—

ঘাটাল, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫ সাল

সবিনয় সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং,

অত্রস্থলে একটী এনট্রান্স পরীক্ষার পাঠোপযোগী সংস্কৃত সহিত ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি বটে; কিন্তু এতদ্দেশবাসী সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য না করায় সুতরাং সম্যক্ প্রেরিত ব্যক্তিগণের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। এই স্কুলগৃহটী প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ চারি হাজার টাকার আবশ্যক। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মার্টিন মহোদয় অনুমতি করিয়াছেন অগ্রে স্কুলবাটী প্রস্তুত করিয়া দিলে পশ্চাৎ গবর্ণমেণ্ট দুই হাজার টাকা দিবেন। কিন্তু এক্ষণে এককালীন দানের যেরূপ ফল দেখা যাইতেছে, ইহা সম্যক্ সংগ্রহ হইলেও প্রায় পনর শত টাকা মাত্র সংস্থান হইতে পারে। যদিও আমরা গবর্ণমেণ্টের ভাবী আনুকূল্যের প্রত্যাশায় ঋণের দ্বারায় দুই হাজার টাকা সংগ্রহের উপায় করিয়াছি, কিন্তু এ দিকে ঐ পনর শত ব্যতীত আর প্রত্যাশা নাই; কাজের এখন এ কাজটী নির্ব্বাহপক্ষে পাঁচ শত টাকার অনটন ঘটনা দেখা যাইতেছে। এই সঙ্কল্পিত কার্য্যটী সংসাধিত করিবার পক্ষে আমরা স্বতঃপরত সাহায্যের ক্রটী করি নাই। কিন্তু ঐ অনটন নিরাকরণ করা

আমাদিগের নিতান্ত সাধ্যাতীত হওয়ায় সুতরাং এক্ষণে একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত উপায়ান্তর উপলব্ধি হইতেছে না, অধুনা অস্মদীয় কামনা এই যে, সেই মহাপুরুষ প্রসন্ননেত্রে এ দেশের প্রতি কটাক্ষ করতঃ উল্লিখিত অনটন বিমোচন করিয়া স্বীয় নাম ও গুণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করুন, নিবেদন ইতি।

(স্বাঃ) শ্রীতারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকেদারনাথ হালদার।

ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সাহায্যদানে কি অসম্মত হইতে পারেন? হাত পাতিয়া কেহ তো প্রায় রিক্তহস্তে ফিরিত না; বিশেষ ইংরেজি শিক্ষার প্রসারকল্পে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া সাহায্যদানে সম্মতি প্রকাশ করেন,—

সবিনয়ং সবহুমানং নিবেদনম্

আপনারা অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমায় যে পত্র লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা সমস্ত অবগত হইলাম আপনাদিগের উদ্যোগে ঘাটালে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে উহার গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে পাঁচ শত টাকার অনটন আছে আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন তজ্জন্য অন্য চেষ্টা দেখিবার আর প্রয়োজন নাই কিন্তু আগামী শারদীয় পূজার পূর্ব্বে এই টাকা আপনাদিগের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প বোধ করি এই বিলম্ব বিশেষ ক্ষতিকর বা অসুবিধাজনক হইবেক না শ্রাবণ মাসের শেষভাগে আমার বাটী যাইবার কামনা আছে। যদি যাওয়া হয় সাক্ষাতে সবিশেষ নিবেদন করিব কিমধিকমিতি ২৪ আষাঢ় ১২৭৫ সাল *

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ

(স্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

মাননীয় শ্রীযুক্ত এল এস উরনবুল স্কোয়ার
শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ হালদার } মহাশয় মদনুগ্রাহকেষু, ঘাটাল

ইহার পর যথাসময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহায্য-দান করিয়াছিলেন।

২৭৫ সালের ৩রা ভাদ্র বা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট পাইকপাড়ার বৃদ্ধা রাণী কাত্যায়নী দেহ ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা ইনি কিরূপ উপকার পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

* শুনিতে পাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাঙ্গালায়, প্রভৃতি বিরামচিহ্নের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল পুস্তকেই ইহার ব্যবহার দেখিতে পাই, কিন্তু পত্রাদিতে প্রায় দেখা যায় না। এ পত্রেও আদৌ কোন চিহ্ন নাই

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ইন্‌কম্ ট্যাক্‌সের অসহ্য কর নির্দ্ধারণে প্রপীড়িত হইয়া অনেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাগত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে কথা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে বিদিত করেন। তাঁহার অনুরোধে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বর্দ্ধমানের তদানীন্তন কমিশনর হারিসন সাহেবকে ইনকম্ ট্যাক্‌সের তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত করেন! তথ্যানুসন্ধানে নির্ণীত হয় যে, প্রকৃত পক্ষে অন্যায়রূপে কর নির্দ্ধারিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দুই মাস কাল অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এ তদন্ত-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় তিন সহস্র টাকার ব্যয় হইয়াছিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ "আখ্যানমঞ্জরী" প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহাতেও বৈদেশিক চরিত্রের সমাবেশ। ভাষা বাঙ্গালী স্কুল-পাঠকের সম্পূর্ণ উপযোগী।

১২৭৬ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতার ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়। ইনিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। ১২৭৬ সালের ২১শে পৌষ বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু জন্য শোক-চিহ্ন প্রকাশার্থ একটী সভা হইয়াছিল। তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন নির্দ্ধারণার্থ এই সভাতে যে 'কমিটী' হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই কমিটীতে ছিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ছাপাখানার সত্ত্ব, মনোবেদনা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, বর্দ্ধমানে বিদ্যাসাগর, ঋণের জন্য ঋণ ও বিধবা-বিবাহে লাঞ্ছনা

একদিন বিদ্যাসাগর মহায়য়ের পুত্র নারায়ণবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেন,—"বাবা! মেজখুড়ো ছাপাখানার বখরা চাহিতেছেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিয়া অবাক্ হইলেন। পরে তিনি মধ্যম ভ্রাতাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"ভাই! শুনিয়াছি, তুমি ছাপাখানার ভাগ চাহিতেছ। ভাল তাহাই হইবে। দেনা পাওনা দেখ, মধ্যস্থ মান।" অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথ মিত্রকে এবং দুর্গামোহন দাসকে মধ্যস্থ মানিলেন।

এ সালিসিতে রাজকৃষ্ণবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয়ানুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং তদীয় পিতৃব-পুত্র পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সাক্ষী মানা

হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ষষ্ঠানুজ ঈশানচন্দ্র ছাপাখানার অংশে দাবী করেন নাই। সাক্ষ্য দিতে হইবে বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ছাপাখানার দাবী পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন*। ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদ্যারত্নের অনুরোধে দাবী পরিত্যাগ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন ছাপাখানার অংশে দাবী পরিত্যাগ করেন,তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনাকে লইয়া চারিভাই ও পিতা মাতা এই কয়জনের নামে ছয়ভাগে ছাপাখানার অংশ করিতে চাহিয়াছিলেন। পরে সালিসীতে ধার্য্য হয়, ছাপাখানায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সম্পূর্ণ সত্ত্ববান্। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিন ভ্রাতা বিদ্যমান ছিলেন,—দ্বিতীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, তৃতীয় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং ষষ্ঠ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম ভ্রাতা ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেহান্তর হয়। ইনি পণ্ডিত ও পরোপকারী ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য আত্মীয়ের সতত শুভ কামনা করিতেন। তাঁহাদের মঙ্গল চেষ্টায় তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হইত। সকলকেই তিনি সাধ্যানুসারে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন ; কিন্তু তিনি প্রায়ই দীর্ঘশ্বাসে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতেন,—"সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পারিলাম না। আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।"

এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ইনি এই চিকিৎসার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ১৮৬৬ সালে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্ বেরিণী সাহেব কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। কলিকাতার বহুবাজার নিবাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বেরিণী সাহেবের বেশ সংপ্রীতি হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক শিক্ষানুশীলনে কতকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন। বেরিণী সাহেবের সহায়তায় তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসামতে রাজেন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিরঃপীড়া আরাম করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে রাজকৃষ্ণবাবু নিদারুণ মলকৃচ্ছতা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবুকে মলত্যাগ করিবার সময় ফিচকারী ব্যবহার করিতে হইত। ফিচকারী ব্যবহারে কঠোর মল অতিকষ্টে নির্গত হইত , এবং তাঁহার দুই জানুদয় রক্তস্রাবে ভাসিয়া

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত "ভ্রমনিরাস" নামক পুস্তকে এই কথার উল্লেখ আছে।

যাইত। এ হেন রোগ কেবল হোমিওপ্যাথিকের বিন্দুপানে আরাম হইল দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতঃপর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ে তিনি সবিশেষ মনঃসংযোগ করেন। ইহাতে কতকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি অনেকের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার পরামর্শে তদীয় মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়াছিলেন। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তখন এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপর তাঁহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। তিনি প্রায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নিন্দা করিতেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মহেন্দ্রবাবু হাইকোর্টের জজ পীড়িত অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় গাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে মহেন্দ্রবাবুর ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়াছিল। শেষে মহেন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শিরোধার্য্য করিয়া বলেন,—"আমি এক্ষণে আর হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিব না; তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ইহার কি গুণ।" পরীক্ষায় তিনি হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ক্রমে অল্পদিনের মধ্যে ঐ চিকিৎসায় তিনি যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহার যশঃপ্রভায় বেরিণীর প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছিল। এ দেশের লোক প্রায় বেরিণীকে না ডাকিয়া মহেন্দ্রবাবুকেই ডাকিতেন। মহেন্দ্রবাবুরই উপর সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ১৮৬৯ সালে বেরিণী সাহেবকে শূন্য পকেটে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"কত সাহেব এ দেশে আসিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় পকেট ভরিয়া টাকা লইয়া যান, আপনি কিন্তু রিক্ত পকেটে ফিরিতেছেন।" এতদুত্তরে বেরিণী সাহেব বলিয়াছিলেন,— "আমি পাঁচ হাজার টাকা পকেটে পূরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

রাজেন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"সে কিরূপ?"

উত্তর হইল—"মহেন্দ্র যে হোমিওপ্যাথিকের পক্ষপাতী হইয়াছে, ইহারই মূল্য পাঁচ সহস্র টাকা।"

এই সময় গোবরডাঙ্গার জমিদার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতার ঝামাপুকুর নিবাসী রাজা দিগম্বর মিত্র হোমিওপ্যাথিকের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইহার ছয়-সাত বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার অতি উৎকট পীড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরাম হইয়াছিল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা

হার মানিয়াছিল। ইহাতে হোমিওপ্যাথিকের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধিকতর ভক্তি হইয়াছিল। তিনি এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নশীল হন। শববিচ্ছেদ শিক্ষা ভিন্ন চিকিৎসা-বিদ্যা ব্যর্থ হয় বলিয়া, তিনি কতকগুলি নরকঙ্কাল ক্রয় করিয়াছিলেন। সুকিয়া ষ্ট্রীট নিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁহাকে এতদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরে এই সব নরকঙ্কাল রাজকৃষ্ণ-বাবুর পুত্রকে দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি বহুসংখ্যক হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সব পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। এই লাইব্রেরীতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ব্যতীত প্রায় লক্ষাধিক টাকার অন্য পুস্তক আছে। তেমন সুন্দর বিলাতী বাঁধান পুস্তক আর কোন পুস্তকালয়ে আছে কি না সন্দেহ। পুস্তকালয় তাঁহার জীবনাবলম্বন বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। অধ্যয়ন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এক মুহূর্ত্ত তিনি পুস্তক ব্যতীত থাকিতেন না। এমন কি একবার তাঁহার প্রিয়পাত্র স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি পুস্তক চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে লাইব্রেরীর পুস্তক না দিয়া নূতন পুস্তক কিনিয়া আনিয়া দেন*। একবার তাঁহার একটী ধনাঢ্য বন্ধু লাইব্রেরীর বাঁধান পুস্তক দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি পাগল! এত টাকা খরচ করিয়া বিলাত হইতে এ সব পুস্তক বাঁধাইয়া আনিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার উত্তরে বলেন,—"একগাছি দড়ি দিয়া আপনি ঘড়িটী বাঁধিয়া রাখিতে পারেন; তবে এত টাকার সোনার চেইনের প্রয়োজন কি? কম্বল গায়ে দিতে পারেন; শাল গায়ে দিয়েছেন কেন? পাগল আপনিও তো।"

উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যাইবার পর স্বাস্থ্যলাভার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় ফরাশডাঙ্গায় যাত্রা করেন। সেখানে কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইতে হয়। বর্দ্ধমানে যাইয়া তিনি পরম মিত্র প্যারিচাঁদ মিত্রের বাড়ীতে থাকিতেন। প্যারিচাঁদ মিত্র জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন †।

* এই কথাটী ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

† প্যারিচাঁদবাবু কলিকাতা-পটলডাঙ্গায় শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের ভগিনীপতি ছিলেন। শ্যামাচরণবাবুর ভগিনী অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্যারিচাঁদবাবুকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে হয়। প্রথমা পত্নী গত হইলেও প্যারিচাঁদবাবু শ্যামাচরণবাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত মনে করিতেন। শ্যামাচরণবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদয় বন্ধু। এই সূত্রে প্যারিচাঁদবাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুত্ব হয়।

প্রণয়-সম্ভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারিচাঁদবাবু হরি-হর আত্মা। উভয়েই যেন এক পরিবারভুক্ত। বর্দ্ধমানেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান ও দয়ার কার্য্য অবিশ্রান্তভাবে চলিত। তাঁহার নাম শুনিলে অনেক দীন-দরিদ্র তাঁহার নিকট আগমন করিত। তিনি যাহার যেরূপ অভাব বুঝিতেন, তাহাকে সেইরূপ দান করিতেন। দানে তাঁহার জাতিবিচার ছিল না। অনেক দরিদ্র মুসলমান তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়া গুরুতর দায় হইতে মুক্ত হইত। বর্দ্ধমান হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় বীরসিংহ গ্রামে যাতায়াত করিতেন। সেই সময় যত দীন-দরিদ্র বালক, তাঁহার পাল্কী ধরিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। তিনি কাহাকেও মিঠাই, কাহাকেও পয়সা, আর কাহাকেও বস্ত্র দান করিতেন। দয়ালু বিদ্যাসাগর যাইতেছেন শুনিলে, সাহায্য-কামনা না থাকিলেও তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য শত শত লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত।

ঋণ-পরিশোধ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। হিন্দু পেট্রিয়টে বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ পায়, তাঁহার দেনা কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা। দেনা হইয়াছিল, প্রকৃত অর্দ্ধলক্ষাধিক টাকা। পত্র লিখিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দেনা শুধিয়াছিলেন*। এক্ষণে অবশিষ্ট ঋণ-পরিশোধের গত্যন্তর না দেখিয়া, তিনি মুরশিদাবাদের মহারাণী স্বর্ণময়ীর সরকার হইতে ঋণ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মহারাণীর পরিবারের সহিত ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এ কথা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাণী মধ্যে মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আবশ্যক মত টাকা ধার দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও যথাসময়ে পরিশোধ করিতেন। ১২৭৬ সালের ২০শে কার্ত্তিক বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া মহারাণীর সরকার হইতে টাকা ধার চাহিয়াছিলেন,—

শুভাশিষঃসন্তু—

সাদরসম্ভাষণমাদনম্—আপনি অবগত আছেন বিধবা-বিবাহ কার্য্যোপলক্ষে আমি বিলক্ষণ ঋণগ্রস্ত হইয়াছি ঐ ঋণের ক্রমে পরিশোধ করিতেছি। দুই ব্যক্তির নিকট কিছু অধিক ঋণ আছে তাঁহারা ক্রমে লইতে সম্মত নহেন এককালে টাকা পাইবার জন্য ব্যস্ত করিতেছেন এককালে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করি তাহার সুযোগ নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও কোন ক্রমে চলিতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তিনি দয়া করিয়া আমাকে সাত হাজার পাঁচশত

* শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এ কথা বলিয়াছেন।

টাকা ধার দেন। একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিব এবং তিন বৎসরে পরিশোধ করিব। এই ঋণ নিয়মিত সময়ে পরিশোধ করিতে পারিব সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই; সন্দেহ থাকিলে কখন আমি এরূপে ধার চাহিতাম না। আপনকার সাহায্য ব্যতিরেকে আমার এই প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অসন্দিগ্ধচিত্তে সহায়তা করিবেন। এই সহায়তা করিয়া আপনাকে কখনও অপ্রস্তুত হইতে হইবেক না; আমি এত অসম্ভ্রান্ত ও অপদার্থ লোক নহি যে পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি ঋণ করিতেছি অথচ পরিশোধ বিষয়ে অযত্ন করিব কিংবা নিশ্চিন্ত থাকিব আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ যতদিন জীবিত ও সহজ অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধার পাইতাম এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতাম। এক্ষণে এখানকার কোন ধনীর সহিত আমার এরূপ আত্মীয়তা নাই যে টাকা ধার চাহিতে পারি। আপনি না থাকিলে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকটেও ধার চাহিতে পারিতাম না। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয় দয়া করিয়া তাহা করিতে হইবেক। না করিলে আমি অপমানিত ও অপদস্থ হইব এই বিবেচনায় যাহা উচিত তাহা করিবেন। অত্যন্ত অসুবিধায় না পড়িলে আমি কদাচ শ্রীমতীকে ও আপনাকে এরূপে বিরক্ত করিতে উদ্যত হইতাম না জানিবেন; অগ্রহায়ণ মাসে আমার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা ধার করিয়া দিলে আর পূর্ব্ববৎ বার্ষিক সাহায্য করিতে হইবেক না। শ্রীমতী আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ঐ সকল উপকার আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি যে তাঁহার যথার্থ গুণগ্রাহী ও আশীর্ব্বাদক অনতিবিলম্বে তাহার পরিচয় দিব।

আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি। আপনার নিজের ও রাজধানীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২০শে কার্ত্তিক ১২৭৬ সাল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পত্র লিখিয়া টাকা পাইয়াছিলেন এবং যথাসময়ে তাহার পরিশোধ করিয়াছিলেন।

কেবল মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে কেন, আরও অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতেও ঋণ করিতে হইয়াছিল। পাইকপাড়ার রাজ-পরিবারের কোন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ

লইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ চকদিঘীর উইল সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন।

মফঃস্বলে বিধবা-বিবাহ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য ব্যয় অধিক হইত। সেই জন্য ঋণটা বেশী হইয়াছিল হিন্দু পেট্রিয়টে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা লিখিয়াছিলেন। কেবল অর্থব্যয় নহে; প্রকৃতই মফঃস্বলের জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। মফঃস্বলে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীদিগের তাড়না ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। জাহানাবাদ মহকুমার চন্দ্রকোণা থানার অন্তবর্ত্তী কুমারগঞ্জে বিধবা-বিবাহের পক্ষ ও বিপক্ষদের এক সময় খুব সংঘর্ষণ চলিয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে ইংরেজিতে এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই,—

"কুমারগঞ্জে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী দলকে চড়ক পূজায় শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে পক্ষপাতীদের পক্ষ হইতে জাহানাবাদের ডিপুটী ম্যাজিষ্টরকে আবেদন করা হইয়াছিল। তিনি তদন্তের হুকুম দেন। তদন্ত হইয়াছিল, উৎসব সাঙ্গ হইবার পর। জমিদার বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীদিগকে প্রহার করিয়া জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। অনেকেই সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করে। পুলিসে সংবাদ দিলেও, পুলিস তদন্তে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন।"

এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্পষ্টতঃই লিখিয়াছিলেন—

"যদি উৎপীড়ন নিবারণ হয়, যদি অত্যাচারী দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে আমার এ পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে আমার জীবন-ব্রতের উদ্যাপন হইবে কিসে? এ ব্রতসাধনেই তো আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। যদি ব্রত সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে জীবন বৃথা।"

ত্রিংশ অধ্যায়

পাচকের অপরাধ, বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়া ও দানে কৌতুক

হরকালী চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় রন্ধন করিত। বর্দ্ধমানেও তাহার উপর রন্ধন করিবার ভার ছিল। একবার বর্দ্ধমানের বাসা হইতে কোন একটী স্ত্রীলোক অনেকবার টাকা কাপড় লইয়া গিয়াছিল। হরকালী তাহাকে বলে—"মাগী তোরা কি বিদ্যাসাগরকে লেদা আম পেয়েছিস্।" বিদ্যাসাগর মহাশয় একথা শুনিয়া হরকালীর উপর বড়ই বিরক্ত হন। হরকালী

ক্ষমা প্রার্থনা করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দুই টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে বিদায় দেন।

এ অতীব অবিশ্বাস্য বিবরণ আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা। তিনি এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তবে একবার একটা দোষ করিয়া দীনহীন অনুগত ভৃত্য কাতর কণ্ঠে ক্ষমা চাহিলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, একথা বিশ্বাস করিতে সহজে কাহার প্রবৃত্তি হইবে বল, তবে ঘটনা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে।

কাহাকেও কোন দোষের জন্য ভৎর্সনা করিলে সে যদি কোপ প্রকাশ বা উত্তর-প্রত্যুত্তর করিত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইতেন, এমন কি তাহার সহিত আর বাক্যালাপও করিতেন না। কেহ যদি ভৎর্সিত হইয়াও নীরব থাকিত বা ক্ষমা চাহিত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অবসরক্রমে তাহাকে সান্ত্বনা করিতেন। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রাভ্যাস। সেই জন্য প্রাগুক্ত ঘটনা সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর ভাঙ্গিয়াছে। রোগে দেহযষ্টি ক্ষীণবল হইয়াছে; তবুও কিন্তু কার্য্যের বিরাম নাই। বর্দ্ধমানে আবার কঠোর কার্য্যকারিতার প্রয়োজন হইল। ১৮৬৮ সালে বর্দ্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের সংহার-মূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ-দৃশ্যে যাঁহার করুণ বুক বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহাতে অবিশ্রান্ত শোণিত-স্রোত ছুটিয়াছিল; আজ বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়ায় কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? সংবাদপত্রে কোটি কণ্ঠের কাতর ক্রন্দন উত্থিত হইল। রোগে ত্রাহি ত্রাহি; কিন্তু চিকিৎসা করিবার লোক নাই। দারুণ দুন্দুভিনাদে সংবাদপত্রসমূহে এ সাংঘাতিক সংবাদ বিঘোষিত হইতে লাগিল, সে সময় কি যে মর্ম্মান্তিক হুলস্থূল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল তাৎকালীন সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই তাহা বলিতে পারেন। সেই মহামারী ব্যাপার বর্ণনাতীত। হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক সে লোকক্ষয়কর কাণ্ডের প্রতিকার প্রত্যাশায় মুহুর্মুহু চীৎকার করিয়া, গবর্ণমেণ্টের চিত্তাকর্ষণ করিতে তিলমাত্র ত্রুটী করেন নাই।

স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় রোগীদিগের চিকিৎসার্থ "ডিস্পেন্সারি" স্থাপন করিয়াছিলেন। ঔষধ-পথ্যের যথারীতি ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া ম্যালেরিয়ার সেই ভীষণ সর্ব্বনাশকারিতার সংবাদ তাৎকালিক ছোটলাট গ্রে সাহেবের কর্ণগোচর করেন। গ্রে সাহেব বাহাদুরও

সবিশেষ তথ্য নির্দ্ধারণার্থে প্রবৃত্ত হন। তথ্য-নির্ণয়ে অবশ্য কালবিলম্ব হইল না। সাহায্যের আবশ্যকতা বিবেচনায় স্থানে স্থানে ডিস্পেন্সারি খোলা হইল। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পীড়িত ব্যক্তিগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ডিস্পেন্সারি" হইতে ঔষধ, পথ্য ও পয়সা পাইত। তিনি প্রায় দুই সহস্র টাকার বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নামের প্রত্যাশায় এ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু তৎকালে হিন্দু পেট্রিয়ট, প্রমুখ সংবাদপত্রে তাঁহার নামে একটা আকাশভেদী জয়জয়কার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল*।

এই সময় প্যারিচাঁদবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক সাহায্য করিতেন। তাঁহার উপর "ডিস্পেন্সারি"র সম্পূর্ণ ভার ছিল। কুইনাইন বড় মূল্যবান্, অথচ রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল। এইজন্য গঙ্গানারায়ণবাবু পরামর্শ দেন যে, কুইনাইনের পরিবর্ত্তে "সিঙ্কোনা" ব্যবহার করা হউক। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"গরীবের রোগ বলিয়া, প্রকৃত ঔষধ ব্যবহার করিবে না; এও কি কখন হয়? দুঃখী ধনী সবারই প্রাণ তো একই; পরন্তু রোগও এক।" গঙ্গানারায়ণবাবু বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বে ডুবিয়া গেলেন; যে সব রোগী ঔষধ লইবার জন্য "ডিস্পেন্সারি"তে আসিতে পারিত না, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের বাড়ীতে গিয়া স্বয়ং ঔষধ-পথ্য দিয়া আসিতেন।

প্যারিচাঁদবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণের প্রিয়তম সুহৃদ্। মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গ বিদ্যাসাগরের সেই সাদর স্নেহে বঞ্চিত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তাঁহারা চিরকৃতজ্ঞ। প্যারিচাঁদবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র এখন মুন্সেফ এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র জজ আদালতের সেরেস্তাদার। বঙ্গবাসী কলেজের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু তাঁহার জামাতা। গিরিশবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ছিলেন। এখনও উভয় সংসারে পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব বিদ্যমান আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই গিরিশবাবুর নিকট আপন জীবনের গল্প করিতেন।

বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য এবং প্যারিচাঁদবাবুর সহিত সৌহার্দ্দ্য জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক সময় বর্দ্ধমানে যাইতে হইত। বর্দ্ধমানের দুঃস্থ দরিদ্রমাত্রেই বিদ্যাসাগরকে দয়ার সাগর ও দাতা বলিয়া চিনিত। তিনি ট্রেন হইতে ষ্টেশনে নামিলেই তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। একবার একটী দীন-হীন মলিন বালক তাঁহার নিকট একটী পয়সা ভিক্ষা চাহে।

* "Hindu Patriot", 1869

তাহার কঙ্কালসার জীর্ণ শীর্ণ-দেহ ও ধুলি-ধূসরিত মলিন মুখখানি দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়াছিলেন। তাহার দারিদ্র্য-মালিন্য-ক্লিষ্ট মুখে কি যেন একটু জ্যোতিঃপ্রভা মিশ্রিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই জন্যই একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—"আমি যদি চারিটী পয়সা দিই," বালক ভাবিল,—"চাহিলাম একটী, ইনি দিতে চাহেন চারিটী; এ কেমন, বুঝি ঠাট্টা করিতেছেন।" তখন সে বলিল, "মহাশয় ঠাট্টা করেন কেন? দিন একটী পয়সা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"ঠাট্টা নহে, যদি চারিটী পয়সা দিই, তাহা হইলে কি করিস্?" বালক বলিল,—"তা হ'লে দুটী পয়সা খাবার কিনি, আর দুইটী পয়সা মাকে গিয়া দিই।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"যদি দুই আনা দিই!" এবারও বালক ঠাট্টা মনে করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবার তাহার হাতে ধরিয়া বলেন,—"বল্ না, সত্যি সত্যি তাহা হ'লে তুই কি করিস্?" তখন বালক চক্ষের দু'ফোঁটা জল ফেলিয়া বলিল,—"চার পয়সার চাল কিনে নিয়ে যাই। আর চার পয়সা মাকে দিই। তাতে আমাদের আর একদিন চ'ল্বে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার বলিলেন,—"যদি চারি আনা দিই।" বালক তখনও বিদ্যাসাগরের মুষ্টিগত; উত্তর দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সে বলিল,—"তা হ'লে দু' আনা দু দিন খাওয়া চ'লবে, আর দুই আনার আম কিনি। আম কিনে বেচি। দু'আনার আমে চার আনা হ'বে। তাহা হ'লে আবার দু'দিন চল্বে। আবার দু'আনার আম কিনবো। এমন ক'রে য'দিন চলে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাহাকে একটী টাকা দিলেন। বালক টাকা পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চলিয়া যায়। বৎসর দুই পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন। তিনি ষ্টেশনে নামিয়া প্রায়ই একটী পরিচিত দোকানদারের দোকানে বসিতেন। এবার তিনি যেমন সেই পরিচিত দোকানদারের দোকানে প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনই একটী হৃষ্টপুষ্ট বালক আসিয়া বলিল,—"মহাশয়! একবার আসুন, আমার দোকানে ব'সতে হবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"তুমি কে আমি তো তোমায় চিনি না। তোমার দোকানে কেন যাইব?" বালক তখন বাষ্পাকুলিতলোচনে বলিল,—"আপনার স্মরণ নাই। আজ দু'বৎসর হলো, আমি আপনার কাছে একটী পয়সা চেয়েছিলুম। আপনি আমাকে একটা টাকা দিয়েছিলেন! সেই এক টাকায় দু'আনার চা'ল কিনি, আর বাকি চোদ্দ আনার আম কিনে বেচি। তাতে

আমার বেশ লাভ হয়। তারপর আবার আম কিনে বেচি। ক্রমে লাভ বাড়তে থাকে। এটা সেটা বেচে বেশ পুঁজি হয়। এখন এই মনিহারী দোকানখানি করেছি।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তখন পূর্ব্ব কথাটি স্মরণ হইল। তিনি বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহার সন্তোষের জন্য তাহার দোকানে যাইয়া বসিয়াছিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়

ভ্রান্তিবিলাস, রামের রাজ্যাভিষেক ও ভাষাচর্চ্চা

রোগ-কোলাহলসঙ্কুল কার্য্যময় বর্দ্ধমানে বসিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্সপিয়রের "কমিডি অব্ এরারস্" অবলম্বন করিয়া, "ভ্রান্তিবিলাস" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ভ্রান্তিবিলাসের ভাষা লালিত্যময়ী ও রহস্যোদ্দীপিকা। ভাষান্তর-রচিত ও ইংরেজি-ভাষার অনুবাদিত পুরাতন পুস্তকের ছায়াবলম্বন করিয়া সেক্সপিয়র "কমিডি অব্ এরারস্" রচনা করেন*। বলা বাহুল্য, এ রচনায় ইংরেজি ভাষার বলপুষ্টি হইয়াছে। "কমিডি অব্ এরারস্" উৎকৃষ্ট নাটক মধ্যে পরিগণিত না হইলেও, সুন্দর রহস্যোদ্দীপক প্রহসন-প্রকারে পরিগণিত হইতে পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি অদ্ভুত অনুবাদ শক্তি ছিল, বিদেশী ভাব ও ভাষাকে তিনি কেমন বঙ্গীয় পরিচ্ছেদে সজ্জিত করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব করিতে পারিতেন, ভ্রান্তিবিলাস তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। "কমিডি অব্ এরারসে"র গল্পাংশ কিছু জটিল। এ জটিলতা সত্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় উপাখ্যান ভাগের এমন সুন্দর সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, মূল কৌতুকাবহত্বের কিছুমাত্র খর্ব্বতা ঘটে নাই। ফলতঃ ভ্রান্তিবিলাস একখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা উপন্যাস হইয়াছে। নাটককে উপন্যাসাকারে পরিণত করা কত দুরূহ ব্রত, তাহা ল্যাম্ব লিখিত গল্পের পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু এ দুরূহ ব্রত বিদ্যাসাগর সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। যে লিপিকৌশল ভবভূতির মর্ম্মস্পর্শী উত্তর-চরিত নাটককে সীতার বনবাসে আকারিত করিয়াছে, তাহার সফলতা আমরা ভ্রান্তিবিলাসে

* Comedy of Errors. (Comedy) The Menaechmi, and Amphiture of Plautws; 'an old play the Historie of Error.' 1576-77, Shaw's 'Student's English Literature,' p. 150.

দেখিতে পাই। বিদ্যাসাগর যদি ভ্রান্তিবিলাসের আদর্শে সেক্সপিয়রের অন্যান্য নাটক বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল।

ভ্রান্তিবিলাসের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই কথা লিখিয়াছেন,—"তিনি (সেক্সপীরের) এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে সেক্সপীরের সেই অপ্রতিম কৌশল নাই।" বিদ্যাসাগর সত্যদর্শী লোক, আপনার গুণ পক্ষপাতের চক্ষে দেখিতেন না। বাস্তবিক "কমিডির" হাস্যরস অনুবাদে রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। ভ্রান্তিবিলাসেও সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই।

আহিরীটোলা নিবাসী ইতঃপূর্ব্বে সব-জজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,—"বিদ্যাসাগর মহাশয় পনর দিনে ভ্রান্তিবিলাস লিখিয়াছিলেন। প্রত্যহ আহার করিতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি প্রায় পনর মিনিট কাল ধরিয়া লিখিতেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি নীরস অঙ্কবিদ্যার চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দকৃষ্ণবাবুর নিকট সেক্সপিয়র না পড়িতেন, তাহা হইলে কি সেক্সপিয়রের এমন অনুবাদ প্রকাশিত হইত? মেকলেও যদি নীরস অঙ্কবিদ্যার অনুশীলনে শ্লথ-প্রযত্ন হইয়া, সাহিত্য-বিদ্যায় অধিকতর মনোযোগী না হইতেন, তাহা হইলে বোধহয়; কতকগুলি সুচারু ইংরেজি সাহিত্য-পুস্তকে বঞ্চিত হইতাম*। ভগবানই প্রস্তুতিসম্মত পথ খুলিয়া দেন।

ভ্রান্তিবিলাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্যের শেষ পুস্তক। তিনি স্কুলপাঠ্য যতগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় দুইখানি অতি উপাদেয় পাঠ্য লিখিত হইয়াও প্রকাশিত হয় নাই। একখানি "বাসুদেব-চরিত" অপরখানি "রামের রাজ্যাভিষেক"। বাসুদেব-চরিত সম্বন্ধে বক্তব্য ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। রামের রাজ্যাভিষেক ছয় ফর্ম্মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রামের রাজ্যাভিষেক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রামের রাজ্যাভিষেক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। শশীবাবু বলেন,—"মৎপ্রণীত রাজ্যাভিষেক মুদ্রিত হইলে পর, যে প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়, একদিন স্বয়ং সেই প্রেস হইতে একখানি মৎপ্রণীত রাজ্যাভিষেক ক্রয় করিয়া লইয়া যান। আমি সেই সময় প্রেসে উপস্থিত ছিলাম না। প্রেসে আসিয়া এ কথা

---

* Minto's "English Prose Literature, p." 78.

শুনিবামাত্র একখানি পুস্তক লইয়া, তাড়াতাড়ি আমি তাঁহার ডিপজিটরীতে যাই। সেইখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, আমি আমার পুস্তকখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করি। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—'আমি যে একখানি কিনে এনেছি। ভাল, তোর খানিও নিলুম। বই বেশ হয়েছে'।"

শশীবাবুর রাজ্যাভিষেক প্রকাশিত হইতে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বলিখিত রাজ্যাভিষেকের মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিয়া দেন। নারায়ণবাবু মুদ্রিত ছয় ফর্ম্মা আমাদিগকে দেখিতে দিয়াছিলেন। পুস্তকের ভাষা অধিকতর সংযত ও মার্জ্জিত। এইখানে ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

"আমি দীর্ঘকাল অকণ্টকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিলাম। লোকে, যে সমস্ত সুখসম্ভোগের অভিলাষ করে, আমি তদ্বিষয়ে পূর্ণাভিলাষ হইয়াছি, এইরূপে সর্ব্বসুখসম্পন্ন হইয়াও, এক বিষয়ে বিষম অসুখী ছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, সংসারাশ্রম সংক্রান্ত সকল সুখের সারভূত পুত্রমুখসন্দর্শন-সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে, চরম বয়সে, সেই সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছি। পুত্র অনেকের জন্মে, কিন্তু কোনও ব্যক্তিই আমার সমান সৌভাগ্যশালী নহেন। কেহ কখনও রামসম সর্ব্বগুণাস্পদ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ, সকল বিষয়েই আমার বাসনা সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণ হইয়াছে; কোনও বিষয়েই আমার আর প্রার্থয়িতব্য নাই; কেবল রামকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত দেখিলেই, সকল সুখের একশেষ হয়। গুণ, বয়স, লোকানুরাগ বিবেচনা করিলে, রাম আমার সর্ব্বতোভাবে সিংহাসনের যোগ্য হইয়াছে; তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, স্বয়ং রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হই। শরীর ক্ষণভঙ্গুর, বিশেষতঃ আমার চরম দশা উপস্থিত; কখন কি ঘটে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, অতএব এ বিষয়ে কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে। যদি, এক দিনের জন্য রামকে সিংহাসনারূঢ় দেখিয়া, এই জরাজীর্ণ শীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবনযাত্রা সফল হয়।

"মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রাজা দশরথ অমাত্যগণের নিকট অতি সংগোপনে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।"—৪৯ পৃষ্ঠা।

কি মনোমোহিনী ভাষা! কি তেজস্বিনী-স্রোতময়ী লিপিভঙ্গী! কি অব্যাহত-গতি ভাব-ব্যক্তি! আজই যেন ভাষার স্রোত ভিন্ন-মুখীন; কিন্তু একদিন বঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাষারই আদর হইয়াছিল। পুস্তক লিখিতে হইলে, এই ভাষারই অনুকরণ হইত। টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) মহাশয়, সরল

গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক লিখিয়া, ভাষার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লিখিত ভাষায়, তাঁহার প্রচলিত সে সরল গ্রাম্যশব্দপূর্ণ ভাষা স্থায়ী হইল না। বঙ্গের প্রতিভাশালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার নূতন মূর্ত্তির প্রকটন করেন। মূর্ত্তি বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদের ভাষার সংমিশ্রণে সংগঠিত। চূণ ও হলুদ স্বতন্ত্র পদার্থ; কিন্তু উভয়ে মিশিয়া এক নূতন পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাষা মিশাইয়া বঙ্কিমবাবু যে নবীন ভাষার গঠনরাগ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এক নূতন পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাই এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে অনুকৃত। বঙ্কিমবাবুর ছাঁচে ঢালিয়া, অথচ একটু নূতন করিয়া, ভাষা-সৃষ্টির প্রয়াস কোথাও কোথাও হইতেছে। ঠাকুর বাড়ীর ভাষা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

নারায়ণবাবু বলেন,—"বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে পত্র পাওয়া যায় নাই।" যাহা হউক, এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় নাই। বঙ্কিমবাবু স্বয়ং ভাষার স্বতন্ত্র পথের নির্দ্দেশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় বঙ্কিমবাবু অনেক সময় বঙ্গদর্শনের লেখায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রকারান্তরে কঠোর কটাক্ষবিক্ষেপ করিতেন। উত্তর-চরিতের সমালোচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্বহীনতার উল্লেখ করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকারান্তরে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কটাক্ষও হইত। বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকগুলি আধুলি সিকির সহিত তুলিত হইয়া তাঁহার নিজস্বহীনতার প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছিল*।

যেখানে যেরূপ হউক, যে ভাবে যে প্রকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় আলোচনা হউক, ভাষা সম্বন্ধে কীর্ত্তিমান্ গ্রন্থকারগণকে বিদ্যাসাগরের নিকট অল্পবিস্তর পরিমাণে ঋণী থাকিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা কোন্ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইবে, তাহার এখনও স্থিরনিশ্চয়তা নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে মূর্ত্তিতে দাঁড়াক্ না কেন, মূর্ত্তি দেখিয়া, সর্ব্বাগে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করিয়া অবনত মস্তকে সহস্রবার অভিবাদন করিতে হইবে। সে মূর্ত্তিতে বিদ্যাসাগরসৃষ্ট ভাষার সৌন্দর্য-বিলাসের ছায়ালোক মিশিয়া থাকিবেই থাকিবে।

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর হইবার পর, বঙ্কিমবাবু একখানি সমবেদনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রও পাওয়া যায় নাই। অতঃপর বঙ্গদর্শন হইতে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া বঙ্কিমবাবু যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংক্রান্ত বক্রোক্তি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে অনুস্যূত; সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গাদি-প্রয়োগ সংস্কৃতানুসারে হইয়া থাকে। আজকাল অনেক স্থলে তাহার ব্যত্যয় হইতেছে। বঙ্কিমবাবু সংস্কৃতানুসারে লিঙ্গাদি প্রয়োগে দৃষ্টি রাখিতেন; অনেক স্থলে তাহার ব্যত্যয়ও করিতেন। এরূপ ব্যত্যয় এখন প্রায়ই হয়। ব্যত্যয় হয় নাই ঢাকার বান্ধব-সম্পাদক মনস্বী চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখায়। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতানুস্যূত; অতএব তাহার লিঙ্গাদিপ্রয়োগে সংস্কৃতানুসারে চলা কর্ত্তব্য বলিয়া, এখনও অনেকের ধারণা। সে সম্বন্ধে ব্যত্যয় হইলে, ভাষা অশুদ্ধ হয়। সেরূপ বিশুদ্ধি রক্ষা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্নবাবু অতুলনীয়। কিন্তু এখনকার উদীয়মান অনেক নব্য লেখক এবং সাহিত্য-সেবি-সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের সর্ব্ববিধ বাঁধন রাখিতে সম্মত নহেন। ফলে, ইংরেজি ভাষার ন্যায় এখন বাঙ্গালা ভাষাও পরিবর্ত্তনমুখী। পরিবর্ত্তন যেরূপই হউক, বিদ্যাসাগর চিরকালই বাঙ্গালীমাত্রেরই বরণীয় হইয়া রহিবেন। ভাষায় সৌন্দর্য্য-বিলাসে, রাগ-অনুরাগে যতই কেন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হউক না বিদ্যাসাগরের ঠাট রাখিতেই হইবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

গৃহদাহ, ছাপাখানা-বিক্রয়, মেঘদূত, দেশ-ত্যাগ, সত্য-রক্ষা, ডাক্তার দুর্গাচরণ, বিষয়-রক্ষা, ডাক্তার সরকার, মহারাজ মহাতাপচাঁদ, সভায় সাহায্য ও পুত্রের বিবাহ

১২৭৫ সালের চৈত্র বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাস-বাটীতে আগুন লাগিয়াছিল। বাড়ী পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ও জননী নিদ্রিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সকলেই রক্ষা পান। বাড়ীর বিগ্রহটী পর্য্যন্ত দগ্ধ-বিদীর্ণ হইয়াছিল*। জিনিস পত্র কিছু রক্ষা পায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া বাড়ীতে গিয়াছিলেন।

১২৭৬ সালের ২৬শে শ্রাবণ বা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অগষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয় পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণবাবুকে সংস্কৃত প্রেসের এক-তৃতীয়াংশ চারি সহস্র টাকায় এবং কালীচরণ ঘোষকে এক-তৃতীয়াংশ চারি সহস্র টাকায় বিক্রয় করেন।

* কাহারও কাহারও মুখে শুনি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা সর্ব্বাগ্রে বিগ্রহটী মস্তকে লইয়া, বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়েন। বিগ্রহ অক্ষত দেহে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণবাবুর মুখেই শুনিয়াছি, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাওনা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাপাখানার অংশ বিক্রয় করিয়া তাঁহার দেনা পরিশোধ করেন।

দেনার দায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধের ছাপাখানা বিক্রীত হইল। এই ছাপাখানার কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ তিনি যে কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, পাঠক, তাহা অবগত আছেন কি? ছাপাখানায় ইংরেজি বর্ণাক্ষরে ৭০।৭২টী ঘর; বাঙ্গালায় প্রায় ৫০০ ঘর। 'র' ফলা, 'ঋ' ফলা, 'য' ফলা, এমন কত আছে। এই সব অক্ষর-যোজনা সামান্য কষ্টকর নহে। কোথায় কোন্ অক্ষরটী থাকিলে অক্ষর-যোজকের যোজনাপক্ষে সুবিধা হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া তাহা নির্দ্ধারিত করেন। ইহার পূর্ব্বে অক্ষরযোজনার এমন সুবিধা ছিল না। তিনি অক্ষর সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলেই তাহা অনুকৃত হইয়া থাকে। তাহার নাম "বিদ্যাসাগর সাট"।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মল্লিনাথের টীকাসহ মেঘদূত মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

এইবার বড় হৃদয়বিদারক কথা। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মের মত বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। পশ্চাল্লিখিত ঘটনাটি তাঁহার দেশ-পরিত্যাগের অন্যতম কারণ।

ক্ষীরপাই নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কেঁচকাপুর স্কুলের হেড পণ্ডিত কাশীগঞ্জ বাসিনী মনোমোহিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগ করেন। পাত্র-পাত্রী উভয়কেই বীরসিংহ গ্রামে আনয়ন করা হইয়াছিল। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার-পরিবারের ভিক্ষাপুত্র। হালদার বাবুরা আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন,—"মহাশয়! যাহাতে এ বিবাহ না হয়, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের কাতরতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন এবং বলিলেন,—"বিবাহ হইবে না, আপনারা উহাদিগকে লইয়া যাউন।" তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও গ্রামের অন্যান্য কয়েক জন রজনীযোগে তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে অকস্মাৎ শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইলেন; কিন্তু ইহার কিছু

ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সেই সময় প্রতিবেশী গোপীনাথ সিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শাঁক বাজিতেছে কেন?" সিংহ মহাশয় বলিলেন,—"আপনি জানেন না? মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়া গেল।" শুনিয়া ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বদনমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। তিনি আর কোন কথা না কহিয়া, কেবল তামাক টানিতে টানিতে ধূম ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাগ হইলে তিনি প্রায়ই এইরূপ করিতেন। রাগ হইলে তিনি অনেক সময় চুপ করিয়া থাকিতেন; বড় একটা কথা কহিতেন না। যদি কোন স্নেহাস্পদ বয়ঃকনিষ্ঠকে "ইনি" "উনি" "বাবু" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইত, তাঁহার অন্তরে দাবানল প্রধূমিত। যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় সিংহ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই ইহার কিছুই জানিস্ না?" সিংহ মহাশয় উত্তর দিলেন—"আপনার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার কিছুই জানি না।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "আমি ভদ্রলোকদিগকে কথা দিয়া সত্য রক্ষা করিতে পারিলাম না; অতএব বীরসিংহ পরিত্যাগ করিলাম, আর আসিব না।" বিধবা-বিবাহের সৃষ্টিকর্ত্তা সত্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর সত্যভঙ্গ হইল বলিয়া জন্মের মত প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। আর তিনি বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন নাই; কিন্তু যাহার যেরূপ বৃত্তি বা মাসহারার বন্দোবস্ত ছিল, তাহা বন্ধ হয় নাই।

বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত কোন অতি-অন্তরঙ্গ আত্মীয় এক স্থানে দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—"জানেন, এখনই তাঁর ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া দিতে পারি; তাঁকে এখানে চেনে কে?"

১২৭৬ সালের ভাদ্র মাসে বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে "ডিপজিটরী" প্রদান করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ডিপজিটরীর কর্ম্মচারীদের ব্যবহারে বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক দিন তিনি রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে বসিয়া বিরক্তভাবে বলিয়াছিলেন,—"কেহ যদি ডিপজিটরী লয়, তাহা হইলে আমি বাঁচি।" সেই সময় ব্রজবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,—"আপনি রাগ করিতেছেন, না সত্য সত্য আপনার মনের কথাই ইহা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"সত্যই আমার মনের কথাই ইহা।" ব্রজবাবু বলিলেন, "তবে আমাকে দিন।" বিদ্যাসাগর বলিলেন,—"লও।"

আমরা এই কথা রাজকৃষ্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "আপনি এক্ষণে ডিপজিটরীর কার্য্য রীতিমত চালাইয়া ইহার উপস্বত্ব ভোগ করুন, পরে যেরূপ হয়, করা যাইবে।" রাজকৃষ্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, ইহার পর দুই এক জন লোক ৫।৬ হাজার টাকা দিয়া, ডিপজিটরীর স্বত্ব ক্রয় করিতে চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন,—"যাহা এক জনকে একবার দিয়াছি, কোটি মুদ্রা পাইলেও তাহা ফিরাইয়া লইব না।"

১২৭৬ সালের ১০ই ফাল্গুন বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলা ৩টার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানবলীলা সংবরণ করেন। যে অকৃত্রিম প্রিয় বন্ধুর নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজি বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; এবং যাঁহার অলৌকিক উদারতাগুণে এবং চিকিৎসা-সাহায্যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় শত শত আর্ত্তপীড়িতের প্রাণ দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর বিয়োগে তিনি যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক তাপ পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যে দুর্গাচরণবাবু প্রাণ উৎসর্গ করিতেন, আবার দুর্গাচরণবাবুর কার্য্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দুর্গাচরণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে সিবিলিয়ান্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু তাঁহার বয়স লইয়া গোল হইয়াছিল। দুর্গাচরণবাবু সে সংবাদ পাইয়া, এ দায়ে উদ্ধার পাইবার জন্য, আকুল প্রাণে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরম বন্ধু দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত নানা পরামর্শ করিয়া দুর্গাচরণবাবুর দায় উদ্ধারার্থ বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেন্দ্রবাবুর কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষোপযোগী বয়স-নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, নানা তর্কযুক্তি সহকারে বিলাতে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। ইহাতেই বয়সবিভ্রাট মিটিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুর্গাচরণবাবুর মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পরে, সে সংবাদ কলিকাতায় আসিয়াছিল। লোকান্তরিত বন্ধু দুর্গাচরণের স্মৃতিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয় চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন। যখন সুরেন্দ্রনাথ নিজ কর্ম্মফলে "সিবিল সার্ব্বিস" হইতে পদচ্যুত হন, তখন তিনি অনন্যোপায়ে বাক্-বজ্র-সাহায্যে দেশহিতৈষী হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্নসংস্থানে সে বাক্‌পটুতা খুব অল্প সাহায্য করিয়াছিল। একমুষ্টি উদরান্নের জন্য তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নিজের কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন।

দুর্গাচরণবাবুর পরিবারবর্গ নানা কারণে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণী। তাঁহার বিষয়সম্পত্তি লইয়া তাঁহার পত্নী ও তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যস্থ হইয়া, মোকদ্দমা মিটাইয়া দেন। এ মোকদ্দমার মীমাংসা-সংক্রান্ত পত্রাদি আজিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। বিবাদ-মীমাংসা পক্ষে তিনি কিরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি ধারণ করিতেন, এই কাগজপত্রে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। শুদ্ধ দুর্গাচরণবাবুর বিষয়ের গোলযোগে কেন, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বিষয়ের কোন গোলযোগ হইলেই, তাঁহাকে মীমাংসা করিবার জন্য সাদর-আহ্বান করিতেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বহু পরিশ্রমে কার্য্য করিয়া অনেকেরই বিষয়ের গোলযোগ মিটাইয়া দেন। কলিকাতার বিখ্যাত ধনাঢ্য আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) মহাশয়ের মৃত্যুর পর, বিষয়-সম্পত্তির গোলযোগ হওয়ায়, তাঁহাকে ম্যানেজারপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বিষয়ের গোলযোগ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাবুর আত্মীয় ও কর্ম্মচারীবর্গের নানা বিষয়ের মতানৈক্য দেখিয়া, এ কার্য্যভার পরিত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিনটী চিকিৎসক বন্ধু সর্ব্বকার্য্যে সহায় ছিলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব মুখোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্রলাল সরকার। দুর্গাচরণের কিছুকাল পূর্ব্বে নীলমাধব লোকান্তরিত হন। মহেন্দ্রলাল আজ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর হইবার পর ইঁহার লোকান্তর হয়। মহেন্দ্রলাল চিকিৎসা রাজ্যের উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই মহেন্দ্রলালের সঙ্গে কিন্তু বৎসর কতক পরে বিদ্যাসাগরের দারুণ মনোবাদ সংঘটিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যার সঙ্কটাপন্ন পীড়াসূত্রে এই মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রেরিত আহ্বান-পত্র না পড়িয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন ; পরে সেই পত্র পড়িয়া চিকিৎসার্থ আগমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার বিলম্বে আগমনের হেতু অবগত হইয়া, ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হন। ইহাতেই মনোবাদের সূত্রপাত। ক্রমে মনোবাদ এত দূর ঘনীভূত হইয়াছিল যে, কোন স্থানে দুই জনের সাক্ষাৎ হইলে চারি চক্ষু একত্র হইত না। সেই চারিটী বিশাল চক্ষুর পুনঃসম্মিলন হইয়াছিল মাত্র, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পূর্ব্বে,—রুগ্নশয্যায়! মহেন্দ্রলাল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় মনের মালিন্য-ভেদ ও মিত্র-মিলন মহা-নাটকেরই বিষয়ীভূত। মৈত্রী-বিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিগত মৈত্রীর পুনরুদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতেন না। মৈত্রী-উদ্ধারের এরূপ অনাকাঙ্ক্ষা,

মানব-চরিত্রের মহত্ত্ব পরিচায়ক নহে নিশ্চিতই ; কিন্তু কৃতাত্ম-নির্ভর ও তেজস্বী পুরুষে প্রায়ই এরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

১২৭৭ সালে বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম সুহৃদ্ ও সহায় বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১২৮০ সালে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সভায় সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। দীন-দরিদ্রে দান ; যাচিত-অযাচিতে দান ; সভা-সমিতিতে দান ; আত্মপরে দান ; বিদ্যাচর্চ্চায় দান ; বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় দান ;—দানময় জীবনের অবারিত দান। বিদ্যোৎসাহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচুর দানের কথা তুলিয়া, তাৎকালিক দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন সাহেব, বিস্ময়-বিমোহনে শত মুখে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন।

১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার পুত্র নারায়ণবাবু বিধবা-বিবাহ করেন। পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভবসুন্দরী। খানাকুল কৃষ্ণনগরবাসী ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। বয়স ত্রয়োদশ বৎসর*। নারায়ণবাবু বিবাহ করিবার পূর্ব্বে পিতাকে এইভাবে বলিয়াছিলেন,—"আমার এমন গুণ নাই যে, আপনার মুখোজ্জ্বল করি; তবে আপনার জীবনের মহৎ ব্রত,—বাল-বিধবা-বিবাহ-প্রচলন করিয়া, বাল-বিধবার ভীষণ বৈধব্য-যন্ত্রণা দূর করা। এ অধম সন্তানের তাহা অবশ্য সাধ্যায়ত্ত। আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না। তাহাতে আপনাকে কতকটা সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমার জীবন ধন্য হইবে, আর তাহা হইলে বোধহয়, আপনার সদভিপ্রায়ের বিপক্ষবাদীরাও সন্দিহান হইতে পারিবে না।"

কন্যার মাতা, বিধবা কন্যাটীকে লইয়া প্রথম বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় তিনি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে কন্যার পূনর্ব্বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী পাত্র ঠিক করিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনিবার জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে পত্র লিখিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে কিন্তু নারায়ণবাবু কন্যাটীকে বিবাহার্থী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সংবাদ পাইলেন। বাড়ীর অন্যান্য অনেকের অমত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পূর্ণ অভিমতি প্রকাশ করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে পাত্র ও পাত্রী কলিকাতায় আনীত হয়। মৃজাপুর-নিবাসী ডেঃ কালেক্টর কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

* বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন,—ষোল বৎসর। ভ্রমনিরাস ২৭ পৃষ্ঠা।

ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বিবাহে আপত্তি করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিবাহান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভ্রাতাকে পশ্চাল্লিখিত পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—

শুভাশিষঃসন্তু,—২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবা-বিবাহ করিলে, আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন; অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে, আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবা-বিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কার্য্য হইত না। আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক। আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া, কুমারী-বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না; ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ-প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন—এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা-বিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে, আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন; সে জন্য, নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা

অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, অস্মদীয় ইচ্ছাব অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি '১শে শ্রাবণ।

শুভকাঙ্ক্ষিণঃ

(স্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই বিবাহের সময় নারায়ণবাবুব জননী উপস্থিত ছিলেন না। এ বিবাহে তাঁহার মত নাই ভাবিয়া বিদ্যাসাগব মহাশয় তাঁহাকে সংবাদ দিতে দেন নাই। নারায়ণবাবু বলেন, "ইহাতে যে মাযের মত ছিল, বিবাহান্তে মা তাহা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন।"

বিধবা-বিবাহে নাবায়ণবাবুব জননীর সম্পূর্ণ অমত ছিল, বিদ্যাসাগব মহাশয় ইহা নিশ্চিতই সিদ্ধান্ত কবিয়াছিলেন। কেননা, পাছে বধূ ও বনিতাব অসদ্ভাব হয়, এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়, নাবায়ণবাবুকে স্বতন্ত্র বাসা কবিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তথায প্রায়ই যাইতেন এবং আহাবাদি করিতেন।

ইহাব পব শ্বশ্রূ, পুত্র ও বধূ, সকলেই বহুদিন একত্র কাল-যাপন করিয়াছিলেন। নিবক্ষরা বিদ্যাসাগর-পত্নী স্বধর্ম্মে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিমতী হইয়াও পতি-পুত্রের স্নেহবন্ধন বশতঃ পুত্রেব সংস্রব পরিত্যাগ কবিতে পাবেন নাই এইখানে একটা কথা বলিয়া বাখি, বিদ্যাসাগব মহাশযেব পিতা মেয়েদের লেখাপডা শিখাইতে বডই নারাজ ছিলেন। এই জন্য তাঁহাব সকল পুত্রবধূরই লেখাপডা শিখিবার পক্ষে বিশেষ অন্তবায় ঘটিয়াছিল।

বিদ্যাসাগব ভণ্ড নহেন। যে কার্য্য, সাধু বলিয়া তাঁহাব বিবেচনা হইয়াছিল, তৎসাধনার্থ তিনি সমগ্র সমাজেব চক্ষের উপব অটল বীরত্বের পরিচয় দিযাছিলেন। অধুনাতন যে সব কুলাঙ্গার সম্পূর্ণ অনাচাব এবং ধর্ম্ম-বিরোধী হইয়াও বাহিরে হিন্দু-নামে পরিচয় দেয়, এবং হিন্দুব সংসারে স্বচ্ছন্দ-বিহারে প্রয়াস পায়, তাহাদের নরকেও স্থান নাই। এই সব ভণ্ড-পাষণ্ডের দল-পুষ্টিতে আজ সমগ্র সমাজ সন্ত্রাসিত। ভয় তাহাদিগেবই জন্য। বিদ্যাসাগর বা রামমোহন এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মগোপনে প্রয়াস পাইতেন না ; বরং তাঁহাদের আত্ম-পরিচয়ে বীরত্বেবই বিকাশ। লোকে তাঁহাদিগকে চিনিয়াছে ; সুতরাং তাঁহাদের দোষ-গুণের বিচাবে সহজে বিডম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ব্যক্ত-শত্রু অপেক্ষা গুপ্ত-শত্রুই ভয়ঙ্কর।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

কাশীতে জননী, মাতৃ-বিয়োগ, পিতৃ সেবা, কাশীর কার্য্য, হিন্দু-উইল, রাজা সতীশচন্দ্র, রাণী ভুবনেশ্বরী, উত্তর-চরিত ও অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক

১২৭৭ সালের ভাদ্র বা ৮৭০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ৺বারাণসী ধামে গমন করেন। তিনি তথায় কিয়দ্দিন থাকিয়া বহু তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হন। তীর্থ-পর্য্যটনান্তে তিনি পুনরায় কাশীধামে ফিরিয়া আসেন। নারায়ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি স্বামীকে বলেন,—"আমি বাড়ী ফিরিয়া যাই; মরিবার এখনও বহু বিলম্ব আছে; এখন দেশে যাইলে, দেশের অনেক গরীব-দুঃখী খাইতে পাইবে; ঠিক মরিবার পূর্ব্বে এইখানে আসিব।" এই কথা বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী দেশে ফিরিয়া আসেন। এখানে তিনি দারিদ্র্য-দুঃখ-হরণ-রূপ মহাব্রতে নিযুক্ত হন। এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন কিন্তু এইবার এইখানেই হইল। পর বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে, ৺বারাণসী ধামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার সাংঘাতিক পীড়া হয়। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা তৃতীয় ভ্রাতা এবং জননী কাশীধামে গিয়াছিলেন। পিতা আরোগ্য লাভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ফিরিয়া আসেন। দুই মাস কাশীবাস করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তিতে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অসুস্থতা-নিবন্ধন কলিকাতা-কাশীপুরের গঙ্গাতীরে দেড় শত টাকার একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। এইখানে তিনি জননীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। মাতৃভক্ত পুরুষ মাতৃ-হারা হইলেন। যে মাতৃ-আজ্ঞার পত্র পাইয়া মাতৃ-চরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিদ্যাসাগর প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, দুস্তর দামোদরের খর-স্রোতে সাঁতার দিয়াছিলেন, সে মা আজ নাই! মাতৃ-ভক্তের সে মর্ম্মান্তিক বেদনা কি বর্ণনীয়! তিনি কয়েক মাস বিষয়-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত নিলয়ে কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। মাতার মৃত্যুর পর তিনি এক বৎসর হবিষ্যান্নাহারী হইয়াছিলেন। এই এক বৎসর কাল তিনি ছত্র, শয্যাসন প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। পূর্ব্বে তিনি প্রায়ই কাশী যাইতেন। মাতার মৃত্যুর পর দুই বৎসর যান্ নাই। মাতৃশোকে জর্জ্জরিত হইয়াও কিন্তু

তিনি পিতৃ-পাদপদ্ম বিস্মৃত হন নাই। পিতার সেবার্থ ভ্রাতা ও অন্য কোন আত্মীয়কে নিযুক্ত করিয়া পিতৃপ্রিয় দ্রব্যাদি এখান হইতে পাঠাইয়া দিতেন। কাশীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আসিলে প্রায়ই বিমুখ হইতেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি কাশীতে মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণদিগকেই ভোজন করাইতেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং তাঁহাদের পাদ-প্রক্ষালনাদি করিয়া দিতেন। কোন প্রকার ক্ষত পূঁজ দেখিয়াও ঘৃণা বোধ করিতেন না। কাশীতে যাইলে, পিতার অন্নব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দেওয়া এবং পিতার ভোজনা-বশিষ্ট-প্রসাদ গ্রহণ করা তাঁহার নিত্যক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত হইত*। তিনি স্বয়ং বাজার করিয়া আনিতেন। মাতৃবিয়োগের পর ১৮৭৩ সালে নবেম্বর মাসে পিতার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে শুনিয়া, তিনি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাশী গিয়াছিলেন। তথায় এক পক্ষের মধ্যে পিতা সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করেন। পবিত্র কাশীধামে তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে টাকা, আধুলী, সিকি লইয়া পদব্রজে বাহির হইতেন; এবং দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিকে যথাসাধ্য বিতরণ করিতেন।

এই সময়ে এক দিন এক ব্যক্তি তাঁহাদের বাসায় আগমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করেন, তিনি তাঁহার পিতার পরিচিত; পিতা মনে করেন, পুত্রের পরিচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় কি একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে যান, পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, লোকটী নাই। তখন পিতাকে লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন—"সে কি, আমি জানি, উনি তোমারই পরিচিত; মনে করিলাম তুমি আসিয়া উহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে। আমি একটা বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, ব্যাপার বুঝিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। তখনই তিনি চাদর লইয়া, বাঙ্গালীটোলায় তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আপনাদের ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। লোকটীও যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলেন।

---

* বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়, দারিদ্র্য-পীড়ন হেতু স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। সুতরাং রন্ধনে তিনি সিদ্ধহস্ত। স্বচ্ছন্দ উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াও অনেক সময় কেবল পিতৃসেবার্থে কেন, অনেককেই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়ান তাঁহার একটা সখ ছিল। খাওয়াইয়া তিনি পরম প্রীতিলাভ করিতেন। খাওয়াইতে বসিয়া, প্রায়ই প্রীতিপ্রফুল্লভাবে বলিতেন,—

"হু হু দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়ঞ্চ করকম্পনে।
শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্র ঝম্পনে!"

পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমাদের বাসায় গিয়াছিলেন কেন ?" ভদ্র লোকটী বলিলেন,—"শুনিলাম আপনি আসিয়াছেন তাই দেখিতেগিয়াছিলাম ; আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"কি জিজ্ঞাসা করিবেন ?" ভদ্র লোকটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মমত কি, জানিতে চাহিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই ; তবে এই কথা বলি, গঙ্গাস্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন : শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন ; তাহা হইলে, তাহাই আপনার ধর্ম্ম।" এই বলিয়াই তিনি ফিরিয়া আসেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয়, একস্থানে লিখিয়াছে,—"কাশীর ব্রাহ্মণেরা বলেন,—'আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না ?' ইহা শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন 'আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।' ইহা শুনিয়া, ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন,—'আপনি কি মানেন ?' তাহাতে অগ্রজ উত্তর করেন, 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান'।"

এইস্থানে বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচয়। তাঁহার ব্রাহ্মণসেবা কেবল মাতাপিতার তৃপ্ত্যর্থ বলিতে হইবে।

১২৭৭ সালের ১৭ই ভাদ্র বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর, "হিন্দু উইলস্ আক্ট" পাস হয়। ১৮৬৫ সালে ইহার পাণ্ডুলিপি "পেশ" হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান সাক্‌সেশন্" নামক আইনে কার্য্য চলিত ; সে আইন কেবল সাহেবদের জন্য। তাহারই কতকগুলি ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া, হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনদের জন্য "হিন্দু উইলস্ আক্ট" হয়। পূর্ব্বে সুপ্রিমকোর্ট হওয়ার পর কলিকাতায় ধনাঢ্যমণ্ডলী আপনাদের স্বেচ্ছামতে উইল করিয়া যাইতেন। ক্রমে বিচারে প্রকাশ পায়, এইরূপ উইলে নানারূপ অসুবিধা ও জুয়াচুরি ঘটে। এতন্নিবারণ উদ্দেশে এই বিলের সৃষ্টি। এই বিল লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট হইতে এ বিষয়ে যাবতীয় গণ্যমান্য ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মত গ্রহণ করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত আইন সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রদান করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তিনি আইনের মর্ম্ম বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দুইটি বিষয় সমর্থন করেন নাই। প্রথমতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অজাত কোন ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা বৈধ হয় না। গ্রহীতার ও দাতার জীবদ্দশায়

বর্ত্তমান থাকা ও বোধবিশিষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু উক্ত আইনে এ প্রকার দান কোন কোন স্থলে বৈধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আইনে যাহাকে "Rules against perpetuity" অর্থাৎ "আবহমানকাল স্বত্বাধিকার বিরুদ্ধ বিল" বলে, তাহাও হিন্দু আইন সম্মত নহে বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মত প্রকাশ করেন। শাসন কর্ত্তারা উক্ত আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করেন।

১২৭৭ সালের কার্ত্তিক বা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর নবদ্বীপের মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যু হয়। নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। সতীশচন্দ্রের পিতা মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে ভারতচন্দ্র প্রণীত গ্রন্থসংগ্রহ এবং কৃষ্ণনগর স্কুলের পরিদর্শনসূত্রে এই সংস্রবের সূত্রপাত হয়। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সুদৃঢ় সখ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোথায় সেই বাঙ্গালীর সর্ব্বজন-পূজ্য ও সর্ব্ব-সাধারণ-মান্য ব্রাহ্মণকুল-প্রদীপ রাজ্যেশ্বর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশতিলক মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, আর কোথায় পরসেবী দীন হীন ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাসের বংশধর গৃহস্থ বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রত্ন-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, পুলকপ্রীতিভরে সেই বেশভূষাহীন দরিদ্র-বেশধারী ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন দিতে কিঞ্চিৎ মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। এত অনুরাগ কিসের? এমন কি, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মবিগর্হিত বিধবা-বিবাহকাণ্ডেও সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই*। বিধবা-বিবাহের আইনসম্বন্ধে আবেদন পত্রে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রথম বিধবা-বিবাহের দিনে তাঁহার লোকান্তর হইয়াছিল। যে হিন্দুকুলচূড়ামণি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবাদী ছিলেন, তাঁহারই বংশীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিধবা-বিবাহের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ইহা শিক্ষাসংস্রব ও যুগধর্ম্মের পরিচয়।

* কেহ কেহ বলেন, পরাশরের যে বচন অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উত্থাপন করেন, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র তাঁহার বহুপূর্ব্বে সেই বচন-সহায়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতেন। কৃষ্ণনগর রাজধানীর দেওয়ান বাহাদুর ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে" এইরূপ লিখিত আছে—'পরাশরোক্ত যে বচন মূল করিয়া মহামতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের অখণ্ড ব্যবস্থা দেন, রাজা (শ্রীশচন্দ্র) অনেক দিন পূর্ব্বে সেই বচনসহায়ে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং যখন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে ঐ বচনের উল্লেখ করেন।"

শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্রও পিতার মত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। পিতার মৃত্যুর পরও মহারাজ সতীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পূর্ব্ববৎ ঘনিষ্ঠ সংস্রব সংরক্ষন করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে দারুণ শোক-শেল বিদ্ধ হইয়াছিল।

সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরও, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কৃষ্ণনগর রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধন জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া, অনেক সময় ক্ষতি ও অর্থহানি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। উপকারী বন্ধুর উপকার-সাধনার্থ এরূপ ক্ষতি-স্বীকার কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগরের স্বভাবসিদ্ধ।

এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ে একটু কলঙ্ক-আরোপ করিয়াছেন, একমাত্র ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। সে কলঙ্ক-প্রক্ষালনার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং "নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহারও প্রতিবাদ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তৎপ্রতিবাদার্থ প্রয়াসী হইয়া, আপন মত সমর্থনার্থ, আর একখানি পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্থূল কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "শিশুশিক্ষা" আত্মসাৎ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা, আত্মসাৎ নহে; ছাপাখানা সংক্রান্ত বিবাদ-মীমাংসায় তাহা তাঁহারই বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বাদ-প্রতিবাদ সংগ্রহ করিয়া একটা মীমাংসাস্থলে উপস্থিত হইতে হইলে, একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিবার প্রয়োজন হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রসমালোচনায় এ কলঙ্ক তাঁহাতে যে অসম্ভব, এ ধারণা অবশ্য সর্ব্ব-সাধারণেরই হইবে। আমাদেরও ধারণা তাই। রাজকৃষ্ণবাবুর মুখে বিবরণ শুনিয়া আমাদের ঐ ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছে। অন্যরূপ যদি কাহারও হয়, আমরা তাঁহাকে বাদপ্রতিবাদের পুস্তক মনোনিবেশ সহকারে পড়িতে এবং তাহার পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি।

মহারাজ সতীশচন্দ্রের দুই মহিষী ছিলেন। মহারাজ উইল করিয়াছিলেন,—

এই ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে যে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝিতে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তৎকালে বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণবয়স্কা কন্যার বৈধব্যব্যাকুলতায় কাতর হইয়া বিধবা-বিবাহ চালাইবার উদ্যোগ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে সে চেষ্টা বিফলীকৃত হয়। সে বৃত্তান্তবর্ণনের স্থান হইবে না। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে, "ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে"র ১৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে পারেন।

"রাজ্ঞীরা যদি পুত্রবতী না হন তাহা হইলে আমার অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠা রাণী দত্তকে গ্রহণ করিবেন। যদি তিনি দত্তক না লন, তবে জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী লইবেন।" মহারাজের জীবিতাবস্থায় জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর মৃত্যু হয়। মহারাজ সতীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইলে পর, কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরী, স্বয়ং বিষয়কার্য্য চালাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাৎকালিক দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় দেখিলেন, বিষয়ের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে স্বয়ং মহারাণী বিষয়ভার গ্রহণ করিলে নানা কারণে বিষয়ের আরও শোচনীয়তর অবস্থা সংঘটিত হইবে। এতৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণার্থ তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল অবস্থা পর্য্যালোচন করিয়া, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে বিষয় থাকা ভাল বলিয়া, অভিপ্রায় প্রকাশ করেন*। তখন রায় মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরীকে বুঝাইয়া, বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে অর্পণ করিতে পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতেই সম্মত হন। তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণনগরে যাইয়া, রাণীকে বিধিমতে পরামর্শ দেন। রাণী তাঁহার পরামর্শ যুক্তি-সঙ্গত ভাবিয়া কোর্ট অব্ অয়ার্ডসের হস্তে বিষয় অর্পণ করেন। ১২৮৫ সালের ২৩শে পৌষ বা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি, বিষয়সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে অর্পিত হয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত "উত্তরচরিত" ও "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটক প্রকাশ করেন। তিনি দুইখানি পুস্তকের টীকা করিয়াছিলেন। দুইখানি পুস্তকের বঙ্গভাষায় লিখিত উপক্রমণিকাটুকু উপাদেয় পাঠ্য প্রবন্ধ। সেই মৃদঙ্গনিনাদ-নিন্দী গুরুগম্ভীর ভাষাধ্বনি! সেই মধুর-কোমল-কান্ত বাক্য-বিন্যাস! অল্পায়তনে ভবভূতি ও কালিদাসের গুণ-গরিমা ও প্রতিভা-প্রতিষ্ঠার এমন প্রস্ফুট পরিচয় আর কুত্রাপি পাইবে না।

এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত "শিশুপাল বধ", "কাদম্বরী", "কিরাতার্জ্জুনীয়", "রঘুবংশ" ও "হর্ষচরিত" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

* না-বালকী জমিদার রক্ষা করণোদ্দেশে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের সৃষ্টি। মালগুজরিতে ব্যাঘাত ভাবিয়াই যে গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না, আইনকারেরা তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে বিষয় না দিলে যে রক্ষা হয় না এমন নহে, পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী ও বহরমপুরের মহারাণী স্বর্ণময়ী, ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপ রাজ্যের বিষয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে না দিলে বিষয় রক্ষা করা দুষ্কর। বাস্তবিকই ওয়ার্ডসে গিয়া, বিষয় শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বেকার সব ঋণ পরিশোধিত হয়।

এই সকল গ্রন্থে টীকা নাই। তবে ইহার পাঠ পরিশুদ্ধ। নিম্নশ্রেণী ইংরেজি পাঠকের পাঠ-সৌকর্য্য-সাধন-কল্পে তিনি তিনখানি ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই তিনখানি গ্রন্থসার-সংকলন। তিনখানি পুস্তক এই,—"Selections from the writings of Goldsmith", "Selections from English Literature" and "Poetical Selections."

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

পাদরী ডল, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু ও রামকৃষ্ণ পরমহংস

পাদরী ডল সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৌহার্দ্দ্য ও সদ্ভাব হইয়াছিল। পাদরী ডল আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের রাজধানী বোষ্টন সহরের অধিবাসী ছিলেন। তত্রত্য "ইউনেটেরিয়ান" খৃষ্টান-সমাজ কর্ত্তৃক তিনি এদেশে প্রেরিত হন। এদেশে আসিয়া, তিনি "ইউসফুল আর্টস্ স্কুল" নামে কলিকাতা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে এদেশবাসীকে ইংরেজি ও তৎসঙ্গে শিল্প, সঙ্গীত, ব্যায়াম প্রভৃতির শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দীন দরিদ্রে তাঁহার অপার করুণা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দীনপালন তাঁহার জীবনের সাধনব্রত ছিল। দীন হীন দরিদ্র বালকদিগকে বিনা বেতনে পড়াইবার জন্য তিনি একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তিনি সদানন্দ, সরল, সাহসী ও সৎপ্রিয় ছিলেন। এই সব গুণ চিরকাল বিদ্যাসাগরের চিত্তাকর্ষক। ডল সাহেবের মুখে প্রায় বিদ্যাসাগরের গুণব্যাখ্যা শুনিতাম। আমি এক সময় তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। স্কুলের শিক্ষক বা অন্য কোন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইলে, ডল সাহেব তৎসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেন। এতদ্ভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক বিষয়েই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ না লইয়া থাকিতে পারিতেন না। দুই জনেই দাতা ও দয়ালু। গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পর অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণের ন্যায় দুই দাতা ও দয়ালু হৃদয়ে আকর্ষণ-সংঘটন হইয়াছিল।

স্বদেশী হউক, বিদেশী হউক, ব্রাহ্ম হউক, খৃষ্টান্ হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক—সাহসী, সদালাপী, সরল, সত্য-সন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় অধিকার করিতেন। যিনি যে পথেই চলুন, দেশের হিত-কামনা তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য বুঝিলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া প্রেমা-

লিঙ্গন দিতেন। কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে মতবিরোধ ছিল, কিন্তু তিনি কেশবকে দেশের হিতকামী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। কেশববাবু তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বহু-বিষয়ে উভয়ে বিরুদ্ধবাদী হইলেও, সাক্ষাৎ সম্মিলনে উভয়ের অসীম সুখানুভব হইত। কেশববাবু প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে আসিতেন। উভয়ের মধ্যে কেবল দেশের মঙ্গলকাম্য কথারই আলোচনা হইত।

সরলতা ও সত্যপ্রিয়তাগুণে ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিও রাজনারায়ণ-বাবুর অটল শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। তিনি মনে করিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারক হইলে, দেশের মহামঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। এক সময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একথা খুলিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু রহস্য-ভাবে বলিয়াছিলেন,—"কাজ নাই মহাশয়, ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া আমি যা আছি এবং যাহা করিতেছি, তাহার জন্য যদি দণ্ডভোগ করিতে হয়, তাহা আমিই করিব। যাহাদিগকে ধর্ম্মে জপাব, তাহাদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহার মতে ধর্ম্মপালন করিয়াছ, তখন তাহারা যদি আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, এবং তাহারা যদি দণ্ড পাইবার পাত্র হয়, তাহা হইলে তাহাদের দণ্ডটা আমার উপর পড়িবে নিশ্চিতই। আমার অপরাধের জন্য আমি বেত খাইতে পারি, কিন্তু অপরের জন্য কত বেত খাইব* ?"

রাজনারায়ণবাবু অনেক বিষয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিবেচনাপূর্ব্বক অতি সাবধানে পরামর্শ দিতেন। নিম্নলিখিত পত্রখানি ইহার একটী প্রমাণ,—

"সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

কয়েক দিবস হইল মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি, কিন্তু নানা কারণে সাতিশয় ব্যস্ততা-প্রযুক্ত এত দিন উত্তর লিখিতে পারি নাই, ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

আপনার কন্যার বিবাহ-বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি; কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফল কথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোনক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্ম্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রবাবু

* এই কথাটী সাহিত্য গুরু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ যদি আপনি দেবেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মপ্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্ব্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, একপ অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায়, তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনার হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ের স্বয়ং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেই আমার মতে সর্ব্বাংশে ভাল হয়।

আমি কায়িক ভাল আছি। ইতি তাং ৬ আশ্বিন*।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে অতি সরল ও সুদৃঢ় বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্যই পরমহংস দেবের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারেই বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমহংস দেবের সরলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। পরমহংস দেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,—"আজি সাগরে আসিয়াছি, কিছু রত্ন সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইব।" ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলেন,—"এ সাগরে কেবল শামুকই পাইবেন।" ইহাতে পরমহংস দেব পরম পুলকিত চিত্তে বলেন,—

* এই পত্রখানি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "অনুশীলন" নামক মাসিক পত্রের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় (১৩০১ সালের ফাল্গুন ও চৈত্রে) প্রকাশিত হইয়াছিল।

"এমন না হইলে সাগরকে দেখিতে আসিব কেন?" অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অন্তরে স্থান দিয়াছিলেন। পরমহংস দেব যে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাদর-অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া আসন গ্রহণ করেন, সেই সময় বর্দ্ধমান হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন আত্মীয় বন্ধু এক হাঁড়ি খাবার লইয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমহংস দেবকে তাহা আহার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পরমহংস দেব সরল-সহাস্য বদনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বুদ্ধি প্রবৃত্তি যেরূপই হউক, ভগবৎকৃপায় তিনি এরূপ সাধু-সমাগমে নিতান্ত সৌভাগ্যহীন ছিলেন না।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বহু-বিবাহ

১২৭৮ সালের শ্রাবণ মাসে বা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না" বিচারের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয়,—বহু-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না। কয়েকটী কারণে হিন্দুর একাধিক বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ পুস্তকের প্রারম্ভে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দশরথ বহু-বিবাহ করিয়াছিলেন। পুত্রাভাব-নিবন্ধন দশরথের বহু-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা বলিয়াছেন। যে কয়টী কারণে একাধিক বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকৃত, তাহা এই,—

১. যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতি ক্রুর-স্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয়, তৎসত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ বিধেয়।

২. স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে ও অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে।

এতৎকারণ ব্যতীত একাধিক দারগ্রহণ অশাস্ত্রীয় এবং নিষিদ্ধ, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহ রহিত হইয়াছে; সুতরাং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা। এ কথার শাস্ত্রীয়তা বা অশাস্ত্রীয়তা লইয়া কোনও বিচারও

উত্থাপিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে কৌলীন্যসম্মত বহুবিবাহ পাপাবহ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এতৎ-প্রমাণার্থ তিনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছেন।

কোন আত্মীয় কন্যার কষ্টানুভবে তিনি বহু-বিবাহ রহিত করিবার জন্য উদ্যোগী হন। আত্মীয় কুলীনকন্যার পতি বহু-বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায়ই পতি-সাক্ষাৎ-লাভ ঘটিত না। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"আমাদের অদৃষ্টে যা ছিল, তা হইয়াছে; আমাদের কন্যারা যাহাতে, আর কষ্ট না পায়, তাহার একটা উপায় করিতে পারেন?" ইহারই পর হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু-বিবাহ রহিতকরণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। বাংলার কোন্ কোন্ কুলীনের একাধিক বিবাহ হয়, তাহারও তিনি তালিকা সংগ্রহ করেন। এই তালিকা "বহু-বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকে" সন্নিবেশিত আছে।

১২৬২ সালের ১৩ই পৌষ বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর বহু-বিবাহ-বন্দ-করণাভিপ্রায়ে বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রমুখ অনেক ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইয়াছিল। এই আবেদনের মর্ম্ম এই,—"কোন কোন বিশেষ কারণে শাস্ত্রে একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু এখন এতৎসম্বন্ধে যথেচ্ছাচার ঘটিয়াছে। কুলীনদের ভিতর এই যথেচ্ছাচার প্রবল। কেবল অর্থ-লালসায় অনেকে বহু-বিবাহ করিয়া থাকে। সমাজে ভ্রূণহত্যা রূপ নানা অনর্থ সংঘটিত হইতেছে। এতন্নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ আইন করা উচিত।" এ আবেদনে ফল হয় নাই। তবুও অন্দোলন চলিয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট ইহাতে মনোযোগী হইতে পারেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে যখন কাশীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন, সেই সময় এসম্বন্ধে আইন হইবার উদ্যোগ হয়; কিন্তু কিয়দ্দিন পরে রাজা বাহাদুরকে ব্যবস্থাপক সভা হইতে যথানিয়মানুসারে বিদায় লইতে হইয়াছিল; সুতরাং উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত হইল না। ১৮৬৫ সালে তাৎকালিক বঙ্গেশ্বর স্যর সিসিল বিডন সাহেবের নিকট বহুজন-স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে যে কোন ফলোদয় হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যান। শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন তিনি এতৎসম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করিতে পারেন নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় এতৎসম্বন্ধে একটা আন্দোলন উপস্থিত

হয়। সভায় বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। এই অবসরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনরায় এতদ্দালোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেই আলোচনার ফল,—এই প্রথম পুস্তক।

প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত ক্ষেত্রনাথ স্মৃতিরত্ন, মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন প্রমুখ অনেকেই ইহার প্রতিবাদ করেন। সেই সময় ইহা লইয়া, সমগ্র বঙ্গদেশ বিলোড়িত হইয়াছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। অন্যান্য পুস্তক বাঙ্গালায়। এই সব প্রতিবাদীর মত খণ্ডনার্থ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না?" বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়।

বহু-বিবাহের আন্দোনকালে উপযুক্ত ভাইপোর পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল। উপযুক্ত ভাইপো এইবার তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে লইয়া পড়িয়াছিলেন। তারানাথের উপর ভাইপোর তীব্র আক্রমণ। ভাষা-ভঙ্গী ভীষণ ভ্রূকুটীময়ী। তাহা সভ্য সাহিত্যের সম্মানাস্পদ নহে। একটু নমুনা দিই,—

> "এত কাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ভুর।
> হতদর্প হইল বাচস্পতি বাহাদুর॥
>
> সকলের বড় আমি মম সম নাই।
> কিসে এই দর্প কর ভেবে নাহি পাই॥ ··
>
> তুমি গো পণ্ডিত-মূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধি হীন।
> অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্ব্বাচীন॥"

ভাইপোর এ পুস্তকের নাম "অতি অল্পই হইল।" পুস্তকের প্রারম্ভে উপরোক্ত ছড়া। পরে আরও গালিগালাজ গদ্যে। তদুদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। অনেকেই বলেন, এ ভাইপো স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই। আমরা কিন্তু ইহার তাদৃশ প্রমাণ পাই নাই। এ ভাষার ভাব-ভঙ্গী বিদ্যাসাগরের চরিত্রোচিত নহে। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও ইহার উত্তরচ্ছলে একখানি ২০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইহা ভাইপোর মতন তীব্র নহে। তবে ভাইপোর উপর কটাক্ষ আছে। "ভাইপোস্য" শব্দ অশুদ্ধ ধরিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় ভাইপোকে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়াছেন। "কস্যচিৎ উচিতবাদিনঃ" নাম দিয়া এক ব্যক্তি "প্রেরিত তেঁতুল" নামে একখানি ২৫ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি আক্রমণ ছিল। এতদ্ব্যতীত গান ছড়াও

অনেক রকম প্রকাশিত হইয়াছিল। এডুকেশন গেজেটের প্রেরিত পত্রে "কুলীন-কামিনীর উক্তি" নামে একটী পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যেরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে যে-ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা বিস্তোচিত হয় নাই। এই সূত্রে উভয়ের যে মনোমালিন্য হইয়াছিল, তাহা আর এ জন্মে বিদূরিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিচারে ভাষাভিজ্ঞতা, তর্কনিপুণতা, মীমাংসাপটুতা, অনুসন্ধিৎসা এবং বিদ্যাবুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন বটে; কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে আক্রমণ করিতে গিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে যে তর্কপ্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন, বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত তেমন অল্প লোকেই পারিয়াছে। কোন কোন আত্মস্পর্দ্ধী দাম্ভিক লেখক তাঁহাকে সময়ে সময়ে 'নিজস্ব হীন' বলিয়া, তাঁহার গৌরবহানির চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থনিচয়, সেই সব দাম্ভিক পুরুষদের রহস্য-বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না?" পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, যাঁহাদের এরূপ স্পর্দ্ধা দেখিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা কৃপার পাত্র মনে করিয়া রাখিয়াছি। কেননা, সেরূপ স্পর্দ্ধা ব্যাধিবিশেষ।

"বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না?" বিষয়ক পুস্তক লইয়া বাদানুবাদ করিতে চাহি না। তাহার স্থানও নাই। এ সম্বন্ধে আইন যে হয় নাই, ইহাই দেশের মঙ্গলের বিষয়। আইনে বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়, "বহু-বিবাহ" সংক্রান্ত পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ, পুত্র বর্জ্জন ও আনুইটি ফণ্ড

১২৭৯ সালের আষাঢ় মাসে বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনীর সহিত চব্বিশ পরগণা রুদ্রপুর নিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়*।

এই সময় পুত্র নারায়ণের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা কারণে বিরক্ত

* ইনি মানভূম-পুরুলিয়ার সব্-রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

হন। ক্রমে বিরক্তি এত দূর উৎকট হইয়া উঠিল যে, প্রিয়তম পুত্রকেও হৃদয়ের শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিতে হইল। মধ্যে একটা বিরাট্ ব্যবধান পড়িয়া গেল। পিতার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামী বলিতে পারেন, কিন্তু পুত্রের কর্ত্তব্যক্রটী সংশোধিত হইল না বলিয়া, পুত্রকে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার বাহ্ ভাবে মনে হইত, তাহাতে তিনি যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। পুত্র নারায়ণের বিসর্জ্জনে মাতা দারুণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। সে কুসুমাদপি-কোমল প্রাণ দাবানলে দগ্ধভূত হইয়াছিল। মাতার সুখস্বচ্ছন্দতা ছিল না। ইহার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বনিতার প্রসন্নতাফলভোগে কতক বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

নারায়ণ পিতা কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইয়া স্বকীয় চেষ্টায় সব রেজিষ্ট্রারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি পিতার ন্যায় তেজস্বী ও কৃতাত্মনির্ভর ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় পিতার বাড়ীতে আসিতেন। দিনকতক থাকিয়া আবার চলিয়া যাইতেন। পিতার সঙ্গে কিন্তু বাক্যালাপ হইত না। কর্ত্তব্য-ক্রটীহেতু একেবারে পুত্র-বিসর্জ্জন এ সংসারে বিরল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্র বর্জ্জনের একটী প্রকট দৃষ্টান্ত ফল। কিন্তু স্বাভাবিক মমতা সহজ পদার্থ নহে। কর্ত্তব্যানুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্র নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নারায়ণের প্রতি তাঁহার স্নেহ যে বিচলিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক দিন তিনি নারায়ণের ফটোগ্রাফ দেখিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। নারায়ণের প্রতিগৃহীত হইবার বড় আশাও ছিল না। অনেকে তাঁহার বিপক্ষে প্রায় গুরুতর অভিযোগ আনিত। তাহাতে পুত্রকে পুনর্গ্রহণের প্রবৃত্তি আর জাগিতে পারিত না।

১২৭৯ সালের ২রা আষাঢ় বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন "হিন্দু ফ্যামিলি আনুইটি ফণ্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই "ফণ্ড" প্রতিষ্ঠার মহদুদ্দেশ্য—সামান্য আয়-সম্পন্ন বাঙ্গালী, মৃত্যুকালে পিতা, মাতা, বনিতা, সন্তান-সন্ততি কিম্বা আত্মীয়-বর্গের জন্য কোনরূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারে না; যাহাতে এরূপ সংস্থান হয়, তাহার জন্য এই ফণ্ডের সৃষ্টি। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তোমার স্ত্রী কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় তোমার মৃত্যুর পর মাসে মাসে যাবজ্জীবন পাঁচ টাকা হিসাবে পাইবে, তাহা হইলে তোমাকে প্রত্যেক মাসে এই ফণ্ডে দুই টাকা চারি আনা আন্দাজ জমা দিতে হইবে। তোমার দেহান্তে তাহা হইলে তোমার স্ত্রী বা আত্মীয় মাসে মাসে পাঁচ টাকা পাইবে। এইরূপে দশ টাকার সংস্থান করিবার ইচ্ছা হইলে, উপরোক্ত হিসাবের অনুপাতে ফণ্ডে টাকা জমা দিতে হইবে। ত্রিশ

টাকা পর্য্যন্ত সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ একটী ফণ্ডের যে প্রয়োজন, ১২৭৮ সালের ১২ই ফাল্গুন বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে একটী সভা করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম ১০টী "সবস্ক্রাইবার" লইয়া ৩২নং কলেজ ষ্ট্রীটে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত দুই চারি জন ইহার সাহায্যার্থ এককালীন মোট টাকা দিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার রাজপরিবার দিয়াছিলেন, দুই হাজার পাঁচ শত টাকা। প্রথম বৎসর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ইহার "ট্রষ্টি" হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরও এই দুই জনই "ট্রষ্টি" থাকেন। তৃতীয় বৎসর অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর [মহারাজ] যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয় "ট্রষ্টি" হন। সভার প্রতিষ্ঠাকালে নিম্নলিখিত ব্যক্তি নিম্নলিখিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন,—শ্যামাচরণ দে—চেয়ারম্যান; মুরলীধর সেন—ডেপুটী চেয়ারম্যান; রায় দীনবন্ধু মিত্র,* রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, নন্দলাল মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন এবং পঞ্চানন রায়চৌধুরী,—ডাইরেক্টর। নবীনচন্দ্র সেন—সেক্রেটরী। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার,—"সবস্ক্রাইবার"দের রোগাদি-পরীক্ষক। "আনুইটি ফণ্ড" যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই উদ্দেশ্যে "আলবার্ট লাইফ আস্যুরেন্স কোম্পানী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা টিকে নাই। অনেকের ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আনুইটি ফণ্ডে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্রব ছিল। তাঁহার মতে 'ফণ্ড' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিন বৎসর 'ফণ্ডে'র কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিয়াছিল। ১২৮২ সালের ১৩ই পৌষ বা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি ডাইরেক্টরদিগকে ফণ্ডের সংস্রবত্যাগের কল্পে পত্র লিখেন। ১২৮২ সালের ১৯শে পৌষ বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারিতে একটী বিশেষ সভায় ডাইরেক্টরেরা তাঁহার সংস্রব-ত্যাগের কারণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১২৮২ সালের ১০ই ফাল্গুন বা ১৮৭৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া সংস্রব-ত্যাগের কারণ বিবৃত করেন। এই পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। পত্রখানি "ফুলিস্কেপ" কাগজের প্রায় ২০।২২ পৃষ্ঠা হইবে। পত্রের ভাষা তেজস্বিনী। সংস্রব-ত্যাগের কারণ যুক্তিপূর্ণ। পত্র পড়িলে এই বুঝা যায়:—

* রায় দীনবন্ধু মিত্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিন্ন সৌহার্দ্দ্য ছিল। সুকিয়া ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার নিকট রায় দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ী ছিল। এই সময় উভয়ে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। জাতিভেদ ছিল বটে; সখ্যে উভয় পরিবার যেন এক পরিবার ছিলেন।

তাৎকালিক সেক্রেটরী ও তৎদলাক্রান্ত কয়েকটী ডাইরেক্টরের একাধিপত্যে ফণ্ডের কার্য্য বিশৃঙ্খল হইতেছে ভাবিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ফণ্ডের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী পাঁচ জনে একত্র কাজ করিতে পারে না বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ফণ্ডের বিশৃঙ্খলতার উল্লেখে তিনি স্পষ্টই এ কথা বলিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসে তিনি প্রথমে এ ফণ্ডের কার্য্যে যোগ দিতে চাহেন নাই। পরে একান্ত অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া তিনি ফণ্ডের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

ফণ্ডের কার্য্যে "সবস্ক্রাইবার" উদাসীন ছিলেন, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণা হইয়াছিল। ডাইরেক্টরদিগের সম্বন্ধে এই অভিযোগ হয় যে, তাঁহারা ফণ্ডের নিয়ম মানেন না; পরন্তু ফণ্ডের মঙ্গলসাধন-পক্ষে তাঁহাদের মনোযোগ ছিল না। ডাইরেক্টর ও সবস্ক্রাইবার সম্বন্ধে এই অভিযোগের কথা ফণ্ডের রিপোর্টে লিখিত আছে*।

সেক্রেটরী ও তৎদলাক্রান্ত ডাইরেক্টদিগের একাধিপত্য কিরূপ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সুদীর্ঘ পত্রে অতি বিস্তৃতভাবে অনেক কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। হিসাব-নিকাশ নাই; ফণ্ডের নিয়মপরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলেও তাহা করা হয় নাই; সভার রিপোর্টে সভাপতি স্বাক্ষর না করিলেও, তাঁহার নাম স্বাক্ষর করা হইয়াছিল; ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া আনা হইয়াছিল; ইত্যাদি ব্যক্তিবিশেষের উপর অনেক দোষারোপ আছে। সে সব কথা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তৎপ্রকাশে ফলও নাই। ইহাতে আর একটা গুরুতর অভিযোগ ছিল। ডাইরেক্টরদের একান্ত অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'ফণ্ডে'র জন্য এক জন কেরাণী মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করেন। এই কেরাণী অন্যত্র কাজ করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ছাড়াইয়া আনেন। সেক্রেটরী ডাইরেক্টরদের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া এই কেরাণীকে ছাড়াইয়া দেন। এ জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সব কারণ ও যুক্তি দেখাইয়া ফণ্ডের সংস্রবত্যাগ

*"The charge against the subscribers was indifference to the affairs of the Fund and the charges against the Directors were disregard of the rules and neglect of the true interests of the Fund."—Proceedings of a special meeting of subscribers to the Hindu Family Annuity-Fund, held at the Hindu School on Sunday, 2nd January 1876.**

করেন, তাহা মর্ম্মান্তিক কষ্টকর। এ সংস্রবত্যাগে তিনি যে কিরূপ মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি অতি সরল ও করুণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যে কয়েকটী কথা লিখিয়া, তিনি পত্রের শেষ করিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"এই ফণ্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তর কালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে; আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান্ হওয়া, তাহার পরম ধর্ম্ম ও তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফণ্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেই জন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যাঁহাদের হস্তে আপনারা কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এমন স্থলে, এ বিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভাগী হইতে ও ধর্ম্মদ্বারে অপরাধী হইতে হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, আমায় এ সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে।

১রা জানুয়ারির বিশেষ সভায় আপনারা ইচ্ছা প্রকাশ ও অনুরোধ করিয়াছেন, আমি পুনরায় এই ফণ্ডের সংস্রবে থাকি; কিন্তু আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ফণ্ডের "সবস্ক্রাইবার" হইবার অভিপ্রায়ে অনেকে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আইসেন। সে সময় আমার বিষম সঙ্কটে পড়িতে হয়। ফণ্ডের যেরূপ কাণ্ড দেখিতেছি, তাহাতে আমার বিবেচনায়, কাহাকেও "সবস্ক্রাইবার" হইতে পরামর্শ দেওয়া যারপরনাই অন্যায় কর্ম্ম আর, কাহাকেও "সবস্ক্রাইবার" হইতে নিষেধ করাও যারপরনাই অন্যায় কর্ম্ম; কারণ উত্তরকালে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা জানিয়া, কাহাকেও "সবস্ক্রাইবার" হইতে পরামর্শ দিলে, তাহাকে প্রতারনা করা হয়, "সবস্ক্রাইবার" হইতে নিষেধ করিলে, ফণ্ডের প্রতিকূলাচরণ করা হয়। জ্ঞানপূর্ব্বক কাহাকেও প্রতারণা করা আর, কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া কোন অংশে এ বিষয়ে প্রতিকূল আচরণ করা, এই উভয়ই অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম।

অতঃপর ফণ্ডের সংস্রবে থাকিতে গেলে, হয় প্রথম, নয় দ্বিতীয়, গর্হিত কর্ম্ম না করিলে, কোনমতে চলিবে না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া, আমি আপনাদের অনুরোধ রক্ষায় সক্ষম হইতেছি না ; সে জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, তথাপি আপনারা আমার উপর এত দূর বিশ্বাস করিয়া গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এ জন্য আপনাদের নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ঐ গুরুতর ভার বহন করিয়া যতদিন এই ফণ্ডের সংস্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষী হইয়াছি ; দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মার্জ্জনা করিবেন। যতদিন আপনাদের ট্রষ্টি ছিলাম, সাধ্যানুসারে ফণ্ডের হিতচেষ্টা করিয়াছি, জ্ঞানপূর্ব্বক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সে বিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা বা অমনযোগ করি নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া বিদায় দেন, প্রস্থান করি।

কলিকাতা, ১০ই ফাল্গুন, ১২৮২ সাল | ভবদীয়স্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ"

অতঃপর ফণ্ডের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর কোন সংস্রব ছিল না। অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র ও রাজা (পরে মহারাজ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার পর ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগ করেন। ফণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সরকার বাহাদুরের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর সংস্রব-ত্যাগে ফণ্ডের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। অধুনা ফণ্ডের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় উৎসাহে, ষোল আনা প্রাণ খুলিয়া, আন্নুইটি ফণ্ডের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রধান উদ্যোগী বলিয়া প্রথম গঠনবন্ধনে ইনি এই সমাজের ট্রষ্টি বা কর্ত্তানায়ক হইয়াছিলেন। এক বৎসর কাজ করিলেন। প্রথম বৎসর খর উৎসাহ-বেগ একটু কমিল, দ্বিতীয় বৎসর আর একটু ; তৃতীয় বৎসরে বিদ্যাসাগরের প্রাণ এ বন্ধন আর সহিতে পারিল না। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী—এ যুগের ফুটন্ত বাঙ্গালী। এ যুগে বাঙ্গালী দশে মিলিয়া এক সঙ্গে থাকিতে পারে না, দশে মিলিয়া একসঙ্গে কাজ করিতে পারে না। এখন সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্বেচ্ছাচারী, সকলেই আপন মতের অবলম্বী। দেশের লোকের এ বিষয়ে মতিগতি বিকৃত পথে যাইতেছে দেখিয়া, বিদ্যাসাগর আন্নুইটি ফণ্ডের উপর বিপরীত দৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালপ্রভাব তীব্র তেজের নিকট ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র তেজ টিকিবে কেন? তিন বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাসাগরকে হাল ছাড়িতে হইল। তিনি অনেকের ঘাড়ে এক সঙ্গে

কাজ করিবার অসমর্থতার দোষ চাপাইয়া ফণ্ড-তরীর কাণ্ডারিগিরি ছাড়িয় দিলেন। তিনি দোষ দিলেন অপরকে; কিন্তু অপরে দোষে দেন তাঁহাকে। তাঁহারা বলেন, বিদ্যাসাগর কখনই কাহারও সঙ্গে একযোটে কাজ করিতে পারেন নাই। প্রথমে তিনি মিশিতেন বটে; কিন্তু শেষ রাখিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগরের বিশেষত্বই ইহার কারণ। এরূপ বিশেষত্বে তেজস্বিতার পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক সময় ইহাতে যথেচ্ছাচার আসিয়া পড়ে।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

স্বাধীন মত, জামাতার মৃত্যু, দুহিতা, দৌহিত্র ও মেট্রোপলিটনের শাখা

বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও সন্তোষ বা অসন্তোষের জন্য কোন কথা গোপন করিতেন না। তাঁহার বিবেচনায় যাহা অন্যায় বোধ হইত, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতেন। নিজের অভিপ্রায় বা মত অকপট চিত্তে না বলিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগের পত্রে ইহার প্রমাণ। তিনি কখন আপন মত স্বাধীনভাবে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অপরকে স্বাধীন ও সঙ্গত মত প্রকাশে অকুণ্ঠিত দেখিলে, তিনি প্রীতিলাভ করিতেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার প্রমাণ,—

একদিন ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, স্বর্গীয় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান।

তর্করত্ন মহাশয়ের তখন ছাত্রাবস্থা। তবে পাঠ সমাপ্তি প্রায় হইয়াছে। ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতগণের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। শেষে একটু ধর্ম্মের তর্ক আসিয়া পড়িল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—দেখ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সব দল বাঁধা কাণ্ড, এই দেখ, মনুর একটী শ্লোক,—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন দুষ্যতি ॥" —মনুসংহিতা।

পিতা পিতামহ যে পথে চলিয়াছে, সৎপথ অবলম্বন করিয়া সেই পথেই চলিবে, তাহাতে চলিলে দোষ হয় না, কেন বাপু, সৎপথেই যদি চলিবে তবে আবার পিতা পিতামহ কেন? আর যদি পিতা-পিতামহের পথেই চলিতে হয়, তবে আবার সৎপথ কেন? দুই পথ না বলিলে দল রক্ষা হয় না, এই না?

পাছে অপরের অপর জাতির সৎপথে লোক যায়, দল ভাঙ্গিয়া যায়, এই জন্যই না মনুঠাকুরকে এত মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। তাই বলি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সব দলবাঁধা কাণ্ড।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বিনীত ভাবে বলিলেন—আমার প্রকৃত অভিপ্রায় স্বতন্ত্র; তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে মনুবচনের যেরূপ ভাব হইলে মহাশয় কিয়দংশে সন্তুষ্ট হইতে পারেন, একটু যত্ন করিলে তো সে অর্থ করা যায়।

বিদ্যাসাগর। কিরূপে সে অর্থ হয় বল।

তর্করত্ন। 'সতাং মার্গং' এই স্থলে শেষের অনুস্বারটী লিপিকর প্রমাদে ঘটিয়াছে। অনুস্বার না হইয়া বিসর্গ হইলে, এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে। অর্থাৎ পিতা-পিতামহের অবলম্বিত পথে চলিবে। ইহা, সাধুগণের পন্থা।

বিদ্যাসাগর। ন্যায়রত্ন, এই ছেলেটী তো ভাল দেখিতেছি।

ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভৃতি তর্করত্ন মহাশয়ের বিশেষ প্রসংসা করিলেন। পরিশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, এত যে প্রশংসা করিতেছ, ইহার পরিণাম তো ভিক্ষাবৃত্তি। ন্যায় পড়িয়াছে, অন্য দর্শন পড়িাছে, বেশ করিয়াছে, এখন বাড়ীতে বলিয়া উপবাস করিবে, তার আর ভাবনা কি?

১২৭৯ সালের ২৩শে মাঘ বা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ঠা ফেব্রুয়ারি, ৺বারাণসী ধামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাগিনেয় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত কাশী গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। জামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় শোক-সন্তাপে অধীর হইয়া পড়েন; কিন্তু শোক-কাতরা কন্যাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তিনি পাষাণ চাপে দারুণ শোকানল চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় জামাতা গোপালচন্দ্রকে পুত্রাধিক ভালবাসিতেন। জামাতা যেমন সুপুরুষ, সুশ্রী ও বিদ্বান্ ছিলেন, তেমনই অমায়িক ও বিনয়ী ছিলেন। কবিতা-রচনায় তাঁহার শক্তি ও আসক্তি ছিল। বিধবা কন্যার মুখপানে তাকাইলে বিদ্যাসাগরের বুক ফাটিয়া যাইত। কন্যা একাদশী করিতেন। তিনিও একাদশীর দিন অন্ন জল গ্রহণ করিতেন না। দুই বেলার আহারও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কন্যার অনুরোধে কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাঁহাকে এ কঠোরতা পরিত্যাগ করিতে হয়।

কন্যাকে তিনি গৃহের সর্ব্বময়ী করিয়াছিলেন। কন্যাও কায়-মনো-বাক্যে পিতৃ-সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মপটুতায় এবং স্নেহসুজনতায় পরিবারবর্গের সকলেই সন্তোষ লাভ করিত। বিধবা কন্যা

বিদ্যাসাগরের গৃহে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমানা। তাঁর পুত্র দুইটী বিদ্যাসাগরের স্নেহবাৎসল্যে এবং করুণাশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পিতার আদরযত্নে এবং পিতৃসংসারের কার্য্যানবচ্ছেদে তিনি স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিসংযোগে একটী বারও অশ্রুপাতের অবসর পাইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় দৌহিত্রদ্বয়ের বিদ্যার্জ্জনের পক্ষে কোন ত্রুটি রাখেন নাই। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং দ্বিতীয় দৌহিত্র শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি উভয়েই বাড়ীতে সংস্কৃত ও ইংরাজি শিক্ষা করিতেন*। স্কুলে দেওয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না। তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে সংস্কৃত শিখাইবার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল না। তাঁহাদিগের পায়ে কাঁটা ফুটিলে বিদ্যাসাগরের বুকে বাজ বাজিত। তাঁহাদের মুখে পিতৃবিয়োগের স্মৃতিজনিত কোন আক্ষেপোক্তি শুনিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় যৎপরোনাস্তি যাতনা অনুভব করিতেন। একবার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র বিলাত যাইবার জন্য উদ্যোগী হন। মাতামহ এবং মাতা উভয়েই নিষেধ করেন। সুরেশচন্দ্র একদিন আহার করিতে করিতে, মাকে বলিয়াছিলেন,—"আমার বাপ থাকিলে কি, তোমার বাপকে বলিতে যাইতাম?" বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তরাল হইতে এই কথা শুনিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। দৌহিত্রদের আহারের সময় তিনি প্রত্যহ নিকটে বসিয়া থাকিতেন। কাহারও কোন সদনুষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। একবার কনিষ্ঠ দৌহিত্র পথপতিত একটী আমাশয়-রোগাক্রান্ত রোগীকে তুলিয়া লইয়া বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। দৌহিত্রের করুণা তাঁহার কারুণ্যস্রোতে মিশিয়া গঙ্গা-যমুনার স্রোত বহিয়াছিল। তিনি স্বয়ং রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহু চেষ্টায় কিন্তু রোগী জীবন লাভ করিতে পারে নাই। জ্যেষ্ঠ সুরেশচন্দ্রের রচনা-শক্তি তাঁহার বড় প্রীতিপ্রদায়িনী হইয়াছিল। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রবৎ স্নেহের ভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে মাতামহের রহস্য ভাষেও বঞ্চিত হইতেন না। বিদ্যাসাগর যে ষড় রসের পূর্ণাধার। তিনি আপন দুইটী দৌহিত্রের ভার তো লইয়াছিলেন; অধিকন্তু জামাতার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী, তাঁহার প্রতিপাল্য হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভরণ-পোষণেরও ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* সুরেশচন্দ্র সমাজপতি "বসুমতী" সংবাদপত্র ও "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক, সুলেখক এবং সুবক্তা ছিলেন।

দারুণ শোক-তাপেও বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল-কলেজের শুভানুধ্যানে এক মুহূর্ত্ত বিরত হইতেন না। স্কুল-কলেজের কথা মনে হইলে, তিনি শোকতাপের সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেন। শোকতাপে অভিভূত হইয়াও, তিনি ১৮৭৪ সালে কলিকাতা শ্যামপুকুরে মেট্রোপলিটনের শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। মূল বিদ্যালয়ের ন্যায় অল্প দিনে ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

পাদুকা-বিভ্রাট

১২৮০ সালের ১৬ই মাঘ বা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীর মৃত কবি হরিশ্চন্দ্রকে কলিকাতার "মিউজিয়ম" (যাদুঘর) দেখাইতে লইয়া যান। সঙ্গে রাজকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তখন পার্ক ষ্ট্রীটে যাদুঘর ও এসিয়াটিক সোসাইটী এক বাড়ীতেই ছিল। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশ, সেই থান-ধুতি, থান-চাদর ও চটি জুতা। কবি হরিশ্চন্দ্রর* পোষাক-পরিচ্ছদ আধুনিক সভ্যজনোচিত. পায়ে ইংরেজি জুতা, গায়ে চাপকান চোগা এবং মস্তকে পাগড়ী। গাড়ী হইতে নামিয়া তিন জনেই যাদুঘরে প্রবেশোন্মুখ হইলেন। দ্বারবান্ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাইতে নিষেধ করিল। হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে নিষেধ রহিল না। সুরেন্দ্রবাবুও নিশ্চিতই সুসজ্জিত ছিলেন; কেননা তিনিও অবাধে

* হরিশ্চন্দ্র একজন প্রতিভাশালী হিন্দী কবি। হিন্দী কবিত্বযশে বর্ত্তমান কালে তিনি অতুলনীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। গুণগ্রাহিতার গুণে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের প্রগাঢ় সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহে বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র জগন্নাথ তীর্থে যাইবার জন্য কলিকাতায় আসেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আপনার সকল পুস্তকের অনুবাদাধিকার দিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী যখন কাশীধামে ছিলেন, হরিশ্চন্দ্র তখন তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। একদিন হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীকে বলেন,—"বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতে রূপার খাড়ু।" ইহাতে বিদ্যাসাগরের জননী উত্তর দেন,—"সোনা রূপায় কি করে? উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় এই হস্তে রাঁধিয়া সহস্র সহস্র লোককে খাওয়াইয়াছিল। তাহাই বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতের শোভা।" কবি হরিশ্চন্দ্র অকালে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ৩৪ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

প্রবেশাধিকার পাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্য বুঝান হইল, তাঁহার মতন একজন উড়িয়াকে জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে*।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। এ সংবাদ তাৎকালিক "এসিয়াটিক সোসাইটী"র আসিটাণ্ট সেক্রেটরী ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ† মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,— "আমি আর যাইতেছি না অগ্রে কর্ত্তাদিগকে পত্র লিখিয়া জানিব, এরূপ কোন নিয়ম আছে কি না, আর যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার করিতে পারি তা আসিব।" এই বলিয়া তিনি সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে ইংরেজিতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রষ্টির অনররি সেক্রেটরী
শ্রীযুক্ত এইচ. এফ্. ব্লানফোর্ড স্কোয়ার সমীপেষু
মহাশয়,

আমি গত ২৮শে জানুয়ারি এসিয়াটিক সোসাটীর লাইব্রেরী দেখিতে যাই। আমার পায় দেশী জুতা ছিল বলিয়া, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে পাই নাই। জুতা না খুলিলে শুনিলাম, প্রবেশ নিষেধ। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকটা মনক্ষুণ্ণ হইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম।

দেখিলাম যে সব দর্শক চটি জুতা পায়ে দিয়াছিল, তাহাদিগকে জুতা খুলিয়া হাতে করিয়া লইয়া ফিরিতে হইতেছে। কিন্তু ইহাও দেখিলাম, কতিপয় পশ্চিমালোক দেশী জুতা পরিয়াই যাদুঘরের এদিক ওদিক ফিরিতেছে।

আরও দেখিলাম, সম্ভবতঃ কালীঘাটের প্রসাদী পুষ্পমাল্য গলায় পরিয়া যাহারা যাদুঘরে যাইতে চাহিতেছে, তাহাদিগকেও ফুলের মালা বাহিরে রাখিয়া যাইতে হইতেছে।

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময় অপরিচিত জনের নিকট সত্য সত্যই একজন সভ্যভব্য উড়িয়ার সম্মান লাভ করিতেন। তিনি একদিন স্বয়ং হাসিতে হাসিতে এই গল্পটী করিয়াছিলেন,— "আমি পটলডাঙ্গার পথ দিয়া যাইতেছিলাম; সেই সময় তাগা- হাতে, দানা গলায়, তসর-পরা, বোধ হয় কোন বড়মানুষের ঝি যাইতেছিল। আমার চটি জুতার ধূলা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। মাগী বলিল;—'আ মর উড়ের তেজ দেখ।' কাম্বেল সাহেব সত্য সত্যই আমাকে উড়ে করেছে।" কাম্বেল সাহেবের সময় বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়।

† শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এখন বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেছেন।

এই জুতা রহস্যের কারণ আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যাদুঘর তো সাধারণের আরাম বিশ্রামের স্থান। এখানে এরূপ জুতাবিভ্রাট দোষাবহ। যাদুঘর যখন মাদুর মোড়া, কারপেটযুক্ত—বিছানা বা কারুচিত্রিত নহে, তখন এরূপ নিষেধবিধির আবশ্যকতা বা কি? তা ছাড়া, পায়ে যাহাদের বিলাতী জুতা, কিন্তু আসিয়াছে পদব্রজে, তাহারা যখন প্রবেশ করিতে পাইতেছে, তখন তাহাদের সমান অবস্থাপন্ন লোকে পায়ে শুদ্ধ দেশী জুতা বলিয়া প্রবেশ করিতে পায় না কেন, ইহা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। অবস্থা যাঁহাদের ইহাদেরও অপেক্ষা উন্নত, আসেন গাড়ী পাল্কী করিয়া, তাঁহাদিগের উপরই বা এরূপ নিষেধবিধি প্রবর্ত্তিত হয় কেন?

পসার-প্রখ্যাতিতে নামে মানে হাইকোর্ট সকলের সেরা। সেখানেও যখন এরূপ ব্যবস্থা নাই, তখন সাধারণের আরাম-বিশ্রামের স্থানে এরূপ অসঙ্গত নিষেধ-বিধি দেখিয়া আমাকে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইয়াছে।

এ কথা তুলিয়া আপনাদিগকে কষ্ট দিতে প্রথমে আমার ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু পরে ভাবিলাম যে, ট্রষ্টিদিগের ন্যায় বিশিষ্ট এবং শিক্ষিত ভদ্র লোক কর্ত্তৃক এই পাদুকার ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছে; কিন্তু ইঁহারাই আপন বাটীতে অথবা জনসমাজে কখনও এই অসম্মানসূচক এবং বিরক্তিকর প্রথার সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই; সুতরাং এ কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর না করিলে, তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। অতএব আমার অনুরোধ, এ বিষয়ের মীমাংসা জন্য আপনি পত্রখানি অনুগ্রহ করিয়া ট্রষ্টিদিগকে দেখাইবেন।

৫/২/৭৪ (স্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ এতৎসম্বন্ধে ইংরেজিতে যে পত্র সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষকে লিখেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই,—

এসিয়াটিক সোসাইটীর অবৈতনিক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারি তারিখে এক জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক এসিয়াটিক সোসাইটী সংলগ্ন পুস্তকাগারে প্রবেশ কালীন বহির্দ্দেশে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎসংক্রান্ত পত্রগুলি উক্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষসভায় বিচারার্থ প্রেরিত হইল।

আপনার বশংবদ ভৃত্য

(স্বাঃ) হেনরি এফ্‌ ব্ল্যানফোর্ড

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রষ্টিগণের অবৈতনিক সম্পাদক

মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইংরেজিতে যে পত্র লিখেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

কলিকাতা, ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

মহাশয় !

আপনি গত ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মিউজিয়াম প্রবেশ কালীন জাতীয় প্রথানুসারে বহির্দ্দেশে পাদুকা পরিত্যাগ বিষয়ে আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা উক্ত মিউজিয়মের ট্রষ্টিগণের গোচরার্থ অর্পণ করিয়াছি এবং প্রত্যুত্তরে আপনাকে অবগত করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, ট্রষ্টিগণ উক্ত প্রথা সম্বন্ধে কোনপ্রকার আদেশ প্রচার করেন নাই বা এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

আপনার ব্যক্তিগত আবেদন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উক্ত মিউজিয়ম, এসিয়াটিক সোসাইটীর অট্টালিকার মধ্যে আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। সোসাইটীর পরিচারকবর্গ মিউজিয়মের ট্রষ্টিগণের আজ্ঞাধীন নহে। যে সমস্ত ভৃত্যের বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহারা মিউজিয়ম বা সোসাইটী সংক্রান্ত কি না, তাহা আপনার পত্রে প্রকাশিত নাই। যাহা হউক, আপনি যখন উল্লেখ করিতেছেন যে, সোসাইটীর পুস্তকাগারে যাইবার পথে অট্টালিকায় প্রবেশকালীন উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, আপনার পত্রখানি উক্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষসভার অর্পণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

আপনার বশংবদ ভৃত্য

(স্বাঃ) হেন্‌রি এফ্ ব্ল্যানফোর্ড

অবৈতনিক সম্পাদক

পত্র লেখালেখি অনেক হইয়াছিল; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা রক্ষা হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় আর কখনও সোসাইটী বা মিউজিয়মে যান নাই;

এতৎসম্বন্ধে তৎকালে হিন্দু পেট্রিয়টে এইরূপ লেখা হইয়াছিল,—"বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে আসিয়া মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়কদিগকে নরম ভাবে একখানি পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলেন, মিউজিয়ামের অধ্যক্ষগণ দেশী জুতা পায়ে দিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ-সূচক কোন আদেশ করিয়াছেন কি না; আর বুঝাইয়া বলা হইল যে, এরূপ নিষেধ থাকিলে মান্য গণ্য দেশীয় ভদ্রলোক অথবা যে সব ব্রাহ্মণপণ্ডিত দেশী চটি জুতা পায়ে দেন, তাঁহারা আর সোসাইটীতে যাইতে চাহিবেন না। সোসাইটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাকে এই মর্ম্মে স্বতন্ত্র পত্র লেখা

হয়। মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, এরূপ হুকুম দেওয়া হয় নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় ফিরিয়া গিয়াছেন বলিয়া কিন্তু তাহার জন্য একটু দুঃখ-প্রকাশও করা হইল না, দ্বারবানকে দোষী করাও হইল না; আর ভবিষ্যতে তাহাকে এরূপ করিতে বারণ করা হইবে, তাহাও বলা হইল না। সোসাইটীর অধ্যক্ষসভা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটু টিটকারী দিয়া বলেন যে, "দেশীয় লোকে দেশীয় আচার-ব্যবহার ভাল জানেন।" পাঠক অবশ্য বুঝিবেন যে, মিউজিয়মের অধ্যক্ষ, আর সোসাইটীর অধ্যক্ষ-সভা স্বতন্ত্র জিনিস। দুই পক্ষের পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। সোসাইটীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্যকে বুঝাইয়া বলা হয়,—"দেশীয় আচার জুতা খোলা বটে; কিন্তু সে কোথায়? যেখানে চেয়ারে বসিবার ব্যবস্থা, সেখানে জুতা খুলিতে হয় না; যখন ফরসা বিছানায় বসিতে হয়, তখনই জুতা খুলিতে হয়। সম্মান দেখাইবার জন্য জুতা খোলা ভারতবাসীর নিয়ম নহে।"

এ সম্বন্ধে ইংলিসম্যান এই ভাবে বলিয়াছিলেন,—"বিদ্যাসাগরের মতন এক জন পণ্ডিতের প্রতি যখন এইরূপ ব্যবহার, তখন এসিয়াটিক সোসাইটীতে আর কোন পণ্ডিত যাইতে চাহিবেন না।"

সোসাইটির জুতাবিভ্রাটের সূত্র ধরিয়া ১২৮১ সালের ২৯শে আষাঢ় বা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখের "সাধারণীতে" "তালতলার চটি" শীর্ষক নিম্নলিখিত শ্লেষটী লিখিত হইয়াছিল,—

"রে তালতলার চটি! ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না! ইংরাজ বটবিটপীর সহিত সাখোটক [শ্যাওড়াগাছ] সমান করিয়া তুলিয়াছেন, কেবল বুট-চটির গৌরব এক করিতে পারিলেন না। ইংরাজ মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুরের সহিত মধু মুচীকে এক কাণফোঁড়া কাগজে গাঁথিলেন, কেবল রে চটি! তোর দুরদৃষ্টক্রমে বুট-চটি, এক ভাবে দেখিতে পারিলেন না। ইংরাজ বিচার-কার্য্যের সাহায্য-জন্য সাক্ষী ডাকিয়া আনেন, আনিয়া তিনু ক্ষেপার স্থানে শ্রীধর সার্ব্বভৌমকে দাঁড় করান, আবার সার্ব্বভৌমের স্থানে গুলজার মণ্ডলকে উঠাইয়া দেন। ইংরাজের চক্ষুতে উচ্চ নীচ নাই, কেবল রে চর্ম্মচটি! তোরই প্রতি তাঁহাদের সমদৃষ্টি হইল না। ইংরাজ বাহাদুর বস্ত্র পরিষ্কারককে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়াছেন, মলজীবির পুত্রকে মসীজীবি করিয়াছেন, ধীবর মৎসজীবিকে, ধীমান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পীরবক্স খাঁকে রায় বাহাদুর করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগা তালতলার চটি! এত উন্নতিতেও তোর কিছুমাত্র উন্নতি হইল না।

চটি, তুই আপন কর্ম্মদোষে আপনি মারা গেলি, এমন সামাজিক জোয়ারে তাই তুই ঠেলিয়া উঠিতে পারিলি না। তুই আপনার কর্ম্মদোষে মারা গেলি ·· তুই কিনা চটি! সেই নীচ পা নীচ বাঙ্গালীর পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলি? তোর দুর্দ্দশা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

···চটি তুই আপনি আপনার কর্ম্মদোষে মারা গেলি! তোকে যে সকল মহৎ স্থান দেখাইয়া দিলাম, যদি এতদিন সেই সকল স্থানে বিশ্রামের উদ্যোগ করিতিস্, তাহা হইলে এত দিন তোর গৌরব, তোর গুণ সাটর্ডে রিবিউ সংহিতা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইত। সেরূপ উন্নতির উদ্যোগ করা দূরে থাকুক, তুই কিনা সেই নীচস্য নীচ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে যে কুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহারই ফাটা পায়ের আশ্রয় লইয়া মহামন্ত্রপূত ইংরাজের যাদুঘরে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছা করিস? তালতলা সন্ততার এতদূর স্পর্দ্ধা। মৌচিকালয়ের নিভৃতার্দ্র প্রদেশে যদি ক্রমাগত দশ হাজার বৎসর উপর্য্যুপরি থাকিয়া লর্ড মেকলের তপস্যা করিতে পারিস, করিয়া, লালবাজারে জন্মগ্রহণ করতঃ পেণ্টুলনধারী কোন কেরাণীর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিতে পারিস, তবে এরূপ স্থানে আসিতে আকাঙ্ক্ষা করিস। তোর এ জন্মে, এ চর্ম্মচটি-জন্মে, কুসন্তান বিদ্যাসাগরের বলে তুই এ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবি না। বোধ হয়, তুই কখন মহর্ষি ডার্বিনের তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করিস্ নাই—মেটকাফ ভবনে যাইতে পারিবি না, সে তন্ত্র দেখিতে পাইবি কোথা হইতে? যদি তোর ডার্বিন-তন্ত্র পড়া থাকিত তো বুঝিতে পারিতিস্।"

চটির বড় লাঞ্ছনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রোপম প্রিয়পাত্র ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের মুখে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আর একটি গল্প শুনিয়াছি,—

পূর্ব্বে বহু-বিবাহের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে যাইতে হইয়াছিল। রাজদরবারের দ্বাররক্ষক তাঁহাকে চটিজুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে বলে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, জুতা খুলিয়াই দরবারে প্রবেশ করেন। বলা বাহুল্য, মহারাজ, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। রাজার নিকট বিদ্যাসাগরের এত সাদর-সম্মান দেখিয়া, দ্বাররক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সে অন্যান্য কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারে, যাঁহার এত সম্মান, তিনি স্বয়ং বিদ্যাসাগর। কার্য্যান্তে বর্দ্ধমানরাজ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিদায় দিবার জন্য দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর বিদায় দিয়া যেমন ফিরিলেন, অমনই দ্বার-রক্ষক করযোড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিল,—"আমি চিনিতে পারি নাই, ক্ষমা

করুন।”. বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—“তোমার দোষ কি? তোমার মনিবের যেমন হুকুম, তেমনই করিয়াছ।” রাজা এ কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া আসিলে পর তিনি দ্বাররক্ষককে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দেন। দ্বাররক্ষক অন্যান্য কর্ম্মচারীর পরামর্শমতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন। তিনি তখনই দ্বাররক্ষককে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, রাজা-বাহাদুরকে একখানি নরম-গরম পত্র লিখেন। রাজা বাহাদুর পত্র পাইয়া দ্বাররক্ষককে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

কলেজ-প্রতিষ্ঠা, মসীযুদ্ধ, দৈনিকের মত, আয়-হ্রাস, সাঁওতালের সহানুভূতি, রহস্য-রস ও অনারেবল দ্বারকানাথ

১২৭১ সালের ১১ই বৈশাখ বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রেল মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে বি. এ. ক্লাস পর্য্যন্ত খুলিবার জন্য তাৎকালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার এইচ. স্মিথ সাহেবকে আবেদন করা হইয়াছিল। সে আবেদনে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষর ছিল। ইঁহারা তখন ম্যানেজার ছিলেন। ফার্ষ্ট আর্টস ক্লাস খুলিবার কোন ক্রটি ছিল না। এই ক্লাসে ৩৯টী ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল। আনন্দকৃষ্ণ বসু, হিড়ম্বলাল গোস্বামী, বি.এ ও মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। এ আবেদনে ফল হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষেরা কলেজ খুলিতে অনুমতি দেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন। কলেজ খুলিবার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। ১২৭৮ সালের ১২ই মাঘ বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি কলেজ খুলিবার জন্য বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল—একত্র নাম স্বাক্ষর করিয়া তাৎকালিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সার্টক্লিফ সাহেবকে আবেদন করিয়াছিলেন। ১২৭৮ সালের ১৪ই বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাইস চ্যান্সালারকে স্বয়ং স্বতন্ত্র এক আবেদন করেন। এ আবেদনের মর্ম্ম এই,—

“আমরা মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিতে অদ্যকার সিণ্ডিকেটের নিকট আবেদন পাঠাইলাম। আপনাদিগের সহায়তার

আশা না করিলে আমি এ কর্ম্ম করিতাম না। গত বৎসর আপনার সহিত দেখা করিতে পারি নাই বলিয়া আমার দরখাস্ত করা হয় নাই। আমি জানি না, সিণ্ডিকেটের অন্যান্য সভ্যগণ এ সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করিবেন; কিন্তু এই ইনষ্টিটিউসনের এক জন কার্য্যনির্ব্বাহক সাটক্লিফ ও আটকিন্‌সন সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত মহোদয় বলিয়াছিলেন, যদিও এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক আপত্তি আছে, তথাপি তিনি আবেদনে সম্মতি প্রদান সম্বন্ধে বাধা দিবেন না। যদি সিণ্ডিকেটে সভ্য মহোদয়গণের মধ্যে এমন কথা উঠে যে দেশীয় অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে পাঠকার্য্য তেমন সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে না, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি সংস্কৃত কলেজে বি. এ. পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে এবং তাহা সুদ্ধ এ দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত। এ কলেজেও সেই প্রকার শিক্ষককে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। আমাদিগের বিশ্বাস, যত্ন ও বিবেচনাপূর্ব্বক দেশীয় অধ্যাপক লইতে পারিলে, তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য চলিতে পারে। কিন্তু যদি কার্য্য করিতে করিতে ইংরেজি অধ্যাপকের প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই এক জন ইংরেজি অধ্যাপক নিযুক্ত করিব। এ কথা বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনই আমাদিগের উদ্দেশ্য। সে জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিব। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের বেতন কিরূপ হওয়া উচিত, বোধ করি, কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন। সেটা আমার বিবেচনায়, নিযুক্ত নিয়োজকের ভিতরে মীমাংসা করিবার কথা। আমি অনেক কাল হইতে বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছি। আশা করি, অধ্যাপক নির্ব্বাচন ও বেতন নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমার নিজের বিবেচনামত কার্য্য করিতে দিবেন।

অধিক আর কি বলিব, আমাদের বিদ্যালয়টী উচ্চ শিক্ষা দিবার উপযোগী করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত লোকের অধিক বেতন দিয়া পুত্রদিগকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ করিতে দেওয়া অসম্ভব। এদিকে তাঁহারা পুত্রদিগকে মিশনরী স্কুলে পড়িতে দিতে ইচ্ছা করেন না। কাজেই প্রবেশিকা পড়াইয়াই তাঁহাদিগকে পুত্রের শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। তাহাদিগের এই বিদ্যালয় অনেক উপকারে আসিবে।

আমি, জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র ও বাবু কৃষ্ণদাস পাল—এই তিন জনে এই বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক। আমাদিগের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনের উপযোগী অর্থ আছে। যদি কোন সময়ে অর্থের অনাটন ঘটে, তাহা হইলে আমরা নিজের হইতে সে অভাব পূরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইব না।"

আবেদন মঞ্জুর হইয়াছিল। এই বৎসর ফাষ্ট আর্টস ক্লাস প্রতিষ্ঠিত হয়। আবেদন করিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাৎকালিক সেক্রেটারী ই. সি. বেলী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সাক্ষাতে তিনি বলেন,—"আপনাদের মহিমা বুঝা ভার। আপনারা বলেন, বাঙ্গালী সকল কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আমি আমার স্কুলে কলেজ খুলিয়া বাঙ্গালী অধ্যাপক প্রতিপালিত করিতে চাহি। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষিতা কিছুই নাই। আপনারা কিন্তু তাহাতে বাদ সাধিলেন। পাছে মিশনরীদের কার্য্যে ব্যাঘাত পড়ে, এই উদ্দেশে আমার কার্য্যে ব্যাঘাত। মিশনরীরা উচ্চ শিক্ষার ভাব লইয়া, হিন্দু সন্তানকে আয়ত্ত করিয়াছেন। আমার কলেজ হইলে, তাহাতে একটা ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। তাই তাঁহারা আমার কলেজ-স্থাপন প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদী।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন,—"আপনি আবার আবেদন করুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"আপনি যদি আমার পক্ষ-সমর্থন করেন, তাহা হইলে আমি আবেদন করিতে পারি।" সাহেব বলেন,—"আমি একা সমর্থন করিলে কি হইবে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"তাহা হইলেই হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল সহকারী সভ্য তো আপনার অধীন। আপনি যে পথে যাইবেন তাঁহারাও সেই পথে যাইবেন। তাঁহাদের সকলকেই অনেক বিষয়ে আপনার উপর নির্ভর করিতে হয়।" সাহেব পক্ষ সমর্থনে রাজি হন।

মেট্রোপলিটনে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, শিক্ষা-বিভাগের একজন উচ্চতম সাহেব কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন,—"এইবার উচ্চশিক্ষার সমাধি হইল*।"

বলা বাহুল্য, মেট্রোপলিটনের এ পর্য্যন্ত শিক্ষিতের নিত্য-কীর্ত্তি কুশলতা,—এই গর্ব্বিত কর্ম্মচারীর গর্ব্বখর্ব্বকারিতার কৃপাণ নিশানস্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কলিকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন রায়ের বাড়ীর নিকট প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে শঙ্কর ঘোষের ষ্ট্রীট্ [লেন] হইতে সুকিয়া ষ্ট্রীটের এক স্বতন্ত্র বাড়ীতে স্কুল উঠিয়া আসিয়াছিল।

কলেজের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক অর্থ-ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ছাত্রদিগের বেতন তিন টাকার উর্দ্ধ হইল না; অথচ অধিক বেতনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হইল; সুতরাং ঘরের অর্থব্যয় ভিন্ন আর উপায় কি? যেরূপেই

* এই কথাটী হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

হউক, কলেজের শিক্ষা সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। এ দেশীয় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধ্যাপনার ভার লইয়াছিলেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি-বিভাগ লইয়া, তদানীন্তন ছোট লাট বাহাদুরের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মসীযুদ্ধ চলিয়াছিল। ছোট লাট ব্যয়সংক্ষেপ-সঙ্কল্পে স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপকের পদ উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা করেন। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যের দুইটী ইংরেজি অধ্যাপকপদ উঠাইয়া এবং অন্যান্য দুই একটী কার্য্য তুলিয়া দিয়া, মাসিক প্রায় ৬৫০ টাকার ব্যয়সংক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প হয়। চারিদিকে একটা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিল। তুমুল আন্দোলন উঠিল। যাহাই হউক, পরে কার্য্য হয়, স্মৃতির অধ্যাপনা, অলঙ্কারের অধ্যাপক দ্বারা সম্পাদিত হইবে। সাধারণ্যে রব উঠিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই, এই স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু তাহা স্বীকার করেন নাই। এই সূত্রেই মসীযুদ্ধ। এতৎসম্বন্ধে যে পত্র লেখা-লেখি হইয়াছিল, তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোট লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী লটসন জনসন সাহেবকে প্রতিবাদ করিয়া যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এই,—

"স্মৃতি শাস্ত্র এত প্রকাণ্ড যে, এক জন মনুষ্য-সমস্ত জীবনে তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন, অথচ স্মৃতি ভাল জানেন, এমন লোক থাকা কিছু অসম্ভব নহে, কিন্তু নিতান্ত বিরল। প্রেসিডেন্সি কলেজের এক জন সাহিত্যের অথবা গণিতের অধ্যাপককে নিজের কাজ করিয়া আইনের অধ্যাপকতা করিতে বলিলে যেরূপ ফল হয়, ইহাতেও সেইরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তবে এক জনের উপর এত অধিক ভার দিলে আইন শিক্ষাও ভাল হইবে না। অন্যান্য শিক্ষাও ভাল হইবে না। হিন্দু সমাজের ইচ্ছা, স্মৃতির এক জন স্বতন্ত্র অধ্যাপক থাকেন। ছোট লাট যে মতামত জানিয়া কার্য্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ, সন্দেহ নাই। লোকের ইচ্ছা যেরূপ, তাহা আমি জানি; তথাপি গেজেটে যখন আমার মত লওয়া হইয়াছে বলিয়া লেখা হইয়াছে, তখন দেশের লোক মনে করিবে, আমার বুঝি ঐরূপ অভিপ্রায়; কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বিরোধী; ইহা প্রকাশ থাকা আবশ্যক।"

২৫শে মে তারিখে জনসন সাহেব এই পত্রের যে উত্তর দেন, তাহার মর্ম্ম এই,—

"আপনার নিজের মত এরূপ নহে, তাহা ঠিক কথা; তবে অধ্যাপনা সম্বন্ধে

ছোট লাটের মত এই, অধ্যাপকের স্মৃতি-অধ্যাপনাই প্রধান কার্য্য হইবে; অন্যান্য অধ্যাপনা নিম্নস্থান অধিকার করিবে। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। উপস্থিত বন্দোবস্ত আপাততঃ চলিতেছে; পরে যদি ভাল না চলে, তবে নূতন বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১০ই জুনের হিন্দু পেট্রিয়টে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, আপনার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ তেজস্বিতার কথা স্মরণ করিয়া বোধ হয় দৈনিক সম্পাদক লিখিয়াছিলেন*,—"যে সকল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের কাছে অন্যে মাথা হেঁট করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদিগকে আপনার সমান বলিয়া মনে করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের সহিত বন্ধুত্বসুলভ সদ্ভাবসম্বন্ধ ছিল. তিনি কোন কালে কাহারও তোষামোদ করেন নাই। গভর্ণর ও কাউন্সিলের সভ্যদিগকে বিদ্যাসাগর নিজের বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন; বড় আদালতের জজদিগকেও সেই ভাবে দেখিতেন। উচ্চ পদে এমন ইংরেজ ছিলেন না, যাঁহার কাছে বিদ্যাসাগরকে ভয়ে ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া কথা কহিতে হইত।"

ইহার পর, শিক্ষা-বিভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় আয়ের হ্রাস হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে নিম্নলিখিত কথা শুনিয়াছিলেন,—

"বর্ত্তমান ছোট লাট কাম্বেল সাহেবের সহিত আমার মনোবাদের কারণ এই যে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপকের পদ যাইবার সময় আমার সহ পরামর্শ করিয়া, আমার উপদেশের বিরুদ্ধে ঐ পদ পাইবার আজ্ঞা দেন এবং প্রকাশ করেন যে, এ বিষয় তিনি আমাদের সহ পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু আমি ইহা দ্বারা সাধারণের ক্ষতি ও নিজের অপবাদ দেখিয়া, ঐ বিষয় প্রকাশ করায়, তাঁহার সহ মনোবাদ হয়। এই কারণে শিক্ষাবিভাগে আমার পুস্তকের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় আয়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে।"

এই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কাহারও কাহারও মাসিক বন্দোবস্ত কমাইতে হয়। পরে আয় বৃদ্ধি হইলেই সকলেরই বন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কলেজের জন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইত। ইহাতে তাঁহার ভগ্ন শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল, সুতরাং ক্রমেই অতি স্বাস্থ্যপ্রদ নিভৃত স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন হইল। এই সময় দেওঘরে একটী বাঙ্গালা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়

* দৈনিক বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র এখন নাই।

প্রথমতঃ তাহা ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মূল্য অত্যধিক বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হন। পরে তিনি অতি সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ বনজঙ্গলে পরিবৃত কর্ম্মাটাঁরের এক অতি নিভৃত স্থানে একটী বাঙ্গালা প্রস্তুত করেন। কর্ম্মাটাঁর সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মধুপুরের আগের ষ্টেশন। সাঁওতালগণ তাঁহার প্রতিবেশী হইল। সাঁওতালগণ ক্রমে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগরের করুণা মর্ম্ম তাহারা বুঝিয়া লইল। কেহ দাদা, কেহ বাবা, কেহ জেঠা ইত্যাদিরূপে সম্পর্ক পাতাইল। জীর্ণ, পর্ণ-কুটীরময় মলিন সাঁওতাল মণ্ডল বিদ্যাসাগরের করুণাস্রোতে প্লাবিত হইল। বিদ্যাসাগর শীতের সময় সাঁওতালদিগকে চাদর ও কম্বল বিতরণ করিতেন। যে সময়ের যে ফল, সর্ব্ব-সুরসবঞ্চিত দারিদ্র সাঁওতাল, বিদ্যাসাগরের প্রসাদে তাহার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইত। বস্ত্র নাই, বিদ্যাসাগর বস্ত্র দিতেন, অন্ন নাই, অন্ন দিতেন; যাহা নাই, তাহাই দিতেন। সাঁওতাল প্রবল পীড়ায় শয্যাগত; বিদ্যাসাগর তাহার শিয়রে বসিয়া মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতেন, হাঁ করাইয়া পথ্য দিতেন; উঠাইয়া বসাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করাইতেন; সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেন। বিদ্যাসাগর যেখানে, সেইখানেই প্রেম ও করুণা। তিনি প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইতেন; প্রত্যেক সাঁওতালবন্ধুর গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কাহার নিকট কুমড়া, কাহার নিকট বেগুন, কাহার নিকট শশা ইত্যাদি উপহার লইয়া প্রফুল্লবদনে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতেন। বাঙ্গালার প্রাঙ্গণ-ভূমি পরিচ্ছন্ন পরিষ্কৃত এবং স্বহস্তে-রোপিত নানা ফল-ফুলের বৃক্ষে পরিশোভিত; যেন একখানি ক্ষুদ্র নন্দন-কানন। যখনই তিনি কর্ম্মাটাঁড়ে যাইতেন, তখনই হয় কন্যা, না হয় দৌহিত্র, না হয় অন্য কোন আত্মীয় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ইচ্ছা হইলে বিদ্যাসাগর সাঁওতালদিগকে নাচাইতেন। সরল-হৃদয় সাঁওতালদের সেই বর্ব্বর-নর্ত্তনে সারল্যের অনুপম মাধুর্য্য অনুভব করিয়া বিদ্যাসাগরের করুণ-হৃদয়খানি বিপুল পুলকে প্লাবিত হইয়া যাইত। সত্য সত্যই তিনি কর্ম্মাটাঁরে যাইত স্বর্গীয় শান্তি উপভোগ করিতেন। সাঁওতালদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য-সম্পাদন-মানসে অনেক সময় কর্ম্মাটাঁড়ে যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলকেই সাদর-সম্ভাষণায় ও আতিথ্য-অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিতেন। একবার সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়,

অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া কর্ম্মাটাঁড়ে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার মলমূত্রাদি পরিষ্কারের ভার লইয়াছিলেন। ইহাতে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় লজ্জিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"ইহার জন্য লজ্জা কি? বায়না দিয়া রাখিলাম।" বলিয়াছি তো, বিদ্যাসাগর সময় বুঝিয়া, পাত্র-বিবেচনায় সকল সময় যথাযোগ্য রহস্য করিতেন। একবার তিনি চারিটী পণ্ডিতকে লইয়া লাট-দরবারে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ দেখেন, বাঙ্গালী ব্যতীত সকলের মস্তকে উষ্ণীষ। তাঁহারা বলেন,—"ইহার কারণ কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলেন,—"বাঙ্গালী মাতৃভূমির আর কোন কাজ করিতে পারেন নাই; মাথার উষ্ণীষ ত্যাগ করিয়া, মাতৃভূমির ভার কমাইয়াছে।" ইহা রহস্য বটে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাঁওতালদিগের সরলতা ও সত্যপ্রিয়তার প্রথম পরিচয় এইরূপে প্রাপ্ত হন,—"পূর্ব্বে কর্ম্মাটাঁড়ে জমি-জমার আঁটা-আঁটী সরহদ্দ ছিল না। অনেক অনেক সময় জমি কিনিয়া, অপরের জমি টানিয়া লইতেন। এক জন বাঙ্গালী বাবু একবার এইরূপ একটু জমি টানিয়া লইয়া বেড়া দেন। অভিযোগ হইয়াছিল। অভিযোগে হাকিমের তদন্তে আসিবার কথা ছিল। যে দিন হাকিমের আসিবার কথা, সেইদিন কতকগুলি সাঁওতাল বাবুটীর জমিতে কাজ করিতেছিল। বাবুটী তাহাদিগকে বলেন,—"হাকিম আসিলে তোরা বলিস্,—বেড়ার ভিতরের জমি সব বাবুর।" হাকিম আসিলে, সাঁওতালগণ উক্তরূপ কথা বলিল। কিন্তু হাকিম দুই একবার ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা আর সত্য না বলিয়া থাকিতে পারিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে সাঁওতালদের প্রতি তাঁহার অটল প্রীতি। তিনি এক দিন কবি হরিশ্চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বে বড় মানুষদের সহিত আলাপ হইলে, বড় আনন্দ হইত, কিন্তু এখন তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সাঁওতালদের সহিত আলাপে আমার প্রীতি। তাহারা গালি দিলেও আমার তৃপ্তি। তাহারা অসভ্য বটে, কিন্তু সরল ও সত্যবাদী*।"

১২৮০ সালের ১৪ই ফাল্গুন বা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের অন্যতম জজ দ্বারকানাথ মিত্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু কার্য্যে দ্বারকানাথের পরামর্শ লইতেন। দ্বারকানাথও বিদ্যাসাগরের মত না

* হরিশ্চন্দ্রের আত্মীয় রাধাকৃষ্ণবাবু একথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

লইয়া কোন কঠিন বিষয়ের সহসা মীমাংসা করিতেন না। উভয়েই উভয়েরই সহায় ও পৃষ্টপোষক। পতিতা রমণীর বিষয়াধিকারের মোকদ্দমা সম্বন্ধে উভয়ের মতভেদমাত্র লক্ষিত হইয়াছিল; নতুবা অন্য কোন বিষয়ে কোন মতভেদ দেখা যায় নাই। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পূর্ব্বে হাইকোর্টে উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মোকদ্দমার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের মত গৃহীত হয়। বিচার্য্য এই, হিন্দুরমণী স্বামি-বিয়োগান্তে স্বামি-পরিত্যক্ত বিষয়ের একবার উত্তরাধিকারিণী হইলে পর, যদ্যপি তাহার চরিত্র কলঙ্কিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রমতে পুনরায় সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না? বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অপর দুই জন পণ্ডিত বলেন, "হিন্দুশাস্ত্রমতে কলঙ্কিত বিধবা বিষয়চ্যুত হইতে পারে।" দ্বারকানাথের এই মত ছিল; কিন্তু তাঁহার এই মত টিকে নাই। দশ জন বিচারক এই মোকদ্দমার বিচারভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই জন ব্যতীত কেহই দ্বারকা-নাথের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণবাবু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন,—"আমি অন্যায় কিরূপে বলিব? অন্যায়ই বা শুনিবে কে? আমি অবশ্য ভ্রষ্টাচারের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু এক জন বিষয়ের অধিকারিণী হইলে, কেমন করিয়া বলিল, আবার সে বিষয়চ্যুত হইবে; তাহা হইলে তো নানা কারণে পদে পদে বিষয়চ্যুতির মোকদ্দমা সংঘটিত হইবে।" এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দূরদর্শিতার পরিচয় নাই সত্য; সমগ্র হিন্দুসমাজ ইহাতে সংক্ষোভিত; কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃঢ় ধারণা ও প্রতীতি ছিল যে, এরূপ অবস্থায় কেহ বিষয়চ্যুত হইতে পারে না। অনেকে বলেন, পতিতা রমণীর বিষয়চ্যুতি আইনসিদ্ধ হইবে, বিদ্যাসাগরের প্রিয় বিধবা-বিবাহ ব্রতে কতকটা ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা, দূরদর্শী বিদ্যাসাগর ইহা বুঝিয়াই দ্বারকানাথের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করিতে সহজে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমরা প্রতিনিয়ত দেখিয়া আসিতেছি, শত্রুর ভ্রুকুটীভঙ্গে, মিত্রের সস্নেহ সম্ভাষণে বা আপনার স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের কখন কোনরূপ পদস্খলন হয় নাই।

দ্বারকানাথ প্রায়ই বলিতেন,—"বিদ্যাসাগর আমার উন্নতির মূল। বিদ্যা-সাগরের পরামর্শে আমি ওকালতী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই। তিনি সে পরামর্শ না দিলে, হয়ত আমার সে প্রবৃত্তি আদৌ হইত না।"

দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। পানদোষের জন্য পাছে

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরক্তিভাজন হইতে হয় বলিয়া, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অতি সাবধানে থাকিতেন। যখন উকীল, তখন উকীলের বেশে, যখন জজ, তখন জজের পরিচ্ছদে, দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইতেন। যখন তখন তিনি বিদ্যাসাগরের বাসায় রাত্রি যাপন করিতেন। পীড়িত-পরিত্রাণে যেমন ডাক্তার দুর্গাচরণ, জমিদার-পীড়িত প্রজা-উদ্ধারে তেমনই দ্বারকানাথ মিত্র বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম সহায় ছিলেন। এক সময় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মোত্তর কাড়িয়া লইতেছেন বলিয়া, অনেক ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের মোকদ্দমায় সাহায্য করিতেন। দ্বারকানাথ তাঁহার (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের) অনুরোধে বিনা পয়সায় অনেকের মোকদ্দমা চালাইতেন। একদিন দ্বারকানাথ বলেন,—"পাছে আপনি মনে করেন, টাকা পাইব না বলিয়া ইহাদের মোকদ্দমা ফেরত দিলাম; তাই আপনার নিকট বুঝাইয়া বলিতে আসিয়াছি, ইহাদের কোন স্বত্বই নাই, যদি তিলমাত্র প্রমাণ পাইতাম; তবে প্রাণপণে লড়িতাম।" দ্বারকানাথের কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন, জয়কৃষ্ণ দোষী নহে। যাহার স্বত্ব নাই, সে কেন জমি ভোগ করিবে? বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে বলিয়াছিলেন;—"যিনি স্বত্ব প্রমাণ করিতে পারিতেন, জয়কৃষ্ণবাবু তাঁহাকে জমি ফেরত দিতেন, এ তত্ত্ব আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম।" ব্রহ্মোত্তর ব্যাপারে জয়কৃষ্ণবাবুর উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রদ্ধা একটু কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু দ্বারকানাথের কথায় পূর্ব্ব শ্রদ্ধা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। তিনি সতত জয়কৃষ্ণবাবুর দাতৃত্ব ও অসাধারণ পুরুষাকারের প্রশংসা করিতেন। জয়কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি রাজনৈতিক কোন সভার সহিত সংস্রব রাখিতেন না; কেবল জয়কৃষ্ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রায় ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান সভায় যাতায়াত করিতেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়

কন্যার বিবাহ, উইল ও সাক্ষ্য-বাক্য।

১৮৮২ সালের ৩০শে আষাঢ় বা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় কন্যার বিবাহ হয়। পাত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী। ইনি বি. এ. উপাধিধারী। পুত্র বর্জ্জনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় জামাতা সূর্য্যকুমারে পুত্রপ্রেম ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৭৫ সালে এক উইল হয়। এই উইলে পুত্র নারায়ণ বিষয়-বর্জ্জিত হন*। শাস্ত্রানুসারে অন্য কোন উত্তরাধিকারী বিষয় পাইবেন বলিয়া স্থির হয়।

উইলের ভাষা বিশুদ্ধ মার্জ্জিত বাঙ্গালা। কলিকাতায় ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, উইলের ভাষা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। উইলের লিপি-প্রণালীতেও নূতনত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উইলে তাঁহার দানশীলতা ও মুক্তপ্রাণতার পরিচয়। উইলখানি এই,—

শরণম্।

১. আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্ব্বতন সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২. চৌগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পাথরানিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদনাথ সিংহ, আমার ভাগিনেয় পসপুরনিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগপত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম। তাঁহারা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৩. আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে যাইবেক।

৪. এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে, কার্য্যদর্শীদিগের অবগতির নিমিত্ত তৎসমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিয়োগ পত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

৫. কার্য্যদর্শীরা আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করিবেন।

৬. আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় প্রভৃতির ভরণপোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত ব্যয় এক কালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন, কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

* এই উইল অনুসারে নারায়ণবাবু প্রকৃতপক্ষে বিষয় বর্জ্জিত হইতে পারেন কি না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর, তন্মীমাংসার্থ হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। বিচারে সিদ্ধান্ত হয়, নারায়ণবাবু বিষয়ে বঞ্চিত হইতে পারেন না। তিনি এখন বিষয়াধিকারী।

৭. এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন, আমি অবিদ্যমান হইলে, তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাঁহারা বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন, তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

প্রথম শ্রেণী

পিতৃদেব শ্রীযুত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ পঞ্চাশ টাকা। মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ৪০ চল্লিশ টাকা। তৃতীয় শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৪০ চল্লিশ টাকা। কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ ত্রিশ টাকা। জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী ১০ দশ টাকা। মধ্যমা ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী ১০ দশ টাকা। কনিষ্ঠা ভগিনী মন্দাকিনী দেবী ১০ দশ টাকা। বনিতা শ্রীমতী দিনময়ী দেবী ৩০ ত্রিশ টাকা। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী ১৫ পনর টাকা। মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ১৫ পনর টাকা। তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী ১৫ পনর টাকা। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী ১৫ পনর টাকা। পুত্রবধূ শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী ১৫ পনর টাকা। পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী ১৫ পনর টাকা। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৫ পনর টাকা। কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান্ যতীশচন্দ্র সমাজপতি ১৫ পনর টাকা। দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজরাণী দেবী ১৫ পনর টাকা। কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী এলোকেশী দেবী ১০ দশ টাকা। শ্বাশুড়ী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী ১০ দশ টাকা। জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বাশুড়ী স্বর্ণময়ী দেবী ১০ দশ টাকা। জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী ১০ দশ টাকা। মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী ৩ তিন টাকা। মাতৃদেবীর মাতুল-দৌহিত্র গোপালচন্দ্র চট্টোর বনিতা ৩ তিন টাকা। পিতৃস্বসৃপুত্র ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বনিতা ৩ টাকা। পিতৃদেবের পিতৃস্বসৃ কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী ৩ তিন টাকা। বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী ৫ পাঁচ টাকা। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা ৮ আট টাকা। শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসুর বনিতা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী ১০ দশ টাকা। শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমণি দাসী ১০ দশ টাকা। বারাশত নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মিত্র ৩০ ত্রিশ টাকা। কালীকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাহার বনিতা উমেশমোহিনী দাসী ১০ দশ টাকা। শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী ২ দুই টাকা।

দ্বিতীয় শ্রেণী

মাতৃস্বস্থপুত্র শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ দশ টাকা। ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ৫ পাঁচ টাকা। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ননদ শ্রীমতী তারামণি দেবী ৫ পাঁচ টাকা। পিতৃস্বস্থ কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ২ দুই টাকা। মাতৃদেবীর মাতৃস্বস্থপুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষাল ৫ পাঁচ টাকা। মাতৃদেবীর মাতুলপুত্র তারাচরণ মুখোর পরিবার ৮ আট টাকা। মাতৃদেবীর মাতৃস্বস্থপুত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৫ পাঁচ টাকা। পিতৃস্বস্থপুত্র রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিবার ৫ পাঁচ টাকা। মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী ২ দুই টাকা। বারাশত নিবাসী নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী ১০ দশ টাকা। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দবালা দেবী ১০ দশ টাকা। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী বামাসুন্দরী দেবী ৩ তিন টাকা। বর্দ্ধমানের প্যারীচাঁদ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী কামিনী দাসী ১০ দশ টাকা।

৮. যদি কার্য্যদর্শীরা দ্বিতীয় শ্রেণীনিবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মাসিক দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না হইলেও তাঁহার চলিতে পারে এরূপ দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার বৃত্তি রহিত করিতে পারিবেন।

৯. আমার দেহান্ত সময়ে আমার মধ্যমা, তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবেক, কোনও কারণে তাহাদের ভরণপোষণ, বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাসিক ১৫ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১০. আমার দেহান্ত সময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক, তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্থ হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১১. যদি আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভগিনীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে, তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয়, তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আরও ২০ কুড়ি টাকা পাইবেন।

১২. যদি শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে, তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয়, তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আরও ১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১৩. কার্য্যদর্শীরা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্য্যের বনিতা শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও পুত্রত্রয়ের ভরণ পোষণার্থে মাস মাস ৩০ ত্রিশ টাকা, আর তাঁহার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন মাস মাস ১০ দশ টাকা দিবেন। তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্ত্তিনী হইলে তাঁহাকে উক্ত উভয় বিধেয় মধ্যে কানও প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই।

১৪. আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক, তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয় ১০০ এক শত টাকা।
ঐ ঐ গ্রামে আমার স্থাপিত চিকিৎসালয় ৫০ পঞ্চাশ টাকা।
ঐ ঐ গ্রামে অনাথ ও নিরুপায় লোক ৩০ ত্রিশ টাকা।
বিধবা-বিবাহ ... ... ১০০ এক শত টাকা।

১৫. যদি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র ভড় এই তিনজন আমার দেহান্ত সময় পর্য্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০ তিন শত টাকা দিবেন।

১৬. কার্য্যদর্শীরা বিষয় রক্ষা, লৌকিক রক্ষা, কন্যাদান প্রভৃতির আবশ্যক ব্যয় স্বীয় বিবেচনা অনুসারে করিবেন।

১৭. এই বিনিয়োগপত্রে যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিলাম, যদি তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুবিধা অথবা সে বিষয়ের সুশৃঙ্খল না হয়, তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিবেন তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক।

১৮. এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে, যদি উত্তরকালে তাহার খর্ব্বতা হয়, তাহা হইলে যাঁহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্ব্বন্ধ করিলাম, কার্য্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯. আবশ্যক বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০. আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শম্ভুচন্দ্রের সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে, আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার পুস্তক সকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয় তবে এক্ষণে যেরূপ

সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেও তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২. কার্য্যদর্শীরা একমত হইয়া কার্য্য করিবেন মতভেদস্থলে অধিকাংশের মতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

২২. নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদের মধ্যে কেহ অবিদ্যমান অথবা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট দুই জনে তাঁহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিজের নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৩. যদি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীরা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে যাঁহারা এই বিনিয়োগপত্র অনুসারে বৃত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তিনি এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৪. যাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিনিয়োগ-পত্রের নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে যাহারা শাস্ত্রানুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন তাঁহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ ধারায় নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। ঐ উত্তরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যদর্শী তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অপসৃত হইবেন।

২৫. আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপর নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি এই হেতুবশতঃ বৃত্তি নির্ব্বন্ধ স্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতুবশতঃ তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগ পত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্ব্বিংশ ধারায় লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ইতি তাং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩০শে মে ১৮৭৫ সাল।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোকাম কলিকাতা

ইসাদী

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীশ্যামাচরণ দে
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	শ্রীনীলমাধব সেন
শ্রীগিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	শ্রীযোগেশচন্দ্র দে
শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী	শ্রীকালীচরণ ঘোষ

সর্ব্বসাকিম কলিকাতা।

চতুর্থ ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি—

(ক) সংস্কৃতযন্ত্রের তৃতীয় অংশ—

(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

বাঙ্গালা—

(১) বর্ণপরিচয় দুই ভাগ (২) কথামালা (৩) বোধদয় (৪) চরিতাবলী (৫) আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ (৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (৭) জীবনচরিত (৮) বেতাল-পঞ্চবিংশতি (৯) শকুন্তলা (১০) সীতার বনবাস (১১) ভ্রান্তিবিলাস (১২) মহাভারত (১৩) সংস্কৃতভাষা প্রস্তাব (১৪) বিধবা-বিবাহ বিচার (১৫) বহু-বিবাহ বিচার।

সংস্কৃত—

(১) উপক্রমণিকা (২) ব্যাকরণকৌমুদী (৩) ঋজুপাঠ তিন ভাগ (৪) মেঘদূত (৫) শকুন্তলা (৬) উত্তরচরিত।

ইংরেজি—

(1) Poetical Selections (2) Selections from Goldsmith.

(গ) যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।

(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ।

(২) রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন কুলসর্ব্বস্ব।

(ঘ) কাদম্বরী সটীক, বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।

(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত বাঙ্গালা হিন্দী পার্শী ইংরেজি প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রেরি।

(চ) কর্ম্মাটাঁড়ের বাঙ্গালা ও বাগান।

(স্বাক্ষর) **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**

উইলের নগদ টাকার কোন উল্লেখ নাই। নগদ ছিল না ও থাকিত না। মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাসিক আয় প্রায় চারি হাজার

টাকা ছিল, দানে সংসারে প্রায় সবই ব্যয়িত হইত। শুনিতে পাই, মৃত্যুকালে তিনি ১৫।১৬ হাজার টাকা মাত্র নগদ রাখিয়া গিয়াছিলেন। অবারিত দান না থাকিলে, তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যাইতে পারিতেন। উইলের একধারে উল্লিখিত পুস্তকাবলীর তালিকায় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে, বাঙ্গালীর উপর বিদ্যাসাগরের সাহিত্য কিরূপ অধিকার বিস্তার করিত। উইলে দেবসেবাদির কোন উল্লেখ নাই। উহাতেও বিদ্যাসাগরের মতিগতির পরিচয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান-চকৃদিঘীর জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহরায়ের উইল সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ১২৮৩ সালের ১৮ই ও ১৯শে শ্রাবণ বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এবং ২রা আগষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেন। উইল প্রকৃত নহে বলিয়া, সারদাবাবুর বিধবা স্ত্রী রাজেশ্বরী এই মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাদিনীর পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। তাঁহাকে দুইদিন অসুস্থাবস্থায় সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। চকৃদিঘীর জমিদার পরিবারের সহিত তাঁহার কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এই সাক্ষ্যবাক্যে তাহার প্রমাণ। সাক্ষ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক প্রাণের কথা বাহির হইয়াছিল। আত্মবাক্যে প্রাণের কথা প্রকাশ পায়। এই সাক্ষ্যবাক্যে ব্যক্তিগত অনেক ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। সাক্ষ্য-বাক্য ইংরেজিতে লিখিত। আমরা তাহার অনুবাদ দিলাম,—

নং ৮৯, হইতে ৮৭ —৪র্থ সাক্ষী ঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মা বিদ্যাসাগরের এজাহার। তারিখ ১৮৭৭ সালের ১লা এবং ২রা আগষ্ট।

বৰ্দ্ধমানের—পূর্ব্ববিভাগের দেওয়ানি আদালত।

উপস্থিত

বাবু নবীনচন্দ্র গাঙ্গুলী দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ।

মোকদ্দমার নং ১৮৭৫ সালের ৭৯ নং।

১৮৭৬ সালের ১লা আগষ্ট।

বাদীর পক্ষে ৪ নং সাক্ষী উপস্থিত হইয়া বিধি অনুসারে শপথ গ্রহণপূর্ব্বক বলিতেছেন,—আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মা বিদ্যাসাগর। আমি ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। নিবাস কলিকাতা, বয়স ৫৬ বৎসর। লেখক ব্যবসায়ী।

সাক্ষী বলিতেছেন,—আমি কিছুদিন পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম। আমি বহুসংখ্যক সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছি। আমি চকৃদিঘীর সারদা রায়কে চিনিতাম। আমার বিবেচনায় তাঁহার সহিত আমার ২০ বৎসরের অধিক কালের আলাপ। তাঁহার মৃত্যুর ১০।১২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে

তাঁহাকে চিনিতাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ ও বন্ধুত্বভাব ছিল। তিনি বিষয়সম্বন্ধে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। আমি নাবালক ললিতমোহন রায়কে চিনি। সারদাবাবু, তাঁহার মৃত্যুর পর কিরূপে তাঁহার বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে, সে বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার উইলের একখানি খসড়া দেখাইয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় ইহা তাঁহার মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে, কিন্তু আমার ঠিক মনে নাই। সেই খসড়া আমার হস্তে আসিয়াছিল। ইহা পাঠ করিবার নিমিত্ত উনি আমাকে দিয়াছিলেন। এই প্রকারেই উহা আমার হাতে আসে। উহা ভাল কি মন্দ, ইহা দেখিবার জন্য তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। ঐ খসড়া আমার কাছে অনেক দিন ছিল। আমার বোধ হয়, উহা এক বৎসর কি দেড় বৎসর আমার নিকটে ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমার ঠিক মনে নাই। ঐ খসড়া আমি সারদাবাবুকে প্রত্যর্পণ করি। উইলের ঐ নকলের কোন্ অংশ আপত্তিজনক, তাহা আমি তাঁহাকে দেখাইয়া দিই এবং ঐ খসড়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিই। ঐ আপত্তিজনক অংশগুলির বিষয় তাঁহাকে আমি মুখেই বলি, তাঁহাকে ঐ খসড়া ফিরিয়া দিবার পর সারদাবাবুর সহিত আমার একবার কি দুইবার কথা হয়। আমার স্মরণ আছে, তিনি পশ্চিমে যান। যখন তিনি পশ্চিমে যাইবার ইচ্ছা করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। এক সময়ে তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, উইলের বিষয় কি হইল? তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে, আমার একবার পশ্চিমে যাইবার ইচ্ছা আছে এবং আমি মনে মনে এই স্থির করিয়াছি যে, তথায় যাইবার পূর্ব্বে আমি যাহা হউক একটা স্থির করিয়া যাইব। তাঁহার সহিত আমার অন্য কিছু কথা হইয়াছিল কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই এবং ইহাও আমার ঠিক স্মরণ নাই, পশ্চিমে যাইবার কত দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ঐ কথা হইয়াছিল। কিন্তু আমার বিবেচনা হয়, তথায় যাইবার ৬।৭ মাস পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ঐ কথা হইয়াছিল।

(প্রঃ—উইলে স্বাক্ষরকারী সাক্ষী কে হইবে, তাহার সম্বন্ধে আপনাদের কোন কথাবার্ত্তা কিম্বা ঐ সম্বন্ধীয় কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কি না?) আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, উইল সম্বন্ধে প্রায়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য আমার বিবেচনায় এইরূপ লোকের সমক্ষে উইল লেখা উচিত যে, পরে কেহ কোন গোলযোগ উপস্থিত করিতে না পারে। তাহার পরে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হয় এবং ইহা সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি তাঁহার উইল হব্-

হাউস সাহেব, হগ্ সাহেব, লর্ফোর্ড সাহেব, হীরালাল শীল, শ্রীরাম চাটুর্য্যে ও আমার সমক্ষে লিখিবেন এবং স্বাক্ষর করিবেন এবং লিখিবার পর রেজেষ্টারি করাইয়া লইবেন। পশ্চিম অঞ্চলে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার এই কথাবার্ত্তা হয়। পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার বিষয় আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু এই কথাবার্ত্তা তাহারও পূর্ব্বে হইয়াছিল। যখন উইলের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখনই ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, মাননীয় ব্যক্তিসমূহ এই উইলের স্বাক্ষরকারী সাক্ষী হইবেন এবং ঐ উইল নিয়মিতরূপে রেজেষ্টারি করা হইবেক। হব্ হাউস সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের একজন বিচারক ছিলেন এবং পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারক হন। যখন আমি সারদাবাবুকে মাননীয় সাক্ষীসমূহের কথা বলি, তখন তিনি নিজেই ঐ তিন জন ভদ্র লোকের নাম করিয়াছিলেন। হগ্ সাহেব এক্ষণে কলিকাতা পুলিসের কমিসনর। লর্ফোর্ড সাহেব তখন বর্দ্ধমান বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না। পূর্ব্বোক্ত শ্রীরাম চাটুর্য্যের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার সাঁকোনাড়া গ্রাম। তিনি ঐ সময়ে পাকপাড়া রাজবাটীর একজন কর্ম্ম কর্ত্তা ছিলেন। সারদাবাবুর সহিত তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্ব ছিল। সারদাবাবু পূর্ব্বোক্ত হীরালাল শীলের বাটীতে মারা যান। আমার যত দূর স্মরণ আছে, তাহাতে আমি বিবেচনা করি যে, উইলের ঐ খসড়া শ্রীরাম চাটুর্য্যের স্বহস্তের লেখা। তিনি এখনও জীবিত আছেন। সারদাবাবু পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলে পর অন্য আর একটী বিষয়ের সহিত তাঁহার সঙ্গে উইলেরও কথা হয়। সে কথাবার্ত্তা এই—তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং আমাকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কতকগুলি লোক ললিতমোহনকে পোষ্যপুত্র লইবার জন্য পরামর্শ দিতেছে, আপনার এ বিষয়ে মত কি? আমি এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলাম যে ক্ষত্রবংশের একজন পুত্রকে শাস্ত্রমতে পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, সম্পর্কে আবার ভাগিনেয় হয় এবং যদি তিনি ঐ ভাগিনেয়কে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা আইনবিরুদ্ধ কার্য্য হইবেক। আমি ঐ কথা বলিলে, তিনি ও বিষয়ের আর কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। তৎপরে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, ললিতমোহনকে যদি বিষয় দেওয়াই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উইল করিয়াই বিষয় দেওয়া শ্রেয়স্কর, আর কোন প্রকারে নহে। তিনি বলিলেন, আচ্ছা যখন আমি পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিব, তখন উইলের একটী খসড়া আনিব এবং কলিকাতায় পুনরাগমনে এ বিষয়ের শেষ করিব। সারদাবাবুর উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে

প্রত্যাগমনের পর এই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। আমার ঠিক মনে নাই যে, এই কথাবার্ত্তা তাঁহার প্রত্যাগমনের কত দিন পরে হইয়াছিল; সারদা বাবু কখন আমাকে বলেন নাই যে, তিনি উইল প্রস্তুত করিয়াছেন। আমার বোধ হইতেছে যে, তিনি আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, পুনরায় বিবাহ করা উচিত কি না। আমার মনে নাই যে, কখন তিনি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ছয় মাস কিম্বা এক বৎসর অধিক হইতে পারে যে, আমার সহিত সারদাবাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হয়। আমি উইলের খসড়াটী প্রত্যর্পণ করিবার পর অন্য কোন খসড়া পুনশ্চ দেখি নাই।

জেরা করাতে সাক্ষী বলেন,—আমার বোধ হয়, উইলের ঐ খসড়া সারদাবাবু আমাকে স্বহস্তে দিয়াছিলেন। আমি খসড়ার কোন অংশের পরিবর্ত্তন করি নাই; কিন্তু আমি খসড়ার ঐ আপত্তিজনক অংশগুলি তাঁহাকে বাছিয়া দিয়াছিলাম। তবুও আমার মনে নাই যে, উহার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম কি না। আমি এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলাম যে, ভাগিনেয়কে সমস্ত বিষয় দেওয়া এবং অপরকে একবারে বঞ্চিত করা নিতান্ত অন্যায়। আমি বলিয়াছিলাম, অপর ভাগিনেয়ের কিছু পাওয়া উচিত। ঐ ভাগিনেয়ের নাম প্রিয়নাথ। ভাগিনারা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ প্রাপ্ত হন। আমি তাদের আরও কিছু বেশী করিয়া দিতে বলি। আমি আরও তাঁহার স্ত্রীকে কিছু বেশী দিতে বলিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর দেন, আচ্ছা আমি এ বিষয়ে বিবেচনা করিব। আমার বোধ হয় উইলের সেই খসড়াতে তাঁহার স্ত্রীকে মাসিক একশত টাকার মাসহারা দেওয়া ছিল। যখন আমি এ উইলের খসড়াটী পাই, তখন আমি ইহা কলিকাতায় কাহাকেও দেখাই নাই। ললিতমোহন কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা আমি জানি না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে তিনি সারদাবাবুর বাটীতে মানুষ হইতেছিলেন। সারদাবাবু তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। রাজেশ্বরী তাঁহাকে যত্ন করিতেন কি না তাহা আমি জানি না। কারণ তখন আমি তাঁহাদের অন্দর মহলে যাইতাম না। আমি ঐ সময় রাজেশ্বরীকে দেখি নাই। আমার সহিত সারদাবাবুর যে কয়েকবার দেখা হয়, তাহাতে তিনি যে এ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এমন কথা কখনও শুনি নাই। কিন্তু এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু কবে তাহা আমার মনে নাই, ললিতমোহন দ্বারা তিনি বড় জ্বালাতন হইতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ললিতমোহন বহিয়া গেছে। কিন্তু কবে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই। সারদাবাবু যখন পশ্চিমে যান, তখন আমি

কলিকাতায়। পশ্চিমে যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। ১২৮২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে, তিনি আমাকে চকদিঘী যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমার মনে নাই। সারদাপ্রসাদ রায়ের সহি আমি চিনি। আমি অনেকবার তাঁহার সহি দেখিয়াছি। আমার বিবেচনায় আমাকে তাঁহার সহি দেখাইলে তাহা আমি চিনিতে পারি। আমার মনে নাই, পশ্চিমে যাইবার কতদিন পূর্ব্বাবধি তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহা ছয়মাস কিম্বা এক বৎসর হইতে পারে। পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিবার কত দিন পরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা আমার মনে নাই। তাঁহার প্রত্যাগমনের পর, আমার বোধ হয়, তাঁহার সহিত তুইবার দেখা হয়। যখন ললিতমোহনকে পোষ্যপুত্র লইবার কথা হয়, তখন আর কেহ উপস্থিত ছিল কিনা, তাহা আমার মনে নাই। সারদাবাবু পশ্চিমে যাইবার পর তাহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি চকদিঘী যাই নাই। সারদাবাবুর জীবিতাবস্থায় আমি রাজেশ্বরীকে কখন দেখি নাই। ললিতের জন্মাইবার পূর্ব্ব হইতে আমি সারদাবাবুকে জানি। সারদাবাবু যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন আমি কলিকাতায়। সারদাবাবুর মৃত্যুর পর দিবস শ্রীরাম চাটুর্য্যে আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, বৃন্দাবনচন্দ্র রায় অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বাটী চলিয়া গিয়াছেন এবং আমাকে আপনার নিকট—সারদাবাবু তাঁহার উইল লিখিয়া গিয়াছেন—ইহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন এবং আপনি ইঁহার সমস্ত কীর্ত্তি বজায় রাখিতে যত্নবান হইবেন, আপনি উইলের বিষয় সমস্তই অবগত আছেন। এই কথা শুনিবার পর আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি মুখে যে উইলের কথা তাঁহার জীবদ্দশায় বলিয়াছিলেন, সেইরূপই উইল করিয়া গিয়াছেন। উইলের ক্রোড়পত্রের বিষয় আমি শ্রীরামবাবুর নিকট হইতে কিছুই শুনি নাই। আমি শ্রীরামবাবুকে উইলের একটী নকল পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম। আমি ঐ নকল পাঠ করিয়া যদি কোন আপত্তিজনক বিষয় না দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করিব বলিয়াছিলাম। অল্পদিন পরেই ঐ উইল এবং উহার একটী ক্রোড়পত্রের নকল আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমার বোধ হয়, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়ই ইহা পাঠাইয়া দেন। ঐ উইল এবং উহার ক্রোড়পত্র পাঠে আমি কতটা বিস্মিত হই। কারণ আমি ভাবিয়াছিলাম, ঐ উইল যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়াছে। আমার বোধহয়, আমি শ্রীরামবাবুর নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, এই উইলের বিষয় তিনি বলিয়াছিলেন। আমি তখন

বুঝিতে পারি নাই যে, প্রথমে কেন উইল এবং তাহার পরে ক্রোড়পত্র লিখিত হয়। শ্রীরাম চাটুর্য্যে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, সারদাবাবু মৃত্যুর সময় উইল করেন। শ্রীরাম চাটুর্য্যের সহিত কথা হইবার আনুমানিক এক সপ্তাহ মধ্যে আমি উইল এবং ক্রোড়পত্রের নকল প্রাপ্ত হই। আমি ঐ নকল পাঠ করি। দুই একটী কথা ছাড়া পূর্ব্বোল্লিখিত খসড়ার সহিত উইলের মিল ছিল। আমি ঐ খসড়ার কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম ;—যথা তাঁহার পরিবার, ভগিনী এবং ভাগিনেয়ের মাসহারা বৃদ্ধি। আমি ইহাতে বৰ্দ্ধিত মাসহারার উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। খসড়ার সহিত ইহার এই কেবল মাত্র প্রভেদ। খসড়ার প্রথম অংশেই ইহা লিখিত ছিল, আমি উইলের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমি আসল উইল কিম্বা তাহার ক্রোড়পত্র দেখি নাই। সারদাবাবুর মৃত্যুর পর ছক্কনলাল রায়কে কখন কলিকাতায় দেখি নাই। আমার বোধ হয়, তাঁহার সঙ্গে আমার একবার চন্দননগরে দেখা হয় এবং আমার বোধ হয়, সেই সময় তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়। ছক্কনলালের নিবাস চকদিঘী। তিনি স্বয়ং আমাকে উইলের বিষয় কিছু বলেন নাই। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি বলিলেন। রাম চাটুর্য্যে সে সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না। (প্রশ্ন,—আপনি কি ছক্কনলাল রায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শেষ উইল যখন স্বাক্ষরিত হয়, তখন তিনি কোথায় ছিলেন? বাদিনীর কৌন্সিল এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে আপত্তি করেন।) উত্তর—আমি তাঁহাকে এ রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি নাই। কারণ আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি সেই সময় হীরালালবাবুর বাগানে ছিলেন। সারদার মৃত্যুর পর বাদিনী আমাকে একখানি পত্র লিখেন। সেই চিঠি আমার নিকট নাই, তাহা আমি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। তিনি আমাকে চকদিঘীতে যাইবার কথা লিখেন। আমি চকদিঘীতে যাই। কিন্তু আষাঢ় মাসে কিম্বা অন্য কোন মাসে এবং কোন্ তারিখে গিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি ঠাকুর প্রসাদ নামধারী কোন লোককে জানি না। একটী লোক আমাকে চকদিঘী লইয়া যাইবার জন্য এক খানি চিঠি লইয়া আসে। ঐ চিঠি দিবার দুই তিন দিবস পরে আমি চকদিঘী যাই।

ইহার পরেও ৩ এ নং কাগজে দেখিয়া সাক্ষী বলেন,—আমি জানি না, এই কাগজের উপর লেখা কাহার হস্তের। আমি সারদাবাবুর বাঙ্গালা হস্তাক্ষর দেখি নাই। যখন আমি চকদিঘী গিয়াছিলাম, তখন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ ধারা

মতে এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪০ ধারামতে সার্টফিকেট লওয়া হয় নাই। যখন আমি চকদিঘীতে গিয়াছিলাম, তখন আমি রাজেশ্বরীকে প্রথমে কিছু বলি নাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি উইলের খসড়া দেখিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে উইলের নকল দেখিয়াছেন। প্রথমে এই এই হাল উইল আমার স্বামীর ইচ্ছামত হইয়াছে কি না? তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম, দুটা একটা বিষয়ে একটু তফাৎ আছে। তদ্‌ভিন্ন আর সমস্ত বিষয় তাঁহার ইচ্ছামত হইয়াছে। ইহার পরে তিনি পুনর্ব্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, নানালোক এ বিষয়ে নানাকথা কহিতেছে, এখন আমার কি করা উচিত? তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম, আপনার স্বামী যেরূপ বলিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ করাই উচিত। লোকে যাহা বলে, সেইরূপ করা উচিত নয়।

উপরে যাহা বলা হইল, ইহা তাঁহার সহিত কথা কহিবার ফল। আমার ঠিক স্মরণ নাই, আমি চকদিঘীতে কত দিন ছিলাম, আমার বোধ হয় দুই তিন দিবস। সাক্ষীকে একখানি পত্র দেখান হইয়াছিল। তিনি ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি বলিতে পারি না, ইহা কাহার হস্তাক্ষর। ইহা রাজেশ্বরীর হস্তাক্ষর হইতে পারে। ইহার সহির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাক্ষী বলেন,—আমি শ্রীরাম চাটুর্য্যের হস্তাক্ষর যতদূর চিনি, তাহাতে বলিতে পারি, ইহা শ্রীরাম চাটুর্য্যের হস্তাক্ষর নহে। এই চিঠি কাহার হস্তাক্ষর, তাহা আমি বলিতে পারি না। ইহার পর সাক্ষী ৪নং কাগজ দৃষ্টি করিয়া বলেন,—ইহা আমার হস্তাক্ষর। ইহা আমি রাজেশ্বরী এবং যোগেন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছিলাম। সারদাবাবুর ভগিনী কুলদা দেবীর কোন বন্দোবস্ত না হইবার দরুণ তিনি আমাকে ইহা জানাইলে, আমি এই পত্র লিখি। সারদাবাবুর বাঙ্গালা সহি আমি জানি না।

প্রশ্ন। আপনি কি বলিতে পারেন, আপনি কি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, আপনি যখন ৪নং চিঠি লেখেন, তখন সারদাবাবু তাঁহার উইল করিয়াছেন?

উত্তর। আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই।

প্রঃ। আপনি কি সেই সময় বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সারদাবাবু তাঁহার উইল করেন নাই?

উঃ। আমার তাহাতে সন্দেহ ছিল।

প্রঃ। আপনার কি বিশ্বাস হইয়াছিল?

উঃ। আমি বিশ্বাস করি নাই যে, তিনি কখন উইল করিয়াছিলেন।

প্রঃ। আপনি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে

তোমরা সকলে চেষ্টা করিবে। এই বিশ্বাসে এবং এই বিবেচনাতে মৃত সারদা-প্রসাদবাবু আপনাদের দুই জনের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া যান। আপনি যখন ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন, তখন আপনার কি সন্দেহ হইয়াছিল যে, সারদা-বাবু আপনাদের দুই জনের হস্তে কার্য্যের ভার দিয়া গিয়াছেন? যখন আপনি ঐ পত্র লিখেন, তখন আপনার কি সন্দেহ হইয়াছিল যে, সারদাবাবু রাজেশ্বরী এবং যোগেন্দ্রের হস্তে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়াছেন?

উঃ। আমি এই প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলাম না। (এই প্রশ্নটী পুনরায় আদালত দ্বারায় বাঙ্গালায় বলা হয়।) সারদাবাবুর উইলের বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। আদালতে যে উইল ফাইল করা হয়, তাহাতেই দুই জনের দ্বারা বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের কথা উল্লেখ আছে ও তজ্জন্য আদালতে যে উইল ফাইল হয়, তাহার আনুষায়িক রাজেশ্বরী এবং যোগেন্দ্র বিষয়ের তত্ত্বা-বধারণের জন্য আদালত "হইতে" অনুমতি পাইয়াছিলেন এবং এরূপ অবস্থাতে কোন বিষয়ের বন্দোবস্ত জন্য তাহাদিগকে পত্র লিখিতে হইলে; তাহারা উইল দ্বারা যে ক্ষমতাপন্ন, তাহা উল্লেখ করিতে হয়। সেই কারণেই আমি তাঁহা-দিগকে ঐ ভাবে পত্র লিখি। সে যাহা হউক, উইল যথার্থ, তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না এবং সারদাবাবু যে উইল দ্বারা কার্য্য করিতে তাহাদিগকে ক্ষমতা দিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করি নাই।

নবীনচন্দ্র গাঙ্গুলী সব্ জজ।

২রা আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

তিন খানি পত্র আমি পাইয়াছি, তাহার মধ্যে এক খানি বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, এক খানি ছক্কনলাল এবং এক খানি রাজেশ্বরী দেবী লিখিয়াছেন। ঐ তিন খানি পত্র উইল সম্বন্ধীয়। আমার স্মরণ নাই, আমি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, সারদাবাবুর যখন মৃত্যু হয়, তখন ছক্কনলাল রায় হীরালাল-বাবুর বাগানে ছিলেন কি না। আমি পত্র খানি ছক্কনলালবাবুর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার চন্দননগরে সাক্ষাৎ হয়। আমার বোধ হয়, ইহা সারদাবাবুর মৃত্যুর একমাস দেড় মাস পরে। সারদাবাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে কিম্বা পরে ছক্কনলালবাবুর সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সারদা-বাবুর মৃত্যুর পরেই চকদিঘীতে যোগেন্দ্রবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। যোগেন্দ্রবাবু সারদাবাবুর মৃত্যুর পর আমার সহিত দেখা করিবার জন্য কলি-কাতায় আসিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সারদাবাবুর মৃত্যুর পর যখন আমি চকদিঘীতে যাই, তখন রাজেশ্বরী এবং বৃন্দাবন রায়ের সহিত আমার

কথাবার্ত্তা হয় ; কিন্তু যোগেন্দ্রের সহিত আমার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। বৃন্দাবনচন্দ্র রায়ের সহিত যখন আমার কথাবার্ত্তা হয়, তখন যোগেন্দ্রবাবু কোথায় ছিলেন, আমি তাহা জানি নাই। আমি তাঁহাকে মণিরামবাবুর বাটীতে দেখি নাই। তাঁহাকে চক্‌দিঘীতে দেখিয়া থাকিতে পারি। আমি বৃন্দাবনচন্দ্রের সহিত চক্‌দিঘীতে যাই। আমি তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—এখানে বহুপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ; সারদা-বাবুর কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য আপনাকে এখানে আনাইবার উদ্দেশ্য। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম,—আমাকে কি করিতে হইবে ? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—আপনাকে এমন করিতে হইবে, যাহাতে রাজেশ্বরী বিপক্ষতা-চরণ না করেন। তাহার মানে, উইলের বিপক্ষতাচরণ না করেন। এই খানে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার শেষ হয়। তৎপরে আমি বাটীর ভিতরে যাই এবং রাজেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করি। তাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি উইলের খসড়াটী খুলিয়া দেখেন এবং আপনি উইল দেখিয়াছেন, এই দুইটী উইলের বিষয় এক রকম কি না। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম যে, উহাতে আপনার স্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে। তাহাতে তিনি বলেন,—আমার এক্ষণে কি করা উচিত। আমি বলিয়াছিলাম,—আপনার মৃত স্বামীর ইচ্ছামত কার্য্য করা উচিত। আমার এই কথাবার্ত্তার বিষয় মনে আছে। আর কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কি না, মনে নাই। ললিতমোহনের লেখা-পড়ার সম্বন্ধে কথা কহিয়াও থাকিতে পারি ; কিন্তু আমার ঠিক স্মরণ নাই। আমার আরও মনে নাই, আমি বলিয়াছিলাম কি না যে, ললিতমোহনকে যদি রীতিমত লেখা-পড়া শিখান, তাহা হইলে কোন বিষয়ে আর গোলযোগ হইবে না। আমি তখন উইলের মর্ম্মে জানিতাম যে, ললিত-মোহনকে সারদাবাবু উইলের দ্বারা উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। আমার স্মরণ নাই, আমি ললিতমোহনের রীতিমত লেখা-পড়া সম্বন্ধে রাজেশ্বরীকে কিছু বলিয়াছিলাম কি না ; কিন্তু আমি বৃন্দাবনচন্দ্র রায়কে বলিয়াছিলাম যে, যাহাতে এই না-বালক ভালরূপ শিক্ষা পায়, আপনার তাহা করা উচিত। আমার স্মরণ নাই,—রাজেশ্বরীকে আমি বলিয়াছিলাম কি না যে, ললিতমোহন উহার পর তাঁহার কাছে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে না। যোগেন্দ্র-বাবুর সেই সময় কত বয়স ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া এক জন অনুমান করিতে পারে, তাঁহার বয়স ১৬।১৭ কিম্বা ১৮।১৯ বৎসর। আমার বোধ হয়, যোগেন্দ্রবাবু সেই সময় আমাকে বলিয়া-

ছিলেন যে, তাঁহার বয়স অতি কম এবং এরূপ বৃহৎ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি তাহাকে কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম কি না, আমার স্মরণ নাই। কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের জন্য আমি কোন স্ত্রীলোকের সহিত কখন তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম না। আমি কখন কাহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম না। যখন যোগেন্দ্র অল্প বয়স হেতু এত বড় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে অপারগতা জানাইয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে সারদাবাবুর ইচ্ছানুযায়িক কার্য্য করিতে বলিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। হয়ত ওরূপ বলিয়া থাকিতে পারি, তাহা আমি এখন ভুলিয়া গিয়াছি। যখন রাজেশ্বরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি তাঁহাকে বলি নাই যে, উইলের নকল আমি দেখিয়াছি। তিনি উইল সম্বন্ধে যেরূপ বলেন, তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি প্রথম উইলের কথা উত্থাপন করি নাই। তিনি প্রথমে আমাকে উইলের কথা বলেন। উহার পর রাজেশ্বরীর সহিত দুইবার চকদিঘীতে আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের পর আমি চকদিঘী হইতে চলিয়া আসিলে, রাজেশ্বরী আমাকে আর পত্র লেখেন নাই। বৃন্দাবনচন্দ্র আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। বৃন্দাবনচন্দ্রকে স্কুল সম্বন্ধে কোন পত্র লিখিয়াছিলাম, কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম কি না, তাহাও আমার মনে নাই। আমি চকদিঘীতে রাজেশ্বরীর পিতাকে দেখিয়াছি। আমি আরও চকদিঘীতে তাঁহার ভ্রাতা ব্রজকৃষ্ণকে দেখিয়াছি। গুরুদয়াল রাজেশ্বরীর পিতা ওরফে বিরজা আমাকে পত্র লিখেন নাই। গুরুদয়াল একবার কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মনে নাই, চকদিঘী হইতে ফিরিয়া আসিবার কত দিন পরে আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ২।৩ বৎসরের পরে হইতে পারে। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার কন্যার বিষয় সম্বন্ধে কথা কহিতে আসিয়াছেন। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, আমি ওকথা শুনিব না। আমি শুনিয়াছিলাম যে, বিষয়-তত্ত্বাবধায়কদিগের মধ্যে গোলযোগ চলিতেছে এবং বিষয়ের ভাল রকম ব্যবস্থা হইতেছে না, তজ্জন্য আমি তাড়াতাড়ি বলিয়াছিলাম যে, আমি ওকথা শুনিব না। সারদাবাবুর মৃত্যুর অল্প দিন পরে কোন ব্যক্তি তাঁহার বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছে কি না, তাহা আমি শুনি নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, দুই মাস পরে যখন আমি বাটীতে ছিলাম, তখন আমি বৃন্দাবন রায়ের নিকট

হইতে একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, তাহাতে ঐ গোলমালের কথা লেখা ছিল। তাহা হইতে বুঝিলাম যে, রাজেশ্বরী অন্য লোকের পরামর্শ লইয়াছে এবং উইল সম্বন্ধে গোলযোগ করিতেছে। ৬নং কাগজে সাক্ষী দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি এই পত্র লিখি। আমার বোধ হয়, বৃন্দাবনচন্দ্র যে পত্র লেখেন এবং যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই পত্রে তাহার জবাব লেখা হইয়াছিল। এই পত্রের শিরোনামা আমার হস্তের লেখা। চিঠি দেখিয়া বলিতে পারি না, বৃন্দাবনচন্দ্রের পত্রের উত্তরে এইরূপ লিখিয়াছিলাম কি না। (চিঠিখানি সাক্ষীকে শুনাইয়া পড়া হইলে সাক্ষী বলেন) আমি খবর জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি ঐ খবর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কি না, আমার স্মরণ নাই। আমার স্মরণ নাই, ঐ চিঠি লিখিবার আগে কি পরে ছক্কনলালের সহিত চন্দন-নগরে সাক্ষাৎ হয়। আমি ছক্কনলালবাবুর নিকট হইতে উইল সম্বন্ধে খবর পাই। আমি কলিকাতা হইতে ঐ পত্র লিখি।

আমি কলিকাতা হইতে চন্দননগরে গিয়াছিলাম; কিন্তু কোন্ মাসে, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমার বোধ হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে হইবে। ছক্কনলালের সহিত আমার চন্দননগরে সাক্ষাৎ হয়। আমি আমার ঐ পত্রে লিখি, তাঁহার উপকারের জন্যই তাঁহাকে আমি পরামর্শ দিব; কিন্তু সেই উপকার করিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। ঐ চিঠি লিখিবার এবং চকৃদিঘীতে আসিবার পর আমি কিছু করিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি ছক্কনলালের নিকট হইতে শুনিয়্যছি যে, তিনি উইল লিখিবার সময় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু আমার স্মরণ নাই, আমি এই কথা চকৃদিঘীতে বলিয়াছিলাম কি না। ইহার পর সাক্ষী বলেন,—ছক্কনলাল বলিয়াছিলেন যে, তিনি হীরালালবাবুর বাগানে ছিলেন। (ইহার পর সাক্ষী ৭ এবং ৭-এ নং কাগজে দৃষ্টি করিয়া বলেন) এই চিঠি এবং খাম আমার হাতের লেখা। সারদাবাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে চকৃদিঘীর স্কুল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। সারদাবাবুর মৃত্যুর পর হইতে উহা ফ্রি স্কুল হয়। উইলের ক্রোড়পত্রের আনুযায়িক স্কুল কি প্রকারে চলিবে, তাহার বন্দোবস্ত আমি করি। সাক্ষী চিঠিখানি পড়িয়াছিলেন। যে নূতন ব্যবস্থার কথা পত্রে উল্লিখিত আছে, তাহা উইলের উল্লিখিত নিয়ম সকলের অনুমত। আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, উইলের দ্বারা উইল বুঝাইতেছে কি উইলের ক্রোড়পত্র বুঝাইতেছে। ঐ পত্রেতে দ্বিতীয় শিক্ষকের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু তাহার নাম জানি না। আমি প্রথম শিক্ষকের নামও জানি না।

ঐ পত্র আনুযায়িক আমি চকদিঘীতে আসি এবং স্কুলের বন্দোবস্ত করিয়া যাই। (সাক্ষী ৮ নং কাগজে দৃষ্টি করিয়া বলেন যে) আমি এই পত্র লিখিয়াছি। প্রশ্ন, —"এ কি রকম, আপনি চকদিঘীতে যান নাই বলিয়া, গোলযোগ উপস্থিত হইল।" উঃ,—আমি তখন ইহা জানিতাম না। আমি ইহা বিশদরূপে বলিতে চাহি। আমার বোধ হয়, বৃন্দাবনচন্দ্র রায় আমাকে একখানি পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, আপনার এখানে না আসাতে বড় গোলযোগ হইতেছে। আমি ঐ পত্র ইহার প্রত্যুত্তরে লিখি। ঐ পত্রে যাহা লেখা আছে, আমি তাহা লিখি। আমি এই ভাবিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম যে, তাঁহারা আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন এবং এরূপ ভাবে কার্য্য করিবেন যে, তাহাতে গোলযোগ কমিয়া যাইবে। (৯ চিহ্নিত কাগজ দেখিয়া সাক্ষী বলেন) এই পত্র রাজেশ্বরীর লেখা। গবর্ণমেণ্টের উকিল মতিলাল চৌধুরীকে আমি চিনি। কুলদাসুন্দরীর দাবীর বিষয় বলিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি যথার্থই বলিতেছি, আমার স্মরণ নাই। আমি বেণীমাধব রায়কে চিনি। তিনি তাঁহার ছেলের পক্ষে এবং রাজেশ্বরী ও যোগেন্দ্রের বিপক্ষে এক মোকদ্দমা করেন। আমার স্মরণ আছে, আমি মতিলাল চৌধুরীকে ঐ মোকদ্দমার কথা বলি। আমার বোধ হয়, আমি বলিয়াছিলাম, আপনি বেণী-মাধব রায়ের পুত্র প্রিয়স্বর উইল আনুযায়িক মাসহারা পাইবার চেষ্টা করিবেন। (সাক্ষী ১০ এবং ১০-এ নং কাগজে সহির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন।) কাগজের তলায় রাজেশ্বরীর যে স্বাক্ষর আছে, রাজেশ্বরীর স্বাক্ষর বলিয়া আমার বোধ হয়। আমি যোগেন্দ্রের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর দেখি নাই (প্রমাণের সহি)। (একটা কাগজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাক্ষী বলেন) কাগজের শেষ রাজেশ্বরীর যে সহি আছে, তাহা রাজেশ্বরীর বলিয়া আমার বোধ হয়। সাক্ষী এক খানি চিঠি লক্ষ্য করিয়া বলেন—ইহা কাহার হস্তের লেখা, আমি বলিতে পারি না। রাজেশ্বরী আমার বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৪।১৫ দিন পূর্ব্বে আমার বাটীতে আসেন এবং প্রায় এক সপ্তাহ আমার বাটীতে থাকেন। সুবিধামত বাটী না পাওয়া যাওয়াতে আমি তাঁহাকে আমার বাটীতে রাখি। না-বালক ললিতমোহন এবং রাজেশ্বরীর যাহাতে মঙ্গল হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিয়াছি এই সম্বন্ধে আমি ককরেল সাহেবের সহিত দেখা করি। তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর। আমি আরও উমেশচন্দ্র মিত্রের পরামর্শ লই। মধ্যস্থদ্বারা মোকদ্দমার মীমাংসা হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে, সর্ব্বপ্রথমে মধ্যস্থ দ্বারা মিটাইবার কথা আমি উল্লেখ করি নাই।

আমাকে এক জন মধ্যস্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। আরও অন্যান্য যাঁহারা মধ্যস্থ হইবেন, তাঁহাদিগের নাম আমি উল্লেখ করি। ঐ মধ্যস্থদিগের নাম প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসন্নবাবু সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং অপর ব্যক্তি প্রেসিডেন্সি কলেজের এক জন অধ্যাপক। উভয়ই আমার বন্ধু। ককরেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি আমাকে বলেন যে, বহু বিলম্বে এই মোকদ্দমা মধ্যস্থ দ্বারা মিটাইবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমার বোধ হয় যে, বাদিনী ভয়ে এইরূপ বলিয়াছেন। যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম, তখন আমি উমেশচন্দ্রবাবুকে উইলের এক খানি নকল দেখাই ও তাঁহার সহিত আর কতকগুলি স্মারকপত্র দেখাই। এই স্মারক-পত্রগুলি আমি চকৃদিঘীতে লিখি। সারদাবাবুর মৃত্যুর পর যখন আমি চক্-দিঘীতে ছিলাম, তখন আমি ঐ স্মারক-লিপিগুলি লিখি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উইল এবং উইলের নকল বৃন্দাবন রায় আমাকে পাঠাইয়া দেন। আমি ঐ গুলি উমেশবাবুকে দেখাই। আমি এমন কথা বলি নাই যে, আমাকে মধ্যস্থ করা হইয়াছে বলিয়া উইল বজায় রাখিব। আমি শপথ গ্রহণপূর্ব্বক এই কথা বলিতেছি। ককরেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। আমি ম্যানেজার উমেশচন্দ্র মিত্রকে রাজেশ্বরীর এ পত্রখানি দিই। আমি ম্যানেজারকে বলি যে, সারদাবাবুর পেতাত্মা যদি এখনও বর্ত্তমান থাকে, ললিতমোহন বিষয় না পাইলে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। আমি আরও বলিয়াছিলাম যে, ললিমোহন বিষয় যদি না পান, তাহা হইলে আমিও দুঃখিত হইব। আমার স্মরণ নাই, আমি বলিয়াছিলাম কি না, না-বালককে উইল আনুযায়িক যে বিষয়ে দেওয়া হইয়াছে, উহা তাহাকে ভোগ করিতে দেওয়া হউক, ইহা আমার ইচ্ছা। আমি বলিয়াছিলাম যে, যদি ললিতমোহন বিষয় পান এবং রাজেশ্বরী মনের সুখে থাকেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। যখন আমি ইহা বলিয়াছিলাম তখন আমার ধারণা ছিল না, সারদাবাবু কোন উইল করেন নাই। যখন আমি মতিবাবুকে বেণীমাধবের পুত্রের পক্ষে উইল আনুযায়িক মোকদ্দমা আনিতে বলি, তখন আমার ধারণা ছিল যে, সারদাবাবু কোন উইল করেন নাই। যখন আমি রাজেশ্বরীকে বলি যে, আপনি আপনার স্বামীর ইচ্ছানুযায়িক কার্য্য করিতে বাধ্য, তখন আমার ধারণা ছিল যে, সারদাবাবু উইল করেন নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি রাজেশ্বরীকে কখন বলি নাই যে, আপনার স্বামী উইল করেন নাই। আমি এ কথা যোগেন্দ্রকেও বলি নাই।

যখন আমি মতিবাবুকে বেণীমাধবের পক্ষে মোকদ্দমা আনিতে বলি, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উইলটী জাল এবং কাল্পনিক। এই ৮ বৎসর ধরিয়া আমি এই বিষয় মনে রাখিয়াছি। আমি বৃন্দাবন রায়কে ঈশ্বরসিংহের স্বাক্ষর সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম কি না, তাহা স্মরণ নাই। আমি পাকপাড়ার রাজাদিগের নিকট টাকা ধারি না; কিন্তু আমি ঐ বাটীর এক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ২০০০ টাকার ধার করিয়াছি। প্রশ্ন—তোমার এক্ষণে দেনা আছে কি না? উঃ—আমি এ প্রশ্নের জবাব দিব না। আদালত এই প্রশ্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে দেন এবং তাহার জবাব চান। সাক্ষী বলেন,—আমার দেনা আছে। আমি কোন বইর কপিরাইট তো বেনামেতে রাখি নাই। সারদাবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয় হইতে আমি টাকা ধার চাহিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার মনে নাই। বোধ হয় আমি ঋণ চাহি নাই। আমি ঋণ চাহিতে সক্ষম নই। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে সাক্ষী বলেন,—আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন সদস্য; কিন্তু সিণ্ডেকেটের এক জন মেম্বর নই। আমি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। প্রশ্ন,—আপনি কি হিন্দু-বিধবা-বিবাহের উত্তেজক? এই প্রশ্নে আপত্তি করা হইল। উঃ—এই হিসাবে আমার দ্বারা অনেক টাকা খরচ করা হইয়াছে। আমাকে অনেককে মাসহারা দিতে হয়। যাহারা বিধবা-বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের অনেককে টাকা দিতে হয়, আমি এই দান বদান্যতা জন্য করিয়াছি। কারণ আমার বিবেচনায় বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া সৎকার্য্য। বিধবাদিগের বিবাহ দিবার জন্য কিম্বা ঐ হিসাবে আমার দেনা। আমি অনেক দিন পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছি। আমি ইহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি না। প্রশ্ন,—সারদাবাবু যে খসড়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল? কিম্বা কাহাকেও তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া উল্লিখিত ছিল? এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। প্রশ্ন,—আপনি বলিলেন, সারদাপ্রসাদ যখন উইল করেন, তখন ছক্কনলাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এ কথা তিনিই আপনাকে বলিয়াছেন। সারদাপ্রসাদের উইল করিবার সময় সত্য সত্যই কি ছক্কনলাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন? অপর পক্ষ হইতে এ প্রশ্নে আপত্তি উঠিল। কিন্তু উত্তর হইল,—আমি জানিয়াছি যে, উইল করিবার সময় তিনি সারদাবাবুর নিকট উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্ন,—আপনি ছক্কনলালের নিকট কোন্ সময়ে এই উইল করা হয় শুনিয়াছেন? উঃ,—মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই উইল করেন। তখন তিনি হীরালাল বাবুর বাগানে ছিলেন! ছক্কনলাল এই উইল করিবার সময় সারদা বাবুর কাছে ছিলেন।

প্রশ্ন। আপনি যদি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে সারদাবাবু উইল করেন নাই, তবে আপনি কেমন করিয়া তাঁহার বিধবা স্ত্রীকে উইল অনুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন ?

সাক্ষী বলেন,—"আমি অত্যন্ত পীড়িত এবং দুর্ব্বল ; বিশেষতঃ সকাল বেলা আহার করি নাই ; কাল বুঝিয়াছিলাম যে, ১১টার ভিতরেই আমার এজাহার শেষ হইয়া যাইবে ; আর বুঝিতেও পারি না এবং কথা কহিতেও পারি না।" বাদিনীর পক্ষ কৌন্সিল বলেন —তাঁহার এজাহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাকে আর দুইটী মাত্র প্রশ্ন করা হইবে। এখন দুইটা বাজিয়াছে।

উঃ। আমি তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিয়াছিলাম, এই বিবেচনায় যে, তাহা হইলে দেশের উপকার হইবে ও সারদাবাবুরও কথা বজায় থাকিবে। যদি রাজেশ্বরী আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, উইল জাল কি না, তাহা হইলে আমার মনের যাহা বিশ্বাস, তাহা আমি নিশ্চয় তাঁহাকে বলিতাম। তিনি আমায় সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং আমিও কোন কথার উল্লেখ করি নাই। আমি বলিয়াছি যে, আমি রাজেশ্বরীর পত্র উমেশ মিত্রকে দিই, উমেশ মিত্র সে পত্র খানি পাইয়া খুব চাপ দেন অর্থাৎ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি এইরূপ পত্র পান, তাহা হইলে তিনি কালেক্টার আফিসে যাইবেন ; আর সমস্ত বিষয় দাবী করিবেন। তিনি এই কথা বলিলে, আমি রাজেশ্বরীকে সেই মত কার্য্য করিতে বলি। ইহার পরে কোন লোক ইংরেজিতে একখানি খসড়া করে। আমি তাহা সর্ব্বপ্রথমে রাজেশ্বরীকে দেখাই, পরে উমেশবাবু সেই পত্রের কতক অংশে আপত্তি উত্থাপন করিলে, রাজেশ্বরীকে ইহার বিষয় জানান হয় এবং এই পত্রখানি বদলাইয়া আবার একখানি খসড়া তৈয়ার করা হয়। পরে ইহা আবার পরিষ্কার করিয়া নকল করা হয়। রাজেশ্বরী তাহাতে স্বাক্ষর করেন।

প্রশ্ন। ইহা কেমন করিয়া হইল যে রাজেশ্বরী কলিকাতায় আপনার বাটীতে আসিতেন ?

উঃ। উমেশচন্দ্র আমাকে কোন কথা বলেন। তজ্জন্য রাজেশ্বরীকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে আমি শীঘ্রই কলিকাতা আসিতে বলি।

উড্র সাহেবের অনুরোধে সাক্ষী বলেন, যখন সারদাবাবু মারা যান, তখন আমি এমন পীড়িত যে, বাটী ছাড়িতে অক্ষম। বিধবা-বিবাহের খরচ যোগাইতে আমি কখনও চাঁদা তুলি নাই ; কিন্তু লোকে যাহা স্বেচ্ছায় দিত, তাহা আমি গ্রহণ করিতাম।

বিচারে উইল প্রকৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। হাইকোর্টের আপীলেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। উইলে সারদাবাবুর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহকে বিষয় দেওয়া হইয়াছিল। (ইনি এখন মান্যবর ললিতমোহন সিংহ বাহাদুর।)

একচত্বারিংশ অধ্যায়

কলেজে জামাতা—পিতৃ-বিয়োগ—কন্যার বিবাহ—বসত-বাড়ী—অসুখে প্রবাস—উপাধি—বি. এ. ক্লাশ,—নিয়মে নিষ্ঠা—বি এর ফল—কানপুরে প্রবাস—ছাপাখানার শেষ ঋণশোধে সাধুতা—ঠাকুর বাড়ীর বিবাদ মতান্তরে ফল—সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র—কলেজ বাড়ী, পত্নী বিয়োগ—পত্নীচরিত্র—জামাতার পদচ্যুতি—কলেজের ভার-গুরুদাসবাবু—বীরসিংহের জননীর পত্র ও ভগবতী বিদ্যালয়

১২৮২ সালে বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জামাতা সূর্য্যবাবু মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

১২৮২ সালের ৩০শে চৈত্র বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রেল পিতা ঠাকুরদাস কাশীপ্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতৃবিয়োগে পঞ্চম বৎসরের শিশুর মত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। মা গেলেন ; পিতা গেলেন ; ইহ-সংসারে বিদ্যাসাগরের সকল সুখ অপসৃত হইল। ১লা বৈশাখ বা ১২ই এপ্রেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভেদ বমি হইয়াছিল। তাঁহাকে তদবস্থায় কলিকাতায় আনা হয়। সুস্থ হইয়া তিনি বারান্তরে কাশী গিয়াছিলেন। তথায় তিনি পিতার শ্রাদ্ধাদি করেন। ইহাই তাঁহার পিতার আদেশ ছিল।

১২৮৪ সালে বা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারীর বিবাহ হয়। কন্যা ও জামাতা বাড়ীতেই থাকিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জামাতা, কন্যা এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাকে বড় ভালবাসিতেন।

এই বৎসর কলিকাতার বাদুড়বাগানের বাড়ী সম্পূর্ণ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুব্যয়ে এই বাড়ী প্রস্তুত করেন। শীত কালে তিনি এই বাড়ীতে

প্রবিষ্ট হন। প্রথমে তিনি স্বয়ং লাইব্রেরি লইয়া এই বাড়ীতে একাকী থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য বাড়ী প্রাপ্ত হইবার সুবিধা না হওয়ায়, সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হন।

আর দেহ বহে না! রোগে শরীর জীর্ণ! ইহার উপর মাতৃশোক ও পিতৃশোক! আর কত সহে! তেজস্বী পুরুষ, তাই এত দিন দেহ বহিয়াছিল। আর কত দিন! প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে দেবতা হারে, মানুষ কোন্ ছার। দুর্জ্জয় বীর বিদ্যাসাগর ক্রমে শোণিতশূন্য ও শক্তিহীন হইয়া আসিতে লাগিলেন। তিনি সংসারের সকল কঠোর কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় আর তিনি বেশী দিন থাকিতে পারিতেন না। ক্রমে সংসার-কোলাহল ভয়ঙ্কর কষ্টকর হইতে লাগিল। তাই তিনি কখন বা কর্ম্মাটাঁড়ে, কখন বা ফরাসডাঙ্গায় থাকিতেন। কর্ম্মাটাঁড়েই তিনি বেশী দিন থাকিতেন। কর্ম্মাটাঁড়ে সরল সাঁওতালগণ তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। প্রত্যহ সাঁওতালগণের কেহ না কেহ যথাসাধ্য উপহার লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। একবার একটী সাঁওতাল একটী মোরগ উপহার আনিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মোরগ উপহার দেখিয়া, হাসিয়া বলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ, মোরগ লই কি করিয়া?" সাঁওতাল কাঁদিয়া ফেলিল। অগত্যা বিদ্যাসাগরকে মোরগটী হাতে করিয়া লইতে হইল। সাঁওতালের আনন্দের সীমা রহিল না। সাঁওতাল চলিয়া আসিলে পর মোরগটী অবশ্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সাঁওতালদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল। এক দিন একটী সাঁওতাল তাহার আত্মীয় স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। সে সাক্ষাৎ করিয়া বলে,—"একে একখানা কাপড দিতে হবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে বলেন,—"কাপড় নাই। আর ওকে দিব কেন?" সাঁওতাল বলিল,—"তা হবে না, কাপড় দিতেই হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"কাপড নাই।" তখন সাঁওতাল বলিল—"দে তোব চাবি। চাবি খুলে সিন্ধুক দেখ্‌বো।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, হাসিয়া সাঁওতালকে সিন্ধুকের চাবিটী দেন। সাঁওতাল চাবি দিয়া সিন্ধুক খুলিয়া দেখে, প্রচুর কাপড়। সে বলিল,—"এই যে কাপড়।" এই বলিয়া সে একখানি ভাল কাপড় বাহির করিয়া আনিয়া, স্ত্রীলোকটীকে প্রদান করিল। ইহাতেই বিদ্যাসাগরের অপার আনন্দ।

সুযোগ্য কৃতবিদ্য জামাতাকে স্কুলের ভার দিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্কুলের ভাবনা সদাই মস্তিষ্কে ঘুরিয়া বেড়াইত। ১২৮৬ সালে

বা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কলেজে বি.এ. ক্লাস খোলা হয়। ইহার চরমোন্নতি হইয়াছিল।

পরে বি. এল. ক্লাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে কলেজের পরীক্ষার্থীদিগকে শতকরা হিসাবে নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত থাকিতে হয়। না থাকিলে পরীক্ষা দিবার অধিকার থাকে না। এ নিয়মপালনের প্রতি বিদ্যাসাগরের দৃঢ় দৃষ্টি ছিল। এ নিয়মভঙ্গে প্রত্যবায় আছে, এই ধারণায়, কলেজের অধ্যাপক মাত্রকেই তিনি এ সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে উপদেশ দিতেন। কাহারও ত্রুটি বোধ হইলে বিদ্যাসাগর তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। একবার রীপণ কলেজ হইতে একজন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার উপস্থিতি-নিয়মে ত্রুটি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে এ কথা বিদিত করেন। তাহা লইয়া হুলস্থুল বাধিয়াছিল। রীপণ কলেজের কর্ত্তা সুরেন্দ্রবাবু বেশ অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। অতঃপর সকল কলেজকে এ সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইয়াছিল।

১২৮৭ সালে বা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সি. আই. ই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমতঃ উপাধি-গ্রহণে অসম্মত হন। পরে উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া উপাধি গ্রহণ করেন; সনন্দ লইতে কিন্তু দরবারে যান নাই।

ইহার পর তিনি কলেজের বাড়ী নির্ম্মাণের ভাবনায় বিব্রত হইয়াছিলেন। তিনি বৎসর-প্রায় আর কোন বিশিষ্ট সাধারণ জ্ঞাতব্য কার্য্য করেন নাই।

১২৮৯ সালে বা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগ উঠিয়া যায়। ষোল বৎসর কাল এই পুস্তক পাঠ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। ঋজুপাঠ উঠিয়া যাওয়ায়, অনেকটা আয় হ্রাস হইয়াছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর একটু বিব্রত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিচলিত হন নাই। ইহার পূর্ব্বে স্কুলের অনেক শিক্ষকের বেতন বাড়াইয়া দিবার আশা দেওয়া হইয়াছিল। আয় হ্রাস জন্য কতকটা নিরাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাহাকেও নিরাশ করেন নাই। যেরূপেই হউক, তিনি অর্থ সঙ্কুলান করিয়া লইয়াছেন। সাধু সঙ্কল্প অসম্পূর্ণ রহে না।

১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর অসুস্থ হইয়া কানপুরে যান।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় মেট্রোপলিটন সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বড়বাজারের শাখা ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বহুবাজারের শাখা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২৯১ সালের ১৮ই পৌষ বা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহার সংস্কৃত প্রেসের অবশিষ্ট অংশ পাঁচ সহস্র টাকায় বিক্রয় করেন। প্রেসের কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি-হীনতা, এ বিক্রয়ের কারণ; অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার অনেক টাকার ঋণশোধ হইয়াছিল। পুস্তকের আয় মাসিক প্রায় তিন-চার সহস্র টাকা দাঁড়াইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দেনা তিনি এক পয়সাও রাখিয়া যান নাই। বিদ্যাসাগর দেনা করিয়াছিলেন অনেকেরই; দেনা রাখেন নাই কাহারও। পাওনাদার পাওনার কথা ভুলিতেন, বিদ্যাসাগর দেনার কথা ভুলিতেন না। যাচিয়া ঋণ পরিশোধের শত-পরিচয় বিদ্যাসাগরের জীবনে পাইবে। একবার তাঁহার নিকট গবর্ণমেণ্টের প্রায় পাঁচ হাজার টাকা পাওনা ছিল। গবর্ণমেণ্ট পাওনার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হিসাব-নিকাশেও ইহার উল্লেখ ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং পত্র লিখিয়া, এই কথা তুলিয়া, টাকা পরিশোধ করেন। শুনা যায়, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন পাটীগণিত, ইতিহাস প্রভৃতি ছাপিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে এই টাকা দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এই টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল।

এই সময় পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতা রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মধ্যে বিষয় লইয়া মতান্তর হয়। বিষয়ের গোল মিটাইবার জন্য ১২৯২ সালের ২৫শে বৈশাখ বা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে উভয় ভ্রাতা নিম্নলিখিত সালিশীনামা লিখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সালিসী হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহাশয় সমীপেষু—

স্বাঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
স্বাঃ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

সবিনয় নিবেদনম্—

আমরা দুই সহোদর একাল পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী থাকিয়া কালযাপন করিতে-ছিলাম। এক্ষণে সেরূপ কালযাপন করায় নানা অসুবিধা বোধ করিয়া পরস্পর পৃথক অন্ন হওয়া আবশ্যক হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে বিষয়বিভাগও অপরিহার্য্য। আপোশে সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভাবনীয় বোধ করিয়া

উভয়ে একমত হইয়া আপনাকে সালিশ নিযুক্ত করিয়া এই ভার দিতেছি, আপনি আমাদের উভয় পক্ষের নিকট হইতে সকল বিষয় অবগত হইয়া ও সবিশেষ তদন্ত করিয়া আমাদের স্থাবরাস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন। আমরা উভয়ে অঙ্গীকার করিতেছি, আপনার কৃত বিভাগ মান্য করিয়া লইব, সে বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি করিব না। যদি করি, বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই সালিশনামা লিখিয়া দিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এই বিষয় নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। ইতি সন ১২৯২ বার শত বিরানব্বই সাল তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, গোলযোগ মিটাইবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজ পত্র আনিয়া তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে, পর্য্যালোচনা করিতেন। নানা কারণে গোলযোগ মিটান দুঃসাধ্য ভাবিয়া তিনি ১২৯২ সালের ১৫ই আষাঢ় বা ৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন উভয় ভ্রাতাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া সালিশীর ভার পরিত্যাগ করেন ·

বিনয়নমস্কারবহুমানপুরঃসর আবেদনমিদম্—

আপনাদের বিষয়বিভাগ সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এত বিরক্ত হইয়াছি যে, আমার ঐ বিষয়ে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। এ জন্য নিরতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে আপনাদের গোচর করিতেছি, আমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। আপনাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া ও আন্তরিক সুখলাভ করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কিমধিকমিতি সন ১২৯২ সাল। ১৫ই আষাঢ়।

১২৯২ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ বা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়, মতান্তরবশতঃ সংস্কৃত ডিপজিটরি হইতে আপনার সমুদায় পুস্তক তুলিয়া লইয়া আনিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা লাইব্রেরিতে রাখিয়া দেন। কলিকাতা লাইব্রেরি এখন কলিকাতার-সুকিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাবতীয় পুস্তক এইখান হইতে বিক্রীত হইয়া থাকে।

এ সময় বিলাতফেরত সিবিলিয়ান ঋগ্বেদ-প্রকাশক [অনুবাদক] রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আলাপ-পরিচয় হয়। রমেশবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ী যাইতেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ ছিলেন। তিনি রমেশবাবুকে ঋগ্বেদ প্রকাশ [অনুবাদ] সম্বন্ধে বলেন,—"ভাই, উত্তম কাজে হাত

দিয়াছ, কাজটী সম্পন্ন কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি আমি কোনরূপে পারি, তোমার সাহায্য করিব।”

স্বয়ং রমেশবাবু এই সব কথা “নব্য-ভারতে” লিথিয়াছিলেন। বিলাতফেরত শূদ্র সিবিলিয়ানকে বেদ-প্রকাশে প্রশ্রয় দিয়া ব্রাহ্মণসন্তান বিদ্যাসাগর এ যুগোচিত কার্য্য করিয়াছেন। অধিকার অনধিকারের সূক্ষ্ম তত্ত্ব মর্ম্মে বিদ্যাসাগর দৃষ্টিহীন, এ ঘটনা তাহারই অন্যতম প্রমাণ। তিনি যে সে মর্ম্ম বুঝিয়াও আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে কাহারও সাহস হইবে না। তিনি যে সত্য-পরায়ণ।

১২৯৩ সালের মাঘ মাসে বা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শঙ্কর ঘোষের লেনে নূতন বাড়ীতে কলেজ ও স্কুল প্রবেশ করে। জমি ক্রয় করিতে ও বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রায় লক্ষ টাকা ধার হইয়াছিল।

১২৯৫ সালের ৩০শে শ্রাবণ বা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী রক্তামাশয় পীড়ায় লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইনি কপালে করাঘাত করিতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতাকে ডাকিয়া বলেন,—“বাবা, মা কি বলিতেছেন শুনুন।” বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—“বুঝিয়াছি, তাই হইবে; তার জন্য আর ভাবিতে হইবে না।” কপালে করাঘাত,—পুত্রের জন্য করুণা-ভিক্ষা। আশ্বাস পাইয়া সতী সুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

পত্নী দীনময়ী প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ন্যায় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে বড ভালবাসিতেন। দানধ্যানেও তাঁহার পূর্ণ প্রবৃত্তি ছিল। বর্জ্জিত পুত্র নারায়ণের জন্য পতির সহিত তাঁহার অনেক সময় বাদবিসংবাদ ঘটিত। এই বাদবিসংবাদই সদ্ভাবক্রটীর মূল কারণ হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি গোপনে পুত্রকে অর্থসাহায্য করিতেন, এমন কি নিজের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বন্ধক দিতেন। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করিতেন। পিতা শত্রুঘ্ন যেমন তেজস্বী ছিলেন, কন্যা দীনময়ীও তেমনি তেজস্বিনী ছিলেন। স্বামীর নিকট একবার কোন জিনিষ চাহিয়া না পাইলে, তিনি দুর্জ্জয় অভিমানে অভিভূত হইতেন। তেজস্বী বিদ্যাসাগর তাহার জন্য বিচলিত হইতেন না। এইরূপে মনোবাদ ঘটিত। দীনময়ী তেজস্বিনী ছিলেন; কিন্তু পিতার ন্যায় তাঁহার যথেষ্ট উদারতা ছিল।

পত্নীবিয়োগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে দাম্পত্য সুখাভাবের সুদারুণ স্মৃতি জাগরিত হইয়াছিল। সেই স্মৃতিতাড়নায় সহসা অনুতাপ-দাবানল প্রবল

বেগে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অন্তর্নিহিত দাব-দাহের যন্ত্রণায় রোগও বাড়িয়া গিয়াছিল।

এত আধি-ব্যাধির জ্বালাময়ী যন্ত্রণায়ও বিদ্যাসাগর এক মুহূর্ত্তের জন্য আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। স্কুল, কলেজ সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। জামাতা সূর্য্যবাবুর উপর ভার দিয়া, তিনি গুরু কার্য্যভার হইতে অবসর লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভাবনা প্রাণের ভিতর অবিরাম। বিধাতা বিমুখ। পত্নী-বিয়োগের দিন কতক পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় জামাতা সূর্য্যবাবুর কোন কার্য্যের কর্ত্তব্যত্রুটি বিবেচনায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। পুত্র-বর্জ্জনান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাঁহাকে পুত্ররূপে কোল দিয়াছিলেন, যাঁহার কার্য্যপটুতায় স্কুল কলেজের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল এবং যাঁহার উপর স্কুলের ভার দিয়া; গুরুতর কার্য্যভার হইতে অবকাশ পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় পদচ্যুত করিলেন। নিশ্চিতই সে কর্ত্তব্যত্রুটীকে তিনি ক্ষমাতীত মনে করিয়াছিলেন।

জামাতার পদচ্যুতির পর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রায়ই স্কুল, কলেজের পরিদর্শন করিতে হইত। তিনি পাল্কী করিয়া যাইতেন এবং পাল্কী করিয়া আসিতেন। উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যাইবার পর, তিনি প্রায় গাড়ী চড়িতেন না। নিজের গাড়ী ঘোড়া রাখিবার অর্থ-সামর্থ্য ছিল; কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। বহু পূর্ব্বে তিনি গাড়ীঘোড়া রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে তাহা তুলিয়া দেন।

এই সময়ে, তিনি হাইকোর্টের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে স্কুলের ভার দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গুরুদাস-বাবু এ গুরুভার বহনে সম্মত হন নাই। এ অসম্মতির কারণ অবশ্য অক্ষমতা। গুরুদাসবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পিতৃবৎ ভক্তি করিতেন। যখন কলিকাতা রাধাবাজারে কলিকাতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলাম, তখন সেই প্রেসে গুরুদাস বাবুর প্রণীত ইংরেজি অঙ্ক-পুস্তক মুদ্রিত হইত। সেই সময় তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার মুখে প্রায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন শুনিতাম। তিনি স্ব-প্রণীত অঙ্ক-পুস্তক বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার জন্য একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অন্য কাহাকেও বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। এ কথা, তখন তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম। এক গুরুদাস বাবু স্কুল-কলেজের ভার লইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। এমন অটল বিশ্বাস আর কাহারও উপর ছিল না। উভয়ের হৃদয়ে নিত্য

তরঙ্গায়িত ঘাত-প্রতিঘাতে ভক্তি-বাৎসল্যের অবিচ্ছিন্ন স্রোত প্রবাহিত হইত। বিদায় হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়, কোন দ্রব্য লইবেন না বুঝিয়া গুরুদাসবাবু মাতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটী রৌপ্য-নির্ম্মিত গ্লাস উপহার দিয়াছিলেন। নারায়ণবাবুর নিকট এই সুন্দর সুগঠিত গ্লাসটী দেখিয়াছিলাম। গ্লাসে এইরূপ খোদিত আছে,—

"পানপাত্রমিদং দত্তং বিদ্যাসাগরশর্ম্মণে।
স্বর্গ কামনায় মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধয়া॥"

রোগ শীর্ণ দেহে স্কুল-কলেজের চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়াও, বিদ্যাসাগর এক দিনের জন্য জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম বিস্মৃত হন নাই। আঠার-উনিশ বৎসর তিনি বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন নাই বটে; কিন্তু বীরসিংহের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এক দিন তিনি কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া উপরে উঠিতে-ছিলেন, সে সময় বীরসিংহ গ্রাম হইতে প্রেরিত একখানি মুদ্রিত ক্ষুদ্র পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। স্বয়ং বীরসিংহের জননী যেন কাতর-কণ্ঠে বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ করিয়া সেই পুস্তক লিখিয়াছেন। সে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার তাড়নায় বীরসিংহ গ্রামের স্কুলটী উঠিয়া গিয়াছিল। ১২৯৭ সালের ২রা বৈশাখ বা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তিনি এই বিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় জননীর নামে এই বিদ্যালয়ের নাম হইল—বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়। এখনও এই স্কুল চলিতেছে।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়

পীড়া-বৃদ্ধি—ফরাসডাঙ্গায় প্রবাস—দয়া—সহৃদয়তা—সহবাস-সম্মতি আইন—মত—রাজনীতির আলোচনা—পীড়ার অবস্থা ও দেহান্তর

আর কত সহে! শোকতাপ-পীড়িত, ব্যাধিজর্জ্জরিত ও সুদারুণ শ্রম-ভারাক্রান্ত জীর্ণ দেহে আর কত সয়! এ কঙ্করিত সংসার-ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কঠোরতার দুর্ব্বার সংগ্রামে আজন্ম জয়ী। কিন্তু এ জগতে কে কালজয়ী! ইতিপূর্ব্বে প্রাণপ্রতিম বন্ধু প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ও প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণদাস পাল, বিদ্যাসাগরকে শোকের অনন্ত শর-শয্যায় শয়ন করাইয়া একে একে ইহসংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন! সুতরাং আর কত সয়! মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর ন্যায় বিদ্যাসাগর

মহাশয় বিখ্যাত নাটককার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরকে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন। দীনবন্ধু মিত্র বহু পূর্ব্বে বিদ্যাসাগরকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেরূপ সৌহার্দ্দ্য ছিল, বোধ হয়, আর কাহারও সহিত সেরূপ ছিল না। সুকীয়া ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার নিকট দীনবন্ধুবাবুর বাসা ছিল। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হইলেও উভয়ের পরিবার সৌহার্দ্দ্য-ব্যবহারে এক জাতীয় হইয়াছিলেন।

২৯৭ সালের প্রারম্ভে বা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উদরাময় পীড়া বলবতী হইয়া উঠে। ইহার পূর্ব্বে ছয় বৎসর কাল তিনি উদরাময়ে ভুগিতেছিলেন। এই ছয় বৎসর কাল আগাবে অন্নাদির গুরুপাক কতকটা সহ্য হইত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অন্নাহার একেবারে বন্ধ হইয়াছিল। সিদ্ধ-করা বালি, পালো প্রভৃতি মাত্র আহার ছিল। অগ্রহায়ণ মাসে ডাক্তার হীরালাল ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নির্জ্জনে থাকিবার পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,— "কলিকাতায় থাকিতে তাহা চলিবে না লোকে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, বলিতে পারিব না, সাক্ষাৎ করিব না, আর দরজায় দরোয়ানও বসাইতে পারিব না।" অবশেষে স্থানান্তরে যাওয়া সিদ্ধান্ত হইল। অগ্রহায়ণ মাসে তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ফরাসডাঙ্গায় যান, সেখানে ভাগীরথীতটে একটি সুন্দর-সুগঠিত স্বাস্থ্যপ্রদ দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এই বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন।

ফরাসডাঙ্গার স্বাস্থ্য-প্রবাসেও দান ও দয়া অবিরাম এবং সহৃদয়তার অবাধ স্রোত। একদিন একটী অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক স্ত্রীর হাত ধরিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল। সমস্ত সহর ঘুরিয়া একমুষ্টি ভিক্ষা মিলে নাই। শেষে সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার অবস্থা অবগত হইয়া, দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে গোটাকতক পয়সা দিয়া, জিজ্ঞাসা করেন,— "তোর কি খাইতে ইচ্ছা হয় ?"

ভিক্ষুক বলিল,—"আমি লুচি ও দই অনেক দিন খাই নাই। আমার এখন তাই খাইতেইচ্ছা হয়।"

বিদ্যাসাগর তখনই আপনার কন্যাকে দিয়া লুচি প্রস্তুত করাইয়া ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকের স্ত্রীকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেন। অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে দুইটি টাকা দিয়া বলেন,—"প্রত্যেক রবিবার আসিয়া লুচি খাইয়া যাস্।" কেবল ইহাই নহে, তাহাদের ঘর-ভাড়া স্বরূপ তিনি প্রত্যেক মাসে ॥০ আনা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

ফরাসডাঙ্গায় থাকিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায়ই নিকটবর্ত্তী স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। একবার তিনি ভদ্রেশ্বরের একটী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র ছিলেন। ব্রাহ্মণের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পুত্র তামাক সাজিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অম্লানবদনে নির্ব্বিকারচিত্তে তামাক খাইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় পথে ভ্রাতা বলিলেন,—"আপনি কেমন করিয়া, কুষ্ঠের হাতের সাজা তামাক খাইলেন ?" বিদ্যাসাগর মহাশয়, গম্ভীর ভাবে উত্তর দেন,—"যদি তোমার বা আমার কুষ্ঠ হইত, তাহা হইলে কি করিতাম ?"

ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিতি কালে গবর্ণমেণ্ট সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি দিন পাঁচ ছয়ের জন্য কলিকাতায় আসেন। বহু পরিশ্রম সহকারে, নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তিনি আইনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন *। এতৎসম্বন্ধে তিনি যে মত লিখিয়া গবর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

"এই বিলের সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতে আমি সমর্থ নহি। যে স্থলে স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয়, সে স্থলে উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে, সর্ব্ববিধায়ে গর্ভাধান-সংস্কারানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। গর্ভাধান সংস্কার শাস্ত্রবিহিত ; সকলের পক্ষে অনুষ্ঠেয় ও সাধারণতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত। স্ত্রীর প্রথমে রজোদর্শন হইলে স্বামীকে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের অনুকূলে অনেক শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এস্থলে কলিযুগের সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ্য একটি পরাশরবচন উদ্ধৃত করিলে যথেষ্ট হইবে,—

"ঋতুস্নানান্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ" ॥ ৪।২৪ ॥

"প্রথম রজোদর্শনকালীন ঋতুস্নাতঃ ভার্য্যাসমীপে যে স্বামী গমন না করেন, তিনি ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাতক সঞ্চয় করেন।"

---

* রাজকুলের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নূতন [illegible] প্রকাশ করিতে হইত। কখন তিনি কোন রাজনীতি আন্দোলন বা রাজনীতি সভায় সংশ্রব রাখিতেন না। একবার তিনি একটি রাজনীতি সভা সংগঠনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন মাত্র। —"নব বার্ষিকী", ১৫৩ পৃষ্ঠা।

যেহেতু কতকগুলি বালিকা দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই প্রথম রজোদর্শন করে, বিল আইনে পরিণত হইলে, তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত বিধির অনুষ্ঠান আদৌ হইতে পারিবে না, সুতরাং রাজবিধি দ্বারা বৈধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিরোধ করিলে, জন সমাজে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বালিকা-স্ত্রীগণের রক্ষার জন্য উক্ত বিল যে আশ্রয় প্রদানে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বহুসংখ্যক ঘটনায় দৃষ্ট হয়, যে সচরাচর দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে প্রথম রজোদর্শন ঘটিয়া থাকে। দ্বাদশ বর্ষে সম্মতিবিধি নির্দ্ধারিত হইলে, ইহার ফল এই হইবে যে, উক্ত বর্ষ-অতিক্রমকারিণী বালিকাগণ নিতান্ত আশ্রয়শূন্য হইবে। অধিকন্তু স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষে পদক্ষেপ করিলেই স্বামী স্ত্রী-সহবাসে উত্তেজনা ও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। যে বিধি স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই তাহার প্রতি নৃশংস আচরণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে উদ্যত, সে বিধির সমর্থন আমি কোন প্রকারেই করিতে প্রস্তুত নহি।

যদিও এই সকল কারণে আমি বিলের সমর্থন করিতে অপারগ, তথাপি প্রচলিত কোন ধর্ম্মসংস্কারের প্রতিকূলাচরণ না করিয়া, এমন কোন আইন হউক, যাহাতে বালিকা-স্ত্রীগণ সমুচিত আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আমি সম্পূর্ণ অভিলাষী। আমার প্রস্তাব এই যে, স্ত্রী রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে তৎসহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক। অধিকাংশ বালিকা ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ বর্ষের পূর্ব্বে প্রায় রজঃস্বলা হয় না। সুতরাং আমার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে, তাহাদিগকে প্রস্তাবিত আইন অপেক্ষাকৃত বাস্তবিক ও অধিকতর প্রশস্ত আশ্রয় প্রদানে সমর্থ হইবে, তৎসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী বলিয়া উক্ত বিধির বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নহে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রজঃস্বলার পূর্ব্বে স্ত্রী সহবাস স্বামীর পক্ষে নিতান্তই ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্য। এ সম্বন্ধে তিনটী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিলেই হইবে। প্রথম বচনটী বাচস্পতি মিশ্রকৃত "স্মৃতিসার সংগ্রহ" হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে,—

"গর্ভাধানং পত্ন্যা যোন ঋতুকালীন আদ্যো রেতঃ সেকঃ"॥

"প্রথম রজোদর্শন হইলে, স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়ে প্রথম বীর্য্যনিষেকের নাম গর্ভাধান সংস্কার।" উক্ত বচনে "প্রথম" এই শব্দের নির্দ্দেশে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্বামীর স্ত্রীর নিকটে অভিগমন শাস্ত্রের অনভিপ্রেত। দ্বিতীয় বচন মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতীথি-প্রণীত টীকা হইতে উদ্ধৃত হইল,—

"ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ" ॥ ৩।৪৫ ॥

"ঋতুকালে (চতুর্থ দিবসে) স্ত্রী-সহবাস কর্ত্তব্য।"

"উক্তো বিবাহঃ। তস্মিন্ নিবৃত্তে সমুপজাতে দারত্বে তদহরেবেচ্ছয়োপগমে প্রাপ্তে। তন্নিবৃত্ত্যর্থমিদমারভ্যতে। ন বিবাহসমনন্তরং তদহরেব গচ্ছেৎ কিং তর্হি ঋতুকালং প্রতীক্ষেত" ॥

"বিবাহের বিষয় উক্ত হইল। বিবাহানুষ্ঠানের পর বালিকার পত্নীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইচ্ছা থাকিলে সেই দিনেই স্ত্রী-সহবাস সম্ভব। বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ। তবে কি করা কর্ত্তব্য? ঋতুকাল পর্য্যন্ত তাহার (অর্থাৎ স্বামীর) অপেক্ষা করা উচিত।"

কমলাকর ভট্ট প্রণীত "নির্ণয়-সিন্ধু" হইতে তৃতীয় বচনটী গৃহীত হইল,—

"প্রথমর্ত্তো পূর্বং স্ত্রীগমনং ন কার্য্যম্
প্রাগ্রজোদর্শনাৎ পত্নীং নেয়াদ্ গত্বা পতত্যধঃ।
ব্যর্থোকারেন শুক্রস্য ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়াত্ ॥
ইতি আশ্বলায়নোক্তেঃ"। তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥

প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীগমন সর্ব্বথা অনুচিত। অশ্বালায়ন বলেন যে, কাহারও ঋতু দর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীগমন উচিত নহে। এরূপ কার্য্যে মহা প্রত্যবায় সঞ্চার হয়। অকারণ বীর্য্যত্যাগে মনুষ্য ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়।

এইরূপ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় যে, রজঃস্বলার পূর্ব্বে স্ত্রী-সহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণনীয় হইবে। ঈদৃশ আইন বিধিবদ্ধ হইলে যে, কেবল জন-সমাজের উপকার ও বালিকা পত্নীগণের সমুচিত রক্ষা হইবে, তাহা নহে; বরং শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধির সমর্থন বাড়িবে। উক্ত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে শাস্ত্রে যে দণ্ডবিধির উল্লেখ আছে, তাহা আধ্যাত্মিক; সুতরাং অধিকাংশের অগ্রাহ্য। আইনানুসারে ইহা দণ্ডের দ্বারা নিষিদ্ধ হইলে, শাস্ত্রীয় বিধি অধিকতর কার্য্যকারী হইবে। গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এ বিষয়ে বিচারার্থ অনুরোধ করিতেছি।

আমার প্রস্তাবিত আইনের কার্য্যকালে যাহাতে কোন প্রকার অনিষ্ট না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে নির্দ্দেশ করিতেছি যে, উক্ত অপরাধে পুলিশ কোনরূপ হস্তক্ষেপতা করিতে পারিবে না; পরন্তু স্ত্রী অথবা স্ত্রীর অনূঢ়াবস্থায় তাহার

আইনানুমোদিত অভিভাবক ব্যতীত অপর কেহ স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর বলাৎকার সংক্রান্ত অভিযোগ আদালতে আনয়ন করিতে পারিবে না।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১

এ মত অবশ্য ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছিল। এখানে অনুবাদমাত্র প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে কার্য্য হয় নাই। ইংরেজি রাজনীতিতত্ত্বের গূঢ়মর্ম্মানুভব করিবার ইহা অন্যতম সুযোগ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত আইনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ ইংরেজ-রাজের প্রকৃতি ও নীতির অনুমোদিত। সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মত গ্রাহ্য হইল না। ইহা তো ইংরেজ রাজের প্রকৃতি ও নীতির অনুমোদিত নহে। বিধবা-বিবাহে যে বিদ্যাসাগর, সহবাস-সম্মতি আইনেও সেই বিদ্যাসাগর।

বিধবা-বিবাহ-বিচারে যে ভ্রম হইয়াছিল, সম্মতি আইনের বিচারে সে ভ্রম ঘটে নাই দেখিয়া, সমগ্র হিন্দুসমাজ সুখী হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা-বিবাহের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে আবার সহবাস-সম্মতি আইনের বিপক্ষে মত দিতে দেখিয়া অনেকেই জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আপনার ভ্রম অনুভব করিতে পারিয়াছেন। বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীরা বলেন, শরীরের অসুস্থতা ও স্বদেশ-বাসীর দুর্ব্ব্যবহার, এই নির্লিপ্ততার কারণ। আমাদের ধারণা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে ভ্রমানুভব হয় নাই। হইলে তিনি এমন কপটাচারী নহেন যে, তাহা সাধারণ্যে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। অধিকন্তু আমরা জানি, জীবনের শেষাবস্থাতেও তিনি নিজ দৌহিত্রের বিধবা-বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনে কৃতকার্য্য না হইয়া তিনি নিরাশহৃদয়ে সমাজের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। নৈরাশ্য জন্যই, বোধ হয় তিনি বাবু দুর্গামোহন দাসের সসন্তান বিধবা-বিবাহে আহ্লাদ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি ফরাসডাঙ্গায় ফিরিয়া যান। সেখানে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ভাল ছিলেন। চৈত্রমাসে দুই দিন অনাহার করিয়াছিলেন। বৈশাখ মাসে আবার পীড়া বৃদ্ধি পায়। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কলিকাতায় আসিয়া ৭০০।৮০০ টাকা ব্যয়ে স্বস্ত্যয়নাদি করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে হঠাৎ তাঁহার পার্শ্বদেশে একটা বেদনা

উপস্থিত হয়। কিছুতেই বেদনার উপশম হয় নাই। তখন তিনি কনিষ্ঠ দৌহিত্র যতীশচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় ইলেক্‌ট্রো-হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইল। তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। এই সময় তিনি অহিফেন পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি বলেন,—"অহিফেন খাইলে দুধ খাইতে হয়। দুধ তো আমার সয় না। কাজেই খাই না, দুধ না খাওয়ায় ফল হইতেছে না। এতএব অহিফেন পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এমন একটা ঔষধ খাওয়া উচিত, যাহাতে অহিফেন ত্যাগ করিলেও কষ্ট হইবে না।" ডাক্তার হীরালাল ঘোষ ও অমূল্যচরণ বসু অহিফেন ত্যাগে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কয়েক জনের সহিত পরামর্শে অহিফেন ত্যাগ করাই সিদ্ধান্ত হয়। কলিকাতা কলুটোলার হাকিম আবদুল লতিফ অহিফেন ত্যাগ করিবার ঔষধ দেন। সেই ঔষধ দুই দিন সেবন করিবামাত্র পীড়ার প্রকোপ বাড়িয়া উঠে বেদনা বাড়িল; আবল্য আসিল; হিক্কা দেখা দিল; সকলেই আশঙ্কিত হইলেন। চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বার্চ্চ ও ম্যাকোলনকে আনান হয়। তাঁহারা বলেন,—"উদরে "ক্যানসার" হইয়াছে।" রোগের উপশম হইল না। কখনও বেদনা বাড়ে, কখনও কোষ্ঠবদ্ধ হয়, কখনও হিক্কা বাড়ে। আবার কোন দিন একটু ভাল, কোন দিন একটু মন্দ হয়। কোন দিন আহারের আদৌ প্রবৃত্তি থাকে না. কোন দিন একটু প্রবৃত্তি হয়। ৩০শে আষাঢ় পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় যায়। ৩১শে আষাঢ় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সল্‌জার সাহেব চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় একটু উপকার হইয়াছিল। পূর্ব্বে মলত্যাগ করাইতে পিচকারী ব্যবহার করাইতে হইত। অতঃপর পিচকারী ব্যবহার করিতে হয় নাই। ডাক্তার সল্‌জার "আলসার" অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ব্যাবা কমিবার সম্ভাবনা, না কমিলে সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা। কমিলেও এক মাসের অধিক বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।" এই সময় গর্দ্দভ দুগ্ধের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কোনও দিন গর্দ্দভ দুগ্ধ সহিত, কোন দিন সহিত না। কোন দিন, একটু বল হইত, কোন দিন হইত না। কোন দিন হিক্কা কমিত, কোন দিন বাড়িত। গাড়ীঘোড়ার শব্দে কষ্ট হইত বলিয়া বাড়ীর পার্শ্বে গলিতে বিচালি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গাড়ী ঘোড়া যাইলে শব্দ হইত না। মিউনিসিপালিটী স্কাভেঞ্জারের গাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ৩রা শ্রাবণ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পুরাতন গ্রহণী যত অনিষ্টের মূল।

ডাক্তারেরা আসিতেন, দেখিতেন, চলিয়া যাইতেন; কিন্তু ডাক্তার অমূল্যচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট দিবারাত্র বসিয়া থাকিতেন; শুশ্রূষা করিতেন; মুহুর্মুহু রোগের গতি নিরীক্ষণ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অমূল্যচরণকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অমূল্যচরণও পুত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন।

৪ঠা শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয় শয্যাশায়ী হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি উঠিতে বসিতে পারিতেন আর তাহা পারিলেন না। এই দিন একটু জ্বর হইয়াছিল। ইহার পর ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত কোন দিন একটু ভাল, কোন দিন একটু মন্দ গিয়াছিল। ৮ই শ্রাবণ নূতন উইল করিবার কথা উঠে। শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উইলের খসড়াও করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল ও কলেজ একটি কমিটীর হস্তে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে কথা উইলে লিখিত হইয়াছিল।

১১ই শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকাল হইতে বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অবস্থা খুব মন্দ হইয়াছিল। আবল্য ও মাদকতা বাড়িয়াছিল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ভাবান্তর হইয়াছিল। প্রবল তাপে জ্বর ফুটিয়াছিল। এই দিন কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন আশঙ্কিত হইয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেনকে আনান হইয়াছিল। তিনি একটী বার মাত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন— "বাহিরে যত মন্দ বলিয়া বোধ হয়, ভিতরে তত মন্দ নয়।" কিন্তু হায়! বিধি বাম!

ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১২ই শ্রাবণ সোমবার একরূপ অচৈতন্য অবস্থা ছিল। মুখের ভাব বিকৃত হয় নাই। ভাবে বোধ হইত, ভিতরে ভয়ানক যন্ত্রণা, বিরাট পুরুষ বিদ্যাসাগর সে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন।

রোগের সঙ্গে যাতনা বাড়িল; যাতনা বাড়িল, কিন্তু সাগরের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। অন্তরের যাতনানুভূতি তিনি বাহিরের লোককে বাহ্যাকারে বুঝিতে দিতেন না। যতক্ষণ না চৈতন্যলোপ হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি কাহাকেও সহজে মল, মূত্র বা বমনাদি পরিষ্কার করিতে দিতেন না। সে পক্ষে কেহ উদ্যোগী হইলে বরং বিরক্ত হইতেন। কাহারও কোন কষ্ট দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, কিন্তু নিজের অসহ্য কষ্টতাপেও তিনি কখন কাতর হইতেন না। তিনি নিরভ্র ভীম হিমগিরিবৎ অচল অটল থাকিতেন। একবার তিনি আপনার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কোন পুস্তকালয়ে গিয়াছিলেন।

সেখানে তাঁহার পায়ের উপর একটা ভয়ানক ভারী লৌহ-চাপ পড়িয়া যায়। অপর কেহ হইলে হয়ত উঠিতে পারিত না। তিনি কিন্তু অম্লানবদনে উঠিয়া পাল্কী চাপিয়া বাড়ী আসেন। যাতনা যৎপরোনাস্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে যাতনার বাহ্যাবয়বে বিকৃতির লেশমাত্র হয় নাই। দৌহিত্র যতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাতনা হইতেছে কি?" তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"যাতনা যা হইতেছে, তোদের হইলে ডাক্তারের ডাক বসাইতে হইত; আমাকেও পাগল করিতিস্।" আর একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পায়ে "কারবঙ্কল" হইয়াছিল। তিনি সদানন্দ সহাস্য-বদনে বসিয়া প্যারীচরণ সরকারের সহিত কথা কহিতেছিলেন। সেই সময় ডাক্তার আসিয়া তাঁহার "কারবঙ্কল" কাটিয়া দেন। "কারবঙ্কল" কাটিবার সময় তাঁহার একটু মাত্র মুখবিকৃতি দেখা যায় নাই। প্যারীবাবু অবাক হইয়াছিলেন। এমন সহিষ্ণুতার পরিচয় সহস্র প্রকারে পাইবে। বার্দ্ধক্যেও কণ্টকময় অন্তিম শয্যায় সে সহিষ্ণুতার সর্ব্বোচ্চ পরিচয়। যাতনার অগ্নিকুণ্ড হইতে যথাপাত্রে যথাযোগ্য রহস্যভাবের সুধাধারা বর্ষিত হইত।

যে ঘরে জননীর চিত্র ছিল, সেই ঘরে তিনি শুইয়াছিলেন। জননীর চিত্র ছিল পূর্ব্ব দিকে, তাঁহাকে উত্তর শিয়রে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বাকশূন্য, অচেতন, কিন্তু কি এক মন্ত্রপ্রভাবে মুমূর্ষু মাতৃভক্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়া পশ্চিম দিকে মাথা লইয়া যান। সম্মুখে পূর্ব্বদিকে তিনি জননীর মূর্ত্তিপানে নিস্পন্দনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মঙ্গলবার আদৌ চৈতন্য ছিল না।

আর আশা নাই! পলকে প্রলয়! গভীর শোকচ্ছায়ায় শান্ত নিকেতন আচ্ছন্ন হইল। আত্মীয় স্বজন, পুত্র, দৌহিত্র, ভ্রাতা, কন্যা, ভক্ত, অনুগত—সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে উৎকণ্ঠিত চিত্তে মুমূর্ষুর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভিতরে হয়ত দারুণ দাবানল, বাহিরে কিন্তু অনাবিল শুভ্র শান্তি। মুখমণ্ডল অবিকৃত। প্রাতে—মধ্যাহ্নে—অপরাহ্নে—সন্ধ্যাসমাগমে এই একই ভাব।

রাত্রি ১১টার সময় নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল। [মঙ্গলবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮। বুধবার, ২৯শে জুলাই, ১৮৯১] রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটে সেই করুণাময়ের করুণাকান্তির নিভন্ত জ্যোতি জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইল!

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

শেষ

এইবার শেষ। শূন্য দেহের শ্মশানসৎকার। নিত্য মৃতগ্রাসী নিমতলা ঘাটে বিদ্যাসাগরের সৎকার হইয়াছিল। দুই দিন পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর শেষ শয়ন করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যে সুন্দর সুশোভন খট্টাঙ্গে শয়ন করিতেন, সেই খট্টাঙ্গেই তাঁহার শব-দেহ শায়িত হইয়াছিল। পুত্র, ভ্রাতা, দৌহিত্র, আত্মীয়বর্গ এবং ভক্তবৃন্দ খট্টাঙ্গ স্কন্ধে লইয়া রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকার সময় নিমতলাভিমুখে যাত্রা করেন। মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, পুত্র নারায়ণ বাষ্পাকুলিত-লোচনে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"বাবা, এই তোমার সাধের মেট্রোপলিটন। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার এই কীর্ত্তি বজায় রাখিতে পারি।" সেই শোক-পরীত কাতর ক্রন্দনে উপস্থিত কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

নিশার শেষভাগে অনেকেই এই শোকময় সংবাদ শুনিয়া, শেষ দেখা দেখিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইয়াছিল। অনেক ভক্ত খট্টাঙ্গ স্পর্শ করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শব শ্মশানে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতৃবর্গ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সৎকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দৌহিত্রগণ কিন্তু শব-দেহের শেষ ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শরৎচন্দ্র সেন মহাশয়কে ডাকাইয়া আনিয়া ঠিক সূর্য্যোদয়ে ফটোগ্রাফ তুলাইয়া লন।

দেখিতে দেখিতে, ক্রমে শ্মশান-ঘাট অসংখ্য জনসমাগমে পূর্ণ হইল। সকলেই বিদ্যাসাগরকে শেষ-দেখা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে গিয়াছিল। যাঁহারা প্রত্যহ প্রাতঃস্নানে যাইয়া থাকেন, তাঁহারা সংবাদ পাইবামাত্র সর্ব্বাগ্রে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় প্রকৃতি প্রকৃতই একটা বিশ্বব্যাপিনী সৌম্য-গম্ভীর শোকময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ভাগীরথীর কলকলনাদে সমাগত ব্যক্তিবর্গের হাহাকার-আর্ত্তনাদ এবং অশ্রু-ভারাবনত আত্মীয়বর্গের নীরব দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া কি যেন এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইল।

ফটোগ্রাফ তুলাইতে এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গের দর্শনাকাঙ্ক্ষা মিটাইতে সৎকারের বিলম্ব হইয়াছিল। সূর্য্যোদয়ের পর শবদেহ চিতা-শয্যায় শায়িত

হয়। চিতার জন্ত বড়বাজার প্রভৃতি স্থান হইতে যথাসম্ভব চন্দনকাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। মুহূর্তে চিতা জলিল! পুত্র নারায়ণ মুখাগ্নি করিলেন।* বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত চিতা জলিয়াছিল। ক্রমে সব ফুরাইল! চিতা নিবিল! অনেক ভক্ত অস্থি ও ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দৌহিত্রদ্বয় দুই কলস ভস্ম সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও দুইদিন পরে জাহ্নবী জলে মিশাইল। কিছুই রহিল না! রহিল কীর্ত্তি! আর রহিল স্মৃতি! কবি মানকুমারী শ্মশানে স্বচক্ষে বিদ্যাসাগরের সৎকার দেখিয়া মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় লিখিয়াছিলেন,—"অই জাহ্নবী-বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জলিতেছে! ঐ আগুনে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে! বাঙ্গালীর পিরামিড ভস্মসাৎ হইতেছে! ঐ ধূ ধূ করিয়া আগুন জলিতেছে! ঐ আগুনে বাঙ্গালীর প্রধান গর্ব্ব—প্রধান অহঙ্কার পুড়িয়া যাইতেছে। ঐ চিতার আগুনে আজ কত কি ফুরাইল। কত কাঙ্গাল গরীবের মাতা পিতা হারাইল। কত হৃদয় আজি আশা-ভরসা হারা হইল। শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইতেছে! ঐ চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে।"

সৎকারান্তে কাঙ্গালী বিদায় করিয়া সকলেই বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বাড়ী ফিরিয়া আসেন। প্রায় দশ-বার দিন বিদ্যাসাগরের ভক্তবৃন্দ মধ্যে মধ্যে শ্মশানে চিতা-চিহ্নের পার্শ্বে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

শোক

ক্রমে শোকাময় সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হইল। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহে এ শোকময় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। যিনি যে ভাবে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব বুঝিতেন, তিনি সেই ভাবে সেই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এলাহাবাদের পাইওনিয়র লিখিয়াছিলেন,—"He was a brilliant educationalist, and well-known for his labours in the promotion of Hindu Widow-remarriage," 30th July, 1891.

* বিদ্যাসাগর মহাশয়, মুমূর্ষু পত্নীর নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, ফরাসডাঙ্গার শেষ প্রবাসে তৎপালনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। নারায়ণবাবু পিতৃ শুশ্রূষার অধিকার পাইয়াছিলেন।

ইংলিশম্যান লিখিয়াছিলেন,—"A man of rare gifts and broad sympaties." —30th July, 1891.

ডেলিনিউস্ লিখিয়াছিলেন,—"Death has again this week carried away another of the brightest jewells of India." 30th July, 1891.

ষ্টেটস্‌ম্যান লিখিয়াছিলেন,—"Another of the foremost men of Bengal has gone over to the majority." —30th July, 1891,

ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পত্রসমূহে এতৎ সম্বন্ধে স্বল্পবিস্তর পরিমাণে লিখিত হইয়াছিল। আমেরিকার কোন পত্র, বিদ্যাসাগরকে গ্লাডষ্টোনের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ভারতের গ্রাম, পল্লী, নগর, সহর সর্ব্বত্রই এই শোকময় সংবাদ প্রচারিত হইল। সহর মফঃস্বলের বেসরকারী স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়াছিল। কলিকাতায় মেট্রোপলিটনের ছাত্রগণ পাদুকা পরিত্যাগ করিয়াছিল। কলিকাতার পুস্তক বিক্রেতৃগণ, কোম্পানীর কাগজের দালালগণ ও রাধাবাজারের দোকানদারগণ দোকানপাট ও আফিসাদি বন্ধ করিয়াছিলেন। মেট্রোপলিটন, প্রেসিডেন্সি, সংস্কৃত কলেজ, হাবড়া স্কুল প্রভৃতি কলেজ-স্কুলে শোক-প্রকাশের জন্য সভা হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে খ্যাতনামা পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, মেট্রোপলিটনে শ্রীযুক্ত মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের মাননীয় অধ্যাপক টনি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, কত স্থানে কত সভাসমিতি যে আহূত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। মফঃস্বলে বর্দ্ধমান, হুগলী, শ্রীরামপুর, ঢাকা, আসাম, গৌহাটি, বরিশাল, ত্রিপুরা, কুচবিহার প্রভৃতি ছোট বড সহরে এবং অন্যত্র হায়দারাবাদ পর্যন্ত নানা স্থানে শোকপ্রকাশ এবং স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার উদ্দেশে সভাসমিতি হইয়াছিল। ঢাকার সভায় ভূতপূর্ব্ব "বান্ধব সম্পাদক" এবং স্বর্গীয় ভাওয়ালরাজের প্রধান মন্ত্রী মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর মহাশয়, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাওয়ালাধিপতি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর বিদ্যাসাগরের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে ঢাকা কলেজে তিন সহস্র টাকা দিবার প্রস্তাব করেন। বন্দোবস্ত এইরূপ হয়, যদি কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি না পায়, অথচ সংস্কৃত পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মাসিক দশ টাকা হিসাবে, পাঁচ বৎসর কাল এই টাকার সুদ হইতে বৃত্তি দেওয়া হইবে। কালীগঞ্জের স্কুলে একটি সভা হইয়াছিল। যে ছাত্র বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের একখানি সুন্দর জীবনী লিখিতে পারিবে, তাহাকে "বিদ্যাসাগর" নামক একটি পদক পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল। একভিন্ন আর বহু স্থানে লাইব্রেরি, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি বহু পত্রেই তাঁহার স্মৃতি-সম্মানসূচক শোক-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় এবং শ্রীমতী ভুপেন্দ্রবালা দেবীর লিখিত তিনটী কবিতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। এই তিনটী কবিতাই হিতবাদী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর

ফুরাল বঙ্গের লীলা মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী।
হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ!
কি মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা, করুণা গভীর;
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর;
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর;—
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার…
কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন,
কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ,
দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ;
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর।
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান্,—
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান!

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর বৈকুণ্ঠে

আমার ঈশ্বর প্রভু,
আমার প্রাণের প্রাণ,
আমার গুরুর গুরু, জ্ঞানের জ্ঞেয়ান ;
অপার দয়ায় সিন্ধু,
অসংখ্য দীনের বন্ধু,
ভাষার ভাস্কর-ইন্দু, দেবতা মহান্ ।
বিধবার কাতরতা,
অনাথের প্রাণব্যথা,
ছাত্রের জীবন গুরু ঈশ্বর আমার ;
বিদ্যার সাগর ধীর,
সত্যের তেজস্বী বীর,
অন্যায়ের মহাবৈর ন্যায়-অবতার
গাম্ভীর্য্যের মহা মূর্ত্তি,
রহস্যের মহাস্ফূর্ত্তি,
শিষ্টের পালন প্রভু দুষ্টের দমন ;
অমর ঈশ্বর মোর,
অমরগণের সনে
হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর বিরাজে কেমন ।
মোর মত শত শত
লক্ষ লক্ষ হৃদয়েতে
এতদিনে পূর্ণরূপে ঈশ্বর-বিকাশ ;
একটি বৈকুণ্ঠ নয়,
লক্ষ লক্ষ—ততোঽধিক
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ এবে ঈশ্বর নিবাস ।
কেন তবে কাঁদ সবে
'জয়েশ্বর' উচ্চ রবে
তোল স্বর বহু দূর আকাশ ভেদিয়া,
পৃথিবীর যে যেথায়,
শুনুক সে উচ্চ স্বর,

কোটি কোটি চক্ষু মেলি দেখুক চাহিয়া,—
বাঙালীর ঘরে ঘরে,
লক্ষ লক্ষ ছয় কোটি
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ মাঝে দয়ার সাগর
ঈশ্বর—ঈশ্বর—গুরু অমর ঈশ্বর।

রাজকৃষ্ণ রায়

কে বলে ঈশ্বর নাই ?

কে বলে ঈশ্বর নাই ?
ঈশ্বর জীবনে ঈশ্বরের কার্য্য
জ্বলিছে দেখিতে পাই।
মৃত লোকে ভরা, স্বার্থপর ধরা
ঈশ্বরে হারায়ে আজ,
মৃত শোক ভরে, কাঁদিতেছে সবে
ধরিয়া শোকের সাজ।
বুঝে না তাহারা, অমর ঈশ্বর—
মরণ তাঁহার নাই ;
নিঃস্বার্থ প্রেমের, অমৃতের ছবি
সংসারে রহিল তাই।
এ ছবি দেখিয়া কত মৃত প্রাণ
নূতন জীবন পাবে।
পরবর্ত্তী কত নূতন জীবন
আদর্শে গঠিত হবে।
অমৃতের পুত্র, অমর ঈশ্বর
অমর-ভবন-বাসী,
প্রেম বিলাইয়া, অনন্ত প্রেমেতে
গিয়াছেন শেষে মিশি।
অমৃতের পুত্র, অমর ঈশ্বর
তাঁহার বিরহে আজ—
কাঁদিতেছে লোক, অমৃত ভাষায়
দেখে হৃদে পাই লাজ !

অমর বিরহে, কাঁদিবার তরে
চাই গো অমর ভাষা।
মৃত লোক তোরা, তুলেছিস্ কেন
তোদের এ মৃত ভাষা?
অমৃতের পুত্র, অমর যাহারা
এসো অগ্রসর হ'য়ে—
অমর ভাষায় বিরহ সঙ্গীত
উঠ গো তোমরা গেয়ে।
সে সঙ্গীত গিয়ে, প্রতি মৃত প্রাণে
ঢালুক অমৃতধারা,
মুহূর্ত্তের তরে, সজীব হইয়া
হউক আপনাহারা।

শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দেবী

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট বা ১২৯৮ সালের ১১ই ভাদ্র টাউন হলে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুজন্য শোক-প্রকাশে এবং তাঁহাদের স্মৃতি-চিহ্ন-সঙ্কল্পে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর স্যর চার্লস্ ইলিয়ট্ সভাপতি হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পেথরাম সাহেব, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর কতক সৌভাগ্যের পরিচয় বটে; কিন্তু ইহাও প্রায় ঘটে না। আমরা বুঝি, কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিই অনন্ত অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ। ধাতু প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বা পটাঙ্কিত প্রতিকৃতি পদে পদে প্রতিকৃতির অধীন। দুই দিনে তাহার লয় সম্ভাবনা; প্রলয়ে কীর্ত্তির বিলোপ নাই। কীর্ত্তি অবিনশ্বর ও অনন্ত-ভাস্বর। যাঁহারা স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের সংকল্প করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য আমাদের বাস্তবিক আন্তরিক কষ্ট হয়। সভা করিয়া বাগাড়ম্বরে শোক প্রকাশ করিবার প্রথা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ প্রথার পরম গুরু, বিলাতী সাহেব সম্প্রদায়। তবে সাহেব সম্প্রদায়, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত পলে পলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে পটু নহেন। বাঙ্গালীর এ গৌরববাদ অধুনা বিশ্ব-বিসর্পিত। সাহিত্যের

রুচির চিত্রপটে ভাষার ললিত বর্ণলাবণ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী চরিত্রের এই অংশের একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমারেল্ড থিয়েটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ জন্য ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে রবীন্দ্রবাবুর পঠিত "বিদ্যাসাগর চরিত" প্রবন্ধের একস্থলে এই কথা লেখা ছিল,— "আমরা আরম্ভ করিয়া শেষ করি না। আড়ম্বর করি, কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি; তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।"

এই সভার সভাপতি মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার অকৃতকার্য্যতা স্মরণ করিয়া যেন আত্মচিত্তপ্রসাদকল্পে বলিয়াছিলেন, "কীর্ত্তি-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত না হউক, বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত!" এ স্তোক-বাণী নিশ্চিতই বিক্ষত বক্ষের স্নিগ্ধ প্রলেপ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

চরিত্র-চর্চ্চা

কাল-স্রোতে বিদ্যাসাগর যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকটিত হইল। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব এবং কৃতিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর প্রকৃতপক্ষে বড়লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর দানে বড়; বিদ্যাসাগর পরদুঃখকাতরতায় বড়; বিদ্যাসাগর বুদ্ধিবলে বড়; তিনি আরও কত শত বিষয়ে সাধারণ লোক হইতে অনেক বড়। সাধারণ হইতে তাঁহার এই অসাধারণত্ব— পার্থক্য ছিল বলিয়াই, তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন; কর্ম্মক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়াছিলেন। ফল মন্দ বা ভালই হউক, অসাধারণত্ব তাঁহার মধ্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যাসাগরের যে কালে জন্ম, সে কালে কালধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত তাঁহারই মত একজন অসাধারণ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। কালস্রোতের পরিবর্ত্তনের যখন প্রয়োজন হয়, তখন এইরূপ লোকেরই জন্ম হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে।

কালপ্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল,—বাঙ্গালার এমনই

দুর্দ্দিনে বিদ্যাসাগরের জন্ম হইল। বিদ্যাসাগর আপন অসাধারণ প্রতিভা এবং কার্য্যক্ষমতা লইয়া সেই ভাব-প্রচারের সহায় হইলেন। আর তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রবলবেগে প্রসারিত হইল। বিদ্যাসাগরের জন্ম এক শত বৎসর পূর্ব্বে বা এক শত বৎসর পরে হইলে, সমাজে তাঁহার এত সম্মান প্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ। সমাজে প্রতিষ্ঠা হয়, কালোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালনে। বিদ্যাসাগর তাহাই করিয়াছিলেন। নতুবা বল দেখি, অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া, হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন? দয়াময় কৃপা করিয়া, কাল ধর্ম্মসিদ্ধির মানসে তাঁহার হৃদয়ে পরদুঃখ-কাতরতার স্রোত এতই প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন যে, বংশপরম্পরাগত ধর্ম্মভাব ও শাস্ত্রজ্ঞান কোথায় ভাসিয়া গেল। বিধবার দুঃখ দেখিয়া বিদ্যাসাগর গলিয়া গেলেন। বহু-বিবাহে কুলীনকামিনীর ক্লেশ দেখিয়া তদ্বিমোচনে বিদেশী রাজার আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কি হইতে কি হইল? হিন্দুর বিবাহে কি পবিত্র সম্বন্ধ, ব্রহ্মচর্য্যের চরম উদ্দেশ্য কি, কোথা হইতে কোন্ মুখ্যধর্ম্মসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিরূপে ব্রহ্মচর্য্যে ব্যাঘাত পড়িল, কিরূপ ব্যাঘাতে সমাজের কি অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে, বিদ্যাসাগর তাহা বুঝিলেন না, তাঁহার অপার দয়া প্রবৃত্তি তাঁহাকে তাহা বুঝিতে অবসর দিল না। তাঁহার সেই দয়াগুণে তাঁহার পৈত্রিক ধর্ম্ম, শাস্ত্রশ্রদ্ধা সবই ভাসিয়া গেল। এইরূপ বিদ্যাসাগরের চরিত্রে দেখিবে, দয়াগুণেই,—আত্মনির্ভরতাগুণেই তাঁহার নিকট আর কিছুই তিষ্ঠিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর কালের লোক। কালধর্ম্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে; হিন্দুসমাজ বিশৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অপরাধ কি? যিনি তাঁহার হৃদয়ে এত দয়া—পরদুঃখকাতরতা দিয়াছিলেন, তিনিই জানেন, কেন এমন হইয়াছিল। নতুবা বড় কথা কহিতে চাহি না, বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম হয়, সে সময় ব্রাহ্মণের ঘরে নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করিত না, এমন লোক প্রায় দেখা যাইত না, কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্ব্বস্ব গায়ত্রী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব কোন্ স্রোতে বহিবে, করুণাময় বাল্যকালেই ইঙ্গিতে তাহার আভাস দিয়াছিলেন।

ইহাই বিদ্যাসাগরের চরিত্রনির্য্যাস। আন্তরিকতা ও একাগ্রতা সে চরিত্র-ভিত্তির মূল উপকরণ। হিন্দুসন্তান বিদ্যাসাগরের এই আন্তরিকতা ও একাগ্রতা

লইয়া, শাস্ত্রনিশ্চিত স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর হয়, ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। এই প্রার্থনা লইয়াই, "বিদ্যাসাগরে"র প্রকাশ।

প্রথম বৎসরের নবজীবনে কবিবর হেমচন্দ্র যে সরল ও সরস ভাষায় এবং সম্যক্ উপযোগী গ্রাম্য-উপমায়, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া, চরিত্র-চর্চ্চার উপসংহার করিলাম। কবি সংক্ষেপে কয়েকটী কথায় লিখিয়াছেন,—

"আস্‌চে দেখ সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যার সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষা-পথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞানবাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙ্গাল বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে সেঁকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরেজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস্',
টোল স্কুলের অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্।"

নিপুণ চিত্রকর বিশাল চিত্রপটে যেমন বিরাট মনুষ্যের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করেন, ক্ষুদ্র চিত্রপটেও সেইরূপ করিতে পারেন। মহাকবি হেমচন্দ্র ক্ষুদ্র কবিতায় বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সকল তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ধন্য কবি!

ইংরেজি রচনার নমুনা

To,
H. F. Blandford Esqr,
Hony. Secretary to the Trustees, Indian Museum.

Sir,

Having had occasion to visit the library of the Asiatic Society of Bengal, I called on the 28th January last, and as I wore native shoes, I was not admitted unless, I would leave my shoes behind. I felt so much affronted that I came back without an expostulation.

Whilst I was in the compound, I saw the native visitors, wearing native shoes, were made not only to uncover their feet, but also to carry their shoes with their own hands, though

there were some up-country people moving about in the museum room with their shoes on.

* * *

Besides, if persons so wearing shoes of the English pattern though coming on foot, could bc admitted with shoes on, I could not make out why persons of the same status in life and under similar circumstances should not be admitted, simply because they happened to wear native shoes. &c.

* * *

I have &c.
(Sd.) I. C. Sarma
5. 2. 74.

পরিশিষ্ট

জীবনান্তে আলোচনা

সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত নানা গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় ইংরাজিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। সে ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। নিম্নে সে ভূমিকার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশিত করিলাম। —গ্রন্থকার।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রমেশচন্দ্র দত্ত

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুন্দর জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই মাননীয় পণ্ডিতের যশ শুধু বাঙ্গালার মধ্যে আবদ্ধ নহে; উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রধান কর্ম্মবীর বলিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বত্রই বিখ্যাত। সার সেসিল বিডনের বন্ধু ও ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহযোগী এই উন্নতমনা বাঙ্গালীর মহৎ চরিত্র ও কীর্ত্তিকলাপের প্রশংসা করেন নাই, এরূপ ইংরাজ তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত ইংরাজিতে প্রণয়ন করিয়া শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তক এই সম্বন্ধে একটী প্রকৃত প্রভাব পূরণ করিবে।

ভারতের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ইংরাজ রাজত্ব ও ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এদেশে নব আশা, নূতন ভাব ও নূতন উদ্যমের সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যে ইহার পরিচয়।

এই দুই কর্ম্মবীরের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়, সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধীয় তাঁহার চূড়ান্ত কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ বা একেশ্বরবাদী হিন্দুসমাজ স্থাপন করেন ; পর বৎসর বালক, ঈশ্বরচন্দ্র, তাঁহার জীবনের কার্য্যোপযোগী বিদ্যাশিক্ষার্থ জন্মস্থান হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন, ইহার কয়েক বৎসর পরেই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন সমাপনান্তে দক্ষতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বিদ্যাসাগর' এই উপাধি লাভ করেন।

বিলাত হইতে যে সকল অল্পবয়স্ক সিবিলিয়ান এদেশে আসিতেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি এদেশীয় ভাষাসকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলস্‌লি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সে ইহার প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই পদপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সৌভাগ্য-গৌরব সূচিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি অতি অল্পই ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় প্রয়োজনবশতঃ তাঁহার উত্তমরূপে ইংরাজি ভাষা শিখিবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি সমবয়স্ক ও একাগ্রচিত্ত রাজনারায়ণ বসুর সহিত ইংরাজি শিক্ষা করেন। এই রাজনারায়ণবাবু পরে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের এই অংশ কতক-গুলি বিশেষ গুরুতর ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয়। তাঁহাকে এই সময় কতিপয় বিশিষ্ট ইংরাজ ও কয়েকজন দেশীয় কর্ম্মবীরের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাঁহারই সাহায্যে অল্পবয়স্ক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়েই তিনি হিন্দুসমাজের তৎকালীন নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট পরিচিত হন ও এই সময়েই অসাধারণ প্রতিভাশালী অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের প্রথম সূত্রপাত।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হয়। পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে যখন বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে একশত একটি

'হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়' স্থাপিত হইল, তখন সেই সমুদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-নির্ব্বাচনের ভার মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। এই প্রভূত ক্ষমতার পরিচালনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার উপর যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল, তিনি সর্ব্বোতোভাবে তাহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া যোগ্যতর ব্যক্তিকে উচ্চ পদলাভে সাহায্য করিতেন, তাহার একটি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, মার্শাল সাহেবের সুপারিশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ঐ পদে বেতন ৯০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে ৫০ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। তিনি কিন্তু ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হন ; কারণ তাঁহার বিবেচনায় প্রসিদ্ধ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ব্যাকরণ-শস্ত্রের অধ্যাপনায় যোগ্যতর ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ই ঐ পদে মনোনীত হইলেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে কলিকাতা হইতে কালনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় অতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে বলিয়াছিলেন, "ধন্য বিদ্যাসাগর! তুমি মানুষ নও, তুমি মনুষ্যাকারে দেবতা!"

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। তখন খ্যাতনামা বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ উদ্যমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সম্পাদকের পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করেন। বেতন বৃদ্ধি করা হইল না বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদে মনোনীত হইলেন। ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সংস্কারসম্বন্ধীয় তাঁহার কঠোর ব্যবস্থাসকল দেখিয়া রসময়বাবু পর্য্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাঁহার কতিপয় প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কৃতসম্বন্ধীয় একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। রসময়বাবু দেখিলেন, এক্ষণে তাঁহার

পদত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। তখন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ এক হইয়া প্রিন্সিপাল পদের সৃষ্টি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন ও তাঁহাকে ইচ্ছামত সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। তিনি বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের দ্বারা বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এই নূতন সহযোগীকে পাইয়া আনন্দসহকারে ইঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। যে সকল সহৃদয় ইংরাজ ভারতের উন্নতি কল্পে ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী পাইলেন। তিনি এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচলনে মন প্রাণ সমর্পণ করেন এবং এতদ্‌সম্বন্ধে মহানুভব বেথুন সাহেবকে অনেক সাহায্য করেন। বঙ্গের প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেড্‌রিক হ্যালিডে সাহেব তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর বেথুন স্কুল নামক বালিকা-বিদ্যালয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন এদেশে বাঙ্গালা ও ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লেখেন। এই রিপোর্ট পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে ২০০ টাকা বেতনে হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাসমূহের একজন বিশেষ ইনস্পেক্টাররূপে নিযুক্ত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের বেতন ৩০০ টাকাও পাইতেন। তিনি ঐ চারিটি জেলায় বালকবালিকাগণের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময়ে তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের নর্ম্ম্যাল স্কুলের কার্য্যেরও তত্ত্বাবধান করিতে হইত। তাঁহার একান্ত অনুরোধে অক্ষয়কুমার দত্ত নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্য চর্চ্চায় বিরত হন নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাঙ্গালা "শকুন্তলা" প্রকাশিত হইল। ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক "সীতার বনবাস" প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য ইহার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ঋণী।

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের ভাষা তেজোময়ী ও ভাবপ্রকাশক হইলেও অতীব জটীল ও দুর্ব্বোধ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও

অক্ষয়কুমার দত্তই যে আধুনিক মনোহারী বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করা হয় না। যে সকল ইংরাজ-লেখক রাজ্ঞী অ্যানের সময়ে ইংরাজি গদ্য বর্ত্তমান ছাঁচে ঢালিয়া ভাষার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় সাহিত্যসেবা বিষয়ে তুলনায় সমকক্ষ।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করিলেন যে, শাস্ত্রে হিন্দু-বিধবাদিগের চির বৈধব্য-বিধি নাই এবং বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বাঙ্গালার প্রত্যেক নগরে এবং প্রত্যেক গ্রামে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দাশরথি রায় এই নব্য সমাজ-সংস্কারককে ব্যঙ্গ করিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে উৎসবাদি উপলক্ষে বিধবা-বিষয়ক গান গাত হইতে লাগিল। শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা স্ত্রীলোকদিগের শাড়ীর পাড়ে এই সম্বন্ধে গান বুনিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মুখে কেবল এই কথা। অতঃপর এই সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব স্বয়ং গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন।

এই প্রবল ঝটিকার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অচল ও অটল। বিরুদ্ধ-মতসকল খণ্ডন করিয়া তিনি আর একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে তিনি যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই আন্দোলন প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নিজ মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর পুনর্বিবাহিত হিন্দু-বিধবাগণের সন্তানসন্ততিকে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ক আইন পাস হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ক্যানিং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন ইহার সভ্য সংখ্যা ৩৯ জন মাত্র। তন্মধ্যে কেবল ৬ জন এ দেশীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শেষ হইয়া আসিল। এডুকেশন কাউন্সিলের স্থানে ডাইরেক্টার অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন পদের সৃষ্টি হইল ও গর্ডন ইয়ং সাহেব প্রথম ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইলেন। ইনি একজন নবীন ও অল্পদর্শী কর্ম্মচারী। এস্থলে সেই পুরাতন নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাই হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত

শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারক, বাঙ্গালা শিক্ষার জন্মদাতা, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনকারী, একাগ্রচিত্ত সংস্কারক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক হইয়াও স্বদেশের শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। কারণ তিনি এ দেশীয়। আবার যিনি তাঁহার উপরে নিযুক্ত হইলেন, সেই গর্ডন ইয়ং সাহেব তাঁহার গুণগ্রহণে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু তাঁহার সহিত বিশেষ ভাল ব্যবহারও করিতেন না, এইরূপ শুনা যায়। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তাঁহার এতদিনের কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কোনরূপ পেন্‌সন বা পুরস্কারও পাইলেন না। তাঁহার কর্ম্মত্যাগ মঞ্জুর করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্ট যে পত্র লিখেন, তাহার শেষে লেখা ছিল, দেশীয় শিক্ষার জন্য তিনি যে দীর্ঘব্যাপী ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন।

ইহা অবশ্য অতিশয় সুখের বিষয় যে, এই কর্ম্মত্যাগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর অপর কার্য্যে দানশীলতার সুবিধা হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন যত দিন না বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সাধারণে বুঝিয়াছিল, ততদিন সাহিত্যিক হিসাবে বাঙ্গালায় তাঁহার সমকক্ষ অপর কেহই ছিল না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল পরোপকারী এবং আর্ত্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনকারী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান। তাঁহার পুস্তকের প্রভূত আয়—আর্ত্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখ দূর করিতে ব্যয়িত হইত, শত শত দরিদ্র-বিধবা জীবিকার জন্য ও শত শত অনাথ বালক শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহার নাম কীর্ত্তন হইত, কি ধনী—কি দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভালবাসিত।

যাঁহারা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাও ইঁহাকে ইঁহার সহযোগীদের ন্যায় মান্য করিতেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমিদারগণ এই শ্রদ্ধাস্পদ সরল অসম সাহসী ও অসীম দয়াবান্ পণ্ডিতকে সম্মানিত করিয়া আনন্দিত হইতেন। তৎকালীন ছোটলাট স্যার সেসিল বিডন এই অবসরপ্রাপ্ত, শিক্ষা-কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিতের সহিত প্রায়ই পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত এবং তাঁহার জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর আমি তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলাম

তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের কার্য্য-সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের উল্লেখ করিতে তিনি তখনও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। তিনি যাঁহাদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখনকার দিনে এক এক জন কর্ম্মবীর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই এই তালিকাভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর আমাদের জাতীয় কার্য্যের ইতিহাস আশার শুভ্র আলোকে সমুজ্জ্বল এবং ইহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে জড়িত।

আমি প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাত ভ্রমণের সঙ্গী হইতাম এবং কখনও কখনও তাঁহার সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতাম; তখন আমি তাঁহার সংগৃহীত ইংরাজি ও সংস্কৃত পুস্তকরাশি দেখিবার অনুমতি পাইতাম। তাঁহার কথাবার্ত্তায় তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের অনেক গল্পই শুনা যাইত এবং তাঁহার সরস রসিকতা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল।

আমি যখন আমার কর্ম্মস্থলে পুস্তকালয় স্থাপন করিলাম, তখন তিনি প্রায়ই স্বরচিত পুস্তকাবলী আমাকে প্রেরণ করিতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন আমি প্রতিবাদের ভীষণ ঝটিকার মধ্যে ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি, তখন মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় আমায় বিশেষরূপে সাহায্য করেন।

এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি প্রায়ই কলিকাতা ছাড়িয়া কর্ম্মটাঁড়ের বাটীতে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিতেন। তথায় সরল গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত এবং তিনি তাহাদের বিপদে আপদে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন; তিনি এই দরিদ্রদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার দয়ায় ইহারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে সকলই ফুরাইল, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আমাদের ছাড়িয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত

কলিকাতার টাঁকশালের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান সুলেখক সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতে কয়েকটী নূতন কথা লিখিয়াছেন। পর পৃষ্ঠায় তাহা প্রকাশিত হইল,—

সবিনয় নিবেদনমেতৎ—

আপনার প্রণীত বিদ্যাসাগর চরিতের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, এ সংবাদে আমি যার-পর-নাই প্রীতিলাভ করিলাম। এই নাটক-নভেল-প্লাবিত দেশে, এরূপ সারবান্ গ্রন্থের যে তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা রচয়িতা ও পাঠক উভয়েরই গৌরবের বিষয়। বিডাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আমার নিম্নলিখিত কয়েকটি গল্প আছে। এগুলি যদি আপনার সংগৃহীত গল্পগুচ্ছের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে (যদি আবশ্যক মনে করেন) নূতন সংস্করণে এগুলি ব্যবহার করিতে পারেন।

এক

কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বুদ্ধিহীনতা সম্বন্ধে কথা উঠিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"উনি কিরূপ বোকা জান ? এক চাষার বালক-পুত্র মাতার নির্দ্দেশে এক মুদির দোকানে এক পয়সার কড়ি কিনিতে গিয়াছিল। মুদী ব্যস্ত থাকায় বালককে বলে—'ঐ কল্‌সির ভিতর কড়ি আছে। কুড়ি গণ্ডা ভাগা দিয়া লও।' বালক ভাগা দিতেছে; এমন সময়ে মুদী ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল যে পাঁচটা করিয়া ভাগ হইতেছে। মুদী বলিল—'বেটা, পাঁচটা করিয়া গণ্ডা হয় ?' বালক থতমত খাইয়া উত্তর দিল—'আমি তো জানি না।' মুদী বলিল—'জানিস্‌নে ? আচ্ছা দেখ্।' এই বলিয়া সে তিনটা করিয়া ভাগ দিয়া বালককে কহিল, 'এই রকম কুড়িটা ভাগ করিয়া লও।' বালক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে মুদী জিজ্ঞাসা করিল—'দাঁড়িয়ে রহিলি যে ?' বালক মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল,—তা হ'লে মা যে ব'কবে !' ধনবান্‌টি সেই চাষা বালকের ন্যায় বুদ্ধিহীন।"

দুই

কলিকাতার কোন উচ্চ-পদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী পীড়িত হইলে, চিকিৎসক তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্মটাঁড়স্থ বাড়িটি কিছু দিনের জন্য চাহিয়া লইবার উদ্দেশ্যে রোগীকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন। চিকিৎসক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচিত, কিন্তু রোগী পরিচিত ছিলেন না। চিকিৎসক রোগীর পরিচয় দিয়া বলিলেন—"ইনি অতিশয় ভদ্রলোক।" বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন—"উঁহার সঙ্গে যখন আমার আলাপ নাই, তখন আপনার কথা স্বীকার করিয়া লইতে আমি বাধ্য। এ পর্য্যন্ত যাঁহাদের সহিত

আমার আলাপ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে তো বড় একটা ভদ্রলোক দেখিতে পাই নাই !"

তিন

বহুদিনের পর জনৈক সব-জজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কথায় কথায় জানিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে সব-জজ মহাশয় প্রথমা পত্নীর বিয়োগান্তে আবার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"তবে তো তোমার স্বর্গের দোর একেবারেই খোলা হে !" সব-জজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি রকম, মহাশয় ?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"তবে শোন, মরণের পরই মানুষমাত্রেই স্বর্গে প্রবেশ করিবার জন্য স্বর্গের দ্বারে হুড়াহুড়ি করে ; দ্বারপাল একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি পৃথিবীতে কি কার্য্য করিয়া আসিয়াছ ?" যাহারা পুণ্য কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, অপরগুলিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নরকে পাঠান হয়। জনৈক স্বর্গ-প্রার্থী এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন বিশেষ পুণ্য বা পাপ কার্য্যের পরিচয় দিতে পারিল না। কথায় কথায় দ্বারপাল জানিতে পারিল যে, সে ব্যক্তি বৃদ্ধ-বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ করিয়াছে। দ্বারপাল বলিল—"তুমি এখনই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পার, পৃথিবীতেই তোমার নরকভোগ হইয়া গিয়াছে !"

চার

কোন অনুগত কর্ম্মপ্রার্থীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার পরিচিত কোন লোকের অধীনে কোন কর্ম্মখালি থাকিলে, আমাকে জানাইও, আমি চিঠি দিব।" অনেক অনুসন্ধানের পর এক দিন সেই লোকটী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানাইল যে, টেলিগ্রাফ আপিসে অমুক সাহেবের অধীনে একটী কর্ম্ম খালি আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"সে সাহেবের সঙ্গে তো আমার আলাপ নাই, তাঁহাকে কেমন করিয়া চিঠি দিব ?" লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"তা হ'লে আর আমার আশা ভরসা কিছুই নাই।" এই বলিয়া সে ক্ষুণ্ন মনে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার কাতরভাব দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি রাস্তা হইতে সেই লোকটিকে ফিরাইয়া আনিয়া, টেলিগ্রাফ আফিসের সেই সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন, এবং তাঁহার নামে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মপ্রার্থীর অনুকূলে একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া দিলেন। লোকটি পত্রখানি লইয়া যাইবার পরে, পার্শ্বস্থ জনৈক বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি অপরিচিত সাহেবকে পত্র লিখিলেন কেমন

করিয়া ?" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দিলেন, "তাতে দোষ কি ? সাহেব যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, তাহলে গরিবটীর অন্ন-কষ্ট দূর হয়, আর যদি না করেন, তা হলে আমি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাতে আমার লজ্জা আর অপমানই বা কি ?" পরে জানা গেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া সাহেব আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং পত্রবাহককে প্রার্থিত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ত্বদীয়

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু

১০ই আশ্বিন, ১৩১৭ ১৬৭, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহান্তর হইবার পর তাঁহার স্মৃতি সম্মানার্থ যে কয়েকটি সভা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সভায় পঠিত প্রবন্ধের ভাব লইয়া বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যাহা আলোচনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

বিদ্যাসাগর যেমন বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগে অসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে যে শোকাচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও তেমনই অসাধারণ। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ যেন স্বজনবিয়োগ বেদনাবিধুর হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে সমগ্র দেশে এরূপ শোকাচ্ছ্বাস আর দেখা যায় নাই। ছাত্রগণ নগ্নপদে বিদ্যালয়ে গমন করিত, যুবকগণ বিদ্যাসাগরের নিকট আপনাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ স্মরণ করিয়া তাঁহার বিষয় আলোচনা করিত, প্রৌঢ়গণ তাঁহার গুণপরিচয় দিতেন। বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অল্প দিনের ব্যবধানে দুইজনের মৃত্যু হয়। উভয়েই বরেণ্য, উভয়েই বাঙ্গালীর ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল সব্যসাচী রূপে এক দিকে রচনায় ও অপর দিকে সমালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কৃতকর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের ছিল না। তাঁহার কার্য্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা কোবিদদিগেরই ছিল; এবং তাঁহার যশ স্বদেশে ও বিদেশে কোবিদ-সমাজেই আবদ্ধ ছিল। বিশেষ তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন—যে মত প্রতিষ্ঠিত করিতে জীবনব্যাপী শ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বাঙ্গালীর পক্ষে তাঁহার যশোমুকুটের হীরক দীপ্তিতে আপনাদের জাতীয় জীবনের সঞ্চিত অন্ধকার দূর করা সম্ভব হইলেও তিনি কেবল বাঙ্গালীরই ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের কথা স্বতন্ত্র। তিনি যে কার্য্য করিয়া সমগ্র ভারতে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন—যে

অসাফল্যকে তিনি সাফল্য অপেক্ষা অধিক আদরণীয় মনে করিতেন—সেই বিধবা-বিবাহ প্রচলনচেষ্টার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে তাঁহার স্বকার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি বাঙ্গালার শিক্ষাকে নূতন উন্নত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যখন পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীরা তাঁহারই "বর্ণপরিচয়ে" বাঙ্গালা বর্ণমালার সহিত পরিচিত। তখন "শিশুবোধকের" কথা বৃদ্ধদিগের স্মৃতিতে বিরাজিত; "বর্ণপরিচয়" ঘরে ঘরে পরিচিত। সেইজন্য তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী স্বজন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছিল।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর কয় বৎসর কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সকল সভায় রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। রজনীবাবু ও রামেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ 'সাহিত্যে', শিবাপ্রসন্নবাবুর প্রবন্ধ 'প্রয়াসে', রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ 'সাধনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের বিশেষ অধিবেশনে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক পঠিত একটী প্রবন্ধও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল উভয়ের শোকসভায় যেরূপ জনসমাগম হইয়াছিল, সভায় সেরূপ জনসমাগম তৎকালে সুলভ ছিল না। বাঙ্গালার ছোটলাট সে সভার সভাপতি ছিলেন। সে সভার বক্তৃগণ ও উল্লিখিত প্রবন্ধ-লেখকগণ সকলেই বাঙ্গালার শিক্ষাবিস্তারকল্পে বিদ্যাসাগরের কৃতকার্য্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার এই ক্ষেত্রে তাঁহার বিরাট্ কীর্ত্তি। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল—সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শ লোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন সৃজন করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে। বঙ্গভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে

বাঙ্গালা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা ঝুলিমাত্র, নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া, ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কার্য্যটীকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ব-বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে ;—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত, প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্য-কুশলতা দান করিয়াছিলেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল অতিক্রম করিয়া সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু যিনি সেই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।"

এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কৃত কর্ম্ম বিশেষত্বব্যঞ্জক। উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম,—"বিদ্যাসাগর মৌলিক রচনায় বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া "বর্ণপরিচয়" হইতে "সীতার বনবাস" পর্য্যন্ত নানা পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন। তিনি যদি মৌলিক উপায়ে ভাষা শিক্ষার পথ সুগম না করিয়া মৌলিক রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আজ বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি লক্ষ্য করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, বিদ্যাসাগর যশের আশায় দাঁড় ধরিয়া দ্রুত ফেনপুঞ্জমাত্রের সৃষ্টি করেন নাই, পশ্চাতে হাল ধরিয়া বঙ্গভাষার তরণীকে সাবধানে গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন ; তাঁহারই জন্য তরণী চড়ায় বাধে নাই, ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া নিমজ্জিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর একটা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর আপনি দেবতা সাজিয়া দাঁড়ান নাই ; দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আপনার যশোঘোষণা করিবার চেষ্টা করেন নাই ; অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে নিপুণতার সহিত বঙ্গভাষায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন ; ভক্তের মত তিনি সে মন্দিরের সোপান হইতে চূড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া আপনি তৃপ্ত হইয়াছেন। তিনি সে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা অবাধে সে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পূজা করিয়া ধন্য হইতে পারিতেছি। বিদ্যাসাগর যে মৌলিক রচনা না

করিয়া দেশের লোকের হিতের জন্য মৌলিক উপায়ে বঙ্গভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব ও স্বার্থত্যাগই প্রকাশ পাইয়াছে। যশোলাভের অপেক্ষা স্বার্থত্যাগের গৌরব অনেক অধিক। দধীচির গৌরব তপস্যায় নহে, স্বার্থত্যাগে—আত্মত্যাগে। সেরূপ তপস্যা অনেকের পক্ষে সম্ভব; সেরূপ স্বার্থত্যাগ নিতান্ত দুর্ল্লভ।"

রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন, "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম হয়," এবং "বিশ্বকর্ম্মা যেখানে সাত কোটি বাঙ্গালী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে দুই এক জন মানুষ গড়িয়া বসেন!" বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সেইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম! রামেন্দ্রবাবুও তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন, "এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কাঠের কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার পক্ষে একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন কেহ নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক যাহা কখন ক্ষমতার নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ মিথ্যাচার ও কপটাচার হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশের বাঙ্গালীর মধ্যে আবির্ভাব, একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইত, সন্দেহ নাই।" পরে স্বাভাবিক নৈপুণ্য সহকারে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে—ভারতে ও জগতের অন্য দেশে প্রভেদ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন:—"ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃত প্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।"

রজনীবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ! পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎকার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত অপেক্ষাও মহত্তর। যেহেতু তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তেজস্বি মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি দানশীলতা

প্রকাশের সহিত বিষয়বাসনা ও আত্মগৌরব ঘোষণার ইচ্ছা সংযত রাখিয়াছেন।''

যে সকল সভায় উপবিলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল, সে সকল সভায় জনসমাগমের অভাব হয় নাই। বিদ্যাসাগরের কথা শুনিতে বাঙ্গালীর আগ্রহের অন্ত নাই। এই আগ্রহেব আব এক প্রমাণ বিদ্যাসাগরের তিনখানি বিস্তৃত জীবনী রচিত হইয়াছে। আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই।

বিদ্যাসাগবের হিতৈষণা ও স্বদেশপ্রীতি লইয়া অনেক কথা শুনা গিয়াছে। এই Philanthrophy ও patriotism জিনিষ তুইটা আমাদের বহুদিনের; কিন্তু নাম তুইটা বিদেশেব। আমাদের দেশে লোকহিতৈষণা ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল—তাহার স্বতন্ত্র নামেব প্রয়োজন হইত না। যে সমাজে মানুষ সমাজেরই ছিল—সে সমাজে স্বদেশপ্রীতি স্বাভাবিক ছিল।

রামেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—"পাশ্চাত্যগণের মধ্যে ফিলান্‌থ্ পি নামে একটা পদার্থ আছে, তাহাব বাঙ্গালা নাম লোকহিতৈষণা। তাঁহাদের এই লোক-হিতৈষণাটী কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে সমগ্র মানবজগৎ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত। এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিকাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। ...বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলান্‌থ্ পিষ্ট বলিলে গালি দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের এবং এই মৌলিক বিভেদই তাঁহার চরিত্রকে পাশ্চাত্য চরিত্র হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের, বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাঁহার অধিকাংশই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটী অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।"

বিদ্যাসাগবের Patriotism সম্বন্ধে ১৩০৬ সালের ৪ঠা বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। —"দেশের হিত-সাধনকারী Philanthropist স্বতন্ত্র, আর কায়মনোবাক্যে

দেশের স্বীয় মাহাত্মের সমর্থনকারী Patriot স্বতন্ত্র। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য্য এবং মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন, তিনিই Patriot। তিনি যদি নেপোলিয়নের ন্যায় রুধিরস্রোতে দেশকে ভাসাইয়া দিয়া দেশের অহিত সাধন করেন, আর বলেন যে, দেশের মহত্ত্ব যদি না রহিল, তবে তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি Patriot। পক্ষান্তরে যাঁহারা কাটা ছাঁটা আঁটা মাটা পোষাক এবং দোকান-সাজানিয়া গৃহ-সজ্জাতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন; স্বদেশের কিছুই দুচক্ষে দেখিতে পারেন না; এমন কি, স্বদেশের সর্ব্ববাদি-সম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ-স্থানটীকেও যাঁহারা কেবল অন্যের দেখাদেখি নাক মুখ সিট্‌কাইয়া ভালবাসেন, বলেন—তা বই, তাহার ভালত্ব আপন চক্ষে দেখেনও না—দেখিতে জানেনও না; যাঁহারা স্বদেশের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, তাহা দূরে থাকুক, উল্টা আরো যাঁহারা স্বদেশকে নীচু করিয়া আপনারা উঁচু হইবার চেষ্টায় 'যাচিয়া মান' এবং 'কাঁদিয়া সোহাগের' কর্দ্দমাক্ত পথে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হন; তাঁহারা যদি দেশের 'মাথা হেঁট করা' দেহের যাঁতা চালাইবার উপযোগী মহামহা বহ্বাড়ম্বরে ব্যাপৃত হইয়া দেশ-হিতৈষিতার ধ্বজা উড়াইতে একমুহূর্ত্তও ক্ষান্ত না হন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাদিগকে Garibaldi বলিব না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ওরূপ Garibaldi ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে আমরা patriot বলিতেছি। তিনি যদি একশত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, শত সহস্র দরিদ্র লোককে অপরের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, দশ কোটি বিধবার মৃত সাধব্য পুনর্জ্জীবিত করিতেন, তাহা হইলে বলিতাম, তিনি মস্ত একজন philanthropist patriot। তাঁহাকে বলিতেছি আরেক কারণে, যখন তিনি Woodrow সাহেবের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লেখনী যন্ত্রদ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, হাঁ ইনি patriot, যেহেতু ইতি খাওয়া পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সারাংশ সমস্তই ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা বিদ্যাবিনয় দয়া-দাক্ষিণ্য-মহত্ত্ব এবং সদাশয়তা—সমস্তই আপনাতে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এ ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ সত্য সত্যই patriot ছাঁচে গঠিত। যখন দেখিলাম, যে এদেশের কিছু হইবে না' বলিয়া তিনি অকেজো মৌখিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংসর্গে বেমুখ হইয়া বাষ্পপদ, গদ্‌লোচনে গৃহকোটরে ঢুকিয়া

আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—দীপ্ত দীবাকর অল্পে অল্পে তেজেরশ্মি গুটাইয়া অস্তাচল শিখরে ত্বরে নত হইতেছেন. তখন বুঝিলাম যে, পূর্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোন একজন খ্যাতনামা patriot ছিলেন—পুনণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে পুঁজিতেছে।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সমাপ্ত